বিভাব

কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা

বিভাব কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা

৮৭

কোথাও এমনও মায়া রহিয়াছে

বিভাব

কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা

১৪১০

কিছু কথা

"হায়, গোলাপের মত বিস্মৃত ফুল আর নাই সমস্ত মুহূর্ত্ত যাহার অনিত্যতা; প্রথমে শুকায়
ধীরে ঝরিয়া চুপ, ক্ষণেকেই কোথাও ফুটিয়া উঠে, সমক্ষে থাকিয়াও চির-বিস্মৃত।
...এখন সকাল, একটি গোলাপের প্রতি বিলাসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; সে-গোলাপের পিছনে
অসংখ্য যোজন অবকাশ, চড়াই উৎরাই কখনও বা সমতল অনেক দূরে অজস্র
পাহাড়ের সারি — যাহা এখন গম্ভীর নীল।
...এখন রাত্র, রাত্র তাহার নৈসর্গিক বিহ্বলতা লইয়া দূর দূরান্ত...
রূপার পাত্রে এখন সে গোলাপ...সম্মুখেই ক্ষুদ্র একটি শূন্যতাকে বন্দী করিয়া নির্ব্বিকার...
কখন যে ভোর হইল বিলাস তাহা দেখে নাই; সহসা দেখিল পূর্ব্ব দিককার
বারান্দার আরাম কেদারায় ছোট্ট একটু আলো শুইয়া আছে।"

উপরের অংশটি একটি গল্পের সামান্য উল্লেখ মাত্র, যে গল্পের নাম 'গোলাপ সুন্দরী', লেখক কমলকুমার মজুমদার। যদিও এটি একটি নিছক গল্প, তবু এর গতি, ছন্দময়তায় উচ্ছল। সে উচ্ছলতায় লেখক কিন্তু তাঁর সাবলীলতাকে বজায় রেখেই, তাঁর সৃজন-সক্ষম নূতনত্বের কাব্যময় পরিভাষাকে একনিষ্ঠভাবেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন শেষ পর্যন্ত। অবশেষে রূপে, রসে, নিটোল হয়ে উঠেছে সে উচ্ছলতা, তার সীমায়িত রেখায়। এবং কখনও বা গল্পের এই ছন্দময়তা, কল্পনার ছবিকে এখানে ওখানে বাস্তবে মূর্ত করেও তুলেছে।

লেখক কমলকুমারের লেখক জীবনের শুরুতেই ছিল তাঁর অসাধারণ জ্ঞান সঞ্চয়ন — শুধু সাহিত্যেই নয়—ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, অঙ্কন ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর ছিল অপূর্ব অভিজ্ঞান। এ কারণে — ব্যতিক্রমী নূতনত্বের সৃষ্টিক্ষম এক প্রচেষ্টা তাঁর মনে সবসময় থাকতই।

এসব সত্ত্বেও গল্প বলা বা আড্ডা জমানোর দক্ষতা তো ছিলই, যার ফলে আড্ডায় আড্ডায় তাঁর জন্য থাকত বিশেষ প্রতীক্ষা। সেখানে শুধু সাহিত্য ইত্যাদি নিয়েই যে আড্ডা জমে উঠত তা নয়। লঘু রস-রসিকতাও যথেষ্ট হত এবং খাদে নেমে তারপর আবার তৎক্ষণাৎ গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে একেবারে পঞ্চমে উঠে যাওয়ার ক্ষমতা বা শিল্প চাতুর্য ছিল তাঁর অধিগত।

লেখকজীবনের প্রথম থেকেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। আর এই ঘনিষ্ঠদের সাগ্রহ রচনা আদায়ের চেষ্টার ফলে কোনও কোনও লেখাও কমলকুমার মজুমদার তাঁদের দিতেন। তবে তখন থেকেই আরম্ভ হয় স্বপক্ষে-বিপক্ষে, আলোচনা-সমালোচনা। অবশ্য বিরুদ্ধ মতামতের পাল্লাই ভারী হয়ে ওঠে। সেই সময়ে একেবারে 'কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব' হয়ে ওঠেন তিনি। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁর নূতনত্বকে অর্থাৎ তিনি যে অধরাকে ধরার চেষ্টা করছেন, সেটা তখন একটা অস্পষ্টতার দুর্ভেদ্য ধোঁয়াশা হিসাবেই গণ্য হত।

তবে কমলকুমারের এগিয়ে চলার পথে এসবের কোনো প্রতিক্রিয়া বাধা সৃষ্টি করেনি।
তাই বরাবরই তিনি তাঁর নিজস্ব নিষ্ঠার সঙ্গেই চলেছিলেন।
তারপর —
সহসা কোনো একদিন, দূরে কাছে, দূরান্তের ঝোড়ো হাওয়ায়...ব্যতিক্রমী এক অঘটন
যেন চমকেই স্থির, — দুর্ভেদ্য ধোঁয়াশার অস্বচ্ছতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল,
ঘনিষ্ঠ কণ্ঠের...স্বাগত ধ্বনি, নূতনত্বের অভিষেক....!

জীবনের চরৈবেতি পথ পরিক্রমায় ক্লান্ত-পথিক
কমলকুমার তখন 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ...' এরই শেষ সংজ্ঞায়
উপলব্ধিতে ভরপুর, এক অবিচল আত্মা।
সেদিন গোধূলির আলো - আঁধারে ছায়াচ্ছন্ন অবকাশে,
ইহজাগতিক সব পাওয়া না পাওয়া শেষ ক'রে সমাপ্তির পথে,
শুধু একটি প্রত্যাশাই হয়ত তখন লেখক কমলকুমারের মনে জেগেছিল —

"মাগো...
গঙ্গা যমুনার চিরসঙ্গমস্থল—
তোমার চরণে
আমার আত্মা উড়িয়া যাক

...গো আনন্দময়ী নিরানন্দ ক'রো না।"

'বিভাব' পত্রিকার এই বিশেষ 'কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা'টির
সমস্ত কাজ করেছে অল্পবয়সী দুটি সাহিত্যপ্রেমী — যাদের
অন্তরঙ্গ নিষ্ঠায় এ এক বিরাট কৃতিত্ব।
প্রয়াত কমলকুমার মজুমদারের
সাহিত্য এবং শিল্প সাধনার সম্ভারগুলি, যা আজ আর ফিরে দেখার সম্ভাবনাই ছিল না,
রাহুল সেন এবং অদ্রীশ বিশ্বাসের সযত্ন প্রয়াসে এবং একান্ত অধ্যবসায়ের মূল্যে
সংগৃহীত হয়েছে সেই সব লুপ্তপ্রায় কাজগুলি।

সমগ্র সংখ্যাটির মুদ্রণ, বিশেষত ব্যবহৃত ফোটোগ্রাফ
এবং তাঁর আঁকা চিত্রগুলি, সব কিছুই যেন এক অসাধারণ দৃষ্টিনন্দন সাফল্য।
তাই আমি এদের মূল্যবান প্রয়াসকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি
এবং সেই সঙ্গে রইল আমার শুভ কামনা।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০

দয়াময়ী মজুমদার

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা
১৪১০

সূচি

কিছু কথা — দয়াময়ী মজুমদার তিন
সবিনয় নিবেদন সাত

চিত্রাবলী ও আলোকচিত্র

কমলকুমার অঙ্কিত বহুবর্ণ ছবি চিত্রাবলী/১-১৬
কমলকুমার অঙ্কিত সাদা কালো ছবি চিত্রাবলী/১৭-১৯
চিত্রাবলী ও আলোকচিত্র সম্পর্কে তথ্য চিত্রাবলী/২০
কমলকুমারের অপ্রকাশিত আলোকচিত্র আলোকচিত্র/১-১২

বিবিধ রচনা

কলকাতার গঙ্গা ৩
ভারতে মুদ্রণ শিল্প ৭
ছাপাখানা আমাদের বাস্তবতা ৮
সিংহ শিকারে বিপদ ১৮
ভারতের সিংহ ২১
লেখা বিষয়ক ২৪
পরিপ্রেক্ষিত ২৭
নির্বাচিত বই ২৮
ইদানীন্তন শিক্ষা প্রসঙ্গ ৩০
বাকপটু চিত্রশিল্পী ৩৩
অবনীন্দ্রনাথের শেষের কাজ ৩৩
পাঁচমুড়ার মাটি ৩৫
পটকথা ৩৭
বাঙ্গালার টেরাকোটা ৪১

তথ্যচিত্র

লোকশিল্পে টেরাকোটায় রামায়ণ (রামায়ণ গান ঃ সংযোজন) ৪৪
বাংলার টেরাকোটা ৪৯
বাংলার সাধক ৫২

গল্প

স্বাতি নক্ষত্রে জল ৫৪

অন্যান্য

নাটকের প্রচারপত্র, প্রবেশপত্র ৬৩-৬৫
কমলকুমার অঙ্কিত ছবি ৬৬-৬৮

বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্ক ভাবনা *প্রথম খণ্ড* ১
অঙ্ক ভাবনা *দ্বিতীয় খণ্ড* ৫৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনীশ দেব
অভিজিৎ নাথ
অরণি বসু
ইন্দ্রনাথ মজুমদার
এককড়ি ভট্টাচার্য
গৌতম বসু
দয়াময়ী মজুমদার
দীপ সাউ
ড. দীপককুমার রায়
(যাদবপুর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)
পম্পা গোস্বামী
পার্বতী মুখোপাধ্যায়
প্রদীপ রায়চৌধুরী
প্রশান্ত মাজী
বিমান সিংহ
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র
মালা চক্রবর্তী
মিহির চক্রবর্তী
রজত সেন
রত্না বসু
রাম রায়
শানু লাহিড়ী
শুভ মুখোপাধ্যায়
শুভ্র মিত্র
শ্বেতা গুহ
শ্যামলবরণ সাহা
শ্রীপান্থ
সন্দীপ দত্ত
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুব্রত রুদ্র
হিরণ মিত্র
আনন্দবাজার পত্রিকা
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার
জাতীয় গ্রন্থাগার (আলিপুর)
দেশ
পারফেকশন
বর্ণনা
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বালি সাধারণ গ্রন্থাগার
বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
রামমোহন সাধারণ গ্রন্থাগার
রেসপন্স
লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
সুবর্ণরেখা
সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুল

প্রধান সম্পাদক : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
আমন্ত্রিত সম্পাদনা সহযোগী : অদ্রীশ বিশ্বাস
সম্পাদক : রাহুল সেন

সম্পাদকমণ্ডলী :
পবিত্র সরকার। অশোক মুখোপাধ্যায়। প্রদীপ দাশগুপ্ত
শান্তিনিকেতন
অনাথনাথ দাশ। অরুণ মুখোপাধ্যায়। স্বপনকুমার ঘোষ

প্রচ্ছদ
হিরণ মিত্র
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত বিভাবের প্রতীকচিহ্ন : অনুপ রায়
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি (একাংশ) : কমলকুমার মজুমদার (আইকম বাইকম)
প্রচ্ছদের রূপারোপ : অভিজিৎ নাথ

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল), কলকাতা-৬৮। দূরভাষ - ২৪৭৩ ৩৬০০

বাঁধাই : আতোয়ার হোসেন (লিপিরাজ বাইন্ডিং ওয়ার্কস)

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম (কলেজ স্ট্রিট),
ইস্টার্ন বুক এজেন্সি (৮/সি টেমার লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির কাছে।)

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৬৮ থেকে প্রকাশিত, 'বর্ণনা', ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২ থেকে অক্ষরবিন্যস্ত ও 'বর্ণনা প্রকাশনী', এ/১২৫ বাঘাযতীন আই ব্লক ক্রশিং, কলকাতা-৯২ থেকে মুদ্রিত।
বহুবর্ণ ছবি মুদ্রণ - লাইন অ্যান্ড টোন প্রা.লি., আলোকচিত্র মুদ্রণ - দিলীপ প্রিন্টিং, পরিস্ফুটন ও স্ক্যানিং - এস.জে.পারফেকশন প্রা.লি.।

সবিনয় নিবেদন

'কথা এক ইশারা বটে'

এই উক্তি যাঁহার, তাঁহার নাম কমলকুমার মজুমদার। কমলকুমার রচিত প্রতিটি পঙ্‌ক্তি, বাক্যগঠনপ্রণালীই ছিল বিবিধ ইশারাপূর্ণ। বস্তুত সাহিত্যের নিকটকালের ইতিহাসে কমলকুমার মজুমদারের ন্যায় বহুবন্দিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয়রহিত। এই অসীম প্রতিভাধর মানুষটির বিচিত্রপথগামী সৃজনকর্মের নানান দিক লইয়া ইতোমধ্যেই বহু নিবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু সেই প্রবাহে এখনো তেমন পলি জমে নাই। যে সর্বস্বপণ অনুধাবন ও গবেষণামনস্কতায় কমলকুমার প্রকৃত আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারিতেন, অপটু তল্লাস ও উৎসমলিন উল্লাসে তাহা অদ্যাবধি হইতে পারিল না। এই ক্ষোভই আমাদের এই সংখ্যা প্রকাশে প্রণোদিত করিয়াছে ও উদগ্র রাখিয়াছে। তবে ইহাও ইশারা মাত্র। কমলকুমারের বহুগামী প্রতিভার বহু অন্যপূর্ব দিক, অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত রচনা ও নানাবর্ণ চিত্রাঙ্কন বহুল পরিমাণে আমাদের সংগ্রহে আসিয়াছে। এইসব উপাদানের মিতপরিমাণই এ সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। অনতিবিলম্বেই বিভাবের কোনো সন্নিকট সংখ্যায় আরো বহু বিস্ময়কর সৃজন পাঠকের কাছে উপস্থাপন করিব।

জাঁ রেনোয়া বলিয়াছিলেন ('হরিসাধন দাশগুপ্ত' স্মারক গ্রন্থ) কমলকুমার সদৃশ ব্যক্তিত্বদীপ্র গুণধর মানুষ বঙ্গভূমে তিনি আর দ্বিতীয়টি দেখেন নাই। সিনেমাকর্ম সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিবার আগে রেনোয়া জানাইলেন — কমলকুমারের স্মৃতি তাঁহার আজীবনের সম্পদ হইয়া থাকিবে। বহু অনুরোধ উপরোধে সত্যজিৎ রায় কমলকুমারকে 'পথের পাঁচালী' দেখাইয়া মন্তব্য প্রার্থনা করিলে কমলকুমার অতি সংক্ষেপে মাত্র দুটি বাক্য উচ্চারণ করিলেন। মৃত্যুর পর কমলকুমারের স্মৃতি উস্কাইয়া সত্যজিৎ রায় প্রায় আভূমিনত শ্রদ্ধায় খেদ জানাইয়া লিখিলেন — গ্রামজীবন লইয়া ছবি করিয়া কমলকুমার মজুমদারকে খুশি করার ক্ষমতা তাঁহার নাই (*সমতট* - কমলকুমার সংখ্যা)। পরে লেখাটি সত্যজিৎ কর্তৃক মার্জিত হইয়া বিভাবেই পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই যে সমীহ তাহা কমলকুমার সদৃশ মহা ব্যক্তিত্বের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব! আসলে ব্যক্তিমানুষটি ছিলেন একই সঙ্গে উদার, বৎসল ও অনতিক্রমনীয়। যাঁহারা তাঁহার চৌম্বক সাহচর্যে আসেন নাই তাঁহারা কমলকুমারের রচনা পড়িলেও অন্তর্নিহিত গভীর ইশারাগুলি তেমন সহজে বুঝিবেন না, যাঁহারা জয়েসের 'ইউলিসিস' বোঝেন নাই, তাঁহারা অনেকেই 'ডাবলিনার্স' বুঝিবেন। অর্থাৎ বিখ্যাত লেখকদের প্রতিটি রচনাই সহজগম্য নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক, ইহা তো আমরা জানিই। কবি কে? জীবনানন্দ এই প্রসঙ্গে যে সমধর্মী বাক্যবন্ধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা শুনিতে ভাল লাগিলেও নতুন কথা কিছু নয়। মাত্র পঞ্চাশজন পরিশ্রমী প্রস্তুত পাঠক চাহিয়াছিলেন কমলকুমার। তাঁহার সেই বাঞ্ছা যে পূর্ণ হয় নাই ইহা আমাদের পক্ষে অতীব আনন্দের বিষয়। যিনি লেখকজীবনের শুরুতে চলতি ভাষার রচনায় আমাদের আপ্লুত করিয়াছিলেন তিনি কেন হঠাৎই একদিন দুর্গম ভাষাপন্থা বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহা জানিতে হইলে দীর্ঘকাল তাঁহার ভাষাপথকে অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই এই প্রতিভার বহুকৌণিক রূপগুলি পাঠকের চেতনায় মিশিবে। কমলকুমারের ভাষাশিল্প, বাক্যগঠনপ্রণালী এবং ক্যানভাসে রঙ-আরোপ প্রণালীর অসংখ্য নিদর্শন এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

অবশ্যই জানানো প্রয়োজন মুদ্রিত ও অগ্রন্থিত এবং অধুনা প্রায় বিস্মৃত কমলকুমারের বহু রচনা প্রায় চার দশক পরে আবার এখানে একত্রিত হইল, যাহাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ পাঠকই অবহিত ছিলেন না। কয়েকটি লেখার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সংখ্যাটির সামগ্রিক মেজাজের সহিত সেগুলি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা! তাহারা, দুষ্প্রাপ্যতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্যই এখানে মুদ্রিত হইল। তথ্য সংকলন ও প্রতি স্তরে তাহাদের যথার্থতা নির্ণয়, শহরে ও গ্রামগঞ্জে অসংখ্য লাইব্রেরীগমন, সব মিলিয়া বহু সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, ফলে সংখ্যাটির প্রকাশ বারংবার বিলম্বিত হইয়াছে।

চিত্রসমালোচনা প্রসঙ্গে কমলকুমার একবার লিখিয়াছিলেন — ক্যানভাস এক বিশাল শূন্যতা। রঙের ব্যবহার জানিতে হয়, না হইলে ওই সাদা শূন্যতায় উহারা বড় কলরব করে। কমলকুমারের যে রঙীন ছবিগুলি এই সংখ্যার পাঠকেরা জীবনে প্রথমবারের মতন দেখিবেন, তাহারা কলরবের বদলে নূপুরনিক্বনশব্দ অবশ্যই যে শুনিতে পাইবেন তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই। কয়েকটি ছবি (কমলকুমার কখনোই খুব দামী রঙ ও কাগজ ব্যবহার করিতেন না!) সময়ের চিহ্ন লাগিয়া কিছুটা ম্লান হইয়াছে। কমল-ভগ্নী বিখ্যাত শিল্পী শ্রদ্ধেয়া শানু লাহিড়ী তাহার অমূল্য কমল-সংগ্রহ আমাদের উজাড় করিয়া দিয়াছেন। দিয়াছেন বহু দুর্লভ মুহূর্তের ফোটোগ্রাফ যাহার সিংহভাগই পূর্বে অদেখা।

এই সংখ্যা প্রকাশে একজনের কথা না বলিলে এই নিবেদনই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি হইলেন কমলকুমারের মানসপুত্র প্রয়াত কবি সুব্রত চক্রবর্তীর পত্নী শ্রীমতী মালা চক্রবর্তী। স্বামীর কমলকুমার বন্দনা, মালার মধ্যেও সমভাবে বর্তাইয়াছে। কি অসীম সমাদরে যে তিনি কমলকুমারের ছবিগুলি রক্ষা করিতেছেন তাহা দেখিলেও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইবে। একই সঙ্গে আরো একটি কথা সঙ্গতভাবেই মনের মধ্যে বসতি করিল। এই সংখ্যা পাঠ-সমাপ্ত করিবার পর কোনো কোনো পাঠকের মনে একটি দোলাচল অবশ্যই উদিত হইতে পারে। দোলাচলটি হইল অক্ষরশিল্পী কমলকুমার ও নবউন্মোচিত চিত্রশিল্পী কমলকুমার, প্রতিভার তুল্যমূল্যে এবং শিল্পবিচারে কে বুকের বামপ্রান্ত বেশি অধিকার করিবেন! এই সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনার পরই সবিস্ময়ে দেখিলাম কমলকুমার-আসক্ত বহু সুজন আমাদের অতি সন্নিকটেই ছিলেন। এতাবৎ যাঁহারা কমলকুমারের গবেষণাগর্বী, মনে হয় তাহাদের তল্লাসে নিশ্চয় কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল। যাহা হউক,

বিভাব ইহাদের সকলকেই সমান গুরুত্ব দিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। আলাদাভাবে প্রায় সকলের নামই সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে কয়েকজনের নাম এখানে আলাদাভাবে উল্লেখ করিতেছি, কেন না ইতোপূর্বে যাঁহারা নানাভাবে কমলকুমার প্রসঙ্গে বিশেষ স্মৃতিগর্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের কাছেও কমলকুমার শুধু তন্মাত্র ধরা পড়িয়াছেন। এখনো অতি-বিস্তৃত অনুসন্ধানের প্রয়োজন। সমস্ত রকম সৌখিনতা পরিহার করিয়া প্রয়োজন তরুণ নিবেদিতচিত্ত কিছু গবেষকের। শুনিলাম কমলকুমারের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি ট্রাস্ট গঠিত হইয়াছে। বাঙালির কাছে ইহা অতি আনন্দদায়ক সুসংবাদ। আমরাও যথাসম্ভব সেবা করিবার আশা রাখি। তবে কিঞ্চিৎ শংকার ফল্গুও যে রহিয়াছে, আগের কয়েকটি লাইনে তাহার প্রকাশ ঘটিল।

এই সংখ্যার প্রতিটি অক্ষরে আমন্ত্রিত সম্পাদনা সহযোগী অদ্রীশ বিশ্বাস ও বিভাবের মূল সম্পাদক রাহুল সেন-এর স্নায়ুবিবশকারী শ্রম রহিয়াছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সংগ্রহই নহে, লেখাগুলিকে বিষয়ানুক্রম ও যথাসম্ভব কালানুক্রমে সাজাইয়া দিয়াছেন অদ্রীশই। 'টুকরো কথা' সংখ্যাটির মতো এই সংখ্যার নির্মাণেও সৌম্যেন পালের অবদান অপরিসীম। রঙীন ছবিগুলির প্রতিলিপি তিনিই তাহার ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়া তুলিয়া দিয়াছেন, ফলে এই সংখ্যার অভ্রভেদী ব্যয়ের কিছুটা সাশ্রয় হইয়াছে।

শুভ মুখোপাধ্যায় আরেকটি কমলআপ্লুত মানুষের নাম। সাউথ-পয়েন্ট স্কুলের এই কবি-গ্রন্থাগারিক বহু অমূল্য অজানা আলোকচিত্র ও রঙিন ছবি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন এবং বিভিন্ন তথ্যের সূত্র দিয়াছেন। নিজ সংগ্রহ হইতে কয়েকটি বহুবর্ণ ছবি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রকাশনার বিভাগের প্রাক্তন প্রধান শ্রীবিমান সিংহ। ইহা ছাড়াও অন্যান্য আরো বহু প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

নানাভাবে ব্যক্তিগত সাহায্য করিয়াছেন প্রশান্ত মাজী। ইন্দ্রনাথ মজুমদার ও কমলকুমারের নাম কমলকুমারের জীবিতকালে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হইত। কমলকুমারের এই মন্ত্রশিষ্য অনুচর যে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি!

'অঙ্ক ভাবনা' অংশের টীকা রচনায় তাঁহাদের অমূল্য সময় ব্যয় করিয়া আমাদের বাধিত করিয়াছেন রত্না বসু, অনীশ দেব, মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র এবং মিহির চক্রবর্তী। কমলকুমার অঙ্কিত চিত্রাবলী ও আলোকচিত্রগুলিকে মুদ্রিত অবস্থায় রূপান্তরকরণে প্রভূত শ্রম নিবেদন করিয়াছেন স্নেহভাজন শ্রীমান অভিজিৎ নাথ।

এই সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভবই হইত না যদি না শ্রদ্ধেয়া দয়াময়ী মজুমদারের অনুমোদন ও সস্নেহ প্রশ্রয় আমরা পাইতাম। কমলকুমারের আরো বহু রচনা যাহা আমাদের নিকট রহিয়াছে এবং আরো বহু অনাবিষ্কৃত রচনা যাহার সন্ধান সিংহভাগ কমলপ্রেমী পাঠকরা জানেনই না, আমরা তা উদ্ধার করিতে পারিব বলিয়া কৃতসংকল্প ও আত্মবিশ্বাসী। এই রচনাগুলি ভবিষ্যতে আমরা দয়াময়ী মজুমদারের হাতে তুলিয়া দিতে পারিব বলিয়া স্থির আশা রাখি।

আরেকটি জরুরী কথা জানানো অবশ্যই প্রয়োজন। তাহা হইল এ যাবৎ মুদ্রিত, অর্থাৎ যাহা এখনো বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, সেগুলি ছাড়াও বহু অগ্রন্থিত রচনা, যাহা ইতোপূর্বে একবার মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহারা এখানে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল — কোনো কোনো স্থানে তাহাতে প্রবল অসংগতি রহিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার কারণ মুদ্রণপ্রমাদ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতি সাধারণ-শিক্ষিত কম্পোজিটরের অজ্ঞানতার ফসল। আমরা যথাসাধ্য কমলদা লিখিত বানান বজায় রাখিয়াছি। ইতস্তত বানানের কিঞ্চিৎ পরিমার্জনার প্রয়োজন হইয়াছে। তবে একবিন্দুও নিজেদের ধ্যানধারণা আরোপ করি নাই।

এই সংখ্যায় পাঠকদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় একটি অংশে কমলকুমার বিরচিত দুইটি প্রকাশিত তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্যের বিস্তৃত মূল পাঠ ও একটি অপ্রকাশিত তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্য মুদ্রিত হইল। শ্রী ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্য ও শ্রীপান্থের উদারতায় এই মুদ্রণ সম্ভব হইল। এই প্রসঙ্গে যাবতীয় তথ্যের আকর ফাইলটি সযত্নে রক্ষিত ছিল শ্রীপান্থের কাছে। তাহাদেরও জানাইতেছি বিনম্র কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে একটি কথা। আমার এই রচনা যে কোনো সংজ্ঞাতেই সম্পাদকীয় নয়, তাহা জানানো বাহুল্যমাত্র। কমলকুমারকে সম্পাদনা আমার ইহজীবনের সাধ্য নহে। তাই এই লেখার শিরোনাম 'সবিনয় নিবেদন'। এই নিবেদনে যদি বিনয়ের কোনো ঘাটতি ঘটিয়া থাকে তাহার জন্য পাঠকের নিকট অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থনা জমা রাখিতেছি। মূল সম্পাদকের অবর্ণনীয় পরিশ্রমের স্বেদ এই সংখ্যার প্রতিটি অক্ষরে লাগিয়া আছে। আশা করি পাঠকেরা এই সংখ্যা পাঠে তাহা অনুভব করিবেন এবং এই মহীরূহসম প্রতিভাসম্পন্ন মানুষটির প্রতি আরো বেশি আকর্ষিত হইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গীণ মূল্য নিরূপণে অবশ্যই চাঞ্চল্য অনুভব করিবেন। সময়সাপেক্ষ হইলেও তাহা অবশ্যকৃত্য।

এই ধরনের সংখ্যা প্রকাশ করিতে যে পরিশ্রম ও সর্বভুক অনুসন্ধানমনস্কতার প্রয়োজন ছিল, মানুষসাধ্য শ্রমে তাহা আমরা করিয়াছি ও ভবিষ্যতেও করিব। এ কারণেই এই সংখ্যাটির প্রকাশে এত বেশি বিলম্ব ঘটিল।

পরিশেষে বলি তবু 'কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল'......

বিভাবের আগামী সংখ্যাই বিশেষ কবিতা সংখ্যা।

নিবেদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

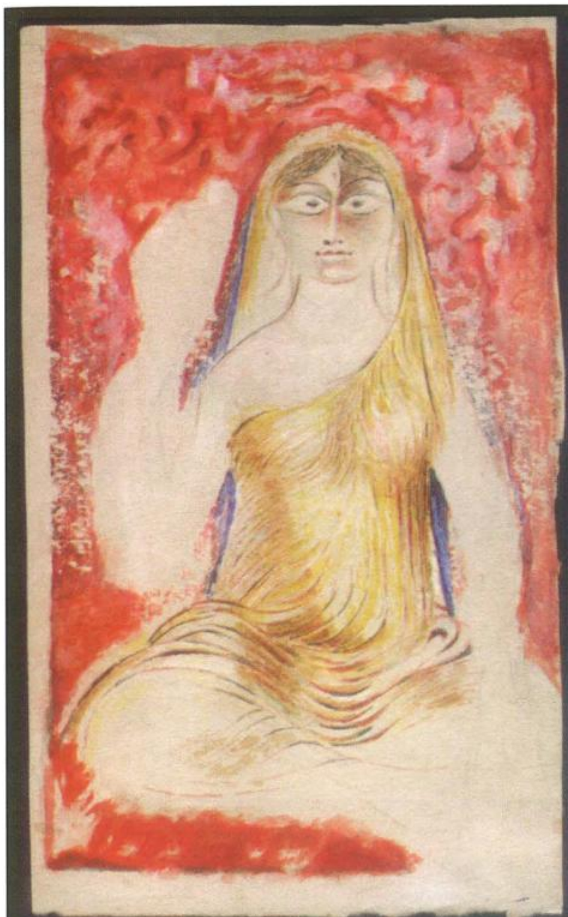

১.

২.

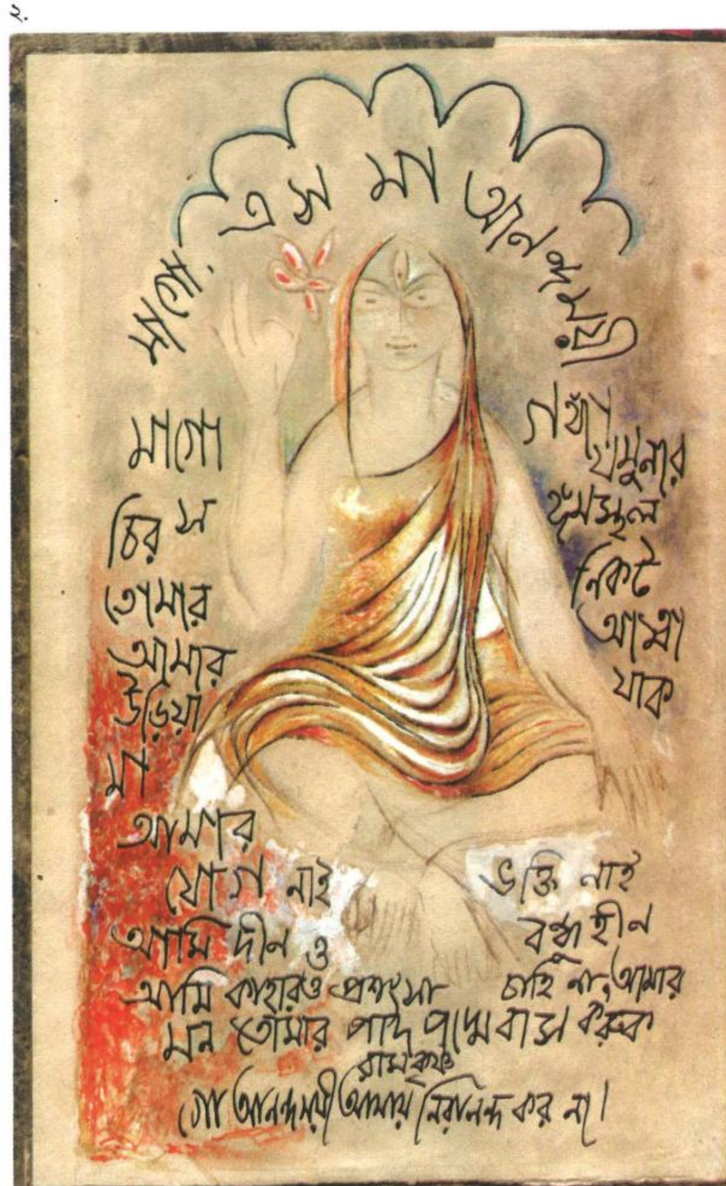

মুদ্রণ ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

৩.

৪.

৫.

৬.

৭.

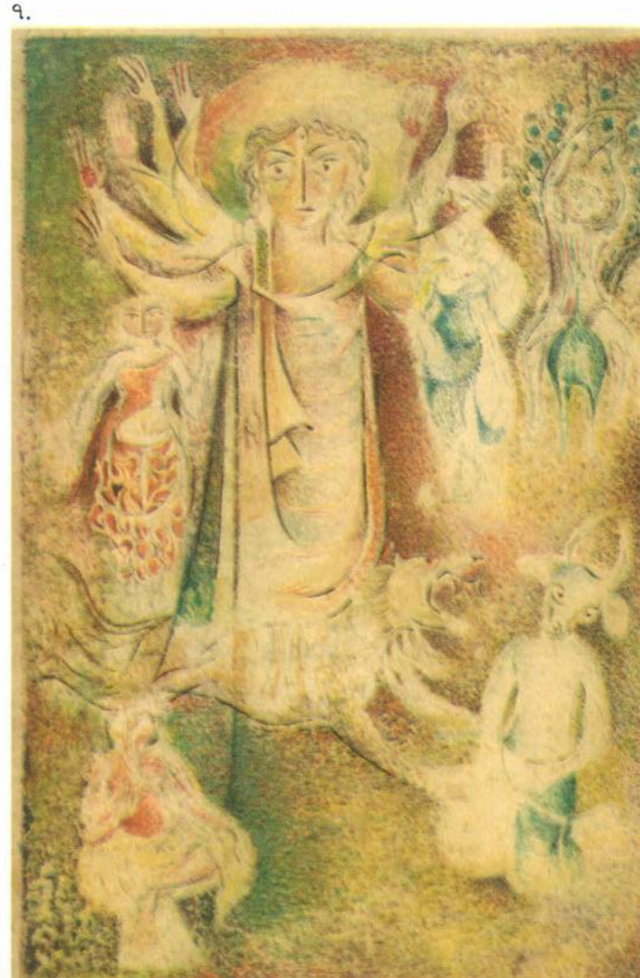

মুদ্রণ ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

৮.

১০.

৯.

১১.

মুদ্রণ ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

১২.

১৩.

১৪.

১৫.

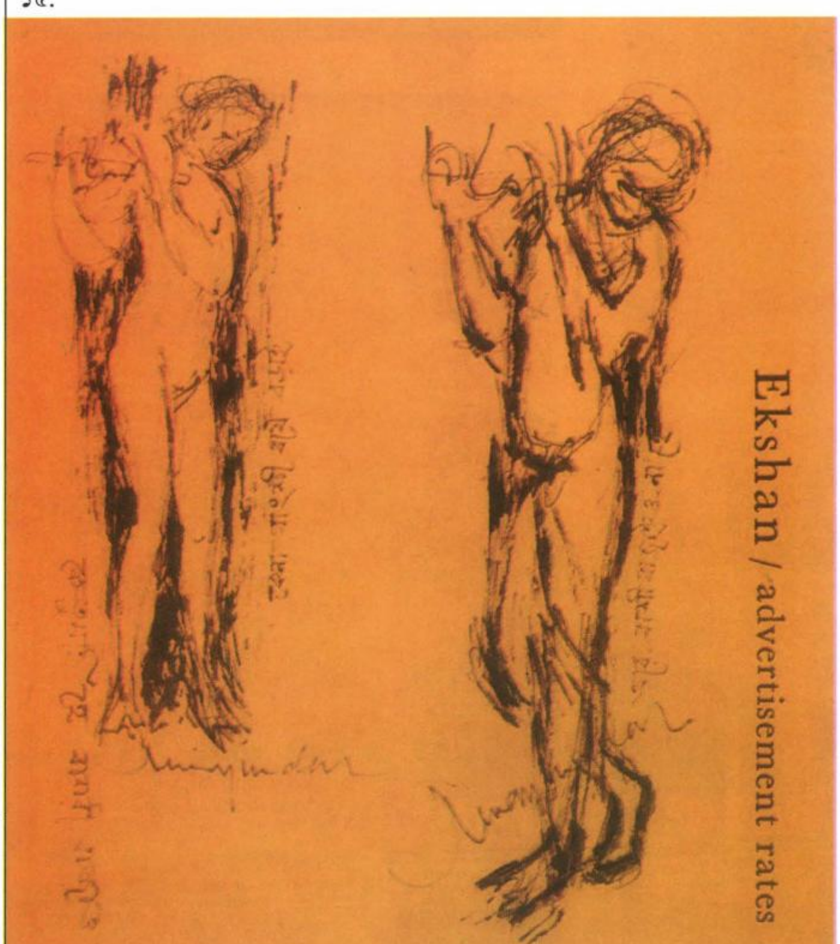

১৬.

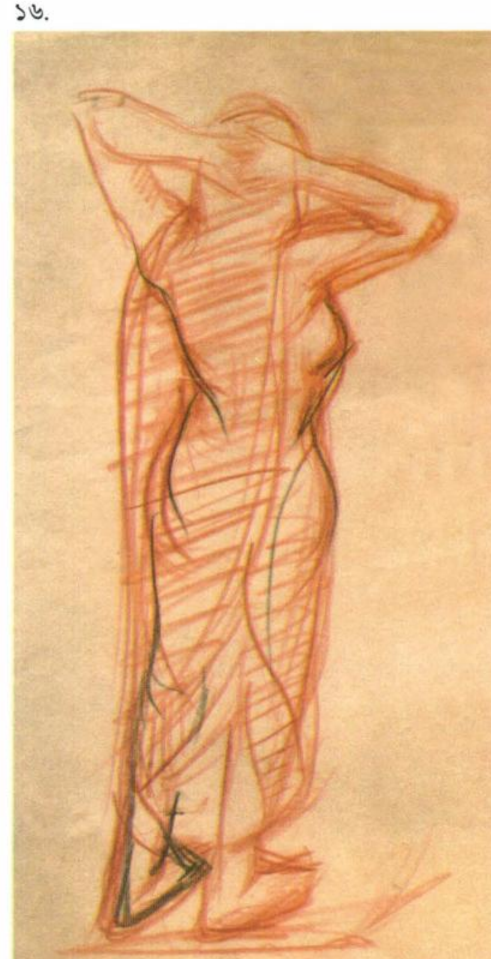

১৭.

১৮.

২০.

১৯.

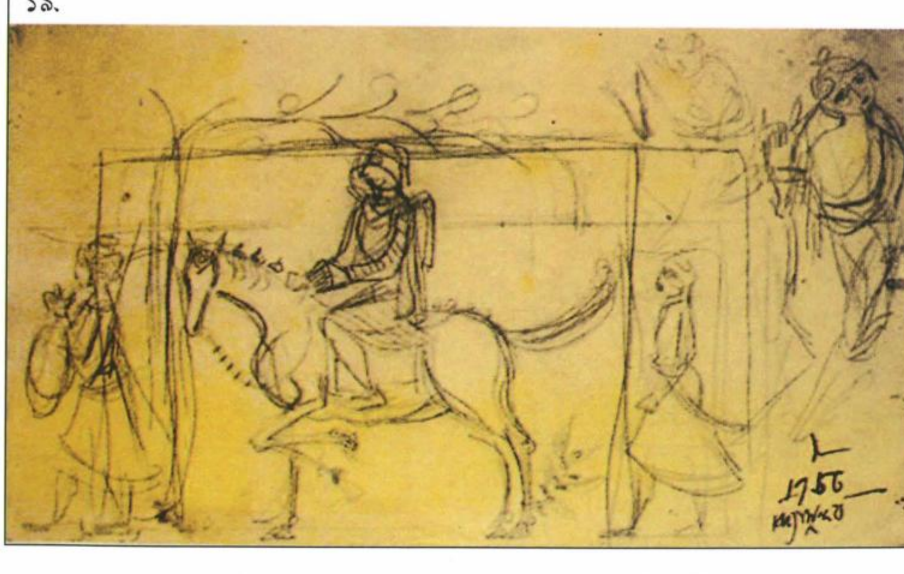

মুদ্রণ ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

২১.

২২.

২৩.

২৪.

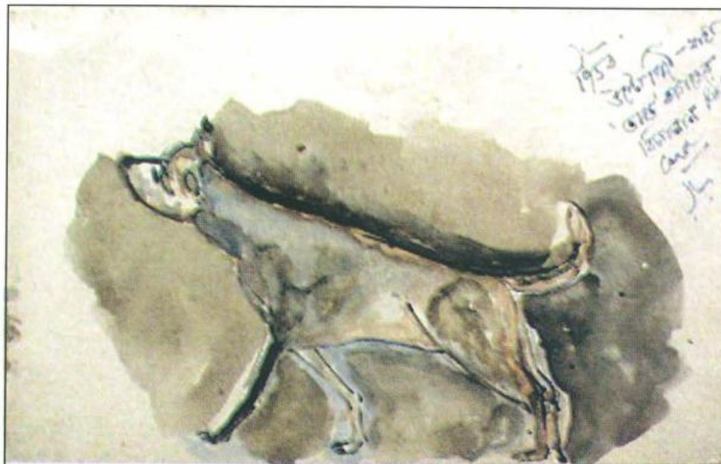

২৫.

২৬.

২৭.

২৮.

মুদ্রণ ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

২৯.

৩০.

৩১.

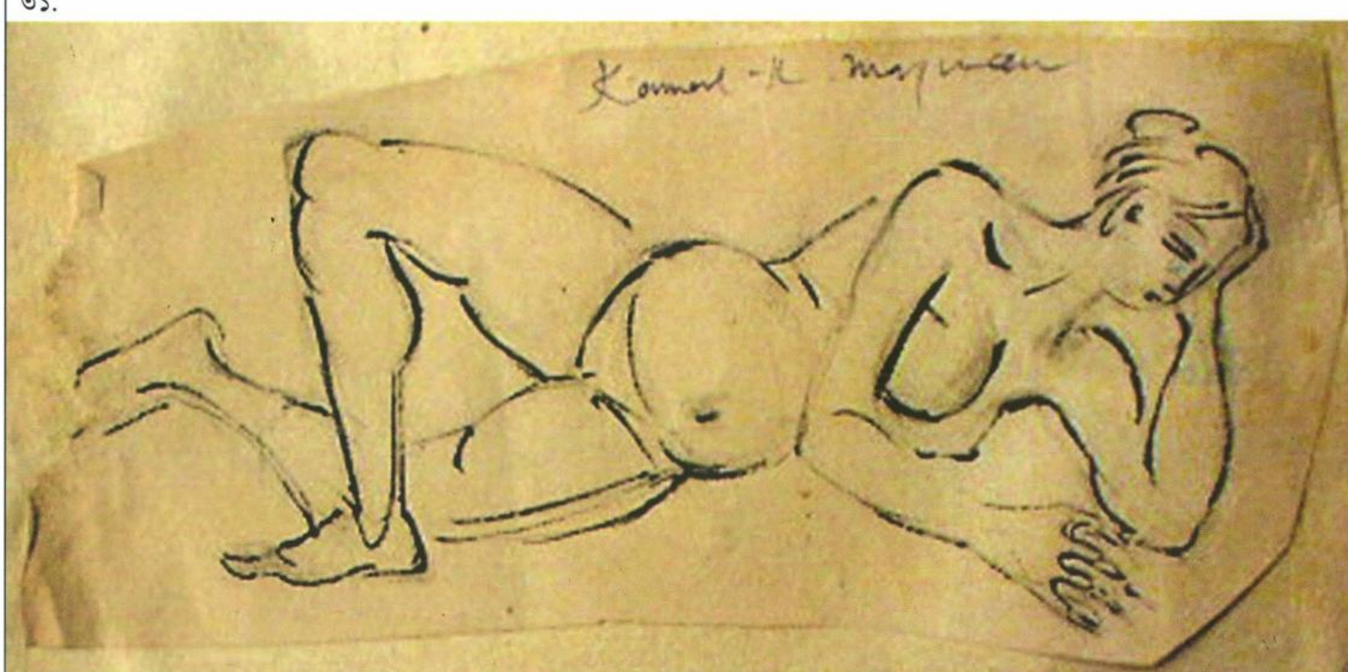

৩২.

৩৩.

৩৫.

৩৪.

মুদ্রণ ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

৩৬.

৩৭.

৩৯.

৩৮.

৪০.

৪১.

৪২.

৪৩.

মুদ্রণ ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

৪৪.

৪৫.

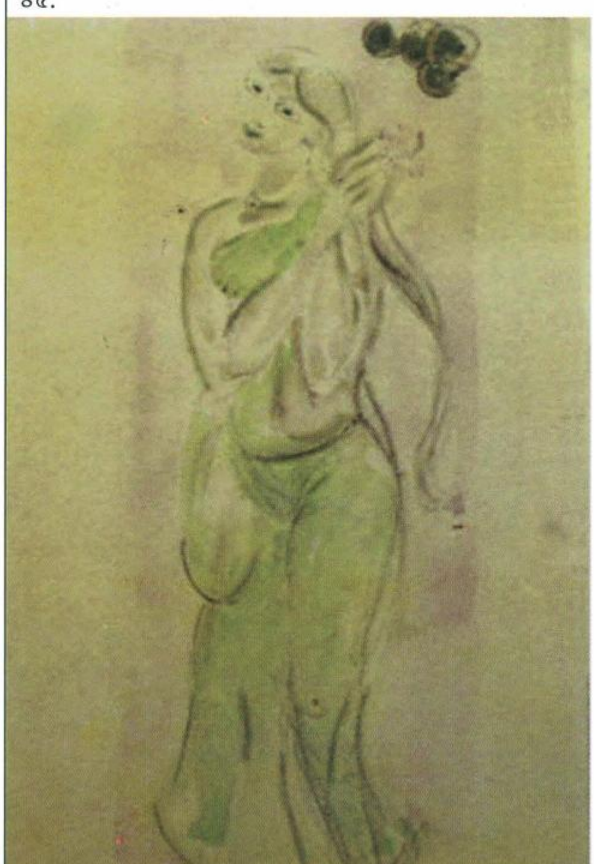

৪৬.

মুদ্রণ ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

৪৭.

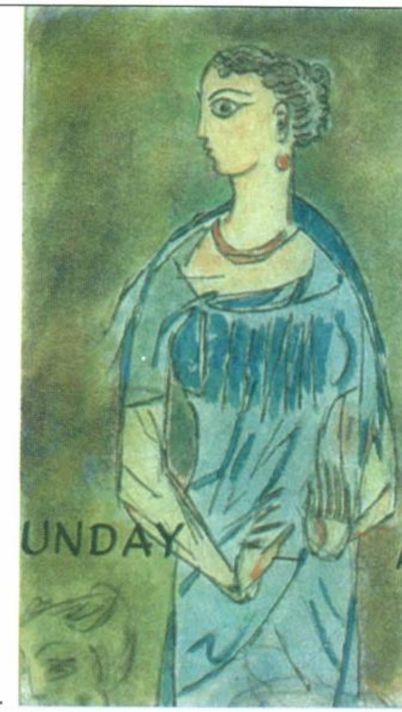

৪৮.

৪৯.

৫০.

মুদ্রণ ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

৫১.

৫২.

৫৩.

৫৪.

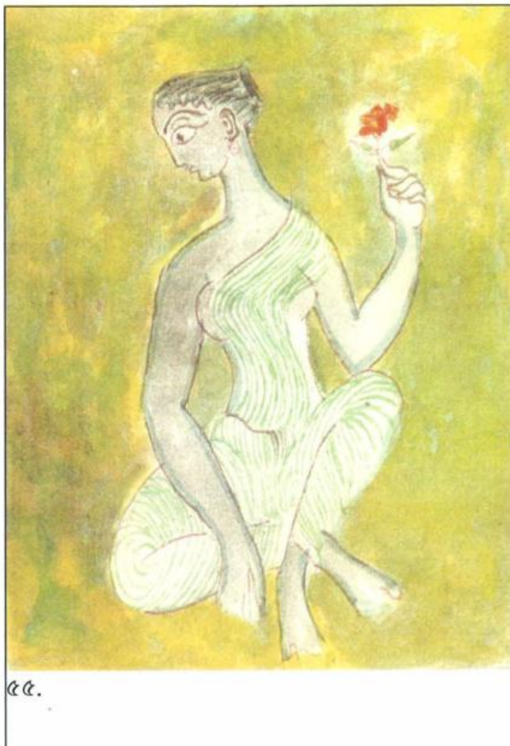

৫৫.

৫৬.

৫৭.

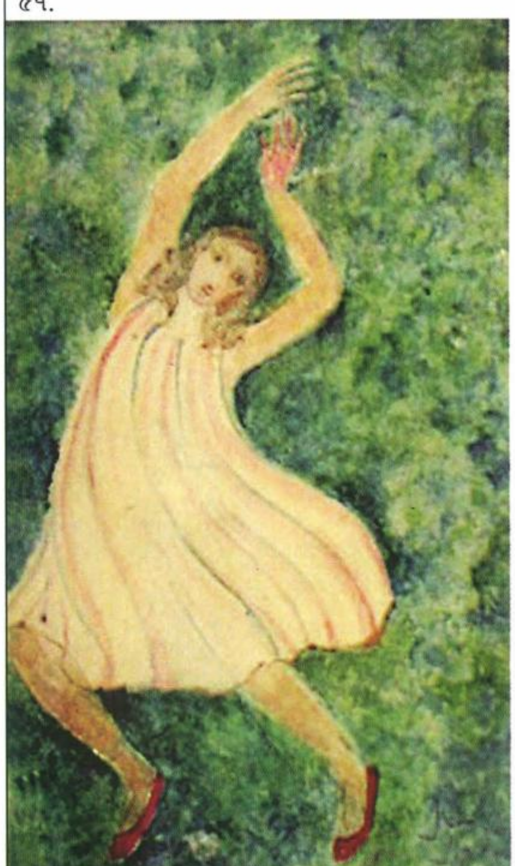

৫৮.

মুদ্রণ ঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সৌজন্যে

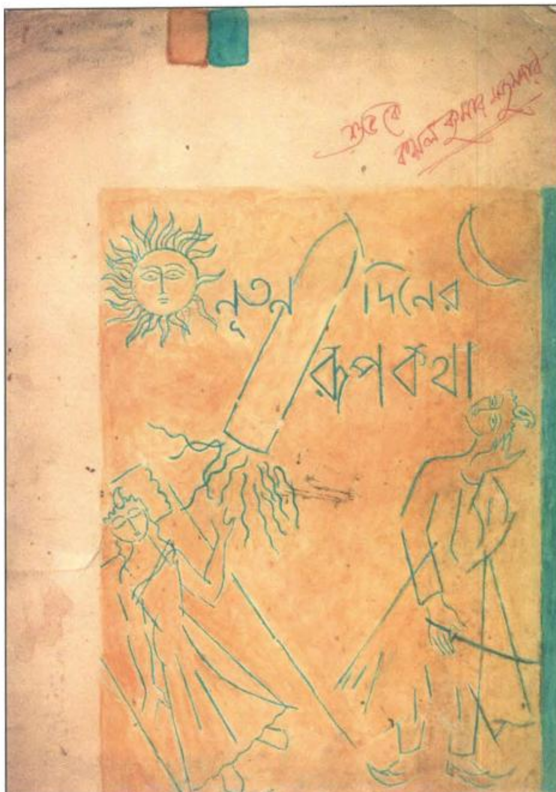

৫৯.

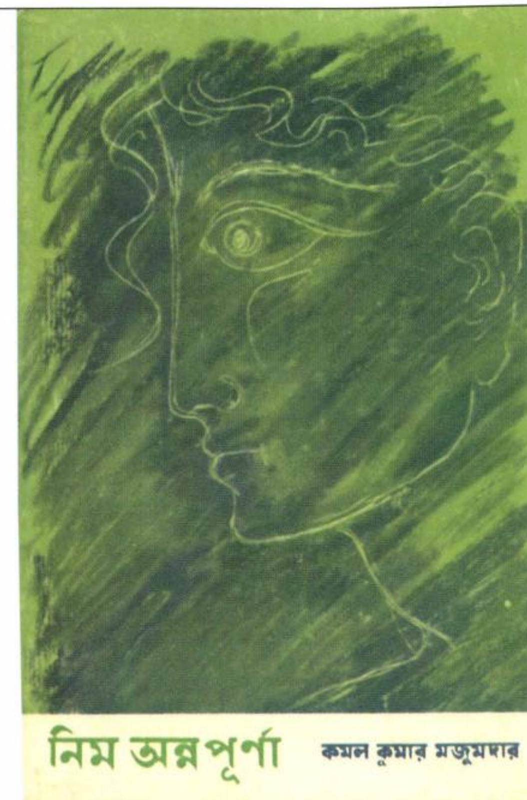

৬০.

৬১.

৬২.

৬৩.

৬৪.

৬৫.

৬৬.

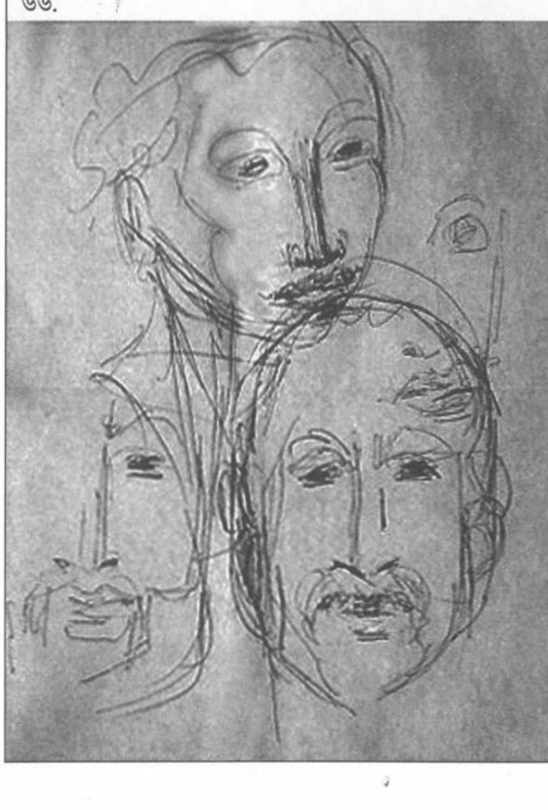

৬৭.

৬৮.

৬৯.

৭০.

৭১.

চিত্রাবলী ও আলোকচিত্র সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য

- আঁকা ছবির কোনো নাম কমলকুমার মজুমদার প্রায় কখনোই দিতেন না। কেবলমাত্র কয়েকটি ছবিতে 'মা আনন্দময়ী', 'বিদ্যাসুন্দর', 'বিপথগামিনী' ইত্যাদি লেখা আছে।

- প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কমলকুমারের আঁকার খাতা থেকে মালা চক্রবর্তীর সৌজন্যে আমরা কিছু স্কেচ এবং ড্রইং ব্যবহার করেছি। সেগুলির আলাদা করে কোনো মাপ নির্দেশ করা হল না।

- কমলকুমার অনেকসময় বিভিন্ন মাধ্যম একসঙ্গে ব্যবহার করতেন, যেমন জলরঙ, কালিকলম, পেনসিল, কালিতুলি (Brush & ink) ইত্যাদি। এই চিত্রগুলিকে মিশ্র মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাচে বাঁধানো ছবি থেকে Digital Cameraর সাহায্যে প্রতিচ্ছবি তুলে তারপর এখানে ছাপা হয়েছে। আমাদের সতর্কতা সত্ত্বেও তাই হয়তো রঙে সামান্য তফাৎ থেকেই গেল।

- চিত্রগুলি যাঁদের সৌজন্যে পেয়েছি — (১) মালা চক্রবর্তী — চিত্র ৪,৮, ৯, ১১-১৪, ১৭-৪৭, ৫২-৫৪, ৫৬-৫৮; (২) শানু লাহিড়ী — চিত্র ১,১৬; (৩) দয়াময়ী মজুমদার — চিত্র ২; (৪) বিমান সিংহ — চিত্র ৩,৫,১৫,৪৮-৫১, ৫৫ (প্রত্যেকটি ছবিই Greetings Card-এর উপর আঁকা); (৫) শুভ মুখোপাধ্যায় — চিত্র ৬, ১০, ৫৯; (৬) প্রদীপ রায়চৌধুরী — চিত্র ৭; (৭) শ্রীপান্থ এবং ইন্দ্রনাথ মজুমদার — চিত্র ৬১; (৮) সুব্রত রুদ্র — চিত্র ৬০।

- যে কয়টির মুদ্রিত প্রতিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে — (১) চিত্র ৬ - 'Tata Scob' কোম্পানির জন্য প্রস্তুত Greetings Card (পূজা উপলক্ষে), কার্ডের মাপ ৯.৭৫ x১৬.৭৫ সেমি। (২) চিত্র ৫৬ - কমলকুমারের তৈরি কাঁথার নকসা ব্যবহার করে ছাপা Greetings Card (জহর শিশু ভবন)। (৩) চিত্র ৬০ - নিম অন্নপূর্ণার প্রচ্ছদ, মাপ ১৩.৭৫ x২১.৫ সেমি।

- যে মাধ্যমে ছবিগুলি আঁকা হয়েছে — (১) জলরঙ - চিত্র ১,৩,৬,৭,১১,১২,২২,২৫-২৭,২৯,৩৩,৩৫,৪৭, ৫১,৫২,৫৪,৫৫, ৫৯-৬১। (২) কালিকলম - চিত্র ৫, ২১,২৩,২৪,২৮। (৩) পেনসিল স্কেচ - চিত্র ৯। (৪) পেপার কাটিং - ১৩। (৫) রঙ পেনসিলে আঁকা - চিত্র ১৬। (৬) কালিতুলি (Brush & ink) - চিত্র ৩১,৩২,৩৬-৩৯,৪১,৪২,৪৪,৫৩। (৭) মিশ্র মাধ্যম - ২,৪,৮,১০,১৪,১৫, ১৭-২০,৩০,৩৪,৪০,৪৩,৪৫,৪৬,৪৮-৫০,৫৬-৫৮।

- ছবিগুলি যে মাপে আঁকা (সেন্টিমিটারে) চিত্র ১— ৮ x১৩.৫/ চিত্র২ — ১০.৫ x১৬.৭৫/ চিত্র ৩ — ৪.৫x৭.৫/ চিত্র ৪ — ২x৭.৭৫ / চিত্র ৫ — ৩.৫ x৮.৫/ চিত্র ৬ — ৬.৫x১২.৭৫/ চিত্র ৭ — ১০.৫ x১৬ (সমতট ৪১ সংখ্যার প্রচ্ছদ, জুলাই - সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, দশম বর্ষপূর্তি সংখ্যা)/ চিত্র ৮ — ৩.৫ x৫.৫/ চিত্র ৯ — ৯ x১৪/ চিত্র ১০ —১০.৫ x১৫.৫ (শুভ মুখোপাধ্যায়কে প্রদত্ত Greetings Card-এ আঁকা)/ চিত্র ১১ — ৮.৭৫x১৩.৫/ চিত্র ১২ — ৬x১০/ চিত্র ১৪ — ৫.৫ x৯/ চিত্র ১৫ — এক্ষণের Rate Card-এ আঁকা, Rate Card-এর মাপ ২০x১৭.৫/ চিত্র ১৭— ৮.৫x১৩.৫/ চিত্র ১৮ — ৮.৫x১৩.৫/ চিত্র ১৯ — ১৪.৫x৮.৫/ চিত্র ২০ — ৭x১৩/ চিত্র ২১ — ১০ x১৭/ চিত্র ২২ — ৭ x১২/ চিত্র ২৩ — ৭ x১০/ চিত্র ২৪ — ১৩.৫ x৯/চিত্র ২৫ — ১৪x৮.৫/চিত্র ২৬ — ৮.৫ x১৪/ চিত্র ২৭ — ৮x১৪/ চিত্র ২৮ — ১২.৭৫x৭.৫/ চিত্র ৪৫ — ৮.৫x১৩.৭৫/ চিত্র ৪৬ — ৯x১৪/ চিত্র ৪৭ — ৭x১১/ চিত্র ৪৮ — ৫.২৫x৯.৫/ চিত্র ৪৯ — ৭.৫x১২.৭৫/ চিত্র ৫০ — ৬.৫x১৩/ চিত্র ৫১ — ৮.৭৫x১৪/ চিত্র ৫২ — ৯.৫x১৪.৫/ চিত্র ৫৩ — ৬x৭.৫/ চিত্র ৫৪ — ৭.৫x১২.৫/ চিত্র ৫৫— ৭x৯/ চিত্র ৫৬ — ১৪.৭৫x১১/ চিত্র ৫৭ — ৭.৫x১২.৫/ চিত্র ৫৮ — ৯x১৪ / চিত্র ৫৯ — ১৪.৫x১৯.৫ (প্রস্তাবিত মলাট অংশের মাপ)/ চিত্র ৬০ — ১৩.৭৫x১৯.৫/ চিত্র ৬১ — ২৮.২৫x১৯।

- বই-এর মূল Text অংশে এবং ক্রোড়পত্র ('অঙ্ক ভাবনা') অংশে যে যে পৃষ্ঠায় কমলকুমার কৃত স্কেচ এবং 'আইকম বাইকম' গ্রন্থের অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে — (১) পৃ ২৩, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৬ (প্রস্তাবিত বই-এর প্রচ্ছদ), ৪৩ — ব্যবহৃত স্কেচ কমলকুমারের স্কেচ বই থেকে, শানু লাহিড়ীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। (২) পৃ ৪৮, ৬২, ক্রোড় ৩৩, ক্রোড় ৬৫, ক্রোড় ৯২, ক্রোড় ১০৩ — 'আইকম বাইকম'-এর অলংকরণ।
  যে যে পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত চিত্র বা অলংকরণ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য দেওয়া আছে, এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হল না।

- সাদা কালোয় আঁকা ছবি সম্পর্কে তথ্য — চিত্র ৬২ - ৭১, প্রত্যেকটি মালা চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। মাধ্যম নির্দেশ — (১) জলরঙ - ৬২, ৬৩, ৬৫,৬৭। (২) মিশ্র মাধ্যম - ৬৪,৭১। (৩) কালিকলম - ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭০।

- ব্যবহৃত আলোকচিত্র সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রতিটি আলোকচিত্রের সঙ্গেই দেওয়া আছে।

- আলোকচিত্রের সৌজন্য নির্দেশ — (১) শানু লাহিড়ী — আলোকচিত্র ১-৮, ১০-১২, ২৯, ৩০/ (২) দয়াময়ী মজুমদার ও আজকাল — আলোকচিত্র ৯/ (৩) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — আলোকচিত্র ১৩-১৭/ (৪) শুভ মুখোপাধ্যায় — আলোকচিত্র ১৮-২১, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮/ (৫) এককড়ি ভট্টাচার্য — আলোকচিত্র ২২/ (৪) মালা চক্রবর্তী — আলোকচিত্র ২৩, ২৬।

১.
অতি শৈশবে
বাবা প্রফুল্লচন্দ্র ও
মা রেণুকাময়ীর সঙ্গে
কমলকুমার ও নীরদ।

২.
ঠাকুমা যোগমায়াদেবীর
সঙ্গে কমলকুমার
(ডানদিকে) ও নীরদ
(বাঁদিকে)। ছবিতে
অন্যদের পরিচয় জানা
যায়নি।

৩.
১৩নং ব্লকমন স্ট্রিটের বাড়ি।
বাঁদিকে কমলকুমার, ডানদিকেনীরদ।
বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় কমলবাবুর মা,
কোলে বাণী মজুমদার।
ডানদিক থেকে দ্বিতীয় 'উপরের মা'
(কমলবাবুদের উপরের তলায় থাকতেন)।
অন্যদের পরিচয় জানা যায়নি।

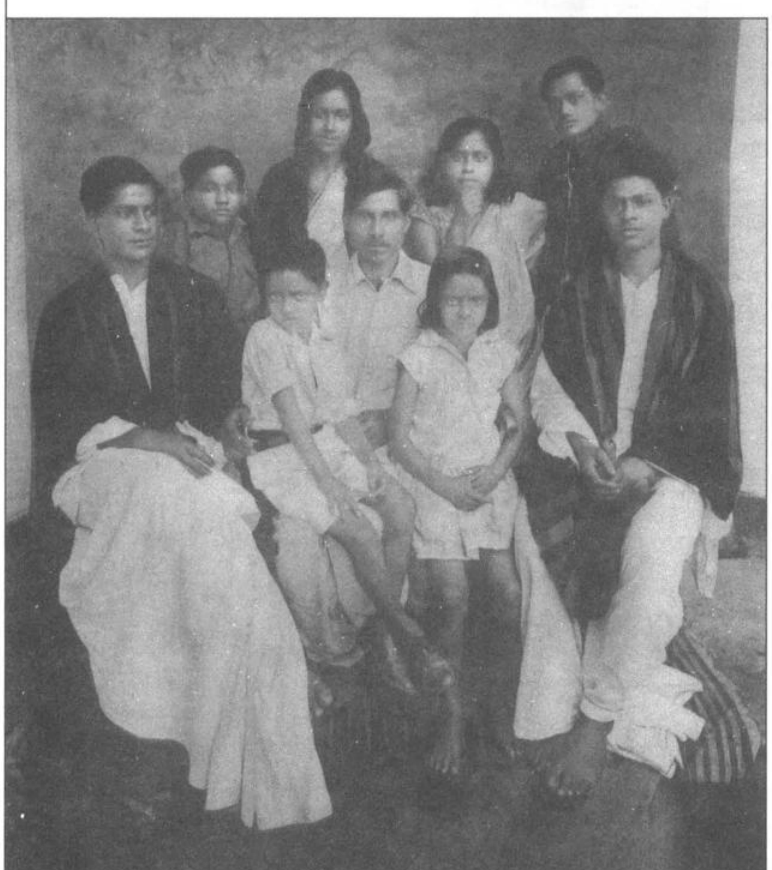

৪.
দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে —
অমিয় মজুমদার, বাণী মজুমদার, গীতা মজুমদার, কেষ্টদা (পিসতুতো ভাই)।
বসে বাঁদিক থেকে —
কমলকুমার, চিত্তরঞ্জন, হরিদা (পিসতুতো ভাই), শানু লাহিড়ী, নীরদ মজুমদার।

৫.
কাবুলিওয়ালার বেশে কমলকুমার।

৬.
যৌবনে প্রস্তাবিত বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে
(যা পরে বাতিল হয়ে যায়)
পাসপোর্টের জন্য তোলা ছবি।

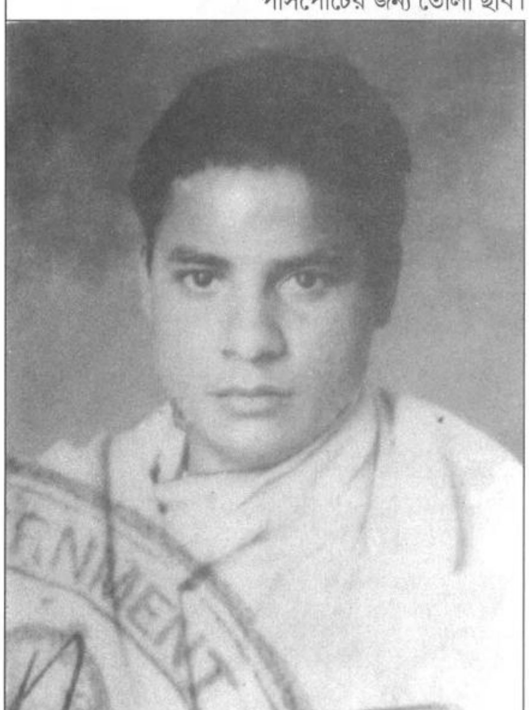

৭.
আলোছায়ায় তরুণ কমলকুমার।

৯.
কমলকুমারের স্ত্রী দয়াময়ী।

৮.
আলো আঁধারিতে
একান্ত মুহূর্তে
কমলকুমার।

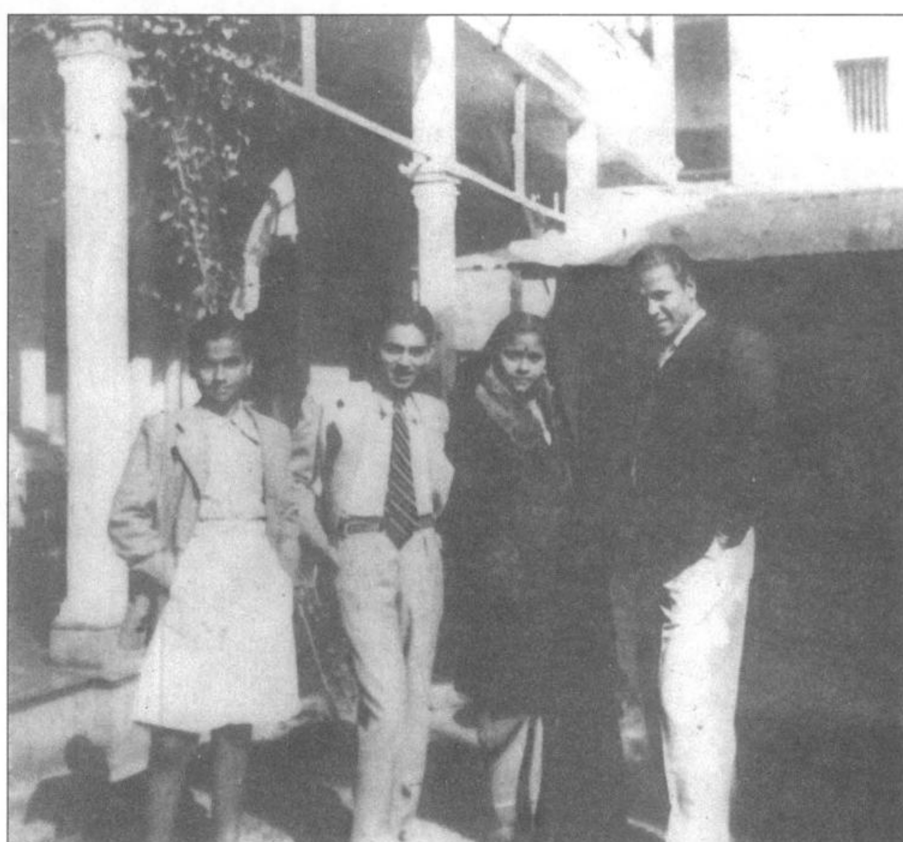

১০.
বাঁদিক থেকে —
অমিয় মজুমদার, রাতুল চট্টোপাধ্যায়
(কমলবাবুর স্যুট প্রস্তুতকারক),
বোন গীতা ও সাহেবি পোশাকে
কমলকুমার।

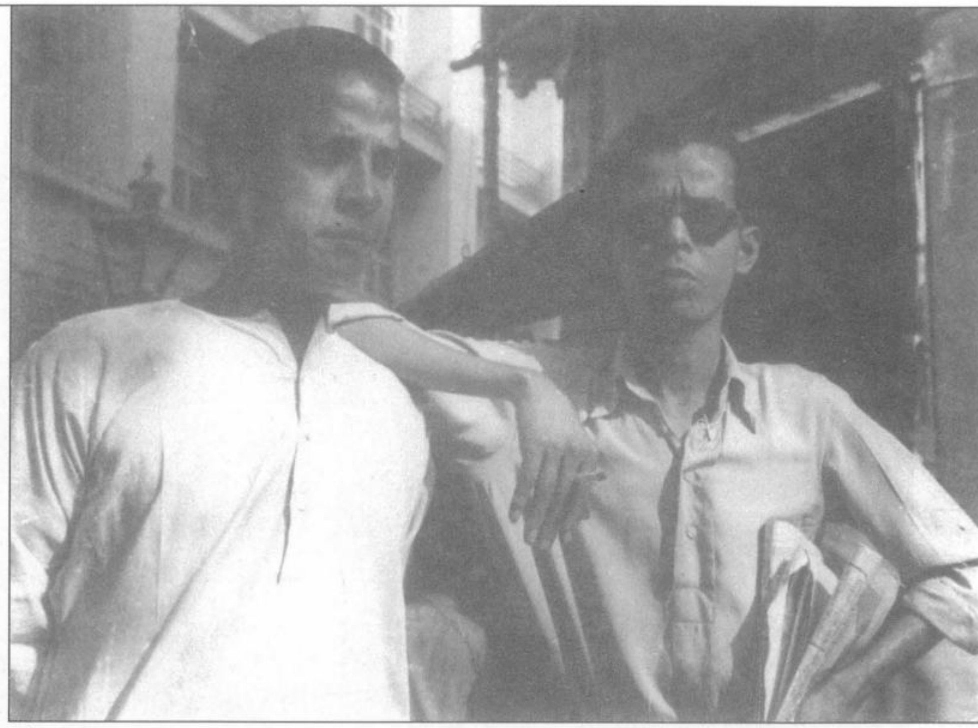

১১.
বন্ধু রাধাপ্রসাদ (শাঁটুল) গুপ্তর (ডানদিকে) সঙ্গে কমলকুমার।

১২.
অন্য মেজাজে কমলকুমার।

১৩.
হরবোলা পর্ব।
কমলকুমার
পরিচালিত
লক্ষ্মণের শক্তিশেল।
বাঁদিক থেকে —
মাটিতে দীপক
মজুমদার (সুগ্রীব),
তৃতীয় সুনন্দ
গুহঠাকুরতা
(বুড়ঢা-রাম),
চতুর্থ শ্যাম গুহ (দূত),
ডানদিকে সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায়
(জাম্বুবান)।
অন্যদের পরিচয়
জানা যায়নি।
১৯৫২।

১৪.
হরবোলা পর্ব।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল।
বাঁ দিক থেকে —
তৃতীয় দীপক
মজুমদার (সুগ্রীব),
ডানদিকে চুনীলাল
শীল (রাবণ)।
অন্যদের পরিচয়
জানা যায়নি।
১৯৫২।

১৫.
হরবোলা পর্ব।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল।
বাঁদিক থেকে —
দ্বিতীয় (হাত তুলে)
নীলাক্ষ গুপ্ত,
চতুর্থ (হুঁকো হাতে)
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
(জাম্বুবান), ডানদিকে
চুনীলাল শীল(রাবণ)।
১৯৫২।

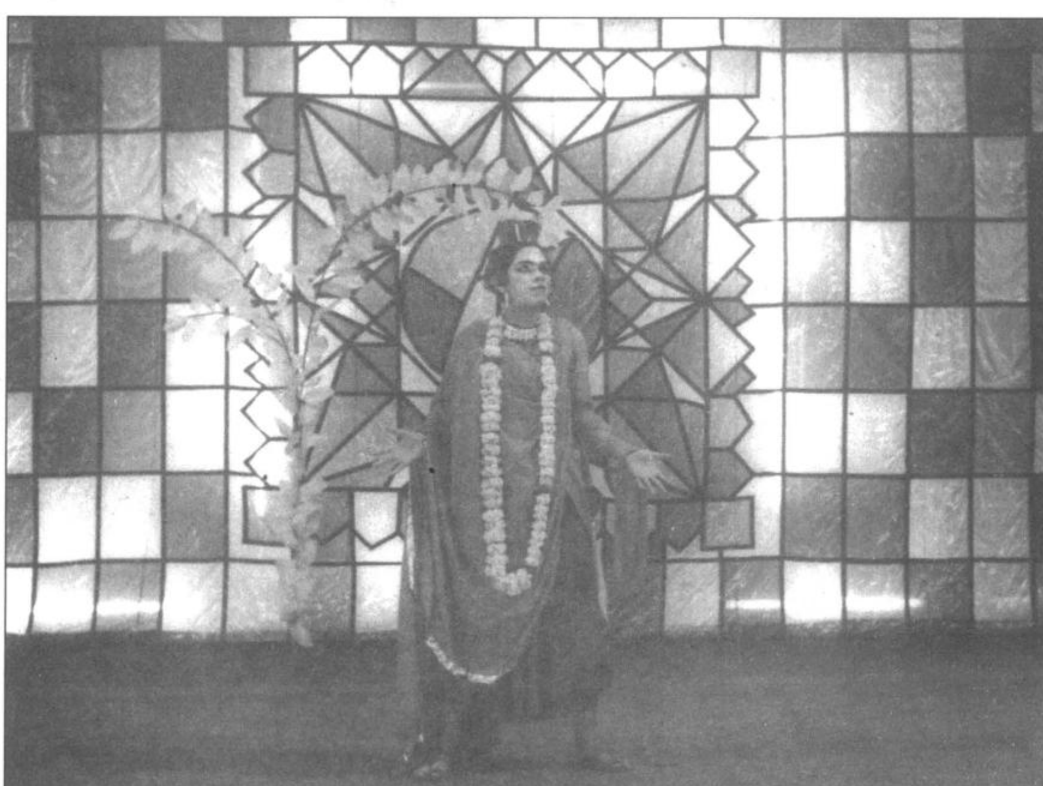

১৬.
হরবোলা পর্ব।
কমলকুমার
পরিচালিত
মুক্তধারা।
যন্ত্ররাজ বিভূতির
ভূমিকাভিনেতা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
মঞ্চসজ্জা —
সত্যজিৎ রায়।
১৯৫২-৫৩।

১৭.
হরবোলা পর্ব।
মুক্তধারা।
বাঁদিক থেকে —
অশোক মৈত্র
(খুড়োমশায়),
সুনন্দ গুহঠাকুরতা
(বুড়ো - রাজা),
চুনীলাল শীল
(ধনঞ্জয়)।
১৯৫২-৫৩।

১৮.
১৯.
কমলবাবুর পরিচালনায়
ভীমবধ পালায় অভিনয়রত
ক্যালকাটা চিলড্রেন্স অপেরার সদস্যবৃন্দ।
স্থান - বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন।
২৮.১১.৭৬।

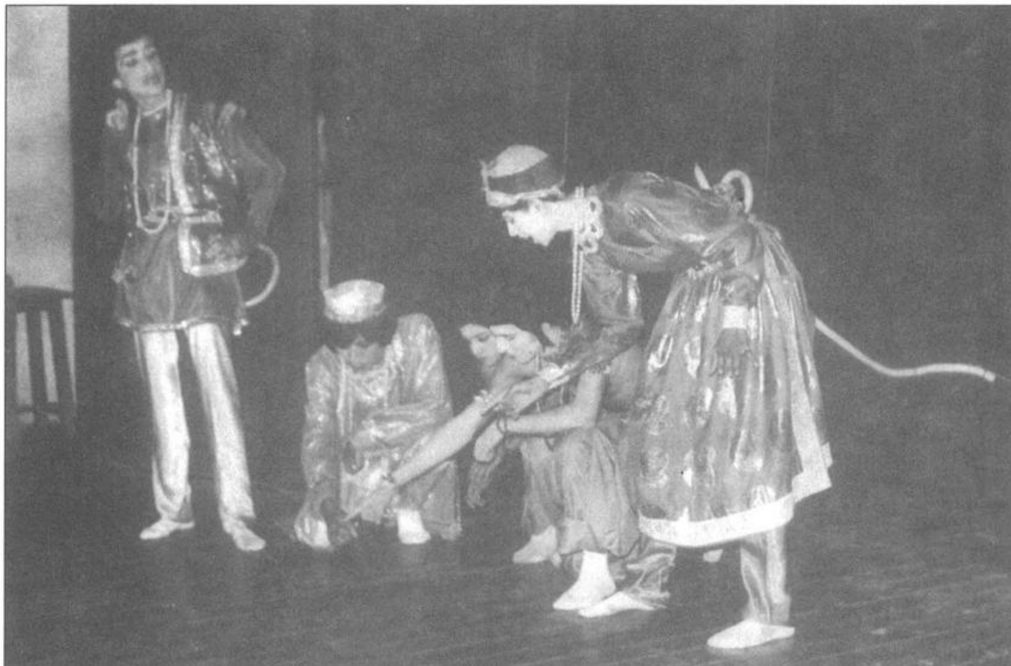

২০.
কমলবাবুর
পরিচালনায়
লক্ষ্মণের শক্তিশেল
পালায় অভিনয়রত
ক্যালকাটা চিলড্রেন্স
অপেরার সদস্যবৃন্দ।
স্থান - বালিগঞ্জ
শিক্ষাসদন।
৫.২.৭৭।

২১.
সাউথ পয়েন্ট স্কুলের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অভিনীত নাটকের প্রাকমুহূর্তে মহলাকক্ষে কমলকুমার ও সাউথ পয়েন্ট স্কুলের জনৈকা ছাত্রী। ১.৪.৭০ (?)।

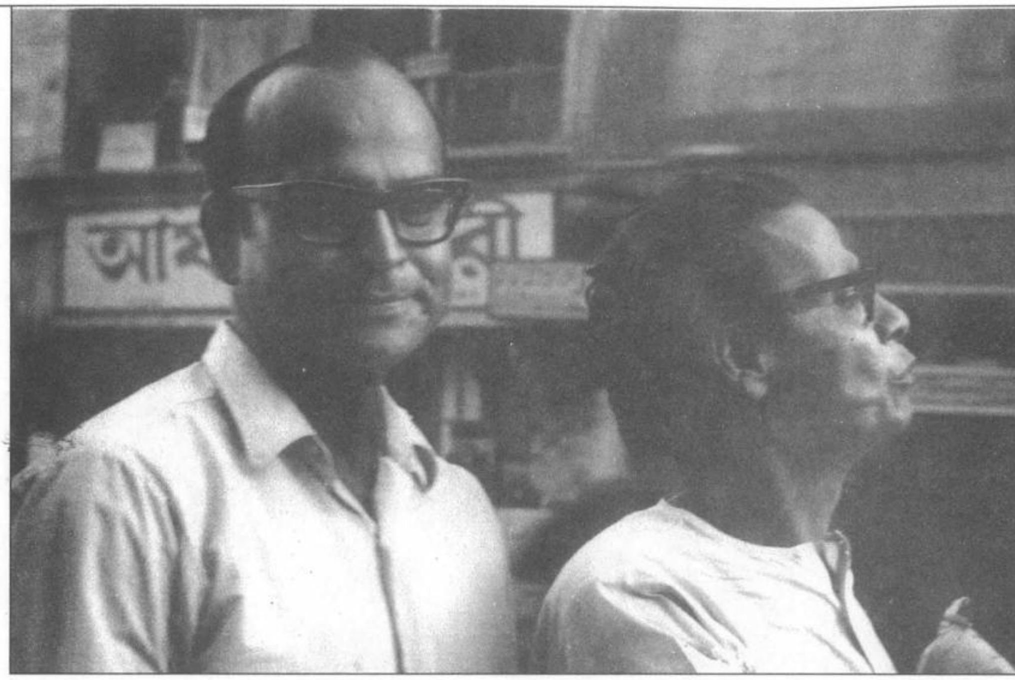

২২. কমলকুমার ও
এককড়ি ভট্টাচার্য।
ফটোগ্রাফার -
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়।
১৯৭২।

২৩.
কমলকুমার ও
ইন্দ্রনাথ মজুমদার।
সরিষা থেকে নৌকা
করে মহিষাদল,
রূপনারায়ণ নদীর
উপর দিয়ে।
উদ্দেশ্য - মহিষাদল
কলেজে কবি
সুব্রত চক্রবর্তীর
সঙ্গে সাক্ষাৎ।

২৪.
২৫.
২৬.
২৭.
হিন্দুস্থান রোডে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদান।
তখন সাউথ পয়েন্ট স্কুলের একটি শাখা হিন্দুস্থান রোডে ছিল।

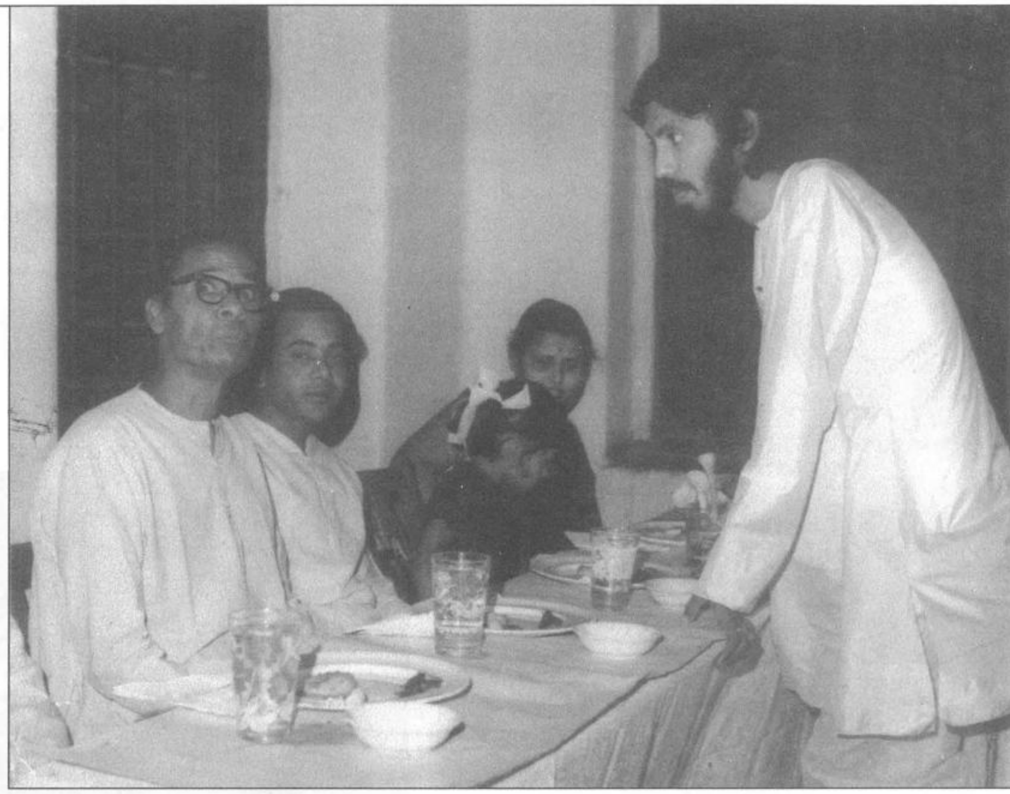

২৮.
শুভ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহে ছবি তোলায় বাধাদানরত কমলকুমার। সঙ্গে সস্ত্রীক আশিস সান্যাল এবং শুভ মুখোপাধ্যায় (দাঁড়িয়ে)।

২৯.
কমলকুমার সম্পাদিত 'উষ্ণীষ' পত্রিকার প্রচ্ছদ (সাদা-কালো)।
১৯৩৭ (বাংলা ১৩৪৪)।

৩০.
কমলকুমার সম্পাদিত 'তদন্ত' পত্রিকার প্রচ্ছদ (সাদা-কালো)।
৩১শে অক্টোবর, ১৯৫২।

বিবিধ রচনা

কলকাতার গঙ্গা

মাধবায় নমঃ, জয় জয় মা কালী, জয় রামকৃষ্ণ! আমি অযুত পূর্বজন্মকৃত পুণ্যতে গঙ্গা বিষয় লিখিবারে আদিষ্ট হইলাম! মাগো আমি তোমার আমার প্রতি করুণার কথা প্রকাশিব!

গঙ্গায় অন্ধকার নাই!

গঙ্গায় আমার ভক্তি পাঁচসিকে পাঁচ আনা; এইরূপ এ দাসের হয় মতি যে যখনই ঐ অলৌকিক স্নেহময়ী ধারায় ডুব কাটিল সে তন্মুহূর্ত্তে ঠাকুর ঘরে প্রবেশিবার শতেক বাধা উজাইল; এইরূপ এ কাঙালের বিশ্বাস, গঙ্গার জল মাথায় ছিটাইলে, তদীয় ডান হস্ত বাম হস্তের নিকট কিচ্ছুটি লুকায় না; যে এবং এইরূপ আমার জাগা ঘর, যে, গঙ্গার জল পান করিলে আমার ভিতর শুদ্ধ হয়।

হায়, ইহা কি আমার নিকট তিলক শোভা মাত্র! প্রত্যহ তো আমি গঙ্গাজল খাইয়াছি! তুলসী পাইয়াছি! — তবে নিশ্চয় আমাতে ভক্তি আছে, ক্রন্দন আছে। এবং ঈদৃশী সত্যে ছাড় নাই, বাঙালীর, উচ্চবর্ণ বুঝি ও তাহা হইতে প্রত্যেকের, বংশমর্য্যাদার সুন্দরটাই মা গঙ্গার; এমনও যে আমাদিগের কণ্ঠস্বর ঐ নিয়ত প্রবাহিনী গঙ্গার সন্ধ্যার সকালের মধ্যরাত্রের ও বিবিধ ঋতুভেদের ধ্বনিমাত্রা দ্বারা নির্ম্মিত। আমরা ঐ গঙ্গার স্বরে কথা বলি। আমাদিগের যুগ্ম হস্তের গতি কপালের দিকে।

ঐ স্বরে কেশব সেন ডাকিয়াছেন, গঙ্গা তুমি অমৃত নদী...গঙ্গা তুমি বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধিকারিণী বলিতেছ, ভাই তোমাদের কবিত্ব রস আছে, আমি মার নাম করি শুন তোমরা মার নাম কর আমি শুনি, শান্ত স্বভাব গঙ্গে তুমি প্রাণকে টান। হে মোক্ষদায়িনী আমরা তোমার স্তব করিতেছি। মহাপ্রভু বলিলেন, গৌড় দেশে আমার মা ও জাহ্নবী দেখিয়া যাইব। এইভাবে গঙ্গার সহিত আমার নাড়ীর টান। গঙ্গা আমারে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে দেয় নাই! ভূদেববাবু কহিলেন, আমরা ভাগীরথীর সন্তান! ইহা মদীয় নির্ভাবনা আনিল।

আমার মা কখনও নিগঙ্গার দেশে মরিতে চাহেন নাই! রিখিয়া হইতে গঙ্গা অনেক অনেক দূরে, ভাগলপুর! বহু লোক ছোট বাঁকে করিয়া, রাত বেরাত হাঁটিয়া, গঙ্গোদক আনিত; বাবা বৈদ্যনাথের মাথায় দিবে — আমরা বারান্দায় দাঁড়াইয়া নমস্কার করিতাম — এখন, তাই, মা রিখিয়ার বাড়ীতে ছোট জালাতে গঙ্গাজল রাখিয়া ছিলেন, এই জালার — এমনই এক গৃহস্থিত জালার, ইহাতে গঙ্গাজল, পাশে আসন করিয়া নাগ মহাশয় ধ্যান জপ করিতেন — কাছে আর একটি পাত্রে গঙ্গা মৃত্তিকা; ক্রিয়াকর্ম্মে অনেক চেঞ্জার আমাদের বাড়ী গঙ্গাজলের খোঁজে আসিতেন; আমরা গামছা পরিয়া হয় গঙ্গার জল বা মৃত্তিকা আনিয়া দিতাম; মার সহিত তর্ক হইয়াছে, গামছা পরিব কেন, গঙ্গার জলে হাড়ি ডোম অবধি শুদ্ধ হয়! মা উত্তর করিলেন, আমি বলিতেছি! দেখ, মরিয়াছে বলিয়া কাঁড়িখানেক মাটি যেন দিও না।

বিশেষত মৃত্যুতে গঙ্গাজলের প্রয়োজন হইবেই; সকলে গঙ্গাতীর যেমন কামনা করেন; তেমনই চাহেন, মৃত্যুকালে, এই নশ্বর ওষ্ঠে যেন তুলসী বা বিল্বদল টুপাইয়া গঙ্গাজল পড়ে; আমার ঠাকুমা যাইতেছেন, গঙ্গোদক দেওয়া হইতেছে এবং তৎসহ বিবিধ কণ্ঠে 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' ধ্বনিতে ঘর রণিয়া উঠিতেছে, আমি দেখিতে আছি; ঐ ঘরে উপরিভাগ বহু দূরে সরিয়া কোথায় যেন নিশ্চিহ্ন হইতে আছিল। বল, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম! মরণোন্মুখ যিনি, তদীয় মাটির ওষ্ঠদ্বয়ে তিনি নিত্য নাম অস্ফুটভাবে উচ্চারিতে প্রয়াসিলেন। ঐ জল বিন্দুতে কখনও বুদ্বুদ হয় নাই, এখন প্রদীপের আলো যাহারে পাচার করিয়াছে; আমি নাসিকা ঐ শব্দর নিকট লইলাম, আঃ এক অপূর্ব্ব সৌরভ! ও যে শ্রাদ্ধর চিঠিতে গঙ্গা কথাটি আমায় সম্মোহিত করিয়া থাকে — একশোবার যে মনেতে খেলিতেছে, আমি যেন গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিতে পারি!

আমি গঙ্গাযাত্রা দেখিয়াছি, আর যে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ধ্বনি কি বা পরমোদ্ভুত বিস্ময়ের সূত্রপাত করিল ইহাও; গঙ্গাযাত্রীর স্বজনরা ঐ পদ অতীব সুললিত স্বরে বলিতেছিল; গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইতেছেন, মধ্যে মধ্যে নৌকার ক্বচিৎ আলোর চেকনাই, আড়পারে অন্ধকার, কিছু দূরে মাঝি-মাল্লাদের গুণ টানিয়া চলাকালীন কথাবার্ত্তা, ঘাটে কেহ জপ করে, অন্য পার্শ্বে সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া, এবং এমত সময় ষ্টীমারের দূরপাল্লার আলোকপাত গঙ্গার পাথুরে হিম ছড়াইয়া দিল; নৌকার চোখসকল কি পর্য্যন্ত ভয়ের হইল; তীরস্থিত বৃষকাষ্ঠ নড়িয়া উঠিল; অবিলম্বে এক মায়িক স্বরভেদে উহার ভোঁ বাজিয়া চলে; ইহাতে আমার সর্ব্বশরীরে সিঞ্চিড়া কাটিল, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ শব্দকে অনৈসর্গিক করিল, ফেরী বা খেয়াঘাটের ডাক, পারে যাব্ হে! নিশ্চয়ই গঙ্গাযাত্রী গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়াছে!

মহর্ষি যখন অল্পবয়সী তখন এমনটি দেখিলেন, সারাক্ষণ কীর্ত্তন হইতে আছে, তিনি কাঠের উপর বসিয়া আছেন, সমস্ত পরিবেশ তাহার মনকে বড় নাড়া দিল; তিনি ঐ বয়সে অবশ্যই আদি অন্তহীন এক মহাব্যোমের মধ্যে মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলেন। এই সনাতন হিন্দু অনুষ্ঠান তাঁহাকে ভাবুক করিল! গঙ্গাতীরের এই ছবি তিনি আমরণ জাগ্রত রাখিয়াছিলেন।

এই গঙ্গার সহিত আমাদিগের জীবন দারুণভাবে জড়াইয়া গিয়াছে; ফি হাত আমাদের গঙ্গাজল দরকার; তাই দেখি, দূর দূর দেশে গঙ্গার জল যাইতেছে, কলিকাতার বড় জমীদার সকলের বাড়ী প্রায়ই দেখিতাম, গরুগাড়ীতে বিরাট তামার হাঁড়া পোক্তরূপে বাঁধা তাহাতে গঙ্গাজল চলিয়াছে, পাত্রটির গা বাহিয়া জল; তদ্দর্শনে আমরা, বিকালে, ক্রীড়াসঙ্গীদের সহিত যাইতে কালে ব্যঙ্গ করিয়াছি নির্ব্বোধ বেটাদের বাড়ী কি গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক নাই! ইহার কিছুদিন পর ঐদৃশ মন্তব্যের সঙ্গেই এই উত্তর শুনিলাম, ট্যাঙ্কের জলের চরণামৃত দিলে তুমি খাইবে, একই তো জল! আমাদের মধ্যে কেহ উহার জবাব দিতে পারি নাই, রাস্তার জল দেওয়ার দিকে চাহিয়াছিলাম, পিচকারি দেওয়া জল খুব লাল, নিশ্চয় সাঁওতাল-পরগণা ধোয়া জল গঙ্গায় আসিয়াছে। কোথায় যেন ঐ প্রশ্ন আঁচড় দিল!

এই গঙ্গা যে আমাদের কতখানি তাহা কেমনে বিস্তারিব, অজস্র সাধক ইহার বিন্দুটি দর্শনে মা, মাগো বলিয়া উঠিয়াছেন; বড় চমকপ্রদ, যাহা মহাপ্রভুর জীবনে, এমন আছে ঃ আগামীকল্য উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন, অপরাহ্নে কতিপয় ভক্তের সহিত নগরভ্রমণার্থে বহির্গত হইলেন......মনে মনে সমস্ত পরিচিত তরুলতা, গৃহ ও পথ প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন পরিশেষে সুরধুনীর তীরে যাইয়া তাহার নিকট বিদায় লইলেন।

নাগ মহাশয় ভগবান রামকৃষ্ণের জিজ্ঞাসাতে বলিয়াছিলেন, যে, গঙ্গাহীন দেশে ভক্তরা শরীর ধারণ করিতে চাহে না। তার্কিক হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন কিন্তু মা ভাগীরথী তীরে জন্মগ্রহণ না করিলে শুদ্ধাভক্তি হয় না! আঃ ঠাকুর! এই সেই গঙ্গা! বারম্বার মনে হইয়াছে, 'আমি কখনও গঙ্গা দেখি নাই'। এই লাইনটি বঙ্কিমবাবুর। এই লাইনটি জপিতে আমার মধ্যে অনৈসর্গিক এক পরিবর্তন সম্ভবে! ঐ আমার পরণের কাপড় বাতাসে মিলাইয়া যায়!... বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়! ঠাকুরবাড়ীর ফরাস আলোর আয়োজন করিতেছে। কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুইজন পূজারী গঙ্গায় অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুচি করিতেছেন। শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদের রাত্রকালীন শীতল দিতে হইবে।......শ্রাবণ মাসের খরস্রোত ঈষৎ বীচিকম্পিত গঙ্গা প্রবাহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমের বারাণ্ডা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গাদর্শন করিতে লাগিলেন।

অদ্ভুত এইভাবে গঙ্গা আমারে পাইয়া বসিয়াছে; যখনই শুনি, যে মন চাঙ্গা তু কুটির মে গঙ্গা! আমি গম্ভীর ইহাতে; অনেক পরে আমার বাবার নিকট — বাবা রিফর্মড হিন্দু ছিলেন — হইতে জানিলাম, উহা বড় জবর ভক্তিমার্গের হেঁয়ালি! গঙ্গাকে ঘরে লওয়া! যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা! ঈদৃশ নিরহঙ্কার বোধ কোথায় এরূপ স্বীকারোক্তি! দশহরার দিন দুই তীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, প্রত্যেকের মুখে মৃদু হাস্য! কি ভক্তি! আবার দেখি, কুশাঙ্গুরীয় অঙ্গুলি কাঁপিতেছে, হস্তধৃত কোষা কাঁপিতেছে — হাতে লাগান কৃষ্ণ তিল! তর্পণ হইতেছে — হা একদা রামচন্দ্র এমনই তর্পণ করত বলিয়াছিলেন, পিতা তুমি মদ্দত্ত সুনির্ম্মল জল গ্রহণ করো! হাওড়ার পুল, বিখ্যাত প্যান্টন্ ব্রীজ খোলা হইয়াছে; পুলের ঠিক মাঝ বরাবর জায়গাতে খোলা, অর্থাৎ সেইখানকার অংশ সরাইয়া পুলের পাশে গঙ্গাতে রাখা; ইতঃমধ্যকার ফাঁক দিয়া বড় বড় জাহাজ পাটকলের দিকে, উত্তরে, যাইতেছে। আমরা ঠাকুমার সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছি — তখন বয়স কতই বা, ঘাটের উপরে যে মন্দির তাহার ঘণ্টা হাত উঁচাইয়াও ছুঁইতে পারিতাম না; এই ঘাটটি বেশ, ঢাকা চাতাল বেশ অন্ধকার — কলিকাতায় আমরা সূর্য্যোদয় গঙ্গায় দাঁড়াইয়া দেখি না — এখানে অন্যান্য ঘাটের মত অনেক পায়রা, ইহারা স্থাপত্যের অঙ্গীভূত তেরিকাটা খিলানের সূক্ষ্মতা লইয়া ঐ পায়রাগুলি এদিক সেদিক উড়িতে আছে; আবার কখনও থামশীর্ষের, বেশীর ভাগ করিন্থিয়ান — ডরিক আইওনীয়ও আছে — কেয়ারির অপূর্ণতা বুঝিতেছে; ঘাট গঙ্গার জলে নামিয়াছে। পশ্চিমারা উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করিতেছে, কেহ লোটা লইয়া উঠিতে আছে, কেহ গঙ্গামৃত্তিকা দিয়া পৈতা মার্জ্জনা করে, কেহ আহ্নিক করে, কেহ চন্দন ঘষে, কেহ ডুব কাটে; অজস্র লোক গঙ্গা হইতে সূর্য্যপ্রণাম করে, তাহাদের আঁজলার জল পড়িতেছে কালে রামধনু রঙ চানকায়! বড় জাহাজে যাওয়ার ঢেউতে ঐ সকলেরা অদ্ভুত মজার হওয়ত টলিতে আছে; ভাসমান ছেলেরা ঢেউ বাহিত ঘাটে পড়িল; কচুরী পানা কাহারও মুখে ঝাপটা মারিল। উপরে ব্রীজের মুখে ঠাসা ভীড়, হাওড়ার দিকে খুনখারাবী ভীড়। ছ্যাকরা গরুর গাড়ী মোটর ট্রাম লোকজন মোটঘাট এক এলাহি ব্যাপার। পোর্ট পুলিশেরা (?) অনবরত বাঁশী বাজাইতেছে! এমন একবার আমরা ফাঁদে পড়িয়াছিলাম, ব্রীজ নড়িয়া উঠিল হঠাৎ দুই তীর হাঁদা হইয়া গেল। হাওড়ার ইষ্টিশানের ২৪ মিনিট পিছান ঘড়িটা বেপট হইল। বড়রা বলিতে লাগিলেন, ইস্, ইংলিশম্যানটা দেখিলে হইত। গঙ্গা স্নান করিতে থাকিয়া আমরা জাহাজের নাম পড়িতেছি এস এস লিভারপুল! এস, এস......

সেইদিনকার রায়টে এই গঙ্গা দিয়া অসংখ্য কুপাইয়া কাটা খাব্‌লান দেহ, যাহার উপরে বসিয়া কাক ঠোকরাইতে আছে, ভাঁটার টানে চলিয়াছে — এতই বীভৎস দৃশ্য ইহা যে এই সুউচ্চ ব্রীজে দাঁড়াইয়া থুতু ফেলিয়াছি, যখন পুলের নীচে প্রায়, আমি পা সরাইয়া লইয়াছি; কিন্তু ইহাতে আমারে ঈষৎ অন্যমনস্ক করিল না এই দৃশ্য হইতে, যে, মহাপ্রভু গঙ্গাতীরেতে ছাত্রদের সহিত বসিয়া আছেন, — যুগপৎ নন্দবাবুর একটি কালিতে আঁকা ছবি, নিমাই পণ্ডিতের টোল আমাতে ভাসিয়া উঠিল — এমত দাম্ভিক কেশব কাশ্মিরী, মুখে গঙ্গা বিষয়ক কবিতা! নিমাই কেমনভাবে তাহার দর্পচূর্ণ করিলেন তাহা! এ কথাও, যে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গঙ্গাকে এতেক ভক্তি করিতেন, যে গঙ্গা স্নান করেন নাই কোনদিন কেন না পা ঠেকিবে! ন্যাংটা গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিতে যাইয়া অবাক হইয়াছিলেন! মকরে বৃহৎ গয়নার (!) নৌকায় অজস্র সন্ন্যাসী সাগর সঙ্গমে যাইতেছেন। উত্তরপাড়া বা রিষড়ার কোন একটা ঘাটে দানসাগরে হাতী গাভী সকলকে স্নান করান হইতেছে। (হরিহর ছত্র হইতে ঐ হাতী যখন আসিল তখন আমরা দেখি।) — মেয়েরা জল সইতে আসে!

ম্যান অফ ওয়ার দেখিতে যাই, তাহার সৌখীন গন্ধ — উপরে ইউনিয়ন জ্যাক্ অদ্ভুত দর্পে উড়িতেছে, আমাদের এক দাদা সে স্কাউট — সে ডেকে দাঁড়াইয়া তিন আঙুলে, সেলুট দিল, ঐ ডেকের উপর হইতে আমরা ঐ প্রিন্সেপ ঘাট, বাবু ঘাট, ঐখানে আমার নিত্য স্নানের তেনা — গঙ্গায় নিত্য স্নান জন্য লোকে ছোট বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করে কেন না জলে দাগ ধরে — চুরি যায়; আর ঐখানে...দিদি শিব গড়িয়া পূজা করে ঐখানে আমরা কলা বৌ স্নান করাইতে আসি। ঐ সেই গঙ্গা যেখানে ঠাকুরের সহিত রামলালা স্নানে নামিয়া ঝাঁপাই জুড়িয়াছে।

কোথাও এই দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে। ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে দারুণ বিশেষণ হইয়াছেন, শিবনাথ শাস্ত্রী কেন ইহা যে কাহারও জীবনধারা স্পষ্ট বুঝাইতে লাগাইয়াছেন তাহা খুব সাদা ঃ এখন আপনারা দেখুন, একটা নদী নামিয়াছে। গঙ্গোত্রীর কাছে দেখুন একনদী

নামিয়াছে, পাথর কাটিয়া, মানবাত্মার গভীর স্থান দিয়া, এক নদী প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ঐ দেখুন উনবিংশ শতাব্দীর ভগীরথ রামমোহন রায় এক নদী নামাইয়া আনিয়াছেন। পুনরায় আরোপ করিলেন, এক ব্যক্তি আমার নিকট গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গার এত মাহাত্ম্য কেন? তিনি বলিলেন, দেখুন, গঙ্গার জলে সব রোগের ঔষধ আছে। তিনি ইংরেজি - জানা লোক, তিনি বলিলেন, গঙ্গার জলে এমন সকল স্বাস্থ্যকর ingredients আছে, যাতে শারীরিক সকল ব্যাধি দূর হইতে পারে। যাই হোক, গঙ্গার জলে এই সকল ingredients আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি যে ভক্তি গঙ্গার কথা বলিতেছি — তাহাতে আছে। এটা মেটাফর!

গঙ্গা বিস্ময়কর চেহারা লইয়াছে, যখন ছোট ঢালাই কাজ দেখি, আমার নিকট ঐরূপ কয়েকটি কাজ ছিল, ইহাকে বলা হয় গঙ্গা-যমুনা, গঙ্গার জল গৈরিক (!) সব জায়গাতে নহে — যমুনা নীল! এখানে তামাটে ও সোনাটে! কাপড়ে গহনাতে এবং কাঁথাতে ভারী মজার খোট পেড়ো সেলাই নক্সা আছে। ইত্যাদি বহু কিছুতে। তেমনি আমাতে ঐ স্রোতস্বিনী এক লোকোত্তররূপে নিশ্চয় আছেন!

অর্দ্ধোদয়যোগ চূড়ামণি যোগে, সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণে আমি স্নান করিয়াছি, বিচিত্র পতাকা শোভিত বিদেশী জাহাজ, সারেঙ, বিরাট নোঙর আমার চোখে পড়িয়াছে; মা মাগো বলিয়া ডুব দিয়াছি, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে মা মা ধ্বনি খেলিয়া উঠিতেছে; এমন এক যোগে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ত্রিবেণীর ঘাটে, কোম্পানীর বহরকে রুখিতে কহিলেন, এবং পুণ্যলোভীদের বলিলেন গঙ্গা নাম।... (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) শত শত কণ্ঠে জয় জয় মা উচ্চারিত হইল! এই ত্রিবেণীতে এক মহাশ্মশান আছে; কত শব যে আসে! নৌকায়, গো-গাড়ীতে ইদানীং মোটর যোগে।

এই ত্রিবেণীর ঘাটের ঠাকুরঘরের একটি রাখালবাবু লিখিত বিখ্যাত দুর্গা মূর্ত্তি আছে, শুধু এখানে বলি কেন, কলিকাতার হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট ঠাকুরঘরগুলিতে কত যে দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তি আছে, তাহা চিন্তা করা যায় না, আমি তিন ইঞ্চি দুর্গা মূর্ত্তি হইতে বহুরূপ এবং সাগরদীঘি কিরকীহার ব্রোঞ্জের মত বিষ্ণু দেখিয়াছি।

গঙ্গার দুই তীরে অনেক শ্মশান আছে, তন্মধ্যে নিমতলা এখানে এবং ত্রিবেণীতে বহু ধ্যান-ধারণা হইয়াছে; কেওড়াতলা ইহার ধূম জগন্মাতা দেখিয়া থাকেন; বরাহনগরে ঠাকুর শেষকৃত্য সমাধা হয়। শিবপুর ও নিমতলা যথেষ্ট পরিচিত, নাগ মহাশয় এখানে জপ করিয়াছেন। আজও দেখা যায় নবীন সন্ন্যাসী, সংসার বিরক্তরা, ঐ সব মহানদের উদ্দেশ শ্যামাসঙ্গীত গাহেন। নৌকা হইতে এ শ্মশান অতীব সুন্দর, কুণ্ডলী পাকাইয়া ধূম ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; কেহ মহাভৈরবকে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষিয়াছেন। এখানে বহুবার ঐ সকল গান শুনি 'এই খেদে খেদ করি, তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।' রামপ্রসাদের গান এবং মজলো আমার মন ভ্রমরা! (কমলাকান্ত) তখন মাইরী আর কোন খেদ নাই।

তখন তাহাদেরও মনেই পড়ে না, এই গঙ্গায়, চিতি কাঁকড়া। চাটুতে সেঁকিয়া সরষে মাখাইয়া যে দল পানীয় সহযোগে খাইতে হেদাইয়া থাকে; মনে পড়ে না, তপসে মাছ মেইয়নেজ দিয়া আঃ! কিম্বা নিকটে বিচুলী ঘাটের ইলিশ তুল্য কিছু নাই! আঃ স্মৌক্‌ড হিলসা! এই দল এক আধ্‌বার খাঞ্চের কথা বা টান অনুভব করে কিন্তু উঠে না। ইহারা মহা ধূমরাশির দিকে চাহে; এরূপ ধূমরাশি আমি দেখিয়াছি একদা গঙ্গাতীরে যখন,...দিদি কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া বৈধব্য গ্রহণ করিলেন, আকাশমার্গে সেই ধূম কালো করিয়া উঠিল।

কাশীতে মহাশ্মশান। এখানে শিব, তারক ব্রহ্ম নাম, নিজে দেন। আমার বড় সাধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল কাশীর ঘাটে, রামায়ণ পাঠ করিব। কেমন গ্যাসবাতি কিনিব তাহাও দেখিয়াছিলাম, রামায়ণ পাঠ শিখিয়াছি, গীতে সুর দিয়াছিলাম। বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কি শালার জীবন হইল। কাশীর জল আমাকে অদ্য ঠাট্টা করে, আমার চোখে জল আসে; এই সেই কাশী, ঐ সেই গঙ্গা যেখানে ত্রৈলঙ্গ্য স্বামী ভাসিয়া থাকিতেন; শ্রীধর স্বামী প্রত্যহ স্নান করিতেন; সনাতন ঘাটের ভিখারীর নিকট হইতে কন্থা লইয়াছিলেন; আঃ ভগবান শঙ্কর! কত নাম বলিব; কোথায় কোন ঘাটে দাঁড়াইয়া কাঁচকামিনী (কামিনী কাঁচ ব্যবসায়ী বাবুদের রক্ষিতা!) কাহাদের শ্লেষের উত্তরে বলিয়াছিলেন, মাগো তপস্বিনীর ভাগ্য যদি পাই — আমি জন্ম-জন্মান্তর যেন ঐ হই! তাহা জানি; কোথায় হিজ হাইনেস মহারাজার বসন্তকালীন রক্ষিতা — পারলি, প্রত্যহ পদব্রজে গঙ্গা স্নানে আসিত, তাহা পশ্চাতে তদীয় ভেড়ুয়া বুলবুল হাতে ও বিল্লী কোলে লইয়া অনুসরণ করিত। পারলি প্রথমে দামী আতর গঙ্গায় মহাভক্তিভরে ঢালিতে থাকে, ঐ গন্ধ দ্রব্যের বাস এমনই যে ভ্রমর আসিত। এই মেয়েছেলেটির ভক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার কণ্ঠস্বর ভুলিবার নহে; 'ভর ভট্টিমে বা মার কাটারী নয়না বাণ'; কাফি, খাম্বাজ, জঙলা — হায় হায় করিয়া উঠে। ইহারে শেষ দেখি বারাবঙ্কীর পীরের দরগাতে। যে গোলাপপাশটি দেয় সেও গালদান দিয়া ছিল আঃমরি! পারলি গঙ্গায় ডুব দিত কি কামনায় জানি না। আবার জানিও বটে! ঠাকুরে গল্পে আছে যাহার বিশ্বাস আছে তাহারই পাপ যায়! (হর-পার্ব্বতীর পরীক্ষা) এণাকে দেখিয়াছি, শুনিয়াছি একদা খুব নাম-ডাক ছিল, আজ বাগানবাড়ী, কাল স্টীমার পার্টি পরশু অন্য কোথাও মাইফেল; হয়ত গান গাহিতেছে, 'খাঁচার পাখী গেল উড়ে' এমত সময় যদি রাস্তা দিয়া শবযাত্রার হরিধ্বনি শোনা যাইত, তখনই সে বলিত, পুঁটি দেখত মা কে যায়! পুঁটি বারান্দায় যাইয়া শবযাত্রা দেখিয়া চীৎকারিল, মা সতী গো! অর্থাৎ এয়োস্ত্রী! এণার মুখ থিতাইয়া গেল। এই এণা গঙ্গা ডুব দিয়া কহিত — মাগো আর জন্মে সতী কর।

কত লোক দোল পূর্ণিমার দিন, মা গঙ্গাকে আবির কুমকুম দিয়াছে। জানিয়াছি, ১০ই জ্যৈষ্ঠ কাশীতে গঙ্গায় ভারী যোগ, গঙ্গার জন্ম, এইদিন অল্পবয়সী মেয়েরা গঙ্গাকে তাহাদের খেলনা সকল নিবেদন করে। এই আচারটি ভাবিতে আমার গাত্রে সিঙ্গিড়া লাগে। ঐ বাবা বিশ্বনাথের পদধৌত প্রবাহিনী গঙ্গা তাহার উপর নানাবিধ খেলনা ভাসিতেছে — আমার ভিতরে কত যে নৌকা তৈয়ারী শব্দ জমা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি। শুনিয়াছি, কাশীর সকাল, আউধের (?) সন্ধ্যা; ও সালেয়োর রাত্র! সকালবেলা গঙ্গার ভাসমান খেলনা ধারণা করিতে

আমার অন্তর আত্মা চিন্ চিন্ করিয়া উঠিল। গঙ্গা যে কি পর্য্যন্ত পূর্ণজ তাহা আমাকে ভরাইয়া তুলিতে আছে — আমাদের ঠাকুর কুলুঙ্গীর পাশেই রবিবর্ম্মাকৃত বিখ্যাত গঙ্গা অবতরণ আমার সামনে প্রকট হইল। আমি কখনও গঙ্গায় সাবান মাখি নাই।

অধুনা ঐ ক্যানটিলিভার ব্রীজ নির্ম্মাণে অসংখ্য ড্রীলের শব্দ গঙ্গার বহতা ধ্বনি নস্যাতিতে পারে নাই; যুদ্ধে প্রকাণ্ড বপু বেলুন সকল উড্ডীয়মান দেখিলাম, ইহা আমার গঙ্গা প্রণামের ইতঃমধ্যে আসে নাই; আমি রবিবর্ম্মার ছবির ভাবুকতা। এই ভাগীরথীকে হুগলি বলিলে কোটি হিন্দুর মত আমার কিছু যায় আসে না! কবে এখানে গঙ্গাহৃদি ছিল (১৯১১ সালের ওমেলির সেনসাস রিপোর্টে যতদূর মনে প'ড়ে আছে গোয়ালপাড়াতে ১০/১২ ঘর গঙ্গাহৃদি ছিল)। এই গঙ্গায় বালাম নৌকা চলিত, হুয়েন সাঙ কানসোনাতে আসিয়াছিলেন, হুমায়ুন গঙ্গা মসকে পার হওয়ত ভিস্তিকে তক্‌তে বসাইয়াছিলেন। কে দোভাষী সম্পর্কে লিখিল, জব চার্নক কে? কে কটি সতীদাহ দেখিয়াছিল। ওভিডে গঙ্গা শব্দ আছে। হিন্দু স্টুয়ার্ট রোজ কেন ঘাটে স্নান করিতেন ইত্যাদি বহু কিছুই আমার কাছে আষাঢ়ে গল্প!

আমার সেই স্থান দেখিতে ইচ্ছা করে যেখানে সুরেশ দত্তর আকুল ক্রন্দনে ঠাকুর গঙ্গা হইতে আবির্ভূত হওয়ত মন্ত্র দিলেন। যেখানে মহাপ্রভু পুরী গমনে গঙ্গা পার হইলেন, যেখানে রামপ্রসাদ গান গাহিলেন। জয়দেব কোন ঘাটে স্নানের পর গিয়া লিখিলেন 'দেহী পদপল্লব মুদারম'। গঙ্গার নিকট আমি সেই ছড়াটি বলিয়াছিঃ কাল খাবে পিঠে ভাত। আজ খাবে গঙ্গার জল। এ বছর যাও পোষলা কাঠের মালা পরে আর বছর আনব গোঁ দুধ তুলসী দিয়ে।......ছোপড়ে লোপড়ি গাঙ সিনাতে যাই।

গঙ্গার দুই তীরবর্তী অসংখ্য চিমনী — প্রবাহিনী সৌন্দর্য্য এতটুকু মার যায় না। — জলে যেখানে তেল পড়িয়াছে মনে হয় — অদ্ভুত চীনে কাজ! অসংখ্য ভিখারী আমার ভাব নষ্ট করে না। আউটরাম ঘাটের চায়ে বা ফুলেশ্বরে ডাকবাংলা, বা কম্পোনীর — রেস্টুরেন্ট সময় অতিবাহিত করা কখনই গঙ্গার মহিমাকে ধামসাইতে পারে নাই, ডায়মণ্ডহারবারে পার্টিগুলি আমার কাছে বৃথা মনে হইয়াছে, হ্যামক-এ শুইয়া কেতাদোরস্ত হওয়া, বোহেমিয়ান কাঁচেতে সরবৎ আদি হইতেও মনে আছে, হরিদ্বারে যখন দোনাতে প্রদীপ ভাসমান দেখি। হোয়াইট ওয়েজ এর চায়ের ঘর হইতে পশ্চিমের আকাশ দেখিয়াছি, — মাস্তুলের কিছু কিছু দেখা যায়, মনুমেন্ট হইতে গঙ্গার দিক! এখনই অনুভব করি, কাল আমবারুনী কচি আম আমি মা গঙ্গাকে দিব, গঙ্গায় স্নান করিব। যখন মনে করিতে চেষ্টা করিয়াছি, একবার পোর্টপুলিশ সার্চ্চলাইট ফেলিয়া আমাদের নৌকা ধরিল! সেই গল্প করিব তখনই সেই ঘটনাকে ঢাকিয়া দুর্গাপ্রতিমা ভাষাণের কথা! দুই নৌকা মধ্যস্থিত মা দুর্গা প্রতিমা, কর্ত্তা কহিল এইবার! অবিলম্বে নৌকা সরিতে আরম্ভিল আমাদের বুক কাঁপিল। তাহার পর এক শব্দ! আমরা কাঁদিয়া ফেলিলাম! দুর্গামূর্ত্তি ডুবিতেই হিম উঠে, আমের বোল দেখা দেয়, ব্রাহ্মণী হংস আকাশে ফুট কাটে। অথবা এই সেই গঙ্গা, আমার মা ষষ্ঠীর দিন ঐ ঘাটে গঙ্গার তীরে ভিজা কাপড়ে আমাকে একটি সিন্দুর দেওয়া আম দেন, এবং পাখার বাতাস করেন। এই সেই গঙ্গা জগজ্জননী মা সারদেশ্বরী আঁধারে যখন অবগাহন নিমিত্ত আসিতেন সেই সময় একবার কুমীরের পিঠে পা পড়িল! আর এই সেই গঙ্গা যাহার তীরে বালিতে মা মা বলিয়া ঠাকুর মুখ ঘষিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু শুনিলেন, গঙ্গায় নৌকার মাঝি গাহিতেছেঃ

সাধ আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে

এখন প্রাণ জুড়াইল — মনের সুর মিলিল। বাঙ্গলা ভাষায় বাঙালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম — এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারেই বটে, তাহা বুঝিলাম! এখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল।

আমি এখনও কচি আম হাতে গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া আছি। বারম্বার ইহা আভাসিত হয়, আমি কখনও গঙ্গা দেখি নাই!

....

প্রথম প্রকাশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ২০ নভেম্বর, ১৯৭৬।

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. মায়িক - মায়াবিস্তারকারী, ২. সিঞ্চিড়া - রোমাঞ্চ, ৩. হাঁড়া - হাঁড়ি থেকে বড় মৃৎপাত্র, ৪. ফরাস - ভৃত্য যে ঘরের নানাবিধ কাজ করে, ৫. তেরিকাটা - বক্রভাবে বিভক্ত (এখানে কারুকার্য), ৬. করিন্থিয়ান-গ্রিক স্থাপত্যে তিনরকম স্তম্ভের বিশেষ একটি, ৭. ডরিক - প্রাচীন গ্রিসের ডরিস প্রদেশের স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী নির্মিত স্তম্ভ, ৮. আইওনীয় - প্রাচীন গ্রিক স্থাপত্যে স্তম্ভের শীর্ষদেশে গোটানো ফর্দসদৃশ অলঙ্করণ, ৯. চানকায় - ঝকঝক করা, উজ্জ্বল হয়ে ওঠা, ১০. হওয়াত - বানানভেদ হওত - 'হওয়া' শব্দের অতিপ্রাচীন বর্তমানে অপ্রচলিত রূপ, ১১. বেপট - গরমিল (বানানভেদ -বেপোট,), ১২. ম্যান অফ ওয়ার - গঙ্গা তীরস্থিত একটি জেটি, ১৩. তেনা - জীর্ণ সংক্ষিপ্ত বস্ত্রখণ্ড যা কোমরে পরিধেয় (বানানভেদ - ত্যানা), ১৪. খোট পেড়ো - বস্ত্রের ধার বা কিনারার যে অংশ কোমরে আটকে থাকে, ১৫. কিরকীহা - বুদ্ধগয়ার কাছে অবস্থিত, ১৬. সাগরদীঘি - উড়িষ্যায় অবস্থিত, ১৭. খাঞ্চ - কাষ্ঠনির্মিত বৃহৎ পাত্র, ১৮. কানসোনা - কর্ণসুবর্ণ, ১৯. ওভিড - রোমক কবির নাম, ২০. পোষলা - পৌষ মাসে উৎপন্ন বা জাত, ২১. দোনা - পাতার ঠোঙা, ২২. শীতল - ঠাকুরের সন্ধ্যারতি ও লঘু ভোগ।

কয়েকটি অনিবার্য সংশোধন করা হল। মূল পাণ্ডুলিপির অভাবে কয়েকটি জায়গায় সন্দেহের অবকাশ থেকেই গেল। বানানরীতি অপরিবর্তিত রাখা হল।

ভারতে মুদ্রণ শিল্প

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, গোয়ার জেসুইট সম্প্রদায়ের দ্বারা মুদ্রণশিল্প ভারতে প্রচলিত হয়। কিন্তু সেই সময় এই ধর্মপ্রচারকরা কেবলমাত্র রোমান লিপিতেই পুস্তক সকল মুদ্রণ করিতেন। ফাদার এস্‌তভাও (অর্থাৎ স্টিফেন্স, জনৈক ইংরাজ) কোনকানী ভাষা ছাপার জন্য একমাত্র রোমানলিপির ব্যবহারের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এই এস্‌তভাও প্রণীত কোনকানী ব্যাকরণ (আর্ত দ্য লিঙগোয়া কানারিণ) এবং পুরাণে এই লিপি অনুকৃতির ব্যবহার দেখা যায়, এ ধরনের ব্যবহার সত্যই প্রশংসনীয়। যদিও সমস্ত বর্ণের উচ্চারণ পর্তুগীজ রীতি অনুযায়ী করা হইয়াছে, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই রীতি অনুযায়ী উক্ত পুস্তক সঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে। অদ্যাবধি দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের বহু কোনকানী রোমান ক্যাথলিকরা ইহা অনুশীলন করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে, যতদূর জানা যায়, গোয়াতে দুইটি ছাপাখানা ছিল। একটি গোয়ার সেন্ট পলস্থিত কলেজে, আর একটি তাহাদের বাসস্থানে রাশোলে। তাহাদের ছাপার কিছু কিছু আজও সযত্নে রক্ষিত আছে, এই দুইটি ছাপাখানার সাহায্যে তাঁহারা যে বহু গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়, এই সকল গ্রন্থের আকার নানাবিধ ছিল, কিছু কিছু বৃহৎ আকারের গ্রন্থও তাঁহারা মুদ্রিত করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গোয়াতে দেশীয় খৃশচানদের গির্জার নানাবিধ উচ্চ কর্মে নিয়োগ করা হইত, ঠিক এই সময় হইতেই মুদ্রণশিল্পের শেষ হয়, পূর্বতন জেসুইট প্রচারকদের সকল পরিশ্রম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সাহিত্য সম্পর্কে নূতন পাদরীদের উদাসীনতার ফলে, মুদ্রিত সকল পুস্তকই হয় অকেজো কাগজের মত ব্যবহৃত হইত, অথবা বই-এর তাকে অব্যবহৃতভাবেই পড়িয়া থাকিত।

গোয়ার মতই কোচিনের নাম মুদ্রণশিল্পে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। কোচিনের আম্বালাকাটার নাম সপ্তদশ শতাব্দীর ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্যটকরা বহুবারই উল্লেখ করিয়াছেন। আম্বালাকাটা যে ঠিক কোথায় অবস্থিত এই লইয়া অনেকেরই সন্দেহ ছিল, কিছুদিন পূর্বে মেজর কার এই তত্ত্বের জন্য প্রথমে গোয়া পরিদর্শন করেন এবং পরে এই আম্বালাকাটা সম্পর্কে সঠিক সংবাদ প্রকাশ করিয়া যান। ইদানীং আম্বালাকাটা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, এখানে কতিপয় সিস্‌মাটিক নেসটোরীয়ানদের (খৃষ্টীয় সম্প্রদায়) বাস। ইহা ক্যারণগালোরের ভিতরে ও আনাগামালীর কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। ১৫৫০ খৃঃ পরে জেসুইটরা এইখানে সেন্ট টমাসের নামে একটি গির্জা ও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৫৯৯ খৃঃ গোয়ার আর্কবিশপ [আর্চবিশপ] আলেকসীয়েস মনজেস-এর সভাপতিত্বে উদয়মপুরায় যে সম্মেলন হয়, তাহার কার্যনির্ধারণ অনুযায়ী এই স্থান ক্রমে মিশনের প্রসিদ্ধ কর্মক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। তৎকালে যে সকল পর্তুগীজ জেসুইটগণ সেখানে বাস করিতেন, তাহারা সংস্কৃত, তামিল, মালায়লম্ ও সাইরীয় ভাষা অতি গভীরভাবে চর্চা করিতেন। জার্মান জেসুইট হনাক্যলডেন সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ইনি ১৭৩২ খৃঃ দক্ষিণ মালাবারের শাসুরতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঠিক এই সময় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়, এই সকল গ্রন্থের নাম ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ আজ আর নাই। এফ দ্যসুজা এবং আরো অনেক লেখক এই সকল পুস্তকের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং ইহাদের পরে ফাদার পালনাস ইহার সম্পর্কে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৫৭৭ খৃঃ কোচিনে জেসুইট সম্প্রদায়ের একজন পাদরী জোয়ানস গোনসালভ্যস সর্বপ্রথম মালাবার-তামিল (মালায়লম্) লিপি খোদাই করেন।

টিপু সুলতান যখন কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন, তখনই আম্বালাকাটা, তাহারই অনুমতিক্রমে ধ্বংস হয়। এখানকার সকল হিন্দু ও খৃশচানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছিল, শুধু তাহাই নয় সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিও পুড়াইয়া দেওয়া হয়।

এখনও অনেক ব্রাহ্মণের মুখে শোনা যায় যে কিভাবে তাহাদের পূর্বপুরুষরা সেই অমানুষিক ধ্বংসের হাত হইতে অতি মূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বাঁচাইয়া লইয়া গভীর বনে গিয়া আশ্রয় লন।

ট্রউবনারস রেকর্ড অক্টোবর '৩১ ।। ইন্ডিয়ান এ্যান্টকিরী — মার্চ ১৮৭৩ — প্রথমবর্ষ থেকে গৃহীত। অনন্যা পত্রিকা, আষাঢ় ১৩৭০-এ পুনঃপ্রকাশিত। *সম্পাদকীয় সংযোজন*

এই লেখার কয়েকটি নামের বানান সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও মূল পাণ্ডুলিপির অভাবে, 'অনন্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত বানান এখানে অক্ষুণ্ণ রাখা হল।

ছাপাখানা আমাদের বাস্তবতা

মাধবায় নমঃ জয় রামকৃষ্ণ তারা ব্রহ্মময়ী। কম্পাস হইতে ঊনিশ শতকের বাষ্পশক্তি পশ্চিমকে বিশাল হইবার সাধ্য দিল, লৌহ যন্ত্র — ইস্পাত সভ্যতার রেখাপাত হইল। যখন, আমাদের পরিবর্তন সম্ভাবনা আসিল একটি যন্ত্রে, অবশ্য যাহা হস্তচালিত, যেটি কাঠের — আদতে ইহা অষ্টাদশ শতকের শেষে আসে — এবং এইটির দ্বারাই আমাদিগের বিগত শতাব্দী আশাতীত সম্ভ্রান্ত মর্য্যাদার হইল; ইহা মুদ্রণ যন্ত্র।

শ্রীপান্থ খুব অবাক চাতুর্য্যে, আমাদের এখানে মুদ্রণযন্ত্রের আরম্ভ হইতে অদ্যাবধি — ও তাহা হইতে আমাদের মানসিকতা গঠনের সূত্র — যাবতীয় কথা গল্পের মত লিখিয়াছেন! অথচ বিষয়ের গুরুত্ব কোনরূপ অসতর্কতাক্রমে তিলমাত্র বিচলিত হয় নাই, বরং শুধু কয়েকটি পদে বিরাট ভাবনার সঙ্কেত আছে। যেমন, ''...'কল' কথাটা ঈষৎ হাল্কা। প্রাচীনেরা অতএব বলতেন যন্ত্র। গাম্ভীর্য ঐশ্বর্য মাহাত্ম্য — সব যেন নিহিত ওই একটি শব্দে, বিধৃত নতুন কালের নতুন তন্ত্রের বীজমন্ত্রও বুঝি।''

সব যেন নিহিত ওই একটি শব্দে...।

এবং এই নির্দ্দেশেতেই বাঙালী জাতীয় জীবনের বিবিধ পরিবর্ত্তনের ব্যাপার আমরা মনে করিয়া থাকি ঃ 'সেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে আমাকে বুঝাইয়া দাও' ইহা অল্পবয়সী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিলেন; আশ্চর্য্য সেই ছাপার অক্ষরেতে লেখা ছিল, ''ঈশা বাস্যমিদং''... এক মহৎ ছন্দোবদ্ধ অনুভব, ও ইহাতে তিনি আদিষ্ট হইলেন, এবং ঠাকুরের ইচ্ছায়, তাঁহার দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম ধর্ম্মরূপ ধারণ করিল! আবার দেখি ঃ একবার মহাসিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী, কোন জিজ্ঞাসুকে বলিলেন, ''দুই পয়সায় ভক্তি লাভ হয়,... উপহাস করি না... দুটি পয়সা দিয়া বটতলার ছাপার 'নরোত্তম দাসের প্রার্থনা' এনে কিছুকাল পড়ুন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।'' সুদুর্লভ ভক্তি লোকের হাতের কাছে আসিল।

এবং স্মরণে আসিবে, ডিরোজিও-র পারথেনন কাগজ, ইয়ং বেঙ্গল তৎসহ বিজাতীয় চরিত্রের প্রমত্ততা ঃ রাজনারায়ণবাবু-তে আছে, 'যেদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়।' কিন্তু ইহা সকল ছাপাইয়া গিয়াছিল অনেক প্রকৃত ধীর ঘটনা ঃ ১৮২৩ খৃঃতে গৌড়ীয় সমাজের সভাতে রামকমল সেন প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণার কথা বলিলেন; রামমোহন, তাঁহার ব্রহ্মণিকাল ম্যাগাজিনে লিখিলেন, বিজিতদের ধর্ম্মকে নিপীড়ন করা হৃদয়হীনতা।

এবং মহামতি কেরীর বাঙলাভাষা লইয়া রাত্রদিন কত অধীরতা; টাইপ-কাটা মিস্ত্রি পঞ্চানন কর্ম্মকারকে লইয়া মহান কোলব্রুকের সহিত বাকবিতণ্ডা — এই ব্যাপার শ্রীপান্থ লিখিয়াছেন, ''...শ্রীরামপুরের মিশনারীরা কোলব্রুককে ধরে পড়লেন...পঞ্চাননকে চাই।'' কোলব্রুক রাজি হইলেন, তাহার পর দারুণ ঘটনা, ''...কোলব্রুক অনেক চেষ্টা করলেন তাঁকে 'মুক্ত' করতে...'' এখানে আছে তিনি, ''ভারত সরকারের কাছে আরজি পেশ করলেন...'' শ্রীপান্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

নিশ্চয় আভাসিত হইবে, মহানুভব হেষ্টিংস, 'রাজনৈতিক জ্ঞান বা তথ্যাদি চাপিয়া রাখিবার — পূর্ব্বকার সরকার কৃত নীতি কোনরূপ মান্য করিলেন না, তিনি দর্পণ-কে সবরকম সাহায্য দিতে লাগিলেন।' এবং ১৮২৩, জন এ্যাডাম-এর প্রেস এ্যাক্ট লইয়া রামমোহন সুপ্রিম কোর্ট এবং দি কিং ইন কাউন্সিল-এর নিকট প্রতিবাদ দাখিল করিলেন। অনেক পরে, কবি কাশীপ্রসাদ তাঁহার, মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদে, হিন্দু ইন্টেলিজেন্‌সিয়া নামক সাপ্তাহিক বন্ধ রাখিলেন (১৫ই জুল - ১৮৫৭)।

এখানে ছাপাখানার ব্যস্ততা লইয়া শ্রীপান্থ ভারী চমকপ্রদ বর্ণনা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন ঃ '...সেখানে তুমি দেখবে ভারতীয়রা নানা ভাষায় শাস্ত্র অনুবাদ করছেন। অথবা প্রুফ সংশোধন করছেন।...ভারতীয় হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান কর্মীরা ব্যস্ত। তাঁরা হরফ সাজাচ্ছেন, সংশোধন করছেন হরফ আবার খোপে খোপে রাখছেন...।' সতের শতকের ইউরোপীয় ছাপাখানার ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে যেন শ্রীরামপুরের বিবরণ।

বাঙালীর জাতির ইতিহাসে ছাপাখানার স্মৃতি ভরিয়া আছে; প্রতিভাবান রামকমল সেন, জীবন আরম্ভ করিলেন ড.হান্টারের প্রেসে; মহাত্মা শিশির ঘোষের কথা নবীন সেন হইতে জানিতে পারি — ''অমৃতবাজার পত্রিকা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা। কাগজ কদর্য্য, ছাপা কদর্য্য, ভাষা কদর্য্য। শুনিলাম উহার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, কম্পোজিটার শিশিরকুমার ঘোষ, প্রিন্টার শিশিরকুমার ঘোষ, এমন কি উহার প্রেস ও অক্ষর প্রস্তুতকারক পর্য্যন্ত শিশিরকুমার ঘোষ...।'' ছাপাখানা আমাদের এতই বাস্তবতা, অর্থাৎ জগৎ হইয়া উঠিল যে সাহিত্যেও তাহার প্রসার ঘটিল ঃ নাটুকে রামনারায়ণ-এর 'নব নাটক'-এ আছে যে, আশু চক্রবর্ত্তী তাহার মামা ন্যায়ভূষণের প্রেসে কম্পোজিটার ছিল এবং তাহার ৪৲ মাহিনা কাটা হয়।

আর শ্রীপান্থের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লেটার প্রেসের বাঙলা প্রচলিত 'যন্ত্র' শব্দটিকে মহাপণ্ডিতদেরও মান্য করিতে হইল ঃ দেবেন্দ্রনাথ-এ

আছে '...এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি যন্ত্রালয় ও একটি পত্রিকা অতি আবশ্যক হইল।' এই সঙ্গে দেখি, বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন '...'তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হইল...।'

এইভাবে লেটারপ্রেসের বিষয় দেশীয় প্রচলিত শব্দগুলিকে একাধিক নজির দ্বারা শ্রীপান্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমে তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কিছুকে বিবেচনার মধ্যে আনিলেন — ইহা করিতে তাঁহার লেখা এক চমকপ্রদ খাত ধরিয়া চলিয়াছে ঃ প্রথমে, ৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই যন্ত্রটির, অর্থাৎ গুটেনবার্গ আবিষ্কৃত যাহা, আমাদের দেশে ব্যবহার প্রচলন এবং এই সংক্রান্ত তাঁহার পূর্ব্বকার লেখকদের কাজ হইতে পরে উদ্ধৃতি — যাহা তিনি নিজের বক্তব্যে সন্নিবেশিত না করিয়া — সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ৩৫-১২৫ পৃষ্ঠা অবধিতে স্থান দিয়াছেন; সেই সঙ্গে ঐ সকল তত্ত্ব কতখানি যথার্থ তাহা লইয়া কখনও তর্ক কোথাও বা অবিশ্বাস করিয়াছেন। যেখানে নিশ্চয়ই অনেকেই উদ্ধৃতি দিয়াই ক্ষান্ত হইত।

শ্রীপান্থকে ঐরূপ অধিকার আমাদের দিতেই হইবে, এ কারণ যে ছাপাখানায় যাবতীয় কিছুর প্রতি নিখাদ ভালবাসা তাঁহাতে আছে; যাহা আগেকার অন্বেষণকারীদের প্রায় ছিল না; ইঁহারা টাইটেল পেইজ-এ আটকা পড়িলেন, লেখক, স্থান কাল লেখার বিষয় লইয়া যথেষ্ট তৎপর; সাট সরঞ্জাম যে বুদ্ধি বিচারের বস্তু তাহা গণ্য করিলেন না। শোনা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়-এর যে এই ব্যাপারে উৎসাহ ছিল তাহাই শুধু টুকিয়া রাখিলেন। পঞ্চাননকে অবশ্য বিষয়ীভূত করিলেন।

মার্শম্যান, ওয়ার্ড ইত্যাদি কোন সূত্রে বলিলেন না, স্যর চার্লস উইলকিন্স কৃত মহা পরিশ্রমের ফল সেই বিরাট টাইপ ফউন্ড গেল কোথায়; পরবর্ত্তীরা কেহই কাঠের স্ক্রু প্রেস হইতে লৌহের, ক্রমে ট্রেড্‌ল, ফ্ল্যাটবেড; ইহাদের ছাপার ক্ষমতা (স্ক্রু প্রেসে ঘণ্টায় ২৫০, তিনজন চালিত) কিরূপ, সাইজই বা কি ছিল — যদিও কোয়ার্টো অফ ফলিও পোষ্ট আছে — সঠিক তাহা খোঁজ করিলেন না ঃ কোথাও টাইপ ছাঁদ লইয়া পাকা বিচার (এমনও যে সুকুমার সেন দ্বারা হয় নাই) দেখা যায় না। ব্রজেনবাবু আদি সকলেই 'প্রস্তর' শব্দটা সত্ত্বেও লিথো বলিতে পারিলেন না — পূর্ব্বে পাষাণ যন্ত্র কথাটার প্রচলন ছিল — পাথুরিয়া রাখিলেন, কোথাও বা সপ্ট মেটাল-এর আজব বাঙলা 'সহজ ধাতু' চালাইয়াছেন। সব থেকে বড় আশ্চর্য্যের কথা মহামান্য হান্টার শিষ্য ত্রৈলোক্যবাবুর সিদ্ধান্তে, তিনি লিখিয়াছেন, লিথোতে পারসিক টান আদি (অর্থাৎ কলীগ্রাফি) ভাল খেলিয়া থাকে তাই পশ্চিমে উহার চলন বেশী। — আমরা জানি, কলিকাতার হরফ ফাউন্ড্রীকৃত ঐ অঞ্চলে বাজার পায় নাই; আর বাঙলা টাইপ ১০/১০ ½ পয়েন্ট অজস্র এবং সস্তা, ফলে লিথোর কথা আসেই না। আবার যখন দেখি সজনীবাবু, স্যর চার্লস উইলকিন্স-কে 'ভারতের ক্যাক্সটন' বলিয়া ঘোষণা দিলেন — এহেন প্রেরণা আমরা ক্যালকাটা রিভিউ ১৮৫০ হইতেও লাভ করিয়াছি, স্যর চার্লস-এর সহিত ক্যাক্সটন-কে তুলনায় আনা যায় না; ফুরনিয়ে-র সংজ্ঞায় টাইপোগ্রাফার বলিতে যাহা বুঝায়, স্যর চার্লস তাহাই; ক্যাক্সটন হল্যাণ্ড হইতে একটি ছাপাখানা খরিদ করিয়া ১৪৭৮ লণ্ডনে লইয়া আসেন। অনুবাদক ও (ভূমিকা) লেখক হিসাবে আজও তাঁহার নাম আছে। অন্যপক্ষে স্যর চার্লস উইলকিন্স বিরাট ব্যাপার।

ইঁহার নিকটই পঞ্চানন কর্ম্মকার টাইপ কাটার কোন ব্যাপারে কাজ করিয়াছিল। শ্রীপান্থের অঢেল বিরক্তি এই হয় যে, হালেদ তাঁহার সুদীর্ঘ ভূমিকা মধ্যে এতটুকু জায়গা উহারে দেন নাই — আমরা ভাবি, বাঙলা টাইপ কাটাতে যদি সে হাতে কলমে কিছু করিত তাহা হইলে নির্ঘাত হালেদ তাহার নাম বাদ দিতেন না। শ্রীপান্থের বিরক্তি আছে, কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে পঞ্চাননকে প্রতিষ্ঠিত করা নিমিত্ত উচ্ছ্বাস তাহাতে নাই; তাই লক্ষ্য করা যায় যে পূর্ব্বগামী মন্তব্য তিনি গ্রহণ করিলেন না ঃ ''এই হরফ যে পঞ্চাননই তৈরী করেছিলেন...তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই...সজনী দাস উদ্ধৃতি দিয়েছেন এই যা...''

এবং বহুস্থানে তিনি নিজ মত প্রকাশে দ্বিধা করিলেন না, যেমন, '...আপজন-এর ছাপা বাংলা বইটির হরফ কিন্তু মোটেই ভাল নয়...।' কখনও বা একমত হইয়াছেন যেমন, '...কাঠের হরফ সম্পর্কে আমরা সজনী দাসকে পুরোপুরি সমর্থন করি...।' অনেক পণ্ডিতদের ধারণা ছিল ''...গোড়ার দিকে কাঠের অক্ষরে বাংলা বই ছাপা হইয়াছিল...।'' এখানে বলা যায় নবীন সেন-এ'তে আছে ঃ ''...কাগজখানির নামটি যে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয় তাহার অক্ষর লোকের বিশ্বাস, লাউ কাটিয়া, কি কাষ্ঠ কাটিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন শিশিরকুমার ঘোষ। পূর্ব্বউক্ত বিশ্বাস অনেকটা এই জাতের। এবং শ্রীপান্থর অধিকার এই জন্য যে, ''অধরের টাইপ ফাউন্ড্রিটি আমরা দেখেছি,...এটি পঞ্চানন প্রতিষ্ঠিত এমন বলা যায় না।'' যে, অর্থাৎ যে পঞ্চানন উইলকিন্স-এর কাছে কাজ করিয়াছিল।

আমরা প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় মনোভাবসম্পন্ন যে বাঙলা সব বিষয়ে প্রথম স্থানে আছে কিম্বা নাই। এখন যখন পড়ি উইলকিন্স নির্ম্মিত বাঙলা মুভএবল অক্ষরই, যাহাতে হালেদ-এর গ্রামার ছাপা হইল, তাহাই দেশীয় ভাষার মধ্যে সর্ব্ব ''প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়।'' আমরা গর্ব্বিত হই! অবশ্য গোয়ার জেসুইটরা রোমান হরফে কোনকানি ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশের সঙ্গে (?) ইহা ষোড়শ শতকে, তামিল অক্ষর কাটাইয়া (মালাবার-তামিল) — মুভএবল টাইপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন — কিন্তু কোন নিদর্শন তাহার নাই — ইহা লিখিত আছে।

যদিও তাহাদের কৃত রোমান অক্ষরে ছাপা বই আছে। যেমন বাঙলাভাষার রোমান অক্ষরে কয়েকটি বই-এর নাম শ্রীপান্থ করিয়াছেন; কিন্তু বাঙলাদেশে রোমান অক্ষরের বিশেষ ক্ষমতার প্রতি ঔৎসুক্য অনেক লোকের ছিল; শ্রীপান্থ লিখিত 'শোভাবাজারস্থ রোমানেজিং' এবং বিতর্কর কথা আমরা বলিতেছি না, আমাদের বক্তব্য এই যে, রোমান অক্ষরে আমরা যখন নাম ইত্যাদি লিখিয়া থাকি, ছেলেমানুষ মেয়েরা

ইতিপূর্ব্বেতে আমরা কখনও এক সঙ্গে — যাহা এখানে প্রকাশিত আছে — এতগুলি, প্রথম দিক্‌কার বিভিন্ন সময়ের মুদ্রিত বইয়ের পাতার ছবি দেখি নাই; ইহাতে মুদ্রণ উৎসাহীদের যে জানা — যে ধারণা দৃঢ়ীকৃত হইল তাহা অপ্রত্যাশিত! এবং তৎসহ এই সত্য যে, সংস্কৃতর আটক উজাইয়া বাঙলায় চর্চ্চা — ইংরাজীকে ধরিতে হইবে আরম্ভিল।

যদিও জানি, শ্রীপান্থ ইংরাজী চর্চ্চা লইয়া তামাসা করিয়াছেন ঃ ''প্রভুদের কাছাকাছি পৌঁছিবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পথ খুঁজছেন।'' এই বেচারাদের মধ্যে কি আমরা রামমোহন, রাজা স্যর রাধাকান্ত, রামকমল মহাশয়দের গণিব; আর এক কথা যে, যোগেনবাবু সেদিন এমন আক্ষেপ করিলেন, 'বাঙালী মুন্সী রাখিয়া বাগবাহার পড়িবে, ইংরাজীনবীশ-এর নিকট 'চ্যসর' পড়িবে...।' মুসলমান যুগে ফারসী শিখিল, আর ইংরাজীতে দোষ! উচ্চবর্ণের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পথ তো উহাই ছিল। কেদারবাবুতে আছে, কোন এক পশ্চিমের ইষ্টিশানে গাড়ীর কামরা হইতে কয়েক ছোকরাকে, চুলের ছাঁটা যে কলিকাতার তাহা দেখিয়া, নামান হয়, এবং যাহারা বড় হাতের এ বি সি লিখিতে পারে তাহাদের একদিকে, ছোটহাতের আর দিকে — দাঁড় করাইয়া বড়হাতের লেখা জানা ৩০্ আর ছোটহাতের ৬০্ টাকা বেতনে কাজের কথা পাড়া হইল!

শুধু এই সকল শিক্ষাগ্রহীদের জন্যই বইয়ের প্রকাশ এমন নহে, রকমারি বই পাঠকদের বিস্মিত করিতেছিল, তখন এখানে প্রেস অনেক কয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে — যেহেতু টাইপের অভাব নাই, কোন ফাউন্ড্রীই বাংলা টাইপ সাট অজস্র বলিয়া বাদ দিতে পারে নাই,— এই সূত্রে শ্রীপান্থ তুলনা করিয়াছেন ঃ ''...লাতিনে সাকুল্যে অক্ষর সংখ্যা ২৬টি অথচ অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় যুক্তাক্ষর ইত্যাদি নিয়ে কমপক্ষে ৬০০ হরফ। হাতে সাজিয়ে বই ছাপতে গেলে বাংলায় কমপক্ষে চাই ৩৭০টি। একটি ডবল কেস বোঝাই রোমান হরফ হলে দিব্যি ইংরাজী বই ছাপা চলে।'' ইহা চমৎকারভাবে শ্রীপান্থ উত্থাপন করিলেন। এখানে আমাদের কাছে কিছু ফাঁক থাকে, যথা গ্রন্থটির আকার এবং টাইপের পয়েন্ট — ইহা জানান ভাল ছিল।

তবে আমাদের জন্য ওজনও দিলে ভাল হইত, এবং আর একটি কথা বলাতে নিশ্চয় দোষ হইবে না যে, যদিও শেষে রোমান হরফ এবং ডবল কেস — অর্থাৎ আপার ও লোয়ার — আছে; তবে দুই এক লাইন আগে 'লাতিনে সাকুল্যে ২৬টি' হঠাৎ ইহা কেন বুঝিলাম না, এবং সেখানেও বড় হাতের ছোট হাতের আছে, এতদ্ব্যতীত এ-ঈ আর ও-ঈ ইত্যাদি ডিপথং বা লিগাটিউর এবং এ্যাক্সেন্ট যুক্তও আছে! এখন কাজের কথা এই যে, বাঙলার বিশাল টাইপকে — ৫০৭ বা ৫১০ টি, ও সাটে খোপ ৫৬৪টি (?) — এক এক টাইপ মিস্ত্রী বিভিন্ন ছাঁদের গড়ন দিল।

এইরূপ ছাঁদ, অক্ষর সমূহে করিতে ঐ সকল কারিগরদিগের অতীব সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়; যদিও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কৃত মন্তব্য যে, ''রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৩৯ সালের লেখা একখানি বৌদ্ধপুঁথি সকলের চেয়ে পুরান...রাজা হরিবর্ম্মদেবের সময় এখনও সূক্ষ্ম করিয়া বলা যায় না তবে একথা ঠিক যে তিনি ১০ ও ১১ শতকের সন্ধিস্থলে বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।...এই পুঁথিখানির অক্ষরের টান প্রায়ই এখনকার অক্ষরের মত...।'' তবে, অতএব কারিগরদের এমন কি ভাবনায় পড়িতে হইল, ইহা অনেকে বলিবেন।

ঐটুকু আকারে অক্ষরের দারুণ স্বতন্ত্র চরিত্র বজায় রাখিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারা বড় কঠিন কাজ! এখানে আমরা পড়িলাম ছেনি তৈয়ারী লইয়া উইলকিন্সকে কি অবর্ণনীয় পরিশ্রমই না করিতে হইল, তাহার পর তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে কি বা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, উইলকিন্স-এর অক্ষররাজি যদি দেখি, তবে নিশ্চয় তাহার কয়েকটি অক্ষর — এখানে যেমন আছে — আমাদের বিশেষ ধন্ধে ফেলিয়া থাকে।

যেমন, ক থাকিতেও 'ঠাকুর বা কুরুবীর'-এর 'ক' অনেকটা টানা লেখা হ্রস্ব উ'কার যেমন, শুধু এখানেই নহে, ঐ ছাঁদ ১৭৮৫, ২১নং চিত্রেও দেখা যায়। আবার জ-ঞ এখানে ঙ-গ এর মতন (ইহা কি আমাদের উচ্চারণ ধরিয়া গঠিত) —'আঙ্গা', [আজ্ঞা] তুমি স্থানে 'ত্তমি' এবং সোমদত্ত-র'ক্ষেত্রে ত-ত যুক্ত। র-এ ফুটকী নাই। হালেদঙ্গ্রেজী-তে ঙ্গ্র অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে বিরাট পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঐ ঙ্গ্রটি ব্যবহার করিয়াছেন (১৮৫১) বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ। — ইহা নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল।

এবং কেরী আদি বহু মিশনারীদের চেষ্টাতে ঊনিশ শতকের প্রথম হইতেই টাইপে ফের দেখা দিল; এখানে বিশেষভাবে নাম করা যায় পীয়ার্স-এর, শ্রীপান্থ বলিয়াছেন, '...আজকের খুঁত ধরা দর্শকও বোধ হয় এক কথায় নাকচ করে দিতে পারবেন না পীয়ার্স সাহেবের সেই অভিনব বাংলা হরফ।' এই ছাঁদ নিঃসন্দেহে অভিনব — ইটালিক-এর মতো। এই কল্পনার মাত্রা পাঠক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; আমরা জানি না ইহা কত পয়েন্টের টাইপ, এখানে, চিত্রতে, খুব অপরিচ্ছন্ন দেখাইতেছে, এতদ্ব্যতীত দুয়েকটি অক্ষর যেমন, দ-ধ এর চেহারা ঙ-গ আবার একই পাতাতে ঙ-গ এর চেহারা একই; অথচ 'জন্মান্ধ'র বেলাতে ন-ধ পরিষ্কার।

বাঙলা টাইপ চেহারা এক বিচিত্র উৎকর্ষের দিকে মুখিয়া চলিতে লাগিল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, ''...ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পশ্চিমের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। আর দেশের লোকে (অর্থাৎ বৌদ্ধেরা) দেশের অক্ষরের পক্ষপাতী ছিলেন। এই দুইয়ের লড়াইয়ে দেশের লোকে অর্থাৎ বৌদ্ধরা জয়লাভ করিল। তেকোণা অক্ষর চলিয়া গেল।''

কোন এক সময়ে আমাদের লেখা এক বিশেষ ধরণকে মান্য করিল; কিন্তু এখনও তাহার স্বতন্ত্র ছাঁদ হারাইল না; এবার, অক্ষরের চেহারাতে আর এক পরিবর্তন ঘটিল, শ্রীপান্থের উক্তিতে '...ব্যক্তি বিশেষের হাতের লেখার আদলে কাটা হলেও যান্ত্রিক কারণে ও প্রয়োজনে চলনশীল ধাতব হরফ নৈর্ব্যক্তিক।'

এখানে এই নৈর্ব্যক্তিক শব্দ আমাদের সত্যিই বড় কষ্ট দিল; আমাদের, এমন যে, জীবনধারার অভিনব সংজ্ঞা উহাতে নিষ্পন্ন হইল। অবশ্য এই শব্দটিকে কাটিতে পারেন ইহা বলিয়া যে অমন তো অনেক যন্ত্র আছে, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, '...যখন চীনজাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবী মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে... জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল এক উপায় বেরিয়েছে, তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।' তথাপি মানিতে হইবে, সাধারণভাবে শ্রীপান্থের সিদ্ধান্তই ঠিক।

'যন্ত্রসভ্যতার বৈশিষ্ট্য যে ইউনিফরমিটি আর ষ্ট্যান্ডার্ডাইজেশন তাই প্রতিফলিত হ্গলির উদ্যোগ আর তার ফলাফলে।' এই ষ্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অর্থাৎ প্রথম দিকের চেষ্টাতে যাহা, তাহার চমৎকারিত্ব আমাদের গর্ব্বিত করে , আমরা হাতে লেখা হইতে বিশেষ কিছু এখানে বাদ দেখি না। বাঙলা বর্ণমালা খতাইলে বুঝিব, বিবিধ আকৃতি খুব মনোরমত্ব বুদ্ধিতে গঠিত — এই দেশীয় আর পাঁচটা ভাষার অক্ষর লইয়া যদি তুলনা করি, দেখিব আমাদের কথা বৃথা নহে। এই সূত্রে আমরা যদি ইংরাজ আমলের প্রমিসরী নোট দেখি তাহা হইলে নিশ্চিত হইব — এবং সেই সুঠাম মনোজ্ঞতার কিছুই খোয়া যায় নাই।

এখন, যদিও আমরা পরিচ্ছন্ন লেখার প্রশংসা করি '...ভাল হাতের লেখাকে আমরা আজ বলি যেন ছাপার হরফ।' ইহা 'আজ' নহে, লিখিত আছে, '...কেশব কয়েকটি প্রার্থনা স্বহস্তে লিখিয়া তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, মা তুমি প্রতিদিন ইহা পাঠ করিও। ঐ কাগজ জননীর গৃহভিত্তিতে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, হাতের লেখাগুলি এমনি সুন্দর যেন ছাপার অক্ষর।' তবে ছাপার অক্ষর বলিলেও, লেখা কথাটা লুপ্ত হয় নাই। ছাপাকে আমরা লেখা বলিয়া থাকি।

এই ছাপার অক্ষর কত যে সুন্দর তাহা তখনকার বই-এর পাতার ছবিতে প্রমাণ হয়; সব থেকে একটি বই আমাদের আকর্ষণ করে, ইহা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবত', এই গ্রন্থের আকার কল্পনা প্রতিটি জনকে — যাহারা গ্রন্থ আকার ও সজ্জা লইয়া চর্চ্চা করেন — তাহাদের অবাক করিবে; ভবানীবাবু নিজস্ব, দেশজ রুচি কাজে লাগাইতে কিঞ্চিতমাত্র দ্বিধা করেন নাই — এখানেতে আমরা বাঙালীর দিব্য শিল্পবোধের দারুণ প্রমাণ পাইয়া থাকি।

ঐ বইটিতে টাইপ সাজান বড় পরিপাটি; শুধু যে এখানেই খুব বুদ্ধিতে সবকিছু ঘটান হইল এমন নহে; সেযাবৎ এবং তাহার অনেকদিন পরেও ঐ ধারা বহিয়া চলিল — তবে শ্রীমদ্ভাগবত-এর সহিত 'ডোর পাটা' মলাটের বদলে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, অতএব পুঁথির সব কিছুই ঐটিতে রহিল — তবে এইগুলি একপাশে বাঁধান — যেমন অদ্যও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পাঁচালী ইত্যাদিতে দেখিয়া থাকি।

অনেকেই নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন এমন অনেক মুসলমানদের বই বাঙলাতে আছে যাহার পাতা আমাদের বিপরীত দিক ধরিয়া শুরু হইয়াছে। হিন্দুর পুঁথি, মুসলমানদের বাঁদিক ব্যবহার, আমাদের স্বীয় ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস দিয়াছে, ইহার পর ডিলুক্স, রাজ সংস্করণ, শোভন সংস্করণ — বিলাতি সাজ সরঞ্জামে ও জিনিষে, তাহা ভারী সৌখীন চেহারা, গ্রন্থাদি ধারণ করিত। তখন অনেক বইতে ছবিও ছিল, যেমন *পদ্মাবলী*, ইহা মহাপ্রতিভাবান লসন-এর আঁকা ছবি সম্বলিত।

শ্রীপান্থ লসন বিষয়ে বিরক্ত ৫২নং নোটে, এবং সমস্ত তর্কে ছুট রহিয়াছে; প্রতি হাত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকেই ছবি বিষয়েও প্রমাণসিদ্ধ রূপে ধারণা করেন, আমরা এ বিষয় কিছু জানি না বলিয়া বুঝি না তাঁহার কোন জ্ঞান এ বিষয় ছিল কি না। ৫২নং নোটে লেটার প্রেস ছাপাখানার কাজ, জোফানিদের ছাপার পদ্ধতি কি এক, ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়! (যেমন ৫১নং নোটে আরচার 'প্যারিসের শিল্পীদের কর্মে কালীঘাট পটের প্রভাব দেখিল' — ইহা আমাদের আশ্চর্য্য করে!) আমাদের ধারণা লসনকে তুচ্ছ করা সঙ্গত নহে।

ছবি সূত্রে এখানেতে আর একটি উদ্ধৃতি আছে, যে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের সম্পর্কে, যেমন '...ইন্টারন্যাশনাল রিপারকাশানস আনয়ন করিল...' কিন্তু তাহা কেমন যাহা জানিতে খুবই উৎসুক শুধু হইলামই কেন না এখানে ৪০নং ও ৪২ নং চিত্র, ইহা সাপ রাজপুত্র, দুইটি এখানে হাফটোনে করা যদিও — হইতে 'সাকসেস্ফুল ম্যানার' যে কিরূপ তাহা বুঝা গেল না। (প্রকাশ থাক যে, এই সব কথা সেদিনকার)।

প্রথম তারিখ হইতে একশত বছরের মধ্যে বিস্ময়কর বই প্রকাশনা উৎকর্ষ সংসারিত হইল; বিবিধ বিষয়ে, বিবিধ ছাঁদ আকারে বই আমাদের ভাবধারাকে ছাইয়া ফেলিল, এই সূত্রে শ্রীপান্থ অনেক সংবাদ দিয়াছেন, কেহ চাঁদা লইয়া বই ছাপিতেছে, — কেহ বিনামূল্যে বই দিতেছে, কেহ বই বিক্রয়ের টাকাতে ধনী হইতেছে; ফেরিওয়ালা গলি ঘুরিয়া বই বেচিতেছে ঃ— এমনকি গত শতকে মেয়ে ফেরিওয়ালার কথা স্বর্ণময়ী দেবীতে আমরা পড়িয়াছি, লিখিয়াছেন যে ''মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি

রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য উপন্যাস আষাঢ়ে গল্প — ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক — অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারী ভরা পুতুল খেলনা বস্ত্রাদি থাকিত তেমনি সিন্দুক বন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।''

সিন্দুক শব্দে আমরা আকৃষ্ট হইলাম — আমরা জানি যে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, দুর্লভ, সাবধানে রাখার, যাহা আনন্দের যাহা সম্ভ্রান্ত অভিজাত তাহাই মানুষে সযত্নে সিন্দুকে রাখিয়া থাকে। এখন পরোক্ষভাবে, বই সিন্দুকে রাখাতে ইহাই স্বীকৃত হইল যে, বই সকল ঐ ঐ বিশেষত্ব লাভ করিল। এখন বইএর অন্য বিষয় ছাড়া শুধুমাত্র তাহার নির্ম্মাণ ব্যাপার লইয়াই আমাদের কথা — তখনকার দিনে, এমত যে সেদিন পর্য্যন্ত ঐগুলির গঠন কতখানি নয়নাভিরাম হইত তাহা বলা যায় না।

এমন কি সেগুলির যাহা শ'দরে ব্যাপারীরা প্রকাশক হইতে খরিদ করিত, হাটে বা তীর্থে — বাস তেল এবং এটা সেটা উপহার সহ — বিক্রয় করিত, তাহাদের চেহারাও ভারী বাবু। টাইটেল পেজ — ইংরাজী বাংলাতে লেখা, চারিদিকে খাসা লতা আকড়ি দিয়া চকমিলান করা; পাঠ্যর আদি অক্ষর খুবই কেয়ারি করা — পাতাগুলি সতর্কতার সহিত ছাপা।

তখন আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় লেখকরা পরিপাটি ছাপা পছন্দ করিতেন, যেমন বঙ্কিমবাবু ঃ ''...একদিন রাজসংস্করণের 'সাহিত্য' লইয়া বঙ্কিমবাবুকে দিতে যাই। বঙ্কিমবাবু ভাল ছাপা পছন্দ করিতেন, সাহিত্যখানি তুলিয়া বলিলেন দিব্যি Get up হইয়াছে। তোমাদের কাগজখানির সুন্দর ছাপা দেখিয়া লোভ হয়। লিখিতে ইচ্ছা করে...।''

শুধু তাঁহারাই নহেন, ছাপা বিষয়ে উচ্চশ্রেণীর গৃহস্থরাও খুব মন দিতেন; বিদেশ হইতে বিবাহতে পদ্য লেখার হাওয়া এদেশে আসিল — স্তাঁদাল লিখিত উপন্যাসের, লা সার্ত্রঝ দ্য পারম-এ, প্রথম পাতাতেই এই খবর, পদ্য লেখার, আছে, আরও অনেক উল্লেখ অন্যত্রেও আছে। এখানে গৃহস্থরা পদ্য ছাপানতে খুবই মুখিয়া উঠিত; পাতাখানি, প্রজাপতি, হাতমিলন, কলাগাছ — বিবিধ মোটিফ দ্বারা বড় মনোহর করিয়া সাজান হইত। কাগজে আতরের ছোঁয়া থাকিত।

আমাদের বইএর মলাটে একমাত্র সোনালী জেল্লা ছাড়া — আর কিছু ছিল না। মলাটে ফের আসিল, এবং ডাষ্ট কভারও। সব থেকে মারচস্ মলাট যাহা মনে আছে তাহা রাধারানী দেবীর 'সীঁথিমৌর' কবিতা পুস্তক; বিয়েতে যে সীঁথিমৌর দশকর্ম্ম ভাণ্ডারে পাওয়া যাইত — ইহা তাহাই। বাঁধানতে রবি ঠাকুর মহাশয়ের একখানি বই — ঠিক খেরোর খাতার মতন বাঁধান; আর ঐ বইতে পাতাগুলি ভাঁজ করিয়া, যেহেতু কাগজ পাতলা, অর্থাৎ ডবল করিয়া ছাপান ছিল (?), বই-এর আকার এতাবৎ ষোল পেইজই ক্রাউন ছিল, ক্কচিৎ ব্যতিক্রম দেখা যাইত — যথা হরিদাসের গুপ্তকথা ইত্যাদি — কিন্তু লড়াই-এর পর (২য় যুদ্ধ) 'দরবারী' বইটি ষোল পেইজ ডিমাই-তে ছাপা হইল। ইহার পর হইতে, রমাপদ চৌধুরীকৃত ঐটির, এখন সব বই ডিমাই আকারের হইয়া থাকে। ডাষ্ট কভার আর নাই, মলাটকে চোখমোচড় দিবার প্রয়াস দেখা দিল; বিশেষত অক্ষর ছাঁদে।

দেখনাই অক্ষর হিসাবে — প্রথম হইতে কাঠের অক্ষরেতে নানান ছাঁদ আছে — রকমারি করার দিকে ঝোঁক পুনঃ দেখা গেল ২০/৩০ দশকে; কোনটির ছাঁদ এত বুদ্ধিসম্মত যে তখনই মনে হইত, হায় যদি ইহার মত টাইপ মিলিত; অবশ্য ইহা আপশোষ নহে, — কেন না আমাদের যে টাইপ সম্ভার আছে তাহা গর্ব্বের বটে; তবে ঐ আশা যে আর এক রকমফের হইত।

আমাদের এরূপ মনোভাব — অভিমান, কিন্তু শ্রীপান্থের মধ্যে নাই বলিব না, তবে যাহা আছে তাহার জোর তেমনধারা নাই। প্রথমেতে, তিনি বেশ জ্ঞাত করিলেন যে, ''এই সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে বাংলা হরফের চেহারা নিয়ে। এখনও হচ্ছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার আদলেও তৈরী হয়েছে বাংলা হরফ। উদ্যোগী হরফ নির্মাতা অতএব একালেও আছেন। আমরা অন্তত একটি প্রতিষ্ঠানকে জানি, ঊনিশ শতকে যাত্রা শুরু করেও এখন যাঁরা প্রাণে ডগমগ — চতুর্থ পুরুষে পৌঁছেও নূতন নূতন হরফ সন্ধানে অব্যাহত যাদের সাধনা।''

এখানে এই জানিতে চাওয়া — যে সেই 'নূতন হরফ' বলিতে আমরা কি বুঝিব; তবে একথা ঠিক বিশেষত স্মল পাইকা লইয়া অনেক পরিশ্রম হইতেছে; ইহা ব্যতীত ফাউণ্ড্রীওয়ালারা ধকল সই টাইপ করিতে — টিনএ্যানটিমনি ও সীসা ইত্যাদি — সংমিশ্রণে — সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আর এক লক্ষ্য — ওজন কেমনে কমান যায়! ইদানীং দুয়েকজন ফাউণ্ড্রীওয়ালা, কিছু নূতন চেহারার টাইপ বাজারে প্রচলন করিলেন। এইগুলি প্রায় ১৪ বা ১৮ ইত্যাদি পয়েন্টে আমরা দেখি, এইগুলি সুঠাম দর্শন নহে। আমাদের অক্ষরের একটি নিজ্ চরিত্র আছে, ইহা মাত্রা ও ফুটকীর গা ধরিয়া থাকে, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকৃত নামকরণ চৈতন (এ্যাসেণ্ডার) লেজুড় (ডিসেণ্ডার) যুতসই হইবে, এবং ভিৎ পঙ্ক্তি বেশ চোরাভাবে থাকে; এসকল গণ্য করত অক্ষর করা হয় নাই! ফলে উপর দিকটা ভারী হইল। তথাপি স্বীকার আমরা করিব যে, চেষ্টা চলিয়াছে, এবং যাহাকে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য!

কিন্তু আমাদের মনে বড়ই এই মন্তব্য লাগে, যখন শ্রীপান্থ বলেন, ''...চালু ফাউণ্ড্রীগুলির নমুনা বইয়ের পাতা ওলটালে হঠাৎ মনে হতে পারে বাংলা হরফ বুঝিবা বৈচিত্র্যে আজও অতুলনীয়! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোমান হরফের নমুনাগুলোর ওপর চোখ বুলালে সে ভুল ভেঙ্গে যায়।...বাংলা হরফ শিল্পে একালে সত্যিকারের যুগান্তকারী ঘটনা বোধহয় লাইনো এবং মনো টাইপের প্রচলন।''

এবং পরেই

মহাসমালোচক নরমান এলিস-এর আক্ষেপ ঃ

India has no Bodoni, Garamond, Gill or other type designer of the West. India has the mechanical resources to print for her increasingly literate population—and no specifically Indians means to bridge up the gap between mechanics of printing and reader's mind.

শ্রীপান্থ ঐ অদ্ভুত উক্তিতে সায় দিয়াছেন। "তবু মনে হয় নরমান এলিস সাহেবের কথাই ঠিক।" এলিস-এর কথা যে কতখানি চাপল্য তাহা বিচার করিলে বুঝিব, তিনি এমন তিনজনের নাম করিলেন, যাহারা, বিশেষত প্রথমোক্ত দুজন মার্ব্বেল নির্ম্মিত; গারাম্যঁ, ক্লৌদ গারাম্যঁ — ফরাসী ষোড়শ শতকের; জি বোডনি ইনি ইতালীয় ১৮১৩ [সালে] মৃত। — ইনি নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। এরিক গিল (১৯২০-৩০) তাঁহার পারপেটুয়া ও স্যনস সেরিফ সৃষ্টি করিলেন। ঐ মহানুভব চারশো বছর ঢুঁড়িয়া এ্যালায়েড এফর্টে — ইহা ইংরাজ সংস্কৃতি — বাঙলা টাইপকে নস্যাতিয়াছেন। বাঙলা অক্ষরের ন্যায় এত অসংখ্য ছাঁদ করিতে যে কোন চতুর টাইপোগ্রাফারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত;— প্রথমত, আমরা বলি, ইহার সমন্বয়, ব্যালেন্স আনিতে, ইহার হারমনি কল্পনা করিতে যে কোন তাত্ত্বিক (এসথেট) হিমসিম খাইত। নরমান এলিস নিশ্চয়ই এ বিষয় বালকমাত্র — আমরা যেমন!

এখানে ইহা খেয়াল রাখা দরকার, যে আমাদের বারো আনা লেটার প্রেসের কাজ ইংরাজী ভাষাতে রোমান অক্ষরে হইয়া থাকে — এমন কি সংস্কৃত প্রশ্নপত্র পর্য্যন্ত। শুধু বইএর জন্য কত টাইপ উদ্ভব হইবে এবং যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা অভাবনীয়! এতদ্ব্যতীত এক ফউন্ট বাংলার ওজন কত তাহা বিচার করা উচিত! এবং খরিদ্দারই বা কোথায়।

শ্রীপান্থ, লাইনো ও মনো টাইপ ব্যাপারে বলিয়াছেন '...সত্যিকারের যুগান্তকারী ঘটনা বোধহয়...' এই বাক্যে 'বোধহয়' ব্যবহারে খুব যথাযথ হইল, একারণে যে তিনি মনে বিশ্বাস করেন যে বাঙলা অক্ষরমালা বিষয়ে — মুভএবেল টাইপ করা হইতে, অক্ষর সংস্কার — যাহা অভাবনীয় তাহা গত শতকেই ঘটিল। এখন আমরা বর্জইসে ৮ পয়েন্ট (?) চমৎকার পরিচ্ছন্ন রূপ পাইয়া থাকি (রোমান হরফে ৪ ১/২ পয়েন্ট পর্য্যন্ত নামিতে পারে!) অথচ কোথাও এতটুকু বৈলক্ষণ্য নাই! যুক্ত অক্ষরগুলি বিস্ময়কর।

এখানে জ্যামিতিকভাবে যদি আমাদের অক্ষরমালাকে খতাইয়া দেখি তাহা হইলে টাইপ কাটিয়েদিগের হাতযশ বুঝিব। প্রথমত বলা উচিত, যে আমাদের অক্ষরমালার যেমন ৯কার — একমাত্র ৯কার যেন ডিগবাজী খায়, আমরা পড়িয়া থাকি এবং সুভোবাবু তাঁহার এক কবিতার নামকরণ করেন '৯লা লিপসটিক', ইহা ব্যতীত বাঙলা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে থাকিতে পারে তবে উহা আর আমাদের জানা নাই। ঞ, পুরাতন বাঙলায় আছে — ইদানীং শুধু যুক্ত অক্ষরে, তেমন ব — ক্কচিৎ।

বাঙলা অক্ষর চরিত্র, কিছু চক্রাকার, অধিকাংশ খাড়া রেখা ধরিয়া আছে। এই চক্রাকার, স্বরবর্ণের, অনেক শব্দের মধ্যে নিজস্ব চেহারা হারাইয়া আর এক চিহ্ন হইয়া দাঁড়ায়, যেমন ই-ি, এ-ে ইত্যাদি; এবং উচ্চারণ স্থানের পূর্ব্বেই অর্থাৎ যেমন 'কে' শব্দে-লিখিত হয় (উ, ঊ, দ্রু, দূ উচ্চারণ স্থান ঃ মাথাতে বসিলেও রেফ্ আগে বিন্দু পরে)। চক্রাকার প্রায় কুড়িটির মতন। বাদ বাকি খাড়া রেখা ধরা। (অবশ্য অ, আ, এ, ঐ ইত্যাদি খাড়া রেখা আছে) যাহার মধ্যে, পূর্ণ ডান দিকে, মাত্র চ ছ ট ঢ (ৎ ৎ) দ, ইত্যাদি আর বাম দিকে অনেক কয়টি, ইহাদের মধ্যে পূর্ণত্রিকোণ, ব। মিশ্র—র ধ ক ঋ। আধা—য ষ য় ঘ ফ ম থ। খাড়া রেখা আঁকড়ান—গ প শ ণ ন ল স। চক্র — ঙ ড় ড ত ভ হ। রকমারি — ঞ জ ঠ ঃ ং। (যুক্ত অক্ষর আলোচিত হইল না)।

ইহা ব্যতীত মনে রাখিবার, বাহিরে এ কার, ও কার, ণ, ভিতরের(?), হ্রস্বউ কার, যেমন কিন্তু, শু ইত্যাদি আরও চমকপ্রদ। ঞ চ-এর চেহারা অবাক রূপ ধারণ করে ঞ্চ। র এর চেহারা একাধিক।

আরও খুঁটাইয়া অনেক কিছুই বিচারে আসিবে; সবথেকে মস্ত গণ্য করিবার হইল — বাঙলা অক্ষরের মাত্রা এবং ফুটকি। এই মাত্রার প্রভাব দারুণ — বহু দিন পূর্ব্বে এক ফরাসী সুভ্যেনীর-এ দেখিলাম লা দাঁস খ্যাঁদু কভার পেজে ছাপান — এবং সমস্ত অক্ষরের উপর মাত্রা দেওয়া, তাহাতে রোমান হরফ যেন সংস্কৃত অক্ষর হইয়া দাঁড়াইল (ইহা ১৯৩৭ সালে যখন হরেন ঘোষ, সেরাই কেল্লার ছউ নৃত্য লইয়া বিদেশে যান)। ঠিক তেমনই কয়েকটি টানের তারতম্যে বাঙলা অক্ষরকে আরবী চেহারা দেওয়া যায় — যেমন অবনীবাবু করিতেন। এখন মাত্রা (ফুটকি) সকল অক্ষরের নাই। ফলে পিয়ার্স-এর অভিনবত্ব খুব সুঠাম হইল না, এখানে যে মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আনুভূমিক সরল রেখার দ্বারা গঠিত হয় নাই; অন্য পক্ষে ঠিক সেই জায়গাতে বেশ একটু চালা দেওয়ার মতন বাঁকা করা আছে — অবশ্য সেই সকল অক্ষরেই যাহার মাত্রা আছে।

আমাদের অক্ষরমালার অনেক অক্ষরে মাত্রা নাই, যেমন ঋ এ ঐ ও ঔ — স্বরবর্ণে এবং ব্যঞ্জনবর্ণে চন্দ্রবিন্দু পর্য্যন্ত বেশ কয়েকটিতে; এই মাত্রা এবং ইহার পর ধর্ত্তব্য ফুটকি — কেন না অধিকাংশ অক্ষর ফুটকি সমন্বিত; আমরা ভাবি মাত্রা ও ফুট কি আমাদের লেখার

কাঠামো, (পুঁথি ও তাম্রশাসনে, এবং প্রস্তরফলকে ইহার চমকপ্রদ ব্যবহার দেখিয়া থাকি)। অনেকে মনে করেন ইহাতে গড়ন ধাতুর অপচয় হইতেছে — অথচ অন্য কোন উপায়ে—যাহাতে সৌন্দর্য্য নষ্ট না ঘটে, তাহারা কল্পনা করিতে পারিতেছেন না।

এই সূত্রে আমরা বরজইস টাইপের চেহারা যদি বিচার করি, তবে দেখিব, কোথাও বাক্য বা লাইন, আটাশ এম বা বত্রিশ এম, সাধারণ নিউজপ্রিন্টে — ঐ মাত্রা ও ফুটকির জন্য থমক খায় না, লাইনের শেষাংশ ধোঁয়াটে নহে (এমন কি এক লেড-এও অর্থাৎ ১/৪ এম)। যেহেতু চৈতন, লেজুড়, বাড়ী, রেফ-চন্দ্রবিন্দু — এবং কিছু মাত্রা ও ফুটকি ছাড়া অক্ষর সকল মিলিয়া শব্দের গঠনের ইতিমধ্যকার ব্যবধান ইত্যাদি মিশিয়া এক অভাবনীয় সমন্বয় সৃষ্টি হইয়া থাকে। আরও যে, রাজা হরিবর্ম্ম হইতে অক্ষরমালার তারতম্য খুব একটা ঘটে নাই। লিপিতে যে সুবিধা আছে এখানে অথচ তাহা নাই। লাইনো টাইপে ইহা আশা করা যায় না।

ইহা দৈনিক কাগজের জন্যই তৈয়ারী। ১৫০ বছর আগেতে সমাচার দর্পণ যেখানে, স্ক্রু প্রেসে, একপিঠ ঘণ্টায় ২০০/৩০০ ছাপান সম্ভব ছিল, সেখানেতে ট্রেডেল, ফ্ল্যাট-বেড উজাইয়া রোটারী। ছেলেবেলাতে, বসুমতীর উপন্যাসের টাইটেলে দেখিতাম লেখা আছে 'বিদ্যুৎ চালিত রোটারী যন্ত্রে মুদ্রিত' (Sic)। এই রোটারীর ক্ষমতা হিসাবে আসে না — ঘণ্টায় না বলিয়া মিনিটে পূর্ণ কাগজ কত ছাপা হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই রোটারীকেই সামাল দিতে লাইনো টাইপের উদ্ভব ঘটিল — ইহা আমরা শুনিয়াছি। অবশ্য বেশ কিছুকাল হইতে বাঙলা টাইপের সংখ্যা [কিভাবে] কমান বা হ্রাস করা যায় সে বিষয়ে তর্ক চলিতেছিল। এইখানে বলিতে পারি শ্রীপান্থ সিদ্ধান্ত অমোঘ সূত্র 'নৈর্ব্যক্তিক' শব্দটি আমাদের মধ্যে কাজ করিল। বটতলা যেখানে টাইপ অভাবে উল্টা 'হ' ইত্যাদি বসাইয়া কাজ চালাইত — (আমাদের মধ্যে উহাই যেন অনুপ্রেরণা হইল!) সেখানে অনেকে অনেক অক্ষর বাদ দিলেন — বিসর্গ আগে যায় — ইদানীং আসিল চন্দ্রবিন্দু। অরুণ সেন মহাশয় কতদিন না 'সচিত্র ভারত'-এর যীশুবাবু ও অরুণ মুখুজ্জ্যেকে আড়াই কাঁচ্চা চন্দ্রবিন্দু কিনিতে বলিয়াছেন, উহারা কিন্তু আমল দেয় নাই। ইহার আগে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বানান সংস্কার বা টাইপ কমাইল। এখানে প্রসঙ্গ করি যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বাঙলা শর্টহ্যাণ্ড সৃষ্টি করেন, তাঁহার এই বিষয়ে কোন লেখা আছে কিম্বা নাই, তাহা জানা দরকার। অবশ্য যদিও তাঁহার লিপি নিশ্চয় সম্পূর্ণ পৃথক।

এখন কমান কথাটি এক আন্দোলনে পরিণত হইল।

দৈনিক কাগজের জন্য লাইনো-কে কাজে লাগাইবার কারণেই আমাদের বাঙলা ভাষার টাইপ সংখ্যা ও চেহারা কয়েকজন এ্যামেচার দ্বারা (?) বিচারিত হইতেছিল। টাইপ সংখ্যা ও চেহারা, বাঙলা টাইপ রাইটারে আছে ৪২টি ও ৪টি ডেড। লাইনো টাইপ করিয়ে-দের পরিশ্রমে আমরা পাইলাম, যাহাকে, কমপক্ষে ৩২০টি — ৩৬৮টিকে একটা কাজ চলা সাট বলা যায়। এবং মোনোতে ১৫ x১৫, ১৫ x১৬, ১৫x১৭ — গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়।

এই লাইনোকে সুদারুণ অভিনব বলিতে হইবে। লাইনো যন্ত্র নিজেই একটি ফাউণ্ড্রী তথা কারখানা। প্রতি হাত ঝক্‌ঝকে নূতন টাইপ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহার বড় আদর। এইটির জন্য বাঙলা অক্ষর কল্পনা করিলেন যতীন সেন মহাশয় — ইনি একজন পাকা অঙ্কনবিদ — ইঁহার সব থেকে চাতুর্য্য আমাদের বুদ্ধি বলে, এই যে, ছাড় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ চিহ্নতে মাত্রা ঃ যেমন হ্রস্বউ, এ-কার ইত্যাদি। কোথাও কোথাও দারুণ মানানসই বাঁধন ধরিয়াছে।

কিন্তু যেক্ষণে ছাড় চিহ্ন পরপর পড়িল তৎসহ ঁ বিন্দু আসিল তখনই টাইপের মান নষ্ট হইল যেমন—বিদ্যুৎ (?), হুঁশিয়ারি, পুঁথিপত্র (ক গঠিত শব্দে ঘটে না, কারণ হ্রস্বউ ইত্যাদি চিহ্ন যুক্ত এখন যদি বিচার করি তবে দেখিব, ঐ ছাড় ঁ , ু (একটি আ-কারে ঁ এক গড়নও আছে। উ-কার ইত্যাদিতেও আছে (?)), পরে 'া' দ্বারা এক বেশ ঘর সৃষ্টি হইয়াছে। এ হেন কাণ্ড ১০/১১ পয়েন্টে বেশ চলিয়া যায়; অবশ্য দৈনিক কাগজেই; কিন্তু কবিতা বা ভাল করিয়া, অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া ছাপাইবার গদ্যতে — যেমন পালামৌ, বা স্যর জগদীশের ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে — আমরা নিশ্চয় ব্যবহার করিব না। কারণ স্পেস। আবার ইত্যাকার লাইনো - অক্ষর যখন বড় করা হইল — (লাডলো সিস্টেম-এ) তখন উহাদের চেহারা আরও বিকট! দেখা যাইবে, কাগজের নামের লিপির ইতিমধ্যর স্পেস আর স্ফীত ৪৮ (?) স্পেস প্রায় এক — যাহা বোল্ড হওয়াতে চোখে পড়ে না। যতীনবাবু শব্দের ইতিমধ্যকার স্পেস যে কি এক মেজাজী সৌন্দর্য্য তাহা নিশ্চয় গণ্য করেন নাই। অথচ ছাপা চেহারা — ধরা যাক এক পাতা — দেখিতে দারুণ হাল্কা, চমৎকার! হায় সেই গুণ খোয়া গেল!

অদ্য হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই লাইনো-র চেহারা কি ছিল, আমাদের সেই বিষয়ে কোন খবর নাই— স্পেস সম্পর্কে কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না; পাঠক, ছোট অক্ষর বড় হইলে স্পেসের তারতম্য ঘটিবেই তখন টাইপোগ্রাফারের কর্ত্তব্য শুনিয়াছি, সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা!

যেহেতু আমাদের দেশের লাইনো-যন্ত্র অধিকারীরা কেহ টাইপোগ্রাফার নহেন, ফলে এ বিষয়ে তাহারা মন দেন নাই — আর হ্যান্ড সেট হইতে এখানেতে অনেক বেশী ধরে — ফলে কিছুই আসে যায় নাই। কিন্তু দৈনিক কাগজের স্পেস-এর দাম অতীব চড়া তথাপি বড়

আকারের টাইপ, ইদানীং কিছু বিদেশী শব্দকে যুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত করিয়া, কোথাও রেফ তুলিয়া ঃ যেমন — পারক, লরড, লনডন! — ইহার যুক্তি যে কি তাহা পরিচ্ছন্ন নহে। পুনঃ বলিব ইত্যাকার শব্দর বেশ দেখনাই আছে — যেহেতু ঐগুলি বোল্ড।

লাইনো-টাইপের তুলনাতে মোনো-টাইপ যথেষ্ট সুঠাম; টাইপ চেহারা লইয়া কোন হেলাফেলা নাই, দু'-একটি স্থানে স্পেস ব্যাপারে ইতরবিশেষ সত্ত্বেও — এবং লাইনো হইতে চেহারা খুব ভারী হইলেও, সমস্ত নির্ম্মাণ প্রশংসার! ইহার একটা সম্ভ্রান্ত চেহারা আছে। আমরা শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকীর বাঙলা খণ্ডে ইহার ব্যবহার দেখি, এখানে কাগজ ঈষৎ লালচে ও গ্রন্থ ৮ পেইজী ক্রাউন, টাইপের পয়েন্ট আদি, কত লাইন কত এম ইহা মনে নাই। তবে ভারী সুন্দর হইয়াছে। ইদানীং বিজ্ঞাপনে বিশেষ স্থান পাইয়াছে। তবে দৈনিক ইত্যাদিতে কতখানি যে ইহার ভারী চেহারা যুতসই হইত তাহা বিষয়ে বুঝিতে অসুবিধে হয় না — সেখানে লাইনোই ঠিক! এবং শ্রীপান্থের সিদ্ধান্তকে আমরা মান্য করিব।

পাঠক এখানে, শ্রীপান্থের এই গ্রন্থখানি বিষয়েতে, যে সকল কথা উত্থাপন করা গেল তাহা নেহাৎ আমরা, সাধারণ পাঠক — যাহার ভাল ছাপা ব্যাপারে আগ্রহ আছে এবং অন্যবিধ অভিমানে না — হিসেবেই করা হইল, অর্থাৎ সকল কিছু আমাদের নিজস্ব কথা! অবশ্য এই সব তত্ত্ব খুবই স্থান লইয়া এবং চিত্র দ্বারা লেখার নিয়ম, আমাদের সেই ধৈর্য্য নাই; তাই অনেক ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক পাঠকের নিকট বড়ই এ্যাবস্ট্রাক্ট লাগিতে পারে। যদি কেহ তাত্ত্বিক থাকিয়া থাকেন!

এখন জানিতে ইচ্ছা হয়, শ্রীপান্থ কাহাদের জন্য এই বিরাট অসাধ্য সাধন করিলেন; এখন সেই উচ্চবর্ণ — ইংরাজদের প্রস্থানের সহিত — লুপ্ত ; নিশ্চয় আমাদের বিশ্বাস থাকা উচিত, বঙ্গদেশে বা ভারতে যাহা কিছু উচ্চমার্গীয় যাহা কিছু আমাদের ঐশ্বর্য্য — তাহা সাধক সন্ন্যাসী শ্রমণ দ্বারাই কৃত! (আমাদের শিক্ষা প্রচারের কি যে প্রয়োজন — কে জানে) এখন সমস্তই নস্যাৎ হইতেছে — অতএব কাহাদের জন্য এই পরিশ্রম করিলেন! — অবশ্য ইহা লিখিত আছে যে, আপন বংশ মর্য্যাদায় অনেক কিছু করিতে হয়, যেমন যুধিষ্ঠির করিতেন! তবে ইহা ঠিক, বাঙলা উনিশ শতকের ইতিহাসের মহা লাভ হইল।

এখন আমরা পুনঃ 'নৈর্ব্যক্তিক' শব্দটিকে খুঁটাইয়া বিচার করিতে তাহাদের বলি যাহারা উনিশ শতক সম্পর্কে একটি সূত্র অনুসন্ধান করিতে চাহিতেছে — এই প্রথম একটি শব্দে সমগ্র চেহারা, বাঙালীর মন, ফুটমান হইল! শ্রীপান্থ কতখানি ইহা ইতিহাস অর্থাৎ অন্যান্য দিক বিচার করত স্থির করিলেন তাহা লেখা নাই — তবে পরোক্ষে, হস্তলিপি সূত্রে যাহা, ঐ কথাটি খুব যথার্থ হইল! যাহা আমাদের অনেকানেক কথা বিচার করিতে নির্দ্দেশ দিবে! শ্রীপান্থর নিকট আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এখানে, বঙ্গ সংস্কৃতিকে আমাদের আন্তরিক প্রশংসাবাদ জানাইতে হইবেই—এই সময় এরূপ মহৎ কাজ কোন সংস্থা করে ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

প্রসঙ্গ ঃ যখন ছাপাখানা এল। লেখক ঃ শ্রীপান্থ। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সৌজন্যে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ - দেশ ১৯.৮.৭৮। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণে মূল বইটি লভ্য।

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. ব্রহ্মণিকাল - রামমোহন রায়ের ইংরেজি ও বাংলাভাষায় প্রকাশিত দ্বিভাষিক 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), ২. কোয়ার্টো অফ ফলিও - বইয়ের পৃষ্ঠার একটি বিশেষ মাপ, ৩. হালেদ - সঠিক উচ্চারণ হলেও অধিক প্রচলিত নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, ৪. লহরাচাল - ঢেউয়ের মতো, ৫. কুলার - তন্ত্রোক্ত তিথি, নক্ষত্র, বার ইত্যাদির সমাবেশ, ৬. ডোর পাটা - কাঠের তৈরী বই-এর মলাট আকৃতির তক্তা, বৈষ্ণবদের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ে আচ্ছাদিত, ৭. মারচস্ - ঝকঝকে, দৃষ্টিনন্দন, ৮. নৈনেত্তর - অব্যবস্থা, ৯. ডিপথং - দুটি স্বরধ্বনির মিলনে একটি যৌগিক স্বরধ্বনি, ১০. লিগাটিউর (Ligature) - অধিক প্রচলিত উচ্চারণ 'লিগেটার'। একাধিক ব্যঞ্জনের সংযুক্ত রূপ কে বলা হয়। উদা - হু, শহু, চ্ছু।

দেশে প্রকাশিত পাঠের মুদ্রণ বিশেষ পরিচ্ছন্ন ছিল না। অস্পষ্টতার কারণে ছাপায় (বর্তমান সংস্করণে আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও) তাই হয়তো কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকেই গেল।

সিংহ শিকারে বিপদ

ব্রকেন পাহাড়ের নামেই এক সময় লোকে ভয়ে শুকিয়ে যেত। এই ব্রকেন পাহাড় আফ্রিকার রোডেশিয়া অঞ্চলের একটি পাহাড়।

আমি যখনকার কথা বলছি তখন ১৯০৮ সন। মেসার্স পল এন্ড কোং এই অঞ্চলের কেপ থেকে কাইরো রেলপথের অংশ তৈরির যাবতীয় কাজ করার ভার পেয়েছিলেন। এই সময় লোকে ব্রকেন পাহাড়ের দিকে চাইতে পর্যন্ত সাহস করত না।

এই পাহাড়ের তলে অজস্র সিংহ এবং অন্যান্য জানোয়ার ছিল। এই দুর্ধর্ষ সিংহদের জ্বালায় অত্যাচারে পাহাড়ের ধারে-কাছে বাস করা দুরূহ হয়ে পড়েছিল। দিনরাত্রে যখন তখন এরা হামলা করত, রাত্রে তো কথাই নেই।

রোজই দেখা গেছে কিছু না কিছু গেছে। হয় গাধা, নয় বলদ, নয় ছাগল। আমাদের রেলপথ তৈরির জন্য এই পাহাড়ের কাছেই ক্যাম্প করা হয়েছিল। আমরা প্রায় প্রত্যহ একটা না একটা কাছাকাছি জায়গায় সিংহের উৎপাতের খবর পেতুম।

আমাদের কাজের জন্য বহু গাধা বলদ ইত্যাদি ছিল। এই সব পশু দিয়ে বহু দূর থেকে মাল বইবার কাজ করান হত। এদের নিয়েই হল সমস্যা। কি করে এদের সিংহের উৎপাতের হাত থেকে বাঁচান যায় সেই ছিল আমাদের একমাত্র চিন্তা।

একদিন সকালবেলা, মনে পড়ে সেদিন রবিবার ছিল। তখন সবে ভোর হয়েছে, বোধহয় পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বাজে। ভেবেছিলুম আমাদের মেসের জন্য একটা হরিণ যদি পাই তাহলে মারব। সঙ্গে থাকার মধ্যে আমার সার্ভিস রাইফেল ৩০৩।

যখন বার হব ঠিক তখন মনে হল অটোমেটিক পিস্তলটা নেওয়া যাক একটু তাক প্র্যাক্‌টিস করব।

কতদূর যে চলে এসেছি তার ঠিক অবশ্য ছিল না। বোধহয় মাইল তিনেক হবে। এখন প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। রেল লাইন বসবে বলে দু'ধারের জমি কেটে উঁচু করা হয়েছে। আমি এই জমির উপর দিয়েই চলেছি।

হঠাৎ কেন কি জানি আমি নিজেই থমকে থেমে গেলুম। পরক্ষণেই মনের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে নিতেই দেখলুম আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক পঞ্চাশ গজ দূরে বিশাল দশাসই এক সিংহ।

এই সিংহটি সমস্ত দেহ সটান এলিয়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। সিংহটি দেখা মাত্র আমার হাতে ঘাম দেখা দিল। নিজেকে আর ভয় পেতে না দিয়ে পলকেই আমার রাইফেলটা তুলে ধরে নিশানা ঠিক করে গুলি ছুঁড়লুম।

নিশানা ছিল সিংহর কাঁধ বরাবর। কিন্তু কপাল মন্দ! গুলি ফসকাল। তাকে সামান্য চোট দিয়েছিল, সে চোট তার পক্ষে কিছুই নয়, অবশ্য তাকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট।

গুলির সঙ্গে সঙ্গে বিশাল হিংস্র জানোয়ার দাঁড়িয়ে উঠে এক মুহূর্ত সময়ক্ষেপ না করে চক্ষের নিমেষে আমাকে আক্রমণ করার জন্য আমার দিকে ছুটে এল।

আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে। যদিও জানতুম দ্বিতীয় গুলি সামান্য চোট-খাওয়া সিংহকে কিছুই করতে পারে না, তবু আমি কোন উপায় না পেয়ে তৎক্ষণাৎ রাইফেল তুলে সিংহর দুই চোখের মাঝামাঝি নিশানা করেই ঘোড়া টিপলুম। ক্লিক করে শব্দ হল সত্যি কিন্তু আশ্চর্য গুলি বার হল না। অর্থাৎ ম্যাগাজিন কাজ করল না।

ঠিক আমার মতন বিপদ কত যে শিকারীর হয়েছে তা আমরা জানি এবং তাদের এক একজনের কি ভয়ঙ্কর ভাবে সমাপ্তি ঘটেছে, সে কথা আমার সারা দেহে খেলে গিয়েছিল। এতক্ষণ সিংহ আমার শিকার ছিল, এখন আমি তার শিকার।

কিন্তু ভগবানের এমন দয়া, বুদ্ধি যখন খেলে না, দেহ তখন আপনাকে বাঁচাবার ভার আপনিই নেয়। পলকের মধ্যেই আমার চোখে পড়ল আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক হাত খানেক অন্তরে একটি বড় গোছের ট্যাঙ্ক পড়ে আছে। ট্যাঙ্কটার মুখ ঠিক আমার দিকেই ফেরান।

তখনও সিংহটা প্রায় বিশ গজ দূরে। দেখলুম এখনও হয়ত রক্ষা পেতে পারি, তাই সত্বর হাতের বন্দুকটাকে ফেলে কোন রকমে ট্যাঙ্কের মধ্যে গিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহটা এসে পড়ল।

সিংহটা আমি বেশ দেখলুম, ট্যাঙ্ক ছাড়িয়ে খানিক দূরে গিয়েই থমকে দাঁড়াল! সে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। এই তার শিকার ছিল — এখনি উধাও। আশ্চর্য!

সিংহটা মহারাগে এদিক ওদিক খানিক দৌড়াদৌড়ি করল, হুঙ্কার ছাড়ল ভয়ঙ্কর মুখ বিকৃত করতে লাগল।

আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে।

পশুদের বুদ্ধি আস্তে আস্তে খোলে। ফলে সিংহ মুখ দিয়েই আমাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। ক্রমে সে তার পা দিয়ে ক্রমাগত আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করলে।

এমনভাবে খানিকক্ষণ যাবার পর সে নিশ্চয়ই বুঝেছিল, পা দিয়ে নাগাল পাবে না, তখন ট্যাঙ্কের মুখের লোহা নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল।

এত বড় বিপদের মুখোমুখি সাধারণত মানুষের কোন বুদ্ধিই খোলে না, আমারও খোলেনি। আমি শুধু ভীত চোখে বিপদকে দেখছিলুম। সিংহটা অনবরত ট্যাঙ্কের গা আঁচড়াচ্ছে। এ আঁচড়ানর শব্দ যেন মেজেতে টিন ঘষার মত, সমস্ত গা আমার রি রি করে উঠছে, আমাকে কাঁপিয়ে তুলছিল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

আফ্রিকার সূর্য যে কি প্রচণ্ড তা আমাদের সকলেরই ধারণা আছে। সূর্যের তেজে ট্যাঙ্কটি আস্তে আস্তে তাতছিল। এখন এমন গরম হয়েছে যে, আর বসে থাকা যাচ্ছিল না — ঘামে সর্বশরীর সিক্ত। গরম ট্যাঙ্কের অল্প পরিসর জায়গায় আমি, আমার সামনে সিংহ। সিংহের ভয়ে গলা আমার শুকিয়ে গেছে।

সিংহ উন্মত্ত হয়ে উঠছে। কখন ট্যাঙ্কের পিছনে, কখন এপাশে, কখনও বা ওপাশে তারই মধ্যে মাঝে-মধ্যে ট্যাঙ্কের মুখ দেখে যাচ্ছে যে, আমি আছি না পালিয়েছি। আমার সামনে সোজাসুজি দাঁড়িয়ে অসম্ভব মুখ বিকৃতি করে, তার ভয়ঙ্কর দাঁত দেখিয়ে নিমেষেই উধাও। আবার ট্যাঙ্ক আচড়ানর শব্দ!

আমি এতক্ষণ বাদে একটু মনস্থির করতে পারলুম। ঘামে আমার সর্বশরীর ভিজে, গলা শুকনো। এবং অসহ্য তৃষ্ণায় আমাকে পাগল করে তুলছিল। আমার শরীর যেন এই ট্যাঙ্ক ছেড়ে মরিয়া হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। বুঝলুম এভাবে আর বেশিক্ষণ যুঝতে পারব না।

আমি যেন ঘুম থেকে উঠলুম। ঘুম থেকে উঠলে যেমন সব কিছু মানুষের মনে পড়ে তেমনি আমারও মনে পড়ল যে, আমার বন্দুক বিশ্বাসঘাতকতা করলেও এখনও আমার পিস্তল আছে, বেল্টের রিংএ আট-ফলা বড় ছুরি আছে — জঙ্গলে যা নিত্য প্রয়োজনীয়।

পিস্তল এবং ছুরি হাতের নাগালে নিলুম।

কিন্তু সকল সময় ভয় যদি পিস্তল কাজ না করে! যাই হোক পিস্তলের সেফটি খুলে উঁচিয়ে ধরলুম, কিন্তু হাত আমার এত কাঁপছিল যে, আমি অবাক হয়ে গেলুম।

সিংহ আবার তদারক করতে এল।

সে ট্যাঙ্ক থেকে দূরে দাঁড়িয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল এবং পরক্ষণেই আমার কাছ বরাবর এসে খাড়া হয়ে হুঙ্কার দিল, তার পৈশাচিক দৃশ্য।

এ দৃশ্য দর্শনে আমার গুলি করার কথা মনেই হল না, আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ। সিংহ একইভাবে তখনও দাঁড়িয়ে। ট্যাঙ্কের মুখ থেকে সিংহের দূরত্ব বেশি নয়, তবু আমার মনে হচ্ছিল যদি আর একটু কাছে আসে, গুলি না আমার ফসকায়।

এই সময় সিংহ তার চোখ দুটি প্রায় ট্যাঙ্কের মুখের সামনেই আনল। চোখ দুটি যে, জ্বলছে।

আমি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলি চালালুম। তার উত্তরে, আর কিছুই বুঝতে পারলুম না, আকাশ বাতাস কাঁপান এক চীৎকার — আর্তনাদ শোনা গেল। সাহস করে দেখি, সিংহ মাটিতে গড়াচ্ছে।

পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে কোন রকমে মুখটা ফিরিয়ে আমার দিকে করল। দেখলুম, তার বাঁ চোখের কোণ বেয়ে রক্ত ঝরছে এবং দুর্ধর্ষ জানোয়ার জিব বার করে, সে-রক্ত চাটবার চেষ্টা করছে। আর মাঝে মাঝে ফুঁসিয়ে উঠছে।

এই দৃশ্যে এটুকু আমার বুঝবার ক্ষমতা ছিল যে, সিংহকে আমার গুলি এমন কিছু জখম করেনি। একবার ভাবলুম, যে সীমানার মধ্যে এখনও সিংহটা ছিল, তাতে গুলি তাকে কাহিল করতে পারে, অতএব গুলী করি। কিন্তু ভাববার পরক্ষণেই এক কাণ্ড ঘটে গেল।

সিংহটা ল্যাজে ঝাপটা দিয়ে দৌড়ে ট্যাঙ্কের কাছে বদ্ধপরিকর হয়ে এসে দাঁড়ালে এবং পরেই অসম্ভব জোরে ট্যাঙ্কটিকে ধাক্কা দিল। সিংহের দারুণ ধাক্কার চোটে, সেই উঁচু রেল লাইন পাতবার পথের উপর থেকে ট্যাঙ্কটি মহা আর্তনাদ করতে করতে নীচে জমিতে পড়ল।

আমি ট্যাঙ্কের মধ্যে যেন থেঁৎলে গেলুম। আমার হাড়গোড় যেন ভেঙ্গে গেল। তবু যাই হোক, উপর থেকে ট্যাঙ্কটা ফেলাতে একটু ভালই হল।

ট্যাঙ্কটা এসে যেখানে পড়ল, সেখানে একটা বড় গাছের ছায়া ছিল। এতক্ষণ বাদে আমি একটু ঠাণ্ডা অনুভব করলুম। একটু নিশ্বাস নিতে পারলুম। এ কথাও অবশ্য মনে হল, এ ছায়া আর কতক্ষণ, তবু যেটুকু পাওয়া যায়। এই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গায় এসে, বেশ অনুভব করলুম আমার গলা শুকিয়ে কাঠ।

ইতিমধ্যে সিংহটি আবার এসে উপস্থিত!

এবার সে আর আঁচড়ান কামড়ান কিছুই করলে না, অবশ্য করবার মত মেজাজ বা ক্ষমতা ছিল না। সে ট্যাঙ্কের মুখে এসে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

সিংহর চোখ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত পড়ছে। ফলে মনে হল সে বাঁ চোখে নিশ্চয়ই কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এবং তার দরুণ ডান চোখও পুরো খুলে রাখতে পারছে না।

আমার মনে হল, এই অবসরে যদি তার ডান চোখে আমি একটা গুলি করে তাকে একেবারে অন্ধ করে দিতে পারি, তাহলে এ যাত্রায় ভগবান হয়ত রক্ষা করবেন।

কিন্তু চোখের যন্ত্রণায় সিংহটা অনবরত মুখ ঝাঁকানি দিচ্ছিল। যত বারই পিস্তল খাড়া করি ততবারই তার মুখ সরে সরে যায়। তখন একটু সাহস সঞ্চয় করে প্রায় ট্যাঙ্কের মুখের কাছে গিয়ে বসতেই তার থাবাটা সশব্দে এসে ট্যাঙ্কের গায়ে আঘাত করল।

আমি মাথাটা কোন উপায়ে সরিয়ে নিয়ে আর সময়ক্ষেপ না করে গুলি ছুঁড়লুম। ভগবান রক্ষাকর্তা । গুলিটা ঠিক গিয়ে লাগল তার ডান চোখে।

সেকি ভয়ঙ্কর আলোড়ন! গুলীর সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জনের মত আওয়াজ করে সিংহটা প্রায় ফুট চারেক লাফ দিয়ে উঠল।

তারপর সব অন্ধকার।

দেখলুম তার মুখটা আমার ট্যাঙ্কের মুখের উপর পড়েছে, বলতে গেলে প্রায় ছিপির মত বসে। হাওয়া বাতাস ঢুকবার সব পথ বন্ধ এবং তখনও সেই অবস্থায় তার থাবা যেন ট্যাঙ্ক ফেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে আর মুখ ঢুকাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

ভাগ্য ভাল যে ট্যাঙ্কের মুখটা তার মাথার তুলনায় যথেষ্ট ছোট।

একবার ভাবলুম ছুরি চালাই, কিন্তু ছুরি মারলে সমস্ত ট্যাঙ্কময় রক্তগঙ্গা বইবে, তা'ছাড়া আবার কি হবে কে জানে! সিংহকে হটাতে না পারলে আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব নিশ্চিত!

টপ টপ করে সিংহর রক্ত পড়ছে, সে যেন কিছুটা অসাড়। পশুর গাত্রগন্ধে আমার নাড়ী উঠে আসবার যোগাড়। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। বেশ বুঝতে পারলুম সিংহটার আর কোন ক্ষমতা নেই।

সিংহ অনড়।

কিন্তু আমার বার হবার পথও বন্ধ। শেষে কি এইভাবে মরতে হবে? কোন উপায় নেই?

ট্যাঙ্কের মধ্যে অন্ধকার, আর বিশ্রী দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ! আমি যে কি করি তা কিছু ঠিকই করতে পারছি না। পিস্তলে মাত্র আর একটি কার্তুজ। আসবার সময় ভরা হয়নি। বেল্টে গুলিও নেই!

একবার ভাবলুম যদি সিংহটার এখনও প্রাণ থেকে থাকে তাহলে গুলি করলে হয়ত সরে যেতে পারে। কিন্তু মাথায় গুলি করলে চলবে না, তার কারণ আগেই বলেছি।

অনেকক্ষণ পর মাথায় বুদ্ধি এল। আমার ছুরি — আট-ফলা ছুরির একটা ফলা লোহা-কাটা (Can opener) ফলাও তো আছে। একটা যদি গর্ত ট্যাঙ্কে করতে পারি তাহলে প্রাণরক্ষা হয়।

এই রকম স্থির করে ট্যাঙ্কের মুখের উল্টোদিকে গুলি করলুম, গুলি ট্যাঙ্কের চাদর ভেদ করে বার হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ একটু আলো একটু হাওয়া এল।

এরপর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লোহা-কাটা ফলা দিয়ে চাদর কাটতে লাগলুম। ধারাল ফলায় ক্রমাগত কেটে চলেছি, হাত আমার ব্যথা হয়ে গেল। যত কাটছি ততই ট্যাঙ্কের আবহাওয়া বদলাচ্ছে। এদিকে একটু ভয়ও আছে, একটু করে কাটি আর একবার করে সিংহটিকে দেখি।

অনেকক্ষণ পর আমার বার হবার মত পথ হল। এবার লোহা-কাটা ফলা বন্ধ করি। ছুরির ফলাটাকে খুলে, আমি অতি সন্তর্পণে বার হয়ে এলুম।

গায়ে আমার বল নেই।

বল না থাকলেও প্রাণভয় মানুষকে নূতন বল দেয়।

টলতে টলতে টেন্টে ফিরে কাপড়চোপড় বদলে, ভাল দেখে একটা রাইফেল নিয়ে এসে দেখি।

সিংহর রক্তে উপর এর মধ্যে পোকামাকড় বসে আছে। উঁচু আকাশে শকুন ঘুরছে।

প্রথম প্রকাশ জলসা পত্রিকায়। প্রথম পুনর্মুদ্রণ অনন্যা নামে এক ডাইজেস্ট পত্রিকায়, শ্রাবণ ১৩৬৯।

সম্পাদকীয় সংযোজন

লেখাটিতে আমাদের মনে হয়েছে, কোথাও শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, কোথাও যতিচিহ্ন বাদ পড়েছে। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যাচাই-এর কোনও সুযোগ না থাকায়, অনন্যায় প্রকাশিত পাঠ অনুসৃত হল।

পিস্তলের সেফটি - Safety Catch যা পিস্তলের Locking System , যাতে হঠাৎ গুলি না বেরিয়ে যায়।

ভারতের সিংহ

ভারতের সিংহ সম্পর্কে অনেক রকম লেখা দেখা যায় কিন্তু এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা কি বলেন দেখা যাক।

মাথা বেশ বড় এবং গোল, কান ছোট, গোঁফ ইতস্তত ছড়ান। গায়ে রঙ এক ভাবের ফ্যাকাশে বাদামী, দুইপাশে (flanks) এবং উরুর ভিতর দিকে খুব হাল্কা। পুরুষ সিংহদের, ঈষৎ কোচকান অমসৃণ ঘন কেশর আছে। সিংহ এবং সিংহীদের দুজনেরই ল্যাজের শেষে সাদাটে এক থোকা চুল দেখা যায়।

দৈর্ঘ্য ৯ ফুট থেকে ৯.৫ সাড়ে ন ফুট হয়, এই দৈর্ঘ্যের মধ্যে একের তৃতীয় বা চতুর্থ অংশ ল্যাজের মাপ। উচ্চতা ৩.৫ সাড়ে তিন ফুট পর্যন্ত, চোখের মণি গোলাকার এবং কালো, মণির পাশে irides হলুদ!

আবাস। গুজরাট, কাথিয়াওয়াড়, রাণ অফ কচ, রাজপুতানা, গোয়ালিয়র, গুণা, এবং সাগর জিলা (মধ্যপ্রদেশ)। ইদানীং গুজরাট এবং কচ প্রদেশে দেখা যায়।

ক্যাপ্টেন স্মি বলেছেন, গুজরাটে আমেদাবাদের কাছে সবরমতী নদীর দুই তীরে সিংহ দেখা যায়। গরম যখন পড়ে তখন সেখানে, যেখানে খুব ঝোপঝাড় আছে। আমেদাবাদ থেকে কচ প্রদেশের নিকট পর্যন্ত সবরমতী আর ভারদার নদীর দু পাশ ধরে ঝোপঝাড় বিশিষ্ট প্রান্তরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সিংহরা, ৪০ মাইল ধরে বিস্তৃত প্রান্তরে ঘোরাফেরা করে।

পূর্বে সিংহ যখন খুব দেখা যেত, তখন অনেকের কাছে সিংহ শিকার একটা খুব সখের ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে খুব বড় শিকারী যেমন লুগ্রান্ড জেকব, স্যর সি মালেট, স্যর কর্নওয়ালিশ হ্যারিশ, কর্ণেল ট্রটার কত যে সিংহ মেরেছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই।

এরা যে সব সিংহ মেরেছেন তাদের সাধারণত মাপ হল, ৮.৭৫ থেকে ৯.৫ ফুট লম্বা। ক্যাপ্টেন স্মি যে সিংহটার মাপ নেন, সেটা সিংহ এবং নাসা থেকে লেজের শেষ পর্যন্ত ৮ ফুট সাড়ে ন ইঞ্চি লম্বা ছিল। একটা সিংহীও সেই সময় মারা হয়েছিল, তার মাপ ছিল ৮ ফুট সাত ইঞ্চি। ১৮৬৩-তে বম্বে স্পোর্টিং ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় যে কাথিওয়াড়ে একটা ৯ ফুট সিংহ মারা হয়েছে।

যারা খুব অভিজ্ঞ শিকারী তাদের মত হল, সিংহের ধরন ধারণই আলাদা। তারা বাঘের মত লুকিয়ে লুকিয়ে নিঃসাড়ে আসে না, এদের স্বভাবই হল মাথাটা উঁচু করে সমস্ত কেশর খাড়া করে চলে। অবশ্য যখন তারা কোন রকমে বিরক্ত হয়, তারা ভ্রূক্ষেপ না করে চারিদিকে নজর দেয়।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৮৩ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বাটলার যখন দিয়েসা নামে একটি জায়গায় বদলি হন, তখন ''গির'' জঙ্গলে একদিন শিকার খেলতে যান, এ ঘটনা প্রথমে ''ফিল্ড'' পরে ''এসিয়ানে'' ১৮৮০ সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যায় বার হয়। তাঁর মতে গির হচ্ছে নীচু পাহাড়ী জঙ্গল পরিপূর্ণ এবং গুজরাটের কাছে কাথিওয়াড়ের মধ্যে অবস্থিত। গির জঙ্গল পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে এবং একমাত্র এই জায়গায়ই সিংহ এখনও দেখা যায়।

ক্যাপ্টেন বাটলার শিকার কাহিনী হচ্ছে প্রথমে সিংহর খোঁজখবর নিয়ে তিনি একটা গাছে উঠেন এবং সিংহটা চারিদিক থেকে বেড় করে ধরতে বলেন। সিংহটা যখন নাগালের মধ্যে আসে, তখন ক্যাপ্টেন গুলী করেন, কিন্তু অনেকগুলো গুলী করার পর সিংহটি তবে ঘায়েল হয়, এ সিংহটা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি নাসা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত। কেশর খুব সুন্দর, এবং সম্ভবত তার বয়স ১২ হয়েছিল।

এর যদি আরও বয়স হত তাহলে বিরাট সিংহ হয়ে দাঁড়াত।

সিংহ সিংহী একসঙ্গে থাকেই যতক্ষণ না পর্যন্ত বাচ্চাগুলো নিজেরা চলে ফিরে খেতে পারে। সিংহীরা পাঁচমাস পরে বাচ্চা দেয়, এদের বাচ্চা দুই থেকে চারটি পর্যন্ত হয়। বাচ্চারা বিড়ালের বাচ্চার মত অন্ধ হয় পরে তাদের চোখ ফোটে।

এবেরি ম্যাকে তাঁর স্পোর্টস ইন ইণ্ডিয়াতে বলেন বাচ্চাদের গায়ে ঠিক বাঘের মতনই ডোরা-কাটা দেখা যায়, অবশ্য দাগগুলো খুব ফিকে ফিকে হয়। পিঠের উপর দিয়ে সোজা একটা কালচে মত রেখা দেখা যায় এবং এই রেখা থেকে দুপাশে সারি সারি রেখা নেমে যায় এমন কি ল্যাজ পর্যন্ত থাকে। মাথায় এবং অন্যান্য জায়গায় খুব ফিকে চাকা চাকা দাগ থাকে। সমস্ত দাগ বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় এবং সাধারণ হাল্কা বাদামী রঙ দেখা দেয়। সিংহদের দশ বারো মাস বয়সেই কেশর বার হয়। আর আঠারো বছর বয়সে এদের পূর্ণ বিকাশ হয় এবং এই বয়স থেকেই গর্জন করতে পারে।

সিংহ শিকার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে, লেখক হিসাবে কর্ণেল প্যাটারসন কর্ণেল পোল দারুণ দারুণ কথা বলেছেন। আমাদের মনে হয় ডেভিড লিভিংস্টোনের অভিজ্ঞতাও বিস্ময়কর।

ডেভিড লিভিংষ্টোন।

১৮৪৩ খৃঃ জুন জুলাই মাসে, যে চিঠি লিভিংষ্টোন লেখেন তাতে আছে ''ডিরেক্টররা যে তাঁকে আফ্রিকার গভীরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন এ খবর আমায় কি যে আনন্দ দিয়েছে তা বলতে পারি না, ভগবান করুন আমার দেহমন সব কিছু আমি তাঁরই কাছে উৎসর্গ করতে পারি।''

(লিভিংষ্টোন খৃশ্চান ধর্ম প্রচার করার জন্যই আফ্রিকার গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। লিভিংষ্টোন, আফ্রিকাবাসীদের কাছে ''ধ্বনিময় ধোঁয়ার'' কথা শুনিয়েছেন; আফ্রিকার বিরাট জলপ্রপাতকে ওখানকার লোক ''ধ্বনিময় ধোঁয়া'' বলেই জানত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লিভিংষ্টোন এই জলপ্রপাত আবিষ্কার করে তার নামকরণ করেন, ''ভিক্টোরিয়া ফলস''।)

অগষ্ট মাসের প্রথমদিকে, অন্য ধর্ম্মপ্রচারকদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন, মাবস্তা নামে একটা চমৎকার উপত্যকা আছে, সেখানে বাসা করে কাজ শুরু হলো মাবস্তা উপত্যকা প্রায় দুশ মাইল উত্তর পূর্বদিকে, এখানে এক ধরণের জাতি বাস করে তাদের নাম 'বাকাৎলা'। এই জায়গায় লিভিংষ্টোন নিজে হাতে একটা কুটির তৈরী করে, একাদিক্রমে তিন বছর বাস করেন।

ইতিমধ্যে একবার এখানকার গ্রামবাসীরা, সিংহের দৌরাত্ম্যে পাগল হয়ে উঠল। সিংহরা রাত্রেই গ্রামের গোয়াল আক্রমণ করতে আরম্ভ করে, ক্রমে তারা এমন দুঃসাহসী হয়ে উঠল যে দিনমানেও হানা শুরু করে দিলে। বাকাৎলারা আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না, তারা দল বেঁধে পাল্টা আক্রমণ করলে, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না।

''সিংহরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে, আমরা জানি সেই দলের একজন যদি জখম হয় অর্থাৎ মারা পড়ে তাহলে তাদের দল সে-তল্লাট ছেড়ে চলে যায়। আবার যখন পশুপালের উপর সিংহ হামলা করে তখন একটা সিংহকে মেরে সবাইকে দেশ ছাড়া করার জন্য বাকাৎলাদের সঙ্গে আমি নিজে গেলাম যাতে তারা সাহস পায়।

আমরা খানিক দূর এসে দেখি সিংহরা একটা ছোটমত গাছে ঘেরা টিলায় বসে আছে। আমাদের লোকেরা তৎক্ষণাৎ টিলাকে বেড় করে ক্রমশ এগিয়ে চলল। আমি মাবালউই বলে এখানকার গ্রামের একজন স্কুল মাষ্টারের পাশেই টিলার নীচের সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমাদের বেড়ের মধ্যে একটা সিংহ পাথরের উপর বসে আছে।

স্কুল মাষ্টার মাবালউই বন্দুক তুলেই চালালেন, হায়, গুলীটা জন্তুর গায়ে না লেগে পাথরের গায় — যে পাথরটার উপর সে বসেছিল — সেটাতে গিয়ে লাগল। সিংহটা যেখানে গুলীটা লেগেছিল সেখানেই ভয়ঙ্করভাবে এক কামড় দিল, যেমন সাধারণত কুকুররা তাদের লক্ষ্য করে কোন লাঠি বা ইট ছুঁড়লে করে থাকে। এই কামড়ের পরই এক লাফে, আমাদের বেড় ভেঙ্গে কোন আঘাত না পেয়েই পালাল।

বাকাৎলারা যদি অবশ্য তাদের দেশের লোকেদের মতই বুদ্ধি করত তাহলে সিংহটার পালাবার উপক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে বর্শা ছুঁড়ে মারতে পারত, কিন্তু বেচারীরা কেমন যেন ভয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। যাই হোক আবার আমরা বেড় দেওয়া আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও দুটি সিংহ দেখা গেল। কিন্তু এখানে এমন ক্ষেত্রে গুলী ছোঁড়া ঠিক হবে না, কারণ বেড়টা বেশ নিকটে এসেছিল — যদি গুলী আমাদের একজনের গায়ে লাগে এ কথা ভেবে গুলী ছোঁড়া হয়নি। জানোয়ারগুলো প্রচণ্ড বেগে আমাদের বেড় ভেঙ্গে উধাও, এটাও সত্যি ওদের সঙ্গে যুঝে ওঠা অসম্ভব।

আমরা অগত্যা গ্রামের দিকে এগিয়ে চললাম, টিলাটার শেষের দিকে ঘুরে যাবার সময় হঠাৎ আমি দেখলাম প্রায় তিরিশ গজ দূরে পাথরের উপর একটা ঝোপের পাশে, একটি সিংহ! আমি আমার দোনলা বন্দুক তুলে বেশ ভালভাবে ঝোপের মধ্যে দিয়ে নিশানা করেই, পরপর গুলী ছুড়লাম।

লোকেরা চীৎকার করে উঠল 'গুলী লেগেছে গুলী লেগেছে'।

আর কেউ কেউ সমস্বরে বলে উঠল 'আর একজনের গুলীও লেগেছে, চল চল দেখি সিংহটাকে'।

এই গোলমালের মধ্যেই আমি স্পষ্ট দেখলাম, সিংহটার ল্যাজ ক্রোধে কাঁটার মত সোজা হয়ে উঠেছে, দেখেই তৎক্ষণাৎ লোকদের বললাম, 'খবরদার, আমি গুলী ভরে নি তারপর' বলে বন্দুক ভেঙ্গে যখন আমি বুলেট ভরছি তখনই একটা ভীষণ চীৎকার আমার কানে এল, আমি তাড়াতাড়ি আড়চোখে চেয়ে দেখেই হতবাক্, সিংহটা লাফ দিয়ে আমার কাছে এসে পড়েছে।

বিরাট জানোয়ারটা আমার ঘাড় ধরে ফেলতেই আমরা দুজনেই মাটিতে পড়ে গেলাম, সিংহ তখনও আমার ঘাড়টা ধরেছিল। এর মধ্যেই ক্রমাগত গর্জন করে চলেছে, টেরিয়ার কুকুর যেমন করে ইঁদুর ধরে নাড়া দেয় তেমনি ভাবে, আমাকে নাড়া দিতে লাগল।

এভাবে নাড়া দেওয়ায় আমার সারা দেহে একটা বিস্ময়কর অসাড় অবশ ভাব দেখা দিল, অনেকটা বিড়াল ইঁদুরকে মুখে করার সঙ্গেই ইঁদুর যেমন নেতিয়ে পড়ে। সিংহ আমাকে কামড়ে ধরাতে আমার মধ্যে যেন খানিকটা তন্দ্রা দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল, আমি এর ফলে কোন যন্ত্রণা অথবা কোন রকমেই আতঙ্কগ্রস্ত হইনি; অথচ আশ্চর্য যে, যা-কিছু ঘটছে সে বিষয় আমার পুরোমাত্রায় জ্ঞান ছিল অনেকটা যেমন ক্লোরোফরম করা রুগীর মতই তারা অস্ত্রোপচার দেখে, কিন্তু অস্ত্রের যন্ত্রণাবোধ কিছুই করে না।

এই অবসন্নতা মাংসাশী জন্তু যখন অন্য কোন জন্তুকে ধরে তখন ধৃত জন্তুর মধ্যে সম্ভবত দেখা দেয়। সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে মৃত্যুর যন্ত্রণা কমাবার জন্য ভগবানের কি আশ্চর্য মায়া সৃষ্টি! এই সূত্রে বলা যায়, একবার স্যর এডওয়ার্ড ব্রাডফোর্ড, এঁর বাঁ হাতটা বাঘ কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিল, ইনি এক ডিনার পার্টিতে ঠিক রুসতাম পাশার পাশেই বসেছিলেন, রুসতাম পাশারও ডান হাতটি এবং বাম বাহু ভালুকে ছিঁড়ে নেয়। দুজনেই পাশাপাশি বসে এক কথা স্বীকার করেন, ছিঁড়ে যাবার সময় কোন যন্ত্রণাই অনুভব করেন নি।

সিংহটা তখনও তার একটা থাবা আমার মাথার উপর রেখে দাঁড়িয়েছিল; আমি চকিতেই তার এই বিরাট ভারের চাপ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সাহস করে ঘুরে যেতেই দেখতে পেলাম, সিংহটা তখন মাবালউইকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করছে।

মাবালউই, দশ পনেরো গজ দূরে দাঁড়িয়ে, তার বন্দুকটি তুলে সোজা সিংহর দিকে নিশানা করেছিল! মাবালউই-এর বন্দুকটা সেকেলে ফ্লিন্ট বন্দুক, খুব নির্ভরযোগ্য নয়, হলও তাই, পর পর দুটো নল থেকেই গুলী বার হল না।

সিংহটা আমাকে ছেড়ে মহা আক্রোশে মাবালউইকে আক্রমণ করল, তার উরুদেশ কামড়ে ধরল। এ সময়, আর একজন — এই লোকটিকে যখন মহিষ তার সিং দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তখন আমি বাঁচাই, সে সত্বর তার হাতের বর্শা দিয়ে সিংহটাকে জখম করতে যেই গেছে, অমনি সিংহটা মাবালউইকে ছেড়ে এই লোকটির ঘাড় ধরল। এই সময়, সিংহটার দেহে প্রথমেই যে বুলেট দুটো বিঁধেছিল, এতক্ষণে সেগুলো তাকে অকর্মণ্য করে দিলে, সিংহটা পড়ে মারা গেল।

এ সব কাণ্ড কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটেছিল, সমস্ত কিছুই যাকে বলে তার মরণকামড়। এই মরণ কামড়েই সে এ সব ব্যাপার করেছিল। বাকাৎলারা তার পরদিন সিংহটার দেহ পোড়ালে, এত বড় সিংহ সবাই বললে দেখা যায়নি।

আমার হাতে মানে বাহুতে সিংহটার এগারোটা দাঁতের দাগ বসে গিয়েছিল, গর্তগুলো ঠিক মনে হয় যেন বন্দুকের গুলীতে গর্ত হয়ে গেছে, তাছাড়া আমার হাড় ভেঙ্গে চুর হয়ে গিয়েছিল। এই ক্ষত দিয়ে অজস্র রক্ত পড়ে সারতেও অনেক দিন লাগে। মাঝে মাঝে এ জায়গাটা অসহ্য ব্যথা অনুভব করতাম।...যে লোকটির ঘাড় সিংহটা জখম করে, ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেলেও, ঠিক তার পরের বছরে ঠিক সেই মাসেই যে মাসে সে জখম হয়, আবার সেখান থেকে রক্ত পড়ে।''

প্রথম প্রকাশ অজ্ঞাত। পুনঃপ্রকাশ 'অনন্যা' পত্রিকায়, চৈত্র ১৩৬৮। 'অনন্যা' পত্রিকায় সূত্রনির্দেশ করা নেই। কিন্তু সাধারণত 'অনন্যা'য় নতুন লেখা ছাপা হত না।

সম্পাদকীয় সংযোজন

লেখাটিতে আমাদের মনে হয়েছে, কোথাও শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, কোথাও যতিচিহ্ন বাদ পড়েছে। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যাচাই-এর কোনও সুযোগ না থাকায়, 'অনন্যা'য় প্রকাশিত পাঠ অনুসৃত হল।

কোনও একককে একই সাথে সংখ্যায় এবং শব্দে লেখার প্রবণতা এই লেখাটিতেও আছে। পত্রিকায় শেষাংশে, কমলকুমার সম্পাদিত পত্রিকা 'অঙ্ক ভাবনা'য় এই উদাহরণ প্রতি পদক্ষেপে ছড়িয়ে আছে।

আধুনিক বানান পর্যন্ত ('পর্য্যন্ত'-এর বদলে) ব্যবহৃত হয়েছে যা সাধারণত এই সময়ে কমলকুমার করতেন না। এই পরিবর্তন হয়তো সম্পাদনার ফল।

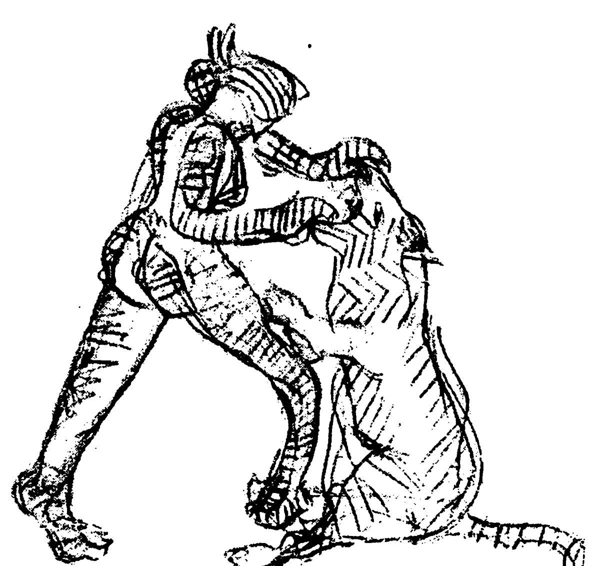

লেখা বিষয়ক

মাধবকে স্মরণ করি, ভুবনেশ্বরী তারাকে স্মরণ করি, জয় রামকৃষ্ণ; আমরা যেন আপনকার বোধ হইতে লিখিতে সক্ষম হই; কেন না এই তত্ত্ব হয় বড়ই মায়ার! আমরা ছেলেবেলাতে যখন

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

হে জগদীশ, আমি ধন জন সুন্দরী নারী বা কবিত্বশক্তিও প্রার্থনা করি না, কেবল

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

কেবল জন্মে জন্মে তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করি।

এই শ্লোক পড়িতে স্বতই মনে আলোচনা হইত কবিত্বশক্তি কি; ইহা এমন কি বৃত্তি যাহা অন্য আর পাঁচটি মারাত্মক বাসনার মত; ইহাতে কবিকে তামসিক করিয়া রাখে বা! অথচ ভগবান নিজে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ঃ

যস্মাৎ ক্ষরমতীতো 'হমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতো 'স্মি লোকে বেদে চ প্রতিথঃ পুরুষোত্তমঃ।।

যেহেতু আমি ক্ষরের (অশ্বত্থ নামক মায়ারূপ সংসারবৃক্ষের) অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম (উর্দ্ধতম) সেই হেতু ইহলোকে (কাব্যাদিতে এবং ভক্তজনে) ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত।

কাব্যাদিতে ঃ হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তম স্মৃতঃ! এই আজ্ঞাতে আমাদের সর্ব্বরূপ বিভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়! এখন বুঝি সঠিকভাবে এই জগতের কথা লিখিতে পারিলে তাঁহার কথাই লেখা হইল, কেন না সমস্ত কিছুতেই তিনি আছেন। তবু প্রশ্ন থাকিয়া গিয়াছে!

আমাদের লেখার মনস্কতা সম্পর্কে অদ্য হইতে বহুকাল আগে, মানে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর হইতে যায় — পরিষ্কার রূপে বিশদিয়াছি, তখন কিছু নূতনত্বের লোভে নয়, যেহেতু যতটুকু বুঝিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করাই আমাদের ধর্ম্ম হউক তাহা এই মন, —। অর্থাৎ আমাদের, মানে একের, মানে নিজের 'আমি-কে' বাদ দিতে সক্ষম নহি। — তাহা আমি!

'আমি' শব্দে পাঠকরা এখনই শ্লেষ করিবেন, যে ইহা পাশ্চাত্য ভাবুকতা; অবশ্যই স্বীকার করিব যে তাহা সত্য; পাশ্চাত্যকে অন্তত বাঙালী কখনও তুচ্ছ করিবার স্বপ্ন দেখিবে না; বিশেষত আমরা যাহারা ইংরাজ শাসনে সুখ সমৃদ্ধিতে ছিলাম তাহারা তো বটেই, এমনও যে আমাদিগের পরের মানুষেরা তাহারাও।

ঐ সূত্র হইতে বাঙালী উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; বাঙালীর পরম বোধগম্যতা, প্রতিটি সুকুমার শিল্পে, কাব্যে পাশ্চাত্যের সহিত যাচাই করার বৃত্তি আসিয়াছে; এবং যাহা আমাদের গর্ব্বের মানুষ যাঁহারা, তাঁহারা আনিয়াছেন (বিদ্যাসাগর কৃষ্ণকমল মধুসূদন)। আমরা কিন্তু সর্ব্বদাই ত্রাসিত হইয়া আছি; কেন না আমরা যখনই নিজেকে লেখক বলিয়া স্থির করি তখনই এক শুদ্ধ ব্রাহ্মণের ভরসার কথা শুনিতে পাই ঃ

'আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত ভাবী লেখক ভাবী প্রতিভাশালী লোক উদয় হইতেছে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত মহাকাব্য বঙ্গবাসীকে আনন্দে ভরাইয়া দেশ-দেশান্তরস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে।......'

পাঠক এমত আশা মার যায় নাই — পরক্ষণেই আমরা মহান সিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাইলাম। তবুও ঐ ভবিষ্যৎ বাণী আমরা যাহারা কলম ধরিয়াছি তাহাদের বড় কারে ফেলিয়াছে; আমরা আঙুল হারাইয়াছি। দেখিলাম অন্ধকার আছে কিন্তু লুকাইতে পারি নাই। এখন কোন সে বিশ্বাসে আমরা কলম ধরিব। ছোটবেলাতে এক প্রবাদ শুনিয়াছিলাম, 'লিখতে লিখতে ঘটে,......'

এইটুকু পন্থা লইয়া আমরা আগুয়ান হইয়াছি; একদা প্রখ্যাত লেখক শ্রীমান গৌরকিশোর ঘোষকে কথা প্রসঙ্গে বলি, আমরা যাগ প্রদীপ মাত্র বাঙলা অক্ষর যাহাতে বর্ত্তাইয়া থাকে তাই লিখি। আমাদের অন্তরেতে কোন মায়া নাই।

আমাদের সময়েতে, এমন এক ভাবধারা আসে যাহা আমাদের সাহিত্যধারাকে বেশ কাবু করিল, ইহা যাঁহারা লইয়া আসিলেন, তাহাদের সম্পর্কে রটিল যে ইঁহারা খুব পণ্ডিত — কিন্তু দেখা গেল, ঐ গোষ্ঠী কিছুই জানে না। শ্রদ্ধেয় নলিনী গুপ্ত মানে পণ্ডীচারীর বা শচীন চৌধুরী বা বিনয় দত্ত বা অজিত চক্রবর্ত্তী ব্যতীত — যদিও ইঁহারা ঐ দলের নহেন — তখন কেই বা ছিল? আমরা ইঁহাদের মান্য করি।

ঐ উক্ত নবতম গোষ্ঠী এমন কি বাঙলা সাহিত্যের কিছুই জানে না, যে এবং চঞ্চলবাবুর কাছে শুনিয়াছি পাশ্চাত্য সাহিত্যে সংস্কৃতি বিষয়েতে উহারা নিতান্ত কাঁচা। আমাদের কি ভয়ঙ্করই না দিন গিয়াছে! আমরা যাহারা শুধু বাঙলা বলিতেই জানি, যে কোন বিষয়েতে পাঠও নাই, মূর্খ মানুষ আমরা, তাই আমরা মহা মুস্কিলে পড়িলাম। ঐ ৩০-৪০ সালের সাহিত্য ব্যবসায়ীগণ, বিদেশের কথা উঠে না, দেশের কিছুই জানিতেন না, ইহাদের কেহ ইদানীং দেখি, কাশীরামকে অজ্ঞ ঠাওরাইলেন, (অথচ নিজে সংস্কৃত তো জানিতেন না; অন্য কোন ভাষা জানিতেন তাহা জানি না) অথচ বিদ্যাসাগর হরপ্রসাদ কাশীরাম সম্পর্কে এমন কথা বলেন নাই।

ঘটনা বলি, একদিন কয়েক বছর পূর্ব্বে ইন্দ্রনাথের দোকানে বসিয়া আছি, হঠাৎ আমাদের সে প্রশ্ন করিল কাহার কাহার মহাভারত ইংরাজীতে আছে। আমরা কহিলাম, 'কেন ? কোন......মেটে ফিরিঙ্গীর...' এইটুকু বলিতেই সে নিম্নকণ্ঠে কহিল 'অমুকের' লোক দাঁড়াইয়া আছে। এবং মাস কয়েক পরে শুনিলাম তিনি মনোজ্ঞ মহাভারত কথা লিখিতেছেন। এইরূপ আমাদের দেশীয় পণ্ডিত! ৩০-৪০-এর কবি পণ্ডিতরা ইদানীং উপনিষদ চর্চ্চা করিতেছেন — ইঁহারা জবর প্রগতিশীল সাম্যবাদী। ইঁহারা আমাদের পূর্ব্বগামী! আমরা ইঁহাদের নিকট কিছুই পাই নাই।

তবে ঠাকুরের কৃপায় এবং আমাদের বাবা ও মায়ের নির্দ্দেশক্রমে বাড়ীর বহু পুরাতন পত্রিকা সকলেতে যে সকল সমালোচনা রহিয়াছে তাহা যত্ন সহকারে পড়িলাম। বঙ্কিম, পূর্ণ বসু, রবিঠাকুর, সুরেশবাবু, হরপ্রসাদ, চন্দ্রনাথ, কত নাম করিব। ইঁহাদের একটি ভাব ছিল ঃ জাগিয়া স্বপ্ন দেখিও না। ইহার সহিত মহাপ্রভুর বিচার আমাদের বিশেষ ভাবনার হইয়াছে (কেশব কাশ্মিরীর গঙ্গা স্তোত্র বিচার সার্ব্বভৌমের সহিত)।

ছেলেবেলাতে আমাদের ব্লকম্যান ষ্ট্রীটের বাড়ীতে, আমরা নিরুপমা দেবী, সরলা দেবী, শরৎবাবু বহু গণ্যমান্যকে আসিতে দেখিয়াছি— তাঁহাদের প্রণাম করিয়াছি। তখনকার এই সকল জমায়েত স্মৃতি এবং ঐ সমালোচনা ও লেখা পাঠ আমাদের সর্ব্ব সময় জাগাইয়া রাখিয়াছে — ঐ সকল মহানরা সমস্বরে বলিতেছেন, ভাবের ঘরে চুরি করিও না।

'আজি ভূসু বঙ্গালী ভইলী'

হরপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন, বাঙালী মানে অদ্বৈতবাদী। ঐ বাঙালিত্ব আমার কাছে ধ্রুব জ্ঞান। এইটি ফুটাইয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য, আর এমত চিন্তা আমাদের মনে আছে, তবে তাহা কেমনভাবে হইবে তাহার নিরন্তর চেষ্টা করিতে হইবে ও যে কতটা তাহা আমরা নহি! এখানে মাত্র এই বলা যায়, বিষ্ণুশর্ম্মা, জাতক ইত্যাদি রকমারি বিচার বা অভিজ্ঞতাতে জাতিকে চেতয়িত করিতে চাহিয়াছেন যেমন, অনেকাংশে ঐ খাতেই আমাদের উদ্দেশ্যের দিকে আগাইতে হইবে। আবার কখনও দেখা যাইবে তাহা সম্ভবে না। প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অপরোক্ষ এই তিন ভেদকে মিশ্রভাবে তৎসহ আমাদের বুদ্ধিকে পন্থা গঠিয়া লইয়াছি। ১৯৩৮ সালের পর আমরা আর লেখা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি নাই; ঠাকুর জানেন, যতটা ক্ষমতা আছে তাহা লইয়া চেষ্টা করি, একমাত্র ভাবনা কেমন ভাবে একটি ঘটনাকে প্রথমত বাঙালীভাবে (অদ্বৈতবাদ না) ফুটাইয়া তুলিব। তবেই বাঙালিত্ব আসিবে। ইত্যবসরে ১৯৩৮-৪৮ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি, এইভাবে ৫৬ সালে আবার নূতন চেষ্টা করি।

অবশ্য সান্ধ্যভাষার নজীর আমাদের আছে, এবং ভাষাকে এমন এক তাহার নিজস্ব সরলতাতে আনিব যাহা বাঙ্ময় হয়। তাহার খোঁজে থাকিতে হইবে। ইহার কারণে আমরা চারিদিকে প্রত্যক্ষিয়াছি ঃ আলপনার খুন্তীলতা চিনিয়া মোহিত হইয়াছি।

'গো জাস্তির ফল খেয়ে প্রাণ কেমন করে' আমাদের মন উন্মনা করিয়াছে।

আমাদের, এই ভুল, যে আমরা ভাবিলাম, সকল পাঠকবর্গ সুদীর্ঘ একশো বছরে কিছু সূক্ষ্মতালাভ করিয়াছে।

আমাদের বুদ্ধি বলে যে আমাদের কি কাব্যে বা গল্পতে সাদামাটা ভাবে কাঠামোর অভাব। নূতন কবিদের (দেশ বিদেশে) মধ্যে, পদ্যতে দেখা যায় চমৎকার এক পঙ্‌ক্তি খেলিয়া উঠিল — হউক তাহা সঙ্গীতালেখ্য বা কিছুর বিবিধ শব্দের সংমিশ্রণ (কার্য্য নহে) বেশ দেখা যাইবে পরক্ষণেই উপনিষদ কথিত ঃ আলো, বা কোন অন্ধকার বা যন্ত্রণা, আশা, বিষাদ ইত্যাদিতে চিরাচরিত ক্রমে পৌঁছিল, তৎসহ কিছু উৎপ্রেক্ষা দ্বারা তাহাকে নাটকীয় করা হইল।

ঐ 'হঠাৎ গঠিত পঙ্‌ক্তি' খোয়া গেল। তেমনই গল্পতে দেখিব, সেই এক নীতি খেলা করিতেছে, যেখানে অদ্য কোন নাড়ীর সম্পর্ক নাই — সেখানে কোথাও বিমাতা পর্য্যন্ত খাড়া করা হইতেছে, অর্থাৎ পাঠকের সাবেক নাটকীয়তা বোধে ঘা দেওয়া এইভাবে। অবশ্য সম্পর্ক ব্যতীত গল্প হয় না কিন্তু সম্পর্ক মানুষের সহিত যেমন; তেমন সভ্যতার সহিতও হইতে পারে, ভাবের সহিত হইতে পারে — কিন্তু তদ্দারা প্রবন্ধ রম্যরচনা লেখা নয়। এমন কি অঙ্কন শিল্পে, যাহা নিরবয়ব গঠন বলা যায়, তাহাতে গভীরতা আছে, সেই গভীরতা সাহিত্যে আলো ও অন্ধকার চেতয়িত হইবে।

গিরিশবাবু বলিয়াছেন, 'সঙ্গীতের আছে কি আকার' তখনই মনে পড়ে, একবার কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্যারিস হইতে আমাদের একটি কার্ড পাঠাইয়াছিলেন, উহাতে বিখ্যাত শিল্পী ব্রাক-এর একটি উক্তি ছিল, যে সঙ্গীতের আড়া (form)[১] শূন্যতার মধ্যে [][২] পাইয়া থাকে! কাব্যের অনুভব, শিল্পের গভীরতা, সঙ্গীতের আড়া, গল্প সম্পর্কে আমরা ব্যবহার করিব।

গল্প ব্যতীত অন্যগুলির এ্যাবসারডিটি আছে। যেমন ছবিতে কাগজ ভেদ করা যায় না, উহা এক নিশ্ছিদ্র দেওয়ালবৎ অথচ কালীঘাট কাঙ্গড়ার ছবি দেখ — কি ব্যাপার! কুরবের ছবি দেখ! কি বিশাল — রোদ, মেঘ, বাড়ী ঘর সব আসিয়াছে।

গল্পের এ্যাবসারডিটি আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বিদেশে (ফ্রান্স) 'নূতন নভেল' ১৯৫৫ হইতে এক ধুয়া উঠিয়াছে; এখানে কোথাও সময় বা কাল, কোথাও অন্য কিছু দিয়া পাতা ভর্ত্তি হইয়াছে। এই সম্পর্কে কোন বিখ্যাত লেখক ঃ স্ট্রাকচার সিনক্রনিক ও ডিয়াক্রনিক

বিধায় এবং 'সমগ্রতা' বিষয়ে অনেক ভাবনা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপার আমাদের। কোন ত্রৈমাসিক সম্পাদক আমাদের এক বিদ্যাজাহির লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝিলাম আমাদের গল্প নিশ্চয় কিছু হয় নাই — এবং ইহাও বুঝিলাম, তিনি এমনই বিদ্বান যে আমাদের মত লোকও বুঝিতে পারে। ফলে আমরা তাহাকে উত্তর করি নাই কারণ তাহার মত বিরাট মনীষীকে উত্তরে দোষ হয়। একদা রবিবাবু (four arts journal) বলেন যখন আমরা আইনষ্টাইনের (sic) সূত্র বুঝি না তখন নিজ মস্তিষ্কের দোষ দিয়া থাকি — যখন কবিতা বুঝি না তখন কবিকে দোষ দিয়া থাকি।

আমরা গদ্যকে সর্ব্বময় ভাবিয়া থাকি যে, উহা কবিতার ইনভার্স! অবশ্য কতক যুক্তিতে অনেকটা অঙ্কের মনে হইবে, গদ্যর দিক দিয়া কবিতাটা কেমন! এখানে বুঝিব গদ্য তাহার নিজস্ব রূপ ছাড়িল — তাহা কবিতারই ইনভার্স হইল। ইহা, (তাহা হইলে কবিতা আদিতে কেমন) তাহা প্রকাশিত চাহি না, যে যাহার মত করিয়া এখন ভাবিতে পারি মাত্র।

আমাদের লেখা সম্পর্কে আপাতত এইমাত্র বলিব যে, ঐ বিশ্বাস লইয়া আমরা লিখিতে চেষ্টা করি। তবে এখনও আমাদের সংস্কার আছে, যাহার কারণে এখনও, মানে আজও, যখন আমরা কোন গল্পকে ছোট করিয়া বলি তখন তাহার অবয়ব উপকথার মত হইয়া থাকে। ফলে উহা মানে গদ্যর রূপ বলিলেই হইবে এমত বিশ্বাস নাই — উহা ঘটাইয়া তুলিতে হইবে। এখন ঠাকুরের ব্যতীত কিছুই হইবার নহে।

ঠাকুর করুন, আমাদের গদ্য কাব্যের ইনভার্স হউক!

এখন আমরা 'খেলা' ও 'বাগান' এই ক্রম দিয়া অনেক লেখা লিখিয়াছি — ইহাতে, 'খেলা'তে, সাধারণত দৈনন্দিন ঘটনা সকলে মানুষের সূক্ষ্মতা আর 'বাগান'এতে মানুষের সম্পর্কবোধ সূক্ষ্মতা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন গল্পগুলি একসঙ্গে না ছাপিলে চরিত্র ফুটিবে না কিন্তু তবু ছোট কাগজ ব্যতীত আমার উপায় নাই সেখানে ক্রমশঃ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

প্রথম প্রকাশ জর্নাল সত্তর, ৫ম সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬।

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. এই অর্থে 'আড়া' শব্দটির ব্যবহার অভিধান অসমর্থিত। বিশেষত 'আড়া'র ইংরেজি অনুবাদে 'form' শব্দটির প্রয়োগও লেখকের নিজস্ব।

২. সম্ভবত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বাদ পড়েছে।

কয়েকটি শব্দার্থ

১. কারে - ঝামেলায়, ২. চেতয়িত - চেতনা জাগ্রত করা, ৩. গো জান্তির ফল - সুপারি গাছের ফল, ৪. ধুয়া - কোনও মত বা উক্তির পুনঃ পুনঃ প্রসার।

পরিপ্রেক্ষিত

বাক্য যখন গীতে, ঘটনাপ্রবাহ যখন বাদ্য অভিধায় তখন শুধুই ভক্তি বিবর্ত কিন্তু আবার এমনও আছে যে গীতগোবিন্দ যখন চিত্রকল্প, শব্দায়মান মানসিকতা যখন অপরাহ্ণ, অপরাহ্ণ যখন অমোঘ নির্জনতা মহিমান্বিত দুঃখ, তখনই তাহা বাঁশীর সুস্বন গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে। আমরা জানি গ্রাহ্য বস্তুর সহিত সঙ্গীতের বস্তুর (*object Musical*) বিভিন্নতা বর্তমান, এবং ইহাও আমাদের ধারণা, গল্পের বস্তুত্বের নিজস্ব কাঠামো আছে এবং তাহাকে, গল্পত্বকে আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

ঠাকুর বলেন, 'কথা ইসারা বটে'। এই ইসারা পরম পর্যায় যাহা ওতপ্রোত বাচনিক সত্তা তাহা দেখা দেয়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য 'সুহাসিনীর পমেটম' বা 'শ্যাম নৌকা' আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেককেই আনন্দ দেয় নাই। ঘটনাপ্রবাহকে আমি লেখার উপজীব্য বলিয়া ধরি না, তাই অনেক ঘটনা বহুবার পরিশোধিত হইয়াও আমার নিকট রহিয়া গিয়াছে — যথা 'তমালীর গল্প'। তমালীর এক প্রেমিক ছিল, ইহাতে তাঁহার তান্ত্রিক স্বামী ঈর্ষান্বিত হয় এবং তমালীকে পিয়ারীলালের দরজায় মন্ত্রচালিত করিয়া একদা নিশীথে পাঠায় — তমালীর হস্তে ডাব, তাহার তিন ডাকে পিয়ারী তাহাকে অনুসরণ করে — ক্রমে রাস্তায় — নিশি পাওয়া পিয়ারীকে তমালীর স্বামী আক্রমণ করে এবং তাহাদের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত। ফলে দুইজনেই মারা যায়। অদূরে ডাব হস্তে উলঙ্গিনী তমালী — ডাব হৃদয়ের প্রতীক। তেমনি আবার 'রুক্মিনীকুমার' বা 'কুষ্ঠ রোগীর গল্প' বা 'বিষাদ উপমঞ্জরী'-তে যথা এক ভদ্রলোক ও এক মহিলা ট্রেনের যাত্রী — দেখা গেল দুজনের গন্তব্যস্থল এক এবং একই কাজে যাইতেছেন — অর্থাৎ রোগী দেখিতে। ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং মহিলার স্বামী যথাক্রমে পাগল — যাত্রীদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা হইল যে তাহারা স্থির করিল কোন সমুদ্রতীরে যাইবে। এখানে আসিয়া বিশেষত মহিলা নিয়ত স্বামীর খোঁজ নেন — ধীরে দুজনে পরামর্শ করিয়া নিজ নিজ স্বামী স্ত্রীকে পাগলা গারদ হইতে লইয়া আসিলেন এবং কোথাও স্বস্তি না পাইয়া অবশেষে একদা ভদ্রলোক মহিলার অনুমতিক্রমে সেই সমুদ্রতীরে পাগল ও পাগলিনীকে মারিলেন। কিন্তু তাহাদের দেহ যতবার সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হয় ততবারই ফিরিয়া আসে। এইভাবে অনেকানেক গল্প।

আমি নিজে জ্যামিতির অনুগ্রাহী — হার্ভে লিখিত পাসকাল সম্পর্কে 'জিওমেতরী এ পাসইও' বা মহাকবি দান্তে লিখিত 'জেও মেটারের লোর' কিন্তু অন্য ব্যাপার।

আমি ঠিক এনালিটিক কিউবিজমের পক্ষপাতী, এখানে টেনসনে রেখাসকল যতক্ষণ না সৃষ্টি হয় (অনেকবার timbre এর মত অথচ এইগুলিকে অনেকে image বলেন)। এতক্ষণ গল্প হয় নাই বলিয়া আমার ধারণা আমি আদতে ইয়েরোগ্রিফিক লেখক নই। লেখার প্রেরণা যখন (সৃষ্টিক্ষমতা বাক্য বড় উচ্চমার্গের) এই ঘটনাপ্রবাহের নিকট যাওয়া আসা করে তখনই গল্পের বস্তুত্বের অনুভব হয়। ইহা স্মর্তব্য যে টেনসন ব্যতীত বস্তুত্বের স্থাবরতা সম্ভব নয়। অবশ্য এই এনালিটিক ব্যাপারের সহিত স্তাঁদালীয় বিশ্লেষণের যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

প্রথম প্রকাশ - দর্পণ, ৬মে ১৯৬৬। পুনঃপ্রকাশ 'আজকাল' পত্রিকায়। আমরা 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ প্রকাশ করলাম।

কমলকুমারের স্কেচে ভগ্নী শানু লাহিড়ী

নির্বাচিত বই

বাংলা বই ঃ

প্রসঙ্গক্রমে

মাধবায় নমঃ তারা ব্রহ্মময়ী মাগো, যাহা স্মরণে ইহা লিখি যে বাঙলা সাহিত্য আমার মজ্জায়, যখনই আমি তাহার দুর্লভত্ব দেখি, তখন আমার ভাব লাগে। আমাকে অন্যরে বুঝিবারে প্রাচুর্য্য দিয়াছে — ধর্ম ব্যাখ্যা, উপন্যাস অথবা ছড়া বা কবিতাতে আমাদের যোগ্য অন্যতে আছে কিনা সন্দেহ! হরপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন, বিশ বছরে এই উদ্‌ঘাটন বিস্ময়কর (মানে মধুসূদন ও বঙ্কিমবাবুর জন্য)। চেষ্টারটনের মতে, ইবসন হঠাৎ নরওয়েতে! এক এক দেশে হঠাৎ আছে! যেমন রুষে [রুশে]! সেখানে পদ্যকার নাইই বলিতে আমার দিক দিয়া পারি (ব্যক্তিগত) — অবশ্য কেহ বলিতে পারেন তোমার জানা কতটুকু!

আমাদের দেশে, বাঙলা (পূর্ব্বঙ্গও), বহুদিন হইতে উদ্‌ঘাটন চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। এমন যে এখানে বহুবারই শ্রীভগবান অবতার হইয়া আসিয়াছেন। চর্যাপদ্ হইতে অদ্য ধর্মস্রোত দেখা যায়। এখানে ছড়া, নাটক, গল্প, রূপকথা, রসিকতা, গীত ইত্যাদি একে অন্যকে প্রভাবিত (!) করিতে আছে, প্রত্যেকটি নিজস্ব ফলে হরপ্রসাদবাবুর উক্তির জড় বহুদূর! ভগবান মহাপ্রভু নিজে কবি ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণও দারুণ কবি। কেন না ভগবৎ কথা অন্যতে সঞ্চার করানোই তাঁহার কাব্য! রামপ্রসাদ আমাকে এক অভিনব বিস্ময় দিয়া থাকে; যে এবং ইহাদের জ্ঞানে সব দেখিতে শিখিয়াছি। বাঙলা লেখা এখন খুবই কম দেখি, যাহা আমার ভালো লাগে না! আমি যখন বাহির হইতে আসি — বঙ্গ ভূখণ্ডে যখন ট্রেন প্রবেশ করে তখন আমি মাগো বলিয়া উঠি। অথচ সেই বিশেষ ভূখণ্ডের লোক আমি নই! যেগুলি এখানে নাম দিলাম সেগুলি, আমি ভক্তিতে স্পর্শ করি — রাসসুন্দরী যেমন চৈতন্য চরিতামৃত (!) স্পর্শ করিয়াছিলেন। আমার বিদ্যাসাগরের ও বঙ্কিম চাটুজ্জের কমা, সেমিকোলন পর্য্যন্ত ভালো লাগে!

১) রাসসুন্দরী — আমার জীবন, সরলতা ধর্ম।
২) নিরুপমা দেবী — দিদি, নিষ্ঠা।
৩) সরলা দেবী — ঝরা পাতা, প্রকাশক্ষমতা।
৪) মহেন্দ্র গুপ্ত — কথামৃত।
৫) কুলদারঞ্জন ব্রহ্মচারী — সদ্‌গুরুসঙ্গ।
৬) শ্রীঅরবিন্দ — ধর্ম ও জাতীয়তা।
৭) কেশব সেন — জীবন বেদ (অন্যান্য লেখা)।
৮) বিবেকানন্দ — মদীয় আচার্য্যদেব (অন্য লেখা)।
৯) বিদ্যাসাগরের — সীতার বনবাস, আখ্যানমঞ্জরী।

বিশেষত, ম্যাংগো পার্কের কথা, কাফ্রি মেয়েরা যে গান গাহিয়াছিল ঃ ''গানের মর্ম এই ঝড় বহিতেছিল, বৃষ্টি পড়িতেছিল। উপায়হীন শ্বেতকায় মনুষ্য, ক্লান্ত হইয়া আমাদের বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতে ছিলেন; তাহার জননী নাই যে দুগ্ধ দেন, তাহার স্ত্রী নাই যে আহার প্রস্তুত করিয়া দেন। আইস আমরা শ্বেতকায় মানুষকে আশ্রয় দি তাহার কেহ নাই তিনি নিরাশ্রয়।'' তাহাতে এমন কোন স্থান আছে যে আমাদের অবাক করে না, ইদানীংকার মানসে তিনি অদ্ভুত প্রগতিবিদ, যেমন, 'পশুদের মধ্যে পদমর্যাদা নাই। লোকে সিংহকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা বলে। কিন্তু উহা কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে' (বোধোদয়)। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ফরাসী বিপ্লবের পর সবকিছু ভুয়ো বলার চেতনায় প্রতিভাবান দোকাঁতো[১] অতিমাত্রায় নাম কিনিয়াছিলেন যেহেতু তিনি তদীয় ইসতোয়রে নাতুবরল[২] এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেন যে সিংহ পশুদের রাজা নহে, প্রকৃতিতে রাজা বলিয়া কিছু নাই।

১০) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য — দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ। ইহার মনুষ্যচরিত বিশ্লেষণ আমাকে সংযত করে।

১১) মধুসূদন — প্রতি ছত্রই। নলিনী গুপ্ত বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথে যদি আমরা পৌঁছিয়া গিয়া থাকি অন্তঃপ্রেরণার কয়েকটি গভীরতম প্রস্রবণের মূলে, মধুসূদনে তেমনি আমরা সাক্ষাৎ পাইয়াছি অন্তর্জ্ঞানের একটা প্রয়াস ও সাধনা।

বঙ্কিমবাবুর — কপালকুণ্ডলা। ভূদেব মুখুজ্জের — প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ।

তারকবাবুর— স্বর্ণলতা। স্বামী গম্ভীরানন্দ — শ্রীমা সারদা দেবী। সঞ্জীবচন্দ্রের — পালামৌ। ত্রৈলোক্য মুখুজ্জের — ডমরু চরিত। গিরিশবাবু — প্রফুল্ল, সিরাজদ্দৌলা। ক্ষীরোদপ্রসাদের — আলিবাবা। শিবনাথ শাস্ত্রী — আত্মজীবনী। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের — ঠাকুরমার ঝুলি। যোগেন সরকার — খুকুমণির ছড়া, হাসিখুশী। বিপিন গুপ্তের — পুরাতন প্রসঙ্গ, বটতলার মেয়েদের ব্রতকথা। মীর মোসারফ হোসেন — বিষাদ সিন্ধু। মহম্মদ দানেশ — চাহার দরবেশ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর — বাংলার ব্রত। হরপ্রসাদের — মেঘদূত। শরৎ চাটুজ্জের — অভাগীর স্বর্গ, বিরাজ বৌ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের — জীবনস্মৃতি। প্রভাত মুখুজ্জের — গল্প সংগ্রহ। মণীন্দ্রলাল বসুর — রমলা। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী — মহাস্থবির জাতক। তারাশঙ্কর — কবি। মানিকবাবুর — পদ্মানদীর মাঝি।

কেদারবাবু, পরশুরাম বাদ গেল।

এখানে অন্য দারুণ লেখক যেমন বনফুল, জগদীশ গুপ্ত ইত্যাদিদের নামকরণ হইল না। যে এখন কি কবিতাতে বা উপন্যাসে যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন, যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন সকলেই কৃষ্ণকমল বাবুর মতই বিস্মিত।

"যে আমি গতরাত্রে জুলিয়ার স্বর্গযাত্রার অনুগামী হইতে চাহিয়াছিলাম, এখন সেই সময়ের পর চব্বিশ ঘণ্টা অতীত না হইতেই সেই আমি আর এক যুবতীর প্রণয় বশম্বদ হইতে পরাঙ্মুখ হইলাম না।"—(দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ)

আর মানুষ কত আলেক কাণ্ড! ইহার সহিত বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও সঞ্জীবের, কেশববাবুর — আর বালক আমার গোলাপ ফুল — (জীবন বেদ) সূক্ষ্মতা আছেই ইহা আমার মন বলে।

বিদেশী বই ঃ

Sir Thomas Malory–*Morted' Arthur*; Lewis Carroll – *Alice in Wonderland*; Henry Fielding–*Tom Jones*; Daniel Defoe–*Robinson Crusoe*; Robert L. Stevenson–*Treasure Island*; Grey Bunyan–*Pilgrim's Progress*; S. Johnson–*Lives of British Poets*; Lamb–*Rosamund Grey & Essays*; Boswell–*Life of S. Johnson*; Edward Gibbon–*The Decline and Fall of Roman Empire*; Darwin–*Voyage of the Beagle*; Lal Behari Dey– *Gobinda Samanta*; J.Locke–*Essays Concerning Human* Understanding; Edmund Burke–*Reflections on the Revolution in France*; Samuel Coleridge–*Biographia Literaria*; Spectator Joseph Addision বিশেষত *Sir Rogerde Coverloy* কথা।

১) এখানে আমেরিকান লেখক বাদ রহিল। ২) কেন ভাল লাগে তাহা সঠিকভাবে উল্লেখিত হইল না। ৩) প্রকাশ থাকুক যে আমার অজস্র বই দেশের ও বিদেশের যাহা ইংরাজীতে লিখিত তাহা ভাল লাগে। ৪) বাঙালী একজনের নাম করিলাম! বাঙলা দেশের ইংরাজীর হাত খুবই সুন্দর ছিল যাহা ইদানীং নষ্ট প্রায়।

প্রথম প্রকাশ - 'নির্বাচিত গ্রন্থ' নামে, কস্তুরি, এপ্রিল ১৯৭৫। পুনঃপ্রকাশ - 'নির্বাচিত বই' নামে প্রতিবিম্ব, ত্রয়োদশ সংকলন ১৯৭৯।

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. দোকাঁতো - নামের বঙ্গীকরণে সন্দেহের অবকাশ আছে। ২. সম্ভবত (?) বইটির নাম 'ইসতোয়ার নাতুরেল'।

এখানে উল্লিখিত প্রতিটি বই-এর নাম এবং লেখক নাম যাচাই করা সম্ভব হল না। যেহেতু আমরা 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ ছেপেছি তাই আমরা 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকার উপর নির্ভর করলাম।

. আলেক কাণ্ড — যা লেখায় ধরা যায় না।

ইদানীন্তন শিক্ষা প্রসঙ্গ

মাধবায় নমঃ, জয় রামকৃষ্ণ; সম্প্রতি কোন এক স্বনামধন্য পত্রিকাতে, এখন ইস্কুলের পাঠ্যসূচী বদলের প্রাক্কাল, প্রসঙ্গত যে বিবিধ ভাবনা, ইহা বিদ্যালয়গত আর শিক্ষাক্রম লইয়া, প্রবন্ধাকারে কিছুকাল যাবৎ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, যাহার প্রতিটি প্রণিধানের, যে এবং যাহা আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করি; যাঁহারা লিখিয়াছেন, সমস্যা সকল বিবেচনায়, যে অভিনিবেশ করিতে তাঁহারা সমর্থ, যে গুণবেত্তা এবং গভীরতা তাহাদের, তত্তুল্য কিছুই লেখকের নাই — আমি ক্রাফ্‌ট শিক্ষক, সুতরাং আলোচ্য বিষয়ক সূক্ষ্মগতি ব্যাপারে আমার স্বত্ব বর্তাইবার নহে — একারণ কোন মন্তব্যই আমার সাজে না; এইমাত্র যে আমি তাঁহাদের নিকট উল্লেখিত তত্ত্ব সম্পর্ককে কিছু জানিতে চাহিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু সমুদয় কথাই বাঙালীকে লইয়া তাই আমার আগ্রহ থাকে; এবং এই সূত্রে যে আজ বিশ বৎসর হয় কলিকাতাস্থ অতীব সম্ভ্রান্ত, অভিজাত যথার্থই, ইংরাজী মিডিয়াম ইস্কুলের পত্তন হইতেই, এখানেতে আমি কর্মসূত্রেই নিয়োজিত আছি, আমার যোগ থাকিয়াছে।

গত ১৬ই জুন ৭৩ তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধে — 'জাতীয় বিদ্যালয়' — লেখিকা লিখিয়াছেন ''...এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে স্থানীয় সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসব-ব্যসনের প্রায় সম্পর্কই নাই। কেবলমাত্র বাৎসরিক বন্যার সময়ে গৃহহীনরা স্কুল বা কলেজ বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং মাসখানেকে সেগুলিকে অব্যবহার্য করে রেখে চলে যায়...''

এখন, যে হৃদয় যে আন্তরিকতা নিমিত্ত, কখনও গান্ধীর নামে কখনও বা রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখিয়া, বিবিধভাবে শ্রদ্ধেয়া লেখিকা আপন দেশবাসীকে সজাগ করিতে প্রবন্ধ ব্যাপিয়া চাহিলেন, যে তাহা ঐ পঙ্‌ক্তি সকলেতে, ইহা বড় দুঃখের, যে অবশ্যই দুর্বল করিল। অথচ এইখানেতে আছে 'উৎসব-ব্যসনের' পদ; এবং পরিলক্ষিত হয় যে উহা হাইফেনেটেড; অথচ আমাদের ভাবনার সহিত উৎসব ব্যসন শব্দ দুইটি হিতোপদেশ হইতে একটি নিশ্চিত পদবন্ধে জড়িত হইয়া আছে; সেই ব্যসন অর্থে আমরা অবশ্য বোধিত হই যাহা তাহা অশুভ অমঙ্গল বিপদ ইত্যাদি, এবং দশবিধ কামজ দোষ আর অষ্টাদশবিধ ক্রোধজ দোষ......। এই সকল অর্থও অভিধানে দৃষ্ট হয়, (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দেখুন) কোন অভিধা এখানে যুক্তিযুক্ত? এবং বন্যাপীড়িতদের স্থান দেওয়া যাহা জাতীয় ধর্মের অঙ্গ বলা যায়, তবে ইহা কেন অন্যায় বিবেচিত হইবে!

ঐখানে, মানে প্রবন্ধতে, যে সকল ইস্কুলের তুলনায়, যথা সেবাগ্রাম শান্তিনিকেতন ইত্যাদি, আর অন্যত্রের গুলিকে অপকৃষ্ট বলিয়া নস্যাতিয়াছেন, তাহা বিচারে নিশ্চিতই দাঁড়াইবার নহে, লেখিকাকেও অনুরোধ করিব তিনিও ভাবিয়া দেখুন, কেন না ঐ ঐ গুলি আবাসিক ইস্কুল, যে এবং উহাদের সহিত তুলনাতে ইঙ্গিতকৃত শিক্ষালয়গুলি সাধারণ ইস্কুল (day school); এই সকল প্রতিষ্ঠানে তাঁহার ভাষাতে 'দুঃসাহসিক' কিছু করিবার স্বপ্নও আসিতে পারে না; এক আবাসিক ইস্কুল সম্পর্কে চলচিত্তচঞ্চরি'তে* আছে শ্রীখণ্ড বলিতেছেন ''... যে-রকম সাবধানতার সঙ্গে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আমরা আধুনিক মেটাসাইকোলজিক্যাল প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অনুসারে সমস্ত শিক্ষা দিয়ে থাকি...'', এরূপ দুঃসাহসিকতার, বঙ্গদেশে, অনেক ঘটনা আছে যে এবং ছোটমুখেও ইহা দর্শাইতে ইচ্ছা হয়, রবীন্দ্রনাথের তুল্য অভিমানী মানুষকেও যুগধারা মান্য করিতে হয়ঃ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এখানে স্মর্তব্য। গান্ধীর কথা আমার জানা নাই! ইঁহাদের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়দের দ্বারা নির্ম্মিত শিক্ষালয়গুলির ইদানীংকার অবস্থা সম্পর্কে লেখিকা খেদোক্তি করিয়াছেন, তখন আর অন্য ব্যক্তি ঐরূপ কল্পনা কিভাবে করিবে! আরও, যে কোন আদর্শই এখন বিলাসিতা হইবে — জাতীয়তা শব্দটি লইয়া অনেক মহান ভাবিয়াছেন যথা 'স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়ভাব স্বতন্ত্রবৃত্তি' ইহা শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন ('ধর্ম ও জাতীয়তা' ৭৬ পৃঃ) এবং উহার ব্যাখ্যা ৭৭ পৃঃতে এই ''...জাতীয়ভাব রাজসিকভাব; যিনি নিজের 'অহং' দেশের 'অহং'এ বিলীন করিতে পারেন, তিনি আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক, যিনি নিজের 'অহং' সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহার দ্বারা দেশের 'অহং' বৰ্দ্ধিত করেন, তিনি জাতীয়ভাবাপন্ন।...'' — কেন না জাতীয়তার সংজ্ঞা আমাদের নির্দেশিত আছেঃ দেশরক্ষা ও সমৃদ্ধি। আর এই বিধেয় আদতে কারিগরী ও ঐ ঐ বোধ হৃদয়ঙ্গম হওয়া নির্ঘাৎ উচিত — লেখিকা এই বুদ্ধিকে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ভাবিবেন না — এখন ঐ ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানর প্রণালী লইয়া অনেকেই বিতণ্ডা করিতেছেন; প্রসঙ্গতঃ এখানেতে শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের কথা আসেঃ ইনি তখন, ১৯৩৬/৩৮, বিদেশ ভ্রমণ হইতে দেশে ফিরিয়া, ডাক্তারী পাঠরত ছাত্রদের সমক্ষে অতীব মনোজ্ঞ এক ভাষণ দিলেন, ইহা ইংরাজীতে, যাহাতে এই ছিল যে, ''...উহারা এ্যালোপ্যাথী বা হোমিওপ্যাথী লইয়া মাথা ঘামায় না, রোগীকে বড় যত্নে অত্যধিক সহানুভূতির সহিত চিকিৎসা করিয়া থাকে...'' এখানে(!) যথা এ্যালোপ্যাথী এবং যে treat a patient with sympathy...'' এখন সহানুভূতি শব্দটি আশ্চর্য্য ঘটাইতে সক্ষম হয়। যে ইহাতে আমাদের গভীর বিশ্বাস আছে; এবং বিশেষত যেহেতু আমাদের ইস্কুলগুলি বেশীরভাগ সাধারণ ডে ইস্কুল, তাই সেইগুলির কর্তব্য, অন্য অভিনবত্ব না পরীক্ষা করিয়া কর্তৃপক্ষ স্থিরীকৃত প্রণালী যাহা তাহাতেই শিক্ষা দেওয়া এবং লেখিকাও নিশ্চয়ই একই পরামর্শ দিবেন।

যে এখন, যে বিদ্যালয়েতে আমি কর্মরত আছি ঐ নামটি প্রবন্ধতে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও — ত্রৈলোক্যবাবুতে আছেঃ এক চপলমতি বালক তদীয় পিতার পরিচিত কোন বয়সী ভদ্রলোকের নাম ধরিয়া ডাকিল, এবং ইহাতে মর্মাহত হওয়ত, বালকের পিতাকে তিনি নালিশ করিলেন, পিতা জানিতে চাহিলেন, বালক তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ডাকিয়াছে কি? তদুত্তরে তিনি কহিলেন, আজ্ঞে না! পিতা বলিলেন, তবে! — বিবিধভাবে ইহা স্বচ্ছ যে উহা 'সাউথ পয়েন্ট স্কুল' ; এখানে বলিবার এই যে, প্রতিষ্ঠানটি সমাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সহিত কি পর্য্যন্ত ধীরতা অবলম্বনে আজ বঙ্গে অন্যতম শিক্ষালয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে, ইহা অন্তত লেখিকা উপলব্ধি করিতে অবশ্যই পারিবেন, এ কারণ

যে তিনিও সাউথ পয়েন্টেই অনেকদিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যেই আমরা গর্ব অনুভব এখনও করিয়া থাকি; এবং আশা করিতাম যে তিনিও এই নূতন ইস্কুলটির দারুণভাবে বঙ্গের মর্য্যাদা রক্ষা সঙ্কল্প বিধায়ে সাধুবাদ করিবেন।

সম্প্রতি কিছু ব্যক্তির এই শিক্ষালয় পীড়ার কারণ হইয়াছে; অথচ আমাদের এখানে কোন বিশৃঙ্খলতা নাই, ছাত্র সংখ্যা অনেক কিন্তু প্রত্যেকের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় বলিয়া — প্রিন্সিপাল এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রতিটি বালক বালিকার নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন — কোন অসংযম তাহাদের মধ্যে আসে না; তাহারা এই স্কুলের ছাত্র সুবাদে গর্ব্ব অনুভব করে ঃ যে এবং একটি নূতন ইস্কুল হিসাবে আমাদের রেকর্ড কখনই আমাদের অহঙ্কার বৃদ্ধি করে নাই কিন্তু ছাপোষা গৃহীরা যদি ইহাতে আনন্দিত হন — লেখিকার কথায় 'উদ্বাহু হয়ে অভিনন্দিত করি'— তাহাতে ধমক দিবার কি থাকিতে পারে? শুধু লেখা ও পড়াতে যে রেকর্ড মার্কস পাইয়াছে এমত নহে, আঁকা খেলা ইত্যাদিতেও যথেষ্ট সুনাম আছে; এবং যাঁহারা পড়ান তাঁহারা, অতীব সচেতন, যে লাইব্রেরী আছে তাহার সাহায্যে এবং আপন হাত-যশ সহকারে আপন কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করেন, ফলে স্বভাবতই মনে হয় আমাদের খুঁৎ কোথায় যে এবং এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ '৮০ বেতার বার্তায় দেবপ্রসন্ন বসু মহাশয়, ইনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, বলিয়াছেন ''— আমার খ্যাতি ও কর্মকুশলতাই আমার পরম শত্রু...''

''স্থানীয় সমাজের আশা'' আমাদের দিক দিয়া বলিব, আজ প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল, আমাদের ইস্কুল হইবার পর, পার্শ্ববর্তী একটি বস্তিনিবাসী বালক বালিকাদের প্রত্যহ লেখাপড়ায় সাহায্য এবং নৃত্যগীত আবৃত্তি ও ক্রাফট শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; এখনও ইহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্তর্গত; আমাদের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ মহাশয়ের একটি সুষ্ঠ স্কীম আছে যাহাতে সঠিক মর্য্যাদায় ভাগ্যহত বস্তীবাসী ছেলেমেয়েরা, যাহার যেমন অভিরুচি সব কিছু শিখিতে পারিবে; এখানে আপাতত যে ছেলেমেয়েরা আছে, পাছে তাহারা গৃহের অন্য কাজে মানে অর্থকরী, ব্যাপৃত হয় তাই তাহাদের প্রত্যেককে যথকিঞ্চিৎ হাতখরচ দেওয়াও হয়। এবং আমি নিজে উহার ঐ সান্ধ্য স্কুলের সব কিছুই করি। গত বছর মে মাসে প্রখ্যাত কবি জ্যোতি দত্ত আমাদের এই সংস্থায় ছেলেমেয়েদের গীত ইত্যাদি টেপ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী মিডিয়মের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিবার উৎসাহ বোধ করি না, কেন না উহা চলিতেই থাকিবে; শুধু এই প্রশ্নের উচ্চ শিক্ষালাভ যাহারা আশা করে এখন তাহারা কি করিবে? তবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা বিষয়ে যদি না আমরা আত্মবিস্মৃত হই, ইহা মহাসঙ্কোচেই স্বীকার করিতে হইবে, যে ইহা অন্তত বাঙালীদের প্রায় এক ঐতিহ্য হইতে চলিয়াছে ঃ সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন ১৭৭৩-৭৪; এবং এই সময় হইতেই ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার সূচনা হয় — ইতিপূর্বে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব এবং নীলমণি দত্ত, ইনি প্রসিদ্ধ লেখক রমেশবাবুর পূর্বপুরুষ, দুইজন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, রতন ধোপা হইতে আরম্ভ করিয়া রামরাম মিশ্রর নিকট শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, রামমোহনের লেখা এবং রামকমল সেনএর অভিধান প্রমাণ করে যে তাহারা পাকা ইংরাজীনবীশ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ সের Shair[২] ইত্যাদি ইংরাজীতে কাব্যরচনা আমরা দেখি; রামদয়াল ঘোষের বক্তৃতা, রেভ কৃষ্ণমোহনের লেখা সত্যিই মনোজ্ঞ; মধুসূদন ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিতেন এবং রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছেন, '' Fancy I was expected to specify in Bengali.'' এখানে এই 'Fancy' শব্দটি তৎসহ বিস্ময়াদির যতিচিহ্ন খুবই চমকের; আবার ইনি প্রথম যিনি ভাষাকে ভালবাসার কথা বলিলেন, ''... Bengali is a very beautiful language,...such as us owing to early defective education, know little of it, and have learnt to despise, are miserably wrong''। তাঁহার মত বাঙলা ভাষার সৌন্দর্য্য কে আর দেখিবে? শুধু এখানে থামিলে লোকে মন্দ কহিবে, কেশব সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, রমেশ দত্ত, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, তরু দত্ত, বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দ ইঁহাদের এবং অনেকেরই ভাল কাজ ইংরাজীতেই দেখা যায়, এবং ইদানীংকার বিংশ শতাব্দীর অগণন লেখক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। লর্ড মানে ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেনট্যরীয়ন এম এস্ ঘোষ ভাবিলে অবাক লাগে, সম্ভবত ১৯ শতাব্দীতে বাঙালী যত ইংরাজী লিখিয়াছেন, তত বাঙলা বা সংস্কৃত লিখে নাই; তখনকার সকলে ইংরাজী ভাষাকে খুব ভালবাসিত,— প্রকাশ থাক যে বাঙালী সর্বসময় অন্য ভাষা শিখিয়াছে, যেমন সংস্কৃত যেমন ফারসী — তাই যোগেন বসু খেদ করিয়াছেন যে বাঙালী ইংরাজীনবীশ রাখিয়া চ্যসর পড়িবে মুন্সী রাখিয়া বাগ বাহার পড়িবে; ভাল যে বাসিত তাহার কথা প্রভাতবাবুর সেই horns of a dilemmaকে কত ইংরাজী জানে এই তর্ক! ইংরাজী শিক্ষা লইয়া ঠাট্টা তামাশা অনেকই আছে; যেমন 'বাপকে বলে মাই ডিয়ার'! লালবিহারী দে যিনি কোন ইংরাজ গ্রামারিয়ানের ভুল সংশোধন করিয়া দেন, ভাষা চর্চায় এম, এম, রায়চৌধুরীর নাম অক্সফোর্ড কনসাইজ-এর দু'পাতায় ইংরাজ ফাউলার স্বীকার করিয়াছেন। এবং এখানে ইহাও উল্লেখ্য প্রত্যেকেই বাঙলা ভাষাও বড় অভিনিবেশ সহকারে শিখিয়াছেন, যেমন মধুসূদন... I did not wish Ramnarayan to recast my sentences — most assuredly not, I only requested him to correct grammatical blunders. যেমন শ্রীঅরবিন্দ দীনেন্দ্র রায়ের নিকট বাঙলা শিক্ষা করিতেন; এমন আছে যে তিনি 'মামার পীরিতে মামী হাঁকোচ নাকোচ এই পদবন্ধের হাঁকোচ নাকোচ বুঝিতে পারেন নাই; ইহা বাঙলায় আছে। কিন্তু হেমেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট শুনি যে শ্রীঅরবিন্দ ইহা ইংরাজীতে বলিয়াছিলেন, ''...আই ডোন্ট আনডারষ্ট্যাণ্ড হোয়াট ইজ হ্যাকৌচ অ্যাণ্ড ন্যাকৌচ''। এখন বাঙালীর সেই গর্ব গিয়াছে; সম্ভবতঃ ৫৬ বা ৫৭ সালে দেশ সাপ্তাহিকে রাজশেখর বসু একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ''তাহাতে খেদ করেন যে ইংরাজী লেখার মান যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে,'' এক সময় ছিল প্রতি বাঙালীই ঐ বিষয় দারুণ সচেতন ছিলেন, কি লেখাতে কি উচ্চারণ — মেজর হবসের বইতে আছে এক বাঙালী জবরদস্ত ইংরাজীনবীশের উচ্চারণের কথা h উচ্চারণ হইত না। লর্ড সিনহা'র গল্প আমরা স্পোকন ইংলিশ ক্লাসে শুনিতাম কোন এক মোকদ্দমা সূত্রে

লর্ড সিনহা (তখন ব্যারিষ্টার) রংপুর গিয়াছিলেন, মুনসেফের কাছে (?) তাঁহার কেস, আরম্ভ করিলেন, মিলার্ড হিজ ক্লাইয়্যান্ট্ ইজ ক্যাঙসার বাই কসেট! মুনসেফ উত্তর করিলেন ঃ মিঃ সিংহ, ডু ইউ মিন টু সে হিঝ ক্ল্যায়েন্ট ইজ এ কাঁসারী বাই কাষ্ট! এখন উচ্চারণে যাহা দি-কে সর্বত্রই দা চালিত হইয়াছে। বাঙালী অতীব কষ্ট স্বীকার ঐ রাজভাষা শিক্ষা করে এমন আছে আন্দিরাম দাসের ইস্কুলে ছেলেরা অনেক ঘণ্টা চুপচাপ (!) বসিয়া থাকিত কেন না পুস্তক হইতে দু-চারটি কথা তাহারা জানিবার সুযোগ পাইবে, মৈমনসিংহের কালীপ্রসন্ন ঘোষ, আনন্দমোহন, ইহারা পালা করিয়া কয়েক মাইল দূরে যাইতেন এক ডিকসেনারীর সন্ধানে; এখানে ইহা বলিতে ইচ্ছা হয়, শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন আর সকল কিছুকে কুসংস্কার বোধে পরিত্যাগ করে, তখন ইংরাজীভাষাই মানে উহার ব্যাকরণ একমাত্র আমাদের নৈতিক অবশ্য তাহা যেমন গান্ধার শিল্পে স্থানীয় প্রচেষ্টা তেমনই সময়কার ব্যাপার হইয়া থাকিবে কি?

অবশেষে, যে ৫ দফা অভিযোগ দেশবাসীর মনেতে আছে বলিয়াছেন, তদানীন্তন শিক্ষা সম্পর্কে তাহার সততা আমাদের ভাবিয়া দেখিবার; কেন না অদ্য যে স্বাধীনতা, তাহা ঐ শিক্ষা হইতে কল্পিত, বঙ্কিমবাবুর লেখা হইতে আমরা জানি, দেশ বাৎসল্যে রামদয়াল ঘোষ ঈশ্বরগুপ্ত, "they say poor Hurrish of the Patriot is dying." হিন্দুমেলা, বঙ্গভঙ্গ চেতনা, সর্বোপরি 'বন্দেমাতরম' হইতে সুভাষচন্দ্র ঐ শিক্ষা প্রাপ্ত, এই স্বাধীনতা সূত্রেই ঐ সকল মানুষদের দেশের নিরক্ষরদের সহিত যোগ ছিল, এমন কি বিবেকানন্দ যিনি ইংরাজী শিক্ষিত সন্ন্যাসী ইনিও ধর্ম (সনাতন ভাবে) হইতে দেশসেবা লইয়া মাথা ঘামাইতে রহিলেন! (যাহা আমার ন্যায় গোঁড়ার নিকট গর্হিত ব্যাপার!) তখনকার শিক্ষিতরা Impeachment of Warren Hastings বার্ক কৃত ও সেরিডানের 'চৈতসিং' 'মুখস্থ' করিয়াই উদ্বুদ্ধ হইতেছিল। যে এবং সমাজসংস্কার, পরোপকারবোধ, বর্ণবৈষম্যে দোষ-দর্শন ও স্বাভাবিক অস্বাভাবিক বিচার — যদিও বাঙালী 'হুজুগে বাঙ্গাল' আখ্যায়িত অর্থাৎ তর্কে পটু তথাপি আবার বিচারে দড় হইল — সবই ঐখান হইতেই আসিল। আবার যদি ভাবিয়া দেখা যায়, দেশের সংস্কৃতি, অস্বীকারের উপায় নাই, ইংরাজ হইতেই প্রাপ্ত, এমন আছে একদা বিবেকানন্দ (নরেন্দ্র) গীতা পাঠ করিতেছিলেন, তৎ শ্রবণে ঠাকুর মন্তব্য করিলেন,...'কোন সাহেব বলিয়াছে বুঝি...' (লীলা প্রসঙ্গ)। উইলিয়ম জোনস হইতে হ্যাভেল, ইতিমধ্যে আরো বিরাট মানুষরা আছেন যাঁহারা দেশের একদিকের সংস্কৃতি বিষয়ে আমাদের চেতনাকে গভীর করিয়াছেন — এবং আমরা পট কাঁথাকে ঘরে টানাইতেছি!

অনেক কুফল আছে; যেমন শ্রীঅরবিন্দ, মনে করেন ঃ "...অপকৃষ্ট heredityর দোষে, আসুরিক শিক্ষার দোষ অনেক কুলাঙ্গারও জন্মগ্রহণ করিয়াছে।..." এরূপ কথার ব্যাখ্যা আমরা ১৯ শতাব্দীর শেষে প্রকাশিত অনেক উপন্যাসে দেখি; শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'নয়নতারা'তে এক ইংরাজীমন্য পরিবারের কথা আছে ... 'এখন এদের চালচলন এঙ্গলো ভার্নাকিউলার হ'য়ে পড়েছে...' এবং বিখ্যাত লেখিকা স্বর্ণকুমারী কৃত 'কাহাকে' গ্রন্থে কোর্টশিপ, টেনিস ও ইংরাজী গদ্যপদ্য আবৃত্তির কথা আছে। ঐ এঙ্গলো ভার্নাকিউলার ক্রমে যখন ইঙ্গ বঙ্গ সমাজ হইল তাহা আমরা জানি, যেখানে; ও নো, পৃটি কাড, স্যর রবীন্দ্রনাথ, ট্যাংকাও, সিলি আরও প্রচুর কথা যে এবং যাঁহারা হিন্দি নেটিভদের সহিত বলিতেন ঃ এ্যাট হোম, টি পার্টির ছড়াছড়ি ছিল! যেমন স্যর লেডীর গায়ে লোকের গা লাগিত ঃ যে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইহাদের খুবই ঠাট্টা করিয়াছেন! এখন যে সংস্কৃতির পড়তি গলিতেও আসিয়াছে ঃ মেমসাহেব ঝি'কে কহিলেন ঃ '...মা যাও, গিয়া দেখত কে (ভাবিয়াছিলেন স্বীয় কন্যা) কাঁদিতেছে', ঝি দেখিয়া আসিয়া খবর দিল, ও অন্য বাড়ীর খুকী কাঁদিতেছে আমাদের বেবি তো ঘুমাইতেছে! এখানে বলা যায়, আমাদের রকম দেখিয়া শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'অনেক ধন্যবাদ' চলন করিলেন। এই সকলের বিরুদ্ধে 'সংবাদপত্রে, সেকালের কথা'তে অনেক আন্দোলন আছে, কালী সিংহ, ইহাদের যাচ্ছেতাই করিয়াছেন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কেনা সাহেব' লইয়া পরিহাস আছে। প্রতিভাবান ভূদেববাবুও ইহাদের ধিক্কার দিয়াছেন; বহু বিলাত প্রত্যাগত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন কারণ ধর্ম, বাঙালিত্ব বিসর্জন দিতে মধুসূদনের মত তাঁহারা রাজী নহেন, গৌরদাস ঠিকানায় ক্রিশ্চান মধুসূদন লেখেন তাহাতে মধুসূদন আপত্তি করিয়া লেখেন ঃ 'শুধু এম এস দত্ত বা বাবু দিয়া লিখিতে পার (মিঃ নহে)' এবং ৺ দুর্গা প্রতিমা যিনি কখনই ভুলিতে পারেন নাই — "যেয়ো না, রজনী, আজি লয়ে তারাদলে", এমনই আর কত লাইন যে আছে।

এত সত্ত্বেও দেখিব, বাঙালীর গর্ব করিবার মত অনেক কিছুই ঐ শিক্ষাবশত এখনও স্মরণে আছে, যে আরও বলা যায় ঐ শিক্ষাকে — যাহা virtue, honour, glory, character এমন নানান সূক্ষ্মতা নূতন করিয়া জাগ্রত করে — তাহা স্বাধীনতার পর দেখিব অন্তর্হিত হইয়াছে — আমরা কাজে লাগাইতে পারি নাই; তবে আমরা নিরাশ নহি! আমাদের ইস্কুলগত কর্তব্য, ভগবানকে ডাকি, আমরা সততার সহিত যেন পালন করিতে পারি, আমাদের ভুলত্রুটি আমাদের অতি বড় বন্ধুও না ক্ষমা করেন।

প্রথম প্রকাশ : কালি ও কলম, আশ্বিন ১৩৮০, সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

মূল রচনায় প্রদত্ত পাদটীকা - * চলচিত্তচঞ্চরি ঃ সুকুমার রায় কৃত স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত নাটক

সম্পাদকীয় সংযোজন

গৌরী আইয়ুব রচিত, আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৬ জুন ১৯৭৩-এ প্রকাশিত 'জাতীয় বিদ্যালয়' শীর্ষক রচনাটি পাঠ করার অভিঘাতে কমলকুমার এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

১. হওয়ত : 'হওয়া' শব্দের অতি প্রাচীন বর্তমানে অপ্রচলিত রূপ।

২. Shair-'শায়ের' অর্থাৎ মুখে মুখে যিনি সংক্ষিপ্ত পদ্য রচনা করতে পারেন।

বাকপটু চিত্রশিল্পী

সাধারণত চিত্রশিল্পীরা খুবই বাকপটু হইয়া থাকেন। খুব বিনয়ী, খুব বিখ্যাত অঙ্কন পারদর্শীরা তাহাদের আঁকাগুলি, শুধু যে, যে কোন সহৃদয় উৎসাহীদের নিকট দেখানো-র ইচ্ছা রুখিতে পারেন না, এমন নহে; সেই সঙ্গে তাঁহারা তাদের নিজস্ব ছবি আঁকার কায়দার বিশেষত্ব মানে রীতি ও তাহাদের শিল্প সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার কথা না ব্যক্ত করিয়া থাকিতে পারেন না। যাঁহারা কিছুটা চাপা, যাঁহারা স্বল্পভাষী, যাঁহারা ভীরু — তাঁহারা শ্রোতার অভাবে (?) তাঁহারা তাঁহাদের নিরন্তর যাতনার কথা, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা লিখিত রাখিয়া গিয়াছেন। আবার ইহাদের মধ্যে যাহারা অন্য প্রকৃতির, তাঁহারা একাধারে কলম ও জিহ্বা সমানভাবে চালাইয়া গিয়াছেন। ইত্যাকার ধ্যান-ধারণাতে — অবশ্য আমি আজেবাজে শিল্পী যাঁহারা এই ব্যাপারে (শিল্পকর্মে) আকছার, তাঁহাদের কথা বলি না — সত্যই যাহারা নিষ্ঠাবান শিল্পী তাঁহারা যে আপন আপন শিল্পকর্ম বাজার-চল মানসেই, ঐ সকল তত্ত্বে, সরল শিল্প উৎসাহীদের কব্জা করিতে চাহিতেছেন এমন বলা অসঙ্গত।

একথা সত্য যে, যে যে ছবি সব থেকে বেশি গঞ্জনা লাভ করিয়াছে, আবার ঠিক এই ঘটনাও খুব অল্প নহে যে, সেই সেই ছবি অজস্র প্রশংসা সাধুবাদ পাইয়াছে, অনেক ভাবুক ব্যাখ্যার স্থল হইয়াছে ও অনেক চিত্তদাহ অস্বস্তিকর সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছে — যথা — আমি কি সৎ শাশ্বত পথেই আছি? না আমি ক্রমাগত ভুলের দিকে, য়্যারসারজিতের দিকে (আর এক পথিকের মতো) চলিতেছি! — এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন অহরহ শিল্পীর মনে জাগ্রত হইয়াছে — বিশেষত আধুনিক চিত্রশিল্পীর মনে তো বটেই, যাহাকে অলৌকিক নিয়তি এক সম্যক ও সঠিক পরিপাটি শিল্পরীতির গবেষণার দিকে ক্রমান্বয় চালিত করিতেছে। হায়! এক আলেয়ার পিছে দৌড়ান! হয়তো এই প্রশ্নের উত্তরগুলি জনমানসে পরিস্ফুট করিবার জন্যই শিল্পীকে বাকপটু হইতে হয়। আমরা তাহার কিছুটা প্রমাণ পাইব শিল্পীদের এখনকার লেখালেখির মধ্য হইতে।

এই অসংখ্য লেখার বিষয়বস্তু আদতে কি? নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চিত্রশিল্প যে আর সকল শিল্প হইতে অতিমাত্রায় জটিল — যেমন ভিঞ্চির পর হইতে অনেক অনেক শিল্পীরাই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে চিন্তায় আমরা দেখিব, অনেক সরল সাদামাটা, আবার কোথাও কিছুটা যুক্তির দম্ভ কোন কোন শিল্পী-লেখকদের মধ্যে খেলিয়া উঠিয়াছে। একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করিবার নয় যে, সবদিক হইতে ইহার মত এমন আর কোন শিল্প নাই, যাহাকে তাহার সমস্ত অতীব বিপরীত উপাদান সকল দ্বারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের একাধারে মানাইতে ও সন্তুষ্ট করিতে হয়। চিত্রশিল্পীদের বাকপটু হইবার পক্ষে সম্ভবত ইহাও একটি কারণ।

প্রথম প্রকাশ, আজকাল পত্রিকা, ২১ জুন, ১৯৮৭।

সম্পাদকীয় সংযোজন

ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপির অভাবে আমরা 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, হুবহু অনুসরণ করলাম।

অবনীন্দ্রনাথের শেষের কাজ

ছোট্ট একটি পিউরীর ফোঁটা যে কি অসম্ভব সত্য, কি অদ্ভুতভাবেই না সে-ফোঁটা দেখা শোনা জগতের বাস্তবতাকে আঁকড়ে ধরতে পারে, তা অবনীন্দ্রনাথের 'সাঁওতালী মেয়ে' ছবিটি দেখলে বোঝা যায়। ছোট ফোঁটা দিয়ে বিরাট অস্তিত্বকে ধরার রহস্য একমাত্র তাঁরই জানা ছিল। এইরূপে কোথাও ফিরোজা, কখনও লাল, ক্বচিৎ সবুজে পরিদৃশ্যমান সমস্ত কিছুরই মূল কথাটি অবনীন্দ্রনাথ আমাদের চোখের সামনে ধরে দিয়েছেন; রঙ এখানে একাধারে যেমন বাস্তবতাকে আনে, তেমনি সেই সঙ্গেই চিত্রের অন্তর্নিহিত কাব্যকে উল্লেখ করে। এই সূত্রে বলা যায়, বহুদিন পূর্বে প্যারিস শহরে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের ছবির এক প্রদর্শনী হয়; ছবিগুলি দেখে এক সমালোচক মন্তব্য করেন যে, 'স্টুডিও' পত্রিকার অস্পষ্ট ছাপা ছবিগুলির রঙই ভারতীয় চিত্রকরদের একমাত্র প্রেরণা এবং সেই সঙ্গে তিনি উপদেশও যথেষ্ট দিয়েছিলেন। এখানে বলা যেতে পারে যে, ওখানকার লোকেদের তখন জোরদার রঙের উপর ভালবাসা জেগেছিল এবং তাছাড়া সচরাচর তৈল-রঙ-করা বড় বড় ছবি দেখাই তাঁদের অভ্যাস। ফলে হঠাৎ এইরূপ আকারের জলরঙ ছবিকে এলো বলে বোধ হবেই। ছোট আকারের ছবিতে রঙ ব্যবহার করা যে অত্যন্ত কঠিন কাজ, তা অন্তত যাঁরা ছবি আঁকেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য। রঙকে ছোট ছবিতে বহু দিক থেকে বিচার করে আরোপ করতে হয়।

এই প্রদর্শনীর খুব ছোট ছোট ছবি অনেকগুলিই আছে, ধরা যাক, ৫৬নং ছবি 'মনডিকাণ্ট' এটির সম্ভবত মাপ হচ্ছে ৪" x ২"। এইটুকু ছবি যে কি বিরাট হয়ে দেখা দেয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দরবেশের প্রতিকৃতিটি দু-একটি দ্রুত কমলালেবু রঙের টানেই ফুটে উঠেছে। এছাড়া পিছনের ঘোর কৃষ্ণাভ লাল রঙের ব্যবহার চিত্রকরের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এ-ছবিকে কোন লোকই মিনিয়েচর

শ্রেণীভুক্ত করতে সাহস করবেন না, তার কারণ এ-দরবেশের নিশ্বাস এখনও ফুরায়নি — এভাবে ফুটানোর কুশলতা এক এবং মিনিয়েচরের কুশলতা আর এক। ছোট ছবির মধ্যে, ১০ নং 'আননোন্' দুটি আলেখ্য, আকারে ডাকটিকিটের থেকে কিছু বড়, তার মধ্যে একটি, যেটি বাঁ দিকে, সে মুখখানি যেন বা পাথরের, এইরূপই মনে হয়। মুখের ভাব, আঁকার নিজস্ব ধর্ম, সমস্ত কিছু এইটুকুর মধ্যে কি করে যে ফুটিয়ে তোলা যায়, সে কথা যাঁরা বহুদিন ধরে আঁকছেন, তাঁরাও ভেবে ঠিক পাবেন না। মুখের উপরে সাদাটে রঙের বিস্ময়কর আরোপ হাই লাইট হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি, কারণ ভারতীয় চিত্রকররা বহুদিন ধরেই একথা জানেন যে, চিত্রের মধ্যেই আলো আছে — সূর্যকে টেনে আনার আর প্রয়োজন নেই। এই সাদাটে রঙের ব্যবহার মুখখানি শুধু নিপট করার জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে।

মধু সিরিজের ছবিগুলিও ছোট ছোট। ছবিগুলি আঁকার রীতি অদ্ভুত; কখনও মনে হয়, সেই সনাতন পদ্ধতিতে আঁকা, আবার কখনও মনে হয় এক নূতন পন্থার উদ্ভাবন করেছেন। ইতস্তত রঙের ব্যবহার, তুলির টানের ফের সত্যই বিস্ময়কর। রীতিই এখানে সব কথা নয়, সব কথা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন কাব্য প্রকাশ। ঠিক ঠিক রঙের ছোঁয়ায় এক অজানিত দূরত্ব ছবিতে ছবিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমরা সাধারণত জানি যে, যথার্থ সৌন্দর্যবোধ তথা কাব্যবোধ মাটি, কাঠ, পাথর, কাগজের দৃঢ়তা ভেদ করে আসতে গিয়ে অন্য রূপ পরিগ্রহ করে, কিন্তু মধু সিরিজের ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, কাগজের দৃঢ়তা কতগুলি সুসংযত টানে ভেঙে গেছে, সম্যক কাব্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ যে কত মিডিয়ামে, কত পদ্ধতিতে তাঁর কাব্য উপলব্ধিকে রূপ দিয়েছেন, তার পরিচয় এ-প্রদর্শনীতে পাওয়া যায়। একথা সত্য যে, তাঁর সারা জীবন কেটেছে শুধু পরীক্ষায়, শুধু সন্ধানে। যে কাব্য তিনি তিলে তিলে অনুভব করেছিলেন, তাকে কি উপায়ে, যথার্থভাবে রূপ দেওয়া যায়, সে চিন্তা তাঁকে সমস্ত সময় জাগিয়ে রেখেছিল। কখনও জলরঙ, কখনও অয়েল, — কত দিশী পন্থা তো আছেই, তাছাড়া তুলি রঙের ব্যবহার, পূর্বদেশীয় রীতি, রকমারি কায়দা তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। একদা মনে পড়ে, খদ্দরের পাঞ্জাবি আঁকতে গিয়ে খানিকটা খদ্দরের ছাপ দিয়ে দিলেন, এ-কথায় কোন সূত্রেই মনে করবার যো নেই যে, হোকুসাই তাঁর প্রেরণা। এখানে যে সকল ছবি আছে, তাতে কাগজের ব্যবহার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মাটি, কাঠ, পাথর ইত্যাদির গুণে যেমন রূপভেদ হয়ে থাকে, তেমনি কাগজও যে চিত্রশিল্পে নিজস্ব গুণ দিয়ে রূপভেদ করতে পারে, সেকথা সত্যই আশ্চর্যের। বহুদিন যাবৎ কাগজের সাদাকে শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার কতকগুলি নিজস্ব স্বভাব আছে, তার এরূপভাবে ব্যবহার কদাচিৎ দেখা যায়, অবশ্য পূর্বদেশে কিছু কিছু এ বিষয়ে কাজ হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ কাগজকে অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করেছেন। যথা 'উপানন্দ' ২৫নং, এটি পেস্ট বোর্ডে আঁকা (লেখা আছে উড)। কতক জ্যামিতিক টান, কিছুটা ফিরোজা — তারপর চোখে পড়ে পেস্ট বোর্ডের গা'কে তুলির ধরন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ চাতুর্য তাঁর বহু ছবিতেই আছে। যথা ৫৮নং 'ওয়াইন, য়ুওমান এ্যাণ্ড ওয়র'। এই ছবিটি তেলরঙের। এখানে ছবির জমি ছেড়ে জামা হয়েছে এবং ফলে জমির বুটিতে বুটিদার জামা হয়ে গেছে, আবার এই ছবিতেই দেখা যাবে রঙের নিঃসঙ্কোচ ছোট ছোট পোঁচ, কোথাও হাই লাইট এবং এই সমস্ত মিলিয়ে ছবির আদত ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

নেপালী কাগজের উপর কাজ অনেকগুলিই, এ-কাগজের উপর আঁকা 'ধোপার গাধা'। কিঞ্চিৎ খাড়াই জমির দিকে একটি গাধা তার বোঝা নিয়ে চলেছে। এ-ছবিটির ড্রইং, তুলির দুর্ধর্ষ টান, গাধাটিকে ঘিরে লাল আঁচড় — সব কিছুই আমাদের আকৃষ্ট করে। পাকা হাতের পদ্ধতির খেলা এক উচ্চমার্গে পৌঁছেছে এবং সেই সঙ্গে কাব্যরসও আপন পথ পেয়েছে। বহুদিন পূর্বে তাঁর আঁকা 'অন্তিম যাত্রা' ছবির উটকেও মনে পড়ে। সেখানে যে বেদনা ফুটেছিল, এখানেও সেইরূপ বেদনাই পরিস্ফুট হয়েছে। আর একটি বিষয় এই ছবিতে লক্ষ্য করার আছে, সে হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের রসবোধ। গাধার অবস্থা দেখে একটি পাখি, সম্ভবত মুরগি, প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। এই পাখি কালোতেই আঁকা তবু মনে হয় ওটা যেন অন্য আর এক রঙের খোঁচ। এ ছবি এক অপূর্ব রহস্যের সৃষ্টি করেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৬৪নং — সাঁওতালী মেয়েটি লিনেন ফিনিশ কাগজে (কাপড়েও হতে পারে) আঁকা। এ-ছবির কাজ অন্যরূপ, সূক্ষ্ম তুলির কাজ এ-ছবিতে নেই। শুধু রঙ আর মোটা মোটা লাইন — একটু কচি কলাপাতা, ঈষৎ লাল এবং কৃষ্ণ পিঙ্গলে আর মোটা মোটা টানে সাঁওতালী মেয়ে ফুটে উঠেছে। তার সেই অদ্ভুত চোখ, কোল জাতীয় ঠোঁট, গালের ভাঁজ, কোন কিছুই বাদ পড়েনি। এর পরেই চোখে পড়ে ১৪নং 'ফ্লাওয়ার ফেস'। কাগজের গুণ কিভাবে সহায়তা করেছে, রঙকে প্রসঙ্গত টেনে নিলেও, চিত্রের আঙ্গিক কোথাও ব্যাহত হয়নি, রঙ চুপসেছে, একথা মনে হলেও সেইখানেই আমরা থেমে যাই না অথবা অন্য রঙ আমাদের থামতেই দেয় না। গোলাপী রঙ, কিছু পানাসবুজ ক্রমে আমাদের একটি ফুলের সামনে নিয়ে যায়। ৩৬নং 'স্টাডি অফ এ ফেস' ছবিটি নেপালী কাগজে (?) করা বাদামী আর ফ্যাকাশে নীলে একটি দৃঢ় চরিত্রের ছবি। ছবিটির চারিদিকে অনেকটা সাদা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় আলেখ্যটি এত উজ্জ্বল যে, জলরঙের ছবিতে খুব অল্পই চোখে পড়ে।

৫১নং 'ফ্লাওয়ার অফারিঙস' ফিরোজা রঙের ব্যবহার এবং ৬৫নং 'পিকক্' ছবি কচি কলাপাতা ও অল্প বেগুনী ধোয়ানী, তাঁর রঙ ব্যবহারের অসম্ভব দক্ষতার পরিচয় দেয়।

একাডেমি অফ ফাইন আর্টসকে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই, সেই সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে, ছবিগুলিকে ভদ্রভাবে সাজাবার কলাকৌশল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সচেতন হলে দর্শকদের অন্তত অনেক সুবিধা হয়।

....

প্রথম প্রকাশ, দেশ ২২বর্ষ, ১৭তম সংখ্যা, শনিবার, ১৪ ফাল্গুন ১৩৬১, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫।
সম্পাদক - বঙ্কিমচন্দ্র সেন, সহকারী সম্পাদক - সাগরময় ঘোষ।

পাঁচমুড়ার মাটি

যে দেশের মৃত্তিকা রক্তিম, যেখানে যেখানেই মাটিতে কাঁকর, একথা সত্যই যে, সেখানকার কুমোররা তাদের কাজ সম্পর্কে অনেক কিছুই ভাবে। মাটির গুণের কথা তাদের সকল সময়ই মনে থাকে, তারা আলোচনা করে। যখনই একটি পুকুর সংস্কার করা হয় অথবা কোন নূতন কুয়ো খোঁড়া হয় — এ খবর পাবা মাত্রই কুমোররা মাটি দেখতে যায়, সংগ্রহ করে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। ঠিক এইরূপ ছুটোছুটি, আমাদের বিশ্বাস, যেখানকার মাটি ঈষৎ কালো সেখানকার কুমোরদের করতে হয় না। গঙ্গা মহলের কুমোররা, শুধু ভাবে জিনিসপত্রে রঙ ধরাবার কথা, তারা বনক মাটি কেনে, তারা লাল মাটি কেনে। কালো রঙটা সংগ্রহ করে নিকটস্থ খেত খামার থেকে, গ্রামের আশপাশ থেকে। গড়ন-পত্তনের জন্য বড় একটা বেশী ভাবতে হয় না। অথচ যেখানকার মাটি লাল সে দেশের কুমোরদের গড়নপত্তনে টিস্ না ধরে এমন মাটির কথা ভাবতেই হয়।

পাঁচমুড়ার কুমোরদের নাম আর পাঁচটা থানায়, নিজ জেলায় এবং ভিন্‌দেশে যথেষ্ট। এখানকার কুমোররা একাধারে যেমন মাটি খুঁজেছে, রঙমাটির (স্লিপস) জন্য যেমত অস্থির হয়েছে তেমনি সেই সঙ্গে তারা খুঁজেছে নূতন ধরন। তাদের সমস্ত কিছু সৃষ্টির মধ্যে একটি সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি কাজের আঙ্গিক, গড়ন, সাজ এবং প্রিমিটিভ বন্ধন আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে।

পাঁচমুড়া, বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার একটি ছোট গ্রাম। বাস অনেক শালের জঙ্গল পেরিয়ে এসে এই গ্রামের ধারে পৌঁছল। দু'পাশেই তাঁতের ঠক ঠক আওয়াজ, এই ছোট রাস্তা ছাড়িয়ে যেই একটি আড়াআড়ি রাস্তায় পড়লাম, অমনি চোখে পড়লো দু'ধারে দোকান সাজানো। এইটুকু গ্রামে এরূপ দোকান সাজানো থাকবে আমি অন্তত আশা করিনি। কত ঘোড়া, কত হাতী সওয়ার, ঝাড়বারি, রকমারি জিনিস থরে থরে; পাঁচ গ্রামের লোক আসে এটা সেটা নিত্যপ্রয়োজনীয় মানসিকের বস্তুসামগ্রী কিনতে। ফলে এদের সাজিয়েই রাখতে হয়। অবশ্য এতে করে প্রমাণ হয় না যে, এদের জিনিস পাঁচ হাটে যায় না, পাঁচ হাটে তো যায়ই, পাঁচ শহরেও যায়।

পাঁচমুড়ার বিখ্যাত কাজ হচ্ছে তার 'ঝাড়বারি'। এই ঝাড়বারির মূল কল্পনাটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বহু জায়গার মনসার ঘটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, কিন্তু কোথাও ঠিক এইভাবে কল্পনা করা হয়নি। এই ঝাড়বারির সমস্ত কিছুতে সর্বাঙ্গীণ চিত্রের লক্ষণ বিশেষভাবেই পরিস্ফুট। কখনও তা স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে দেখা দেয়; সময়ে তার ভাস্কর্য মহিমা অতি দূর অন্তরীক্ষ থেকে সম্মুখে ভেসে আসে। মধ্যবর্তী প্রতিমার দেবমূর্তির সকল গাম্ভীর্য, তেজ, দীপ্তি শুধুমাত্র আয়ত নয়নের জন্য নয়, তার সংযত ভঙ্গিমার জন্যই অদ্ভুতভাবে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, ঘর কাটা চৌহদ্দিতে আর আর মূর্তিগুলিতেও সেই সৌন্দর্য বর্তমান। সমস্ত ঝাড়বারি ঘিরে সর্পমস্তক, অথবা গোলাপ ফুলকারি জাতীয় ঘের, এক অপূর্ব সাজব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। ঠিক এই কাব্যময় নক্সা সাধারণত লোকশিল্পে দেখা গেলেও আলোছায়ার সত্যের এইরূপ বাস্তব উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। এই বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে সব থেকে সাহায্য করেছে এর রঙ — যা অনেকটা ব্রোঞ্জের মত। ঠিক এরূপ রঙ সাধারণত বাঙলার অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় না, তার অবশ্য প্রথম কারণ হ'ল মাটি (স্লিপস) সে কথা আমরা স্বীকার করি, দ্বিতীয় কারণ হলো পোড়াবার পদ্ধতি।

ঠিক এইরূপ রঙ পাঁচমুড়ার ঘোড়ায়, বিড়ালে, হাতীতে, এই সকল জন্তুগুলি স্থানীয় লোকেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। লোকে মানত করে, ঠাকুর দেবতার থানে দেয়। আমরা কিন্তু এগুলির মধ্যে চমৎকার একটি রূপের সন্ধান পাই। বহুকাল থেকেই আমাদের দেশে অনেক রকমারি হাতী ঘোড়া গড়া হয়েছে। প্রত্যেকটিতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, তারা হাতী ঘোড়া করতে চেয়েছিল, ছোট আয়তনের মধ্যে স্পষ্টরূপে যতটুকু আনা সম্ভব ততটুকুই আনবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যায়, যতটুকু তেজ সবটুকু স্বভাব আছে তা পাঁচমুড়ার কারিগররা এনে ফেলেছে। সব থেকে আনন্দদায়ক হল, এই জন্তুগুলির — যথা ঘোড়া বিড়াল এদের বলিষ্ঠ বুক। একটি জানোয়ারের যা কিছু জোর, তা যেন বা একটি অমোঘ মুঠোর মত সবেগে দর্শকের সামনে এগিয়ে আসছে। তার উপর জয়পোণ্ডার, পাঁচমুড়া থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূর হবে, সেখানকার মাটির গুণে, জিনিসগুলি যেন ধাতুময় বলে মনে হয়। এক একটি ঘোড়া তিন ফুট চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। এগুলি পোড়ানো যে কি বিচক্ষণতার কাজ তা না দেখলে বুঝা যায় না। অনেক সময় হয়তো এগুলি চিড় খেয়ে যায়, তখন কুমোররা সেই ফাটল গালা দিয়ে সুন্দরভাবে জুড়ে দেয়। আর একটি জিনিস পাঁচমুড়ার বিখ্যাত, তা হচ্ছে ঘোড়-সোয়ার। মানুষটি সত্যই ভারি সুন্দর, কালীঘাটের পটের মুখখানি যেন বসানো, চোখ দুটি মিঠে, চুল কেয়ারি করা।

আমার নিজের ভাল লেগেছে পাঁচমুড়ার ছোট হাতী, এই ছোট বস্তুটির মধ্যে অদ্ভুত স্কাইফীয়ান ঢং বর্তমান। মনে হয় যেন একটা তার দিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জিনিসটা করা। মাটিতে এরূপ কাজ অত্যন্ত বিরল। এই হাতীটি তথা প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যেই আদিম রহস্য ছড়িয়ে আছে। তার ভৌগোলিক কারণও যথেষ্ট আছে। এই রহস্যকে ঠিকভাবে বাঁচিয়ে রাখা সত্যই অত্যন্ত বিস্ময়কর। যে কোন জিনিসের অনুশীলন ক্রমে পটুত্বের দিকে অথবা সামঞ্জস্যের দিকে হাতকে নিয়ে যায়ই, সুতরাং একথা আমরা কিছুতেই বলতে পারবো না যে, তাদের

হাত ততটা পটু নয়। তবু অনুশীলনের কঠিন শৃঙ্খলতাকে ছাপিয়ে কিভাবে যে সেই আদিম রহস্য সমস্ত কাজের মজ্জায় থেকে সঠিক রসে রূপে দেখা দিল তা আমরা বুঝতে পারলেও বর্ণনা করতে পারি না। একথা খুব ঠিক নয় যে, এখানে সবই প্রায় আদিবাসী থাকে। তবে একথা সত্য, এখানে শালবন আছে, এখানকার রাস্তা লাল।

তাই বহু পুরাতন যক্ষিণীর শ্রীছাঁদটি ঝাড়বারির মধ্যবর্তিনী মূর্তির নামে আজও দেখা দেয়, তার অঙ্গ ভঙ্গে যথাযথ লীলার ব্যঞ্জনাও রয়েছে আমরা দেখতে পাই।

প্রথম প্রকাশ, দেশ ২২বর্ষ, ৪৩তম সংখ্যা, শনিবার, ১০ ভাদ্র ১৩৬২, ২৭ অগস্ট ১৯৫৫।
সম্পাদক - বঙ্কিমচন্দ্র সেন, সহকারী সম্পাদক - সাগরময় ঘোষ।

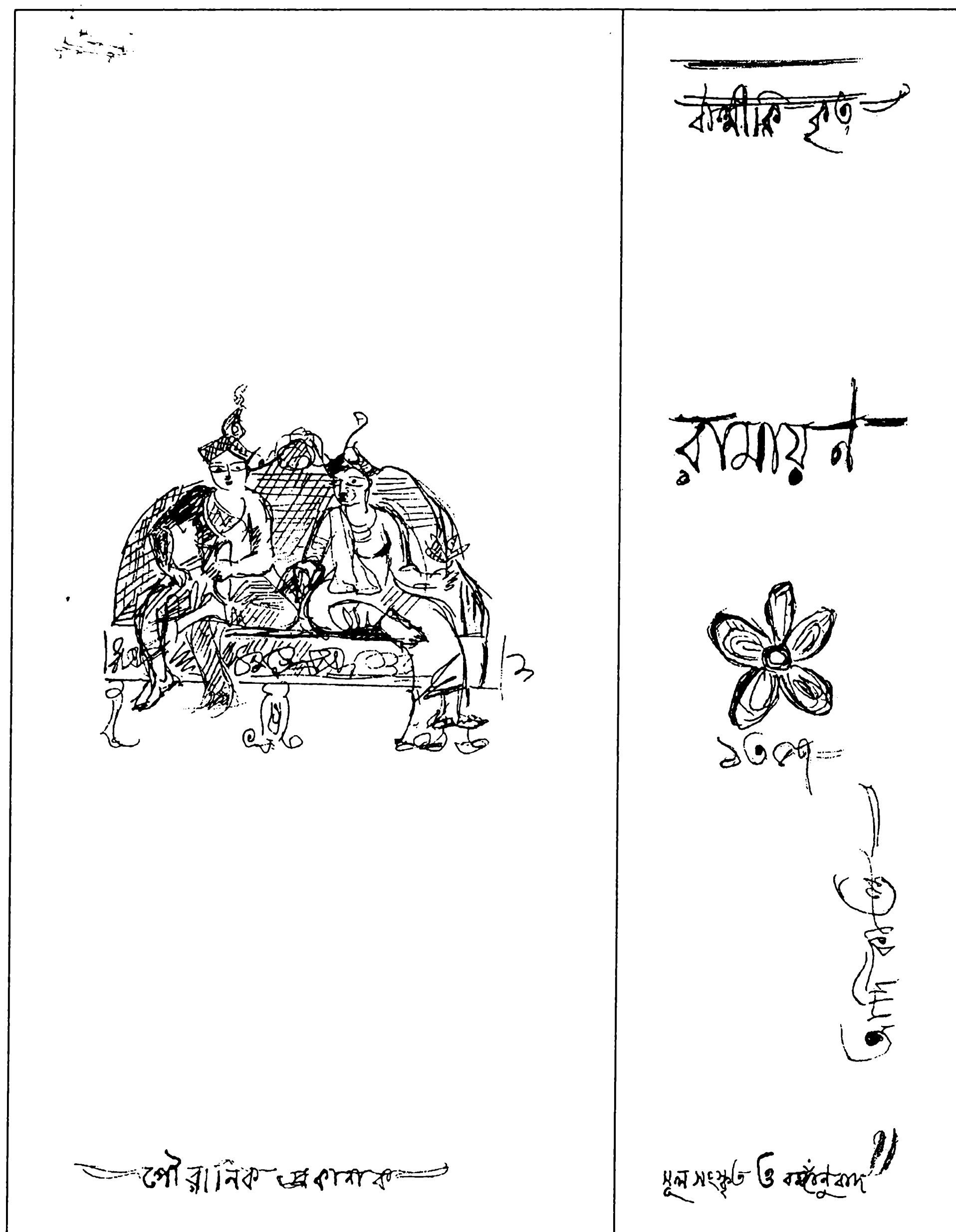

কমলকুমার অঙ্কিত প্রস্তাবিত রামায়ণ গ্রন্থ-এর প্রচ্ছদ-এর খসড়া

পটকথা

ধান ক্ষেত। হলুদ তটস্থ করেছে আর সকল কিছুকে; এমন যে আকাশের নীল এবং মানুষের চোখ। অনেক ইতস্ততঃ তামাটে বুদ্বুদ ফুট কাটে, কেটে উঠে কর্মব্যস্ত। ওরা যারা মাঠে কাজ করে তারা জনমনিষ বটে।

এ-সময় পৌষ মাস। রোদ শুধুই মানুষের পিঠে চড়ে থাকে। এরা ধানের গোছা কব্জা করে ধান কাটে; ইতিমধ্যে কভু বা খুশী সম্ভব হাস্যের কথাও ভাবতে সাহস করে। এতদিন ছিল চৌক চৌক সবুজ আর নীল, এখন রঙের বিস্তর ফের। এই লোকটির ঠেঁটি পরনে, কোমরের কষি যুতসই করে এঁটে হুঁকো ধরে দুটি সাবসই টান দিয়ে আড়চোখ হেনে বললে, ''তোম্মাদের দেঃশে কি'গো বোক্‌খনায় হাল চযে নাকি গো।'' এ রসিকতায় সহবত ছিল না, ছিল খুনখারাপী রগড়।

এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই তুফানের একটি নখর ডাগর ঢেউ চকিতেই দাঁড়িয়ে উঠল। তার পিছনে অগণন হলুদ বাঁকা রেখা কাস্তে। সে কাস্তে দিয়ে অতি সন্তর্পণে আপনকার কূর্মপৃষ্ঠ কপালটি চুলকায়। তাগড়া যৌবনে দেহ হিলমিল, গাত্রবাস উস্‌খুস্‌। এক‌ক্ষেপে অনেক দেহ দেখবার জন্য বড় বড় দুটি চোখ; এখন একটি চোখ ছোট হয়েছিল, মুখের একপাশ কুঞ্চিত হয়েছিল, ঠোঁট অল্প ফাঁক করে সে বললে, 'কেনে গো, কি বল্লিস গো? বিটিছানা ভালমত দেখিস নাই বুঝি বা — মরদ বলি মানে লাগে নাকি গো, হিঃ গো মরদ পরাণ, হাই গ।'

আল্লাদীর মুখে উল্লিখিত উল্কী, সেগুলি এখন স্থির। তার পিছনেই ধানের শিষের যে কয়েকটি এখনও সটান তারই পাশ দিয়ে এখুনি কে গেয়ে উঠল—

পীরিতি আমার কাঁটা নটে
ঘাটে আঘাটায় জন্মায়
পায় পায় লুটায় পড়িতে গিয়ে গো
পদে পদে কাঁটা দেয়।

গীতের পদ বড্ড ডাল ভাত, পাখিতেও বড্ড বুঝে। জোয়ারের মেয়েছেলে কোন কথা! আল্লাদী মুখ সেই দিকে ফিরায়নি, সম্মুখেই ঠেঁটি পরনে, সে আপনার হস্তধৃত কাস্তের দিকে চাইল তার ক্ষুরধার দাঁতে মোটা আঙুল দিয়ে অযথা চাপ দিলে, অল্প বেদনা। ধানের শিষের পশ্চাতের লোকটি বললে, ''শুনবে নাকি গো দুটি মনের কথা, দেখবে নাকি গো মনের মানুষ?''

আল্লাদী কোনমতে অস্ফুটভাবে 'মন না মরণ' বলেই খুদে ছোট দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরেই তার দিকে চাইলে, তার অনেকটা ঘাড়, পরিষ্কার গালটি, পিছনে যাওয়া চোওয়ালের হাড় আর কপালের খানিক, চোখের ভাঁজ মুখের রেখা দেখা গেল! মুখ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই মাথা থেকে একটি খড়ে কুটো খসে পড়ল। আল্লাদী এখন কথা বলে অথচ ধানের শিষ্ দেখে। যে লোকটি গান গেয়েছিল তাকে আল্লাদী বড় পছন্দ করে না, সে বড় আজে কথা বলে বাজে কথা বলে।

আর যারা কাছাকাছি ছিল তারাও কাছ ঘেঁষে এল, সকলেরই হাতে কাস্তে, আঁচলের খুঁটে কেউ মুখখানি মুছে। লোকটিকে এদের বড় মনে ধরছে। সে বললে, 'শুধাই গো মনের কথা শুনবে না কি গো লাও কথা কও গো, আমন ঠ্যাঙয়াতে এসেছ দুটা মনের কথা শুনে লাও দু মুঠা ধান দিবে গো জন্মজন্মান্তরের পট দেখাব গো'।

ঠেঁটি পরনে যে, সে কথাটি বুঝলে বটে, মুখস্থও বললে ''আমন ঠ্যাঙয়াতে এসে মনের কথা শুনে লাও।''

সবাই উৎসুক পট দেখার তরে, কথা শুনবার লেগে। কিন্তু এরা ধান কোথায় পাবে, তারা তো সকলেই রোজ তারিখের জনমনিষ।

'শুনাবে নাকি গো মনের কথা আজজি' আল্লাদী বলেছিল। এহেন মারহাট্টা মেয়েছেলে পট দেখা কথা শুনার লোভে দুব্বোঘাস।

পট সে তো কল্পনার সূত্র, কথার পর কথা। কথার প্রতি সমবেত সকলের ভালবাসা অস্থির হয়। ঠিক এমত হয়ই মেলাখেলার পুতুল মেলানী দেখলে; এখানে হরিৎ টিয়া-ব্র্যাকেট; ওধারে হঠাৎ পরীব্র্যাকেট, সে পাশে গোঁফওয়ালা মন্দ ব্র্যাকেট মুখটা তার শ্যাওলা সবুজ; এ সকল কিছু দিয়ে চমৎকার দেওয়াল সাজান হয়। এবং এ ছাড়া যে ছুলে আল্লাদী নিজেই ঘরের বাহিরের দেওয়ালে আঙুলে খেলাটি রেখে দিয়েছে, নানান সুচিন্তিত চিত্তির বিচিত্রতায়। এমনই সে ভালবাসা, দেহ মাজায় তোটক ছাঁদের খেল নেই।

এই লোকটি এসেছে এখানে, কয়েকদিন হল। কথার সাফাই শুনিয়ে, গাঁয়ে গ্রামান্তরে আসে যায়। পাঁচথানা দশ নদী পার, বহু নদীর জল সে আঁজলায় পান করেছে, লাল পথ খর পথ ইদানীং পাঁশুটে পথ তা'ও পার হবে। আকাশে বাতাসে মুঠো মুঠো পটল চেরা চোখ, স্মিত হাস্যের রেখা উঁচিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। জনমানুষের চোখে চোখে ঘুরছে সেগুলো। তার কাছে জনমানুষ কথার ফের শিখবে, বলবে। খেরোর কাপড়ের ঝুলি কাঁধে, শরের মত বেতের রেখা। এই বেত জড়িয়ে আছে থান থান অনেক লেখা। মানুষটির মুখে চোখে তাদের কথা, তবু যেন বা চোখে দূরপাল্লার চাহনি। চোখ চেয়ে সে যেন বসেই আছে, কখন সমস্ত বাস্তবতাটা মোটমাট হয়ে আসবে, ক্ষীর হয়ে দাঁড়াবে। বেতে জড়ান অনেক অনেক কথা ভাসানের পট, মান-মাথুর, লৈকবিলেস সীতাহরণ। লোকটি পটিদার, লোকটি পোটো, তাই বুঝি বেদে।

পট সে দেখায়। ডাগর কথার দাপটে মানুষকে বড় সঙ্গীহীন করে দিয়ে থাকে। জনহীন অন্ধকার নদীতটে নিয়ে যায়। যে তার ফেরে পড়ে, পট দেখে কথা শুনে, সেই কপালে হাত দিয়ে ভাবে 'আমি বড় বন্ধুহীন গো'। কোমরে কাপড় আছে বলেই আছি — তাছাড়া দীঘির অন্ধকার।

বেদে পোটো তার আঁখি ঠারে গুণ করেছে, রূপ চিনিয়েছে তাই আলো বড় ভাল লাগে, কথা শিখিয়েছে। তাই বুঝি ঠেঁটি পরনের সুখ এতশত খৈ ফুটে বাকচাতুরীর। যখন আসেনি তখন এরা শুধুই জনমনিষ ছিল, জামবাটি ভরা মুড়িগুড়, পাঁচপো চেলের ভাত, তাতে খুদ মিশিয়েছে কিনা এই ছিল সিধে ভাবনা; ততখানি পরিধি, খড়ধান যেটুকু ভাবিয়েছে ততটুকুই মন নিয়েছে। দড়িতে গিঁট দিয়েছে রোজ তারিখ ঠিক দিতে; সাবধান হয়েছে ইঁদুরে সেটি না ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাই সেটি কোমরে সর্বক্ষণ। বেদে এল, এলেবেলে জন সকলেই লালকে আর নীল বলে না। লীল কে লীল বলে। হলুদের পারে নীল মন আঁচড়ায়। এ কারণে যে সে মনে লিখন দিয়েছে, অনেক রেখা গোট করে লোকে দেখে — ভালবাসে।

পটুয়া বাইরীদাস বেসাইজের কোট তার গায়, ফলে তার গলাটা অযথা সরু লাগছিল, সে যেমন বা একটি আলনা। কাটের কেয়ারি করা থাম থেকে ঝুলান ভাসানের এলো করা পট, আর একটি আলোয় পটের নিম্নভাগ অনেক স্পষ্ট। পটের আর এক পাশে অল্পবয়সী দোলাই পরা ছেলেটি, মাথার চুল তার কাটা, পাক খেয়ে ঘুরে ঘুরে গেছে, এক হাত কোমরে, অধোবদনে অন্য হাতে লণ্ঠন ধরে দাঁড়িয়ে। ভঙ্গী সহকারে বাইরীদাস দাঁড়ায় তখন এ পাশে — উপরে হিম, ধানের ডাঁই, খড় আলো হয়ে আছে। আর অনেক লোক কাছ ঘেঁষে বসে। বাইরীদাসের দু এক পদ প্রাচীন, আর আর সবই তার কল্পনাপ্রসূত।

"এ লব যৌবনে   কিসের কারণে   মড়া লইয়া কোলে   একা ভাস জলে"

কেমন যেন রেখাবের গুণে গান্ধারের স্থিরতায় খাড়া পঞ্চমে উদাস ধৈবত লেগে আবার ভৈরবী গুণ দেখা দেয়। রাগ না জেনেও সে বিলাসখানি ধরছে।

সঘন আকাশী-সুনীল জলরাশি, জল মাছ, এ মান্দাস যাত্রার পট কলার ভেলায় এক অনিন্দ্যসুন্দরী ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডল, আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষুদ্বয়, সুবিন্যস্ত পাতাকাটা কেশদাম, সারা দেহে অঢেল লক্ষ্মীশ্রী। এ মুখ বহু শতাব্দীর, এ মুখে দিদারগঞ্জী যক্ষিণীর আহ্লাদ তৎসহ হেলেনিক অহঙ্কার। সম্মুখেই শায়িত লখিন্দর। সুন্দর গোঁফরেখা, রাখালিয়া কাব্যের হ্লাদিনী শক্তি। বাইরীদাস সকল কিছুকে তার গলার স্বরে সহজ করে এঁকে বুঝিয়ে দেয়; আঁধারের নানা চোখের প্রশ্ন সে অনায়াসেই বুঝে, সে বলে "ওগো কাছে এস দেখে যাও, দূরে গেলেও বটে মনে থাকবে।"

আহ্লাদী কাছে এসে পট দেখছে, এখন লণ্ঠনের লাল আলো তার মুখে। তার চোখ বহু কিছু দেখেছে, এমনকি তপ্ত পাশবিক নিশ্বাস, তাছাড়া তুলসীর মালা। কিন্তু এটাই বা কি, নীল লাল গোলাপী রঙকে আশ্রয় করে রয়েছে, আর ঝটিতি সই করার মত, পাখীর ছোঁ মারার মত, খয়রা মাছের সটকে পড়ার মত, কামারের হাতে তপ্ত লোহার ফুল্কী উড়ার মত কালো রেখার সত্বর তৎপর দৌড়। সে বেহুলাকে সত্যই দেখতে পায় না, বেহুলা সত্যই আঁকা, হেঁসোর মত বাঁকা ভ্রূযুগল শীতল অটল দুটি চক্ষুদ্বয়। আহ্লাদীর মুখে আলো পড়ে, সে মুখ ফিরিয়ে বাইরীদাসকে জিজ্ঞাসা করলে, 'দেখেছো কি গো উয়ারে'।

বাইরীদাস এইদিকে চাইল। লণ্ঠনধারী ছেলেটির ম্লান মুখ আলোতে কঠিন। আহ্লাদী এপাশে, তার মুখের সব কিছুই দেখা যায়, লালচে মুখ পিঙ্গল চুলগুলি ঠাস করি বান্ধা আর চারিপাশে অন্ধকার। চোখ দুটি সরল, সে যেন কিছু দেখতে চায়। বাইরীদাস অবাক হয়ে আছে, থলির তুলি যেন তার হাতে উঠে আসতে চাইল। কখন সে এক ফাঁকে উত্তর দিয়েছিল, "আমি দেখি নাই বটে, তবে আমার তুলি দেখেছে"
"তুলি কি দেখি কারে গো"...

"হি গো সকল কথা সেই বলবে, আমি ত গণেশ"

আহ্লাদী বিমূঢ়ের মত তার দিকে চেয়ে, হাতের নিভে যাওয়া বিড়ি কানে গুঁজে কি যেন সে থৈ পেতে চাইল।

তুলি কথা কয় আর সে শুনতে পায়, এ বড় শ্রদ্ধাভক্তির কথা। নূতন চেলের ভাত পেটে ফুট কাটে, তামাক আর বিড়ির গন্ধ — তবু হিম-বসা খড়ের গন্ধে অনেক সায়েস্তা; তারই মধ্যে বর্তমান থেকেও আহ্লাদী যেমন শুধুমাত্র স্তব্ধতা। আলো আছে, তাই তো আমি, এই যার একমাত্র বুঝা, একমাত্র বিশ্বাস সে যেন কোথায় যায়, যখন সে শুনে 'পীরিত আমার কাঁটা নটে' সঙ্গে সেই পট। বেধড়ক খাড়া হয়ে থাকা গোপিনী, মন্দিরের ইঁটে কাটা চেহারার মত, মাথা ভারী দেহ ছোট, ছুরি চালান রেখা, বড় দুটি চোখ। আবার গানের দৃপ্তস্বর —

"ওগো পিরীতির ব্যাপারী আমি
সাত হাটে পট দেখিয়ে ফিরি
জড়ি জড়া জানি না"

সঙ্গে সঙ্গে আখর চিরে ফুঁড়ে উঠে, "পট আমার ভুল না, কথা আমার বেটে খেও গো রস পাবে।"

বাইরীদাসের বেঢপ কোটে আলো দুলে উঠল। তারপর তার গল্প। জনার্দনপুরের তিনমহলা জমিদারবাড়ির সাত আনির মালিক জয়কেষ্টবাবুর সৎ-মা তাকে মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধু করে নতুন কাপড় দিয়েছিল, দিয়ে বললে — লাও বেদের ছেলে, মথুরার রাজাকে এঁকে দাও, বস্ত্রহরণ আঁকো। গোপিনীদের গোপী ভাব আঁকো, গোপাল তাদের কাপড় নিয়েছেন, কিন্তু গোপীভাবই তাদের অঙ্গের ভূষণ। লজ্জা কি গো; তুমি না পোটো, তা ছাড়া কৃষ্ণ ভিন্ন পুরুষ আছে?

বাইরীদাসের মনে হয়েছিল, সে তো সত্যই পোটো। তারপর জমিদার গিন্নী তার নিজের চোখের দিকে চাইতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, এমন চোখ হবে গোপিনীর। সে চোখ খঞ্জন নয়ন। গল্পের পর আবার গান ''এতেক ঘাট ঘুরলাম গো, কিন্তুক পীরিত আনতে লারলাম তোমার মনে''...

মৃদু আলোয় রঙের কত আখ্যান। রেখার কি মাতৃভাব, কোন কিছুই আঁটকুড় লয়। কত গোপিনী, চমকে কেউ আছে, থমকে কেউ গেছে; হাতের উপরে কারও মুখ ন্যস্ত, কিছু চুলের রেখা, একটি চোখ আর একটা মস্ত চোখ। দেহবাস কার এলো। এছাড়া চাঁদসওদাগর সনকা, কাজলা মালিনীর কিবা টোপর আঁকার ঘটা, মা মনসার কোপে সটান সোজা হয়ে নৌকা উল্টান আর কেয়ারি করে ছিটকে পড়া মানুষগুলোকে আঁকা। আর বেহুলা?

আর বেহুলা।

আকাশ নেই, গঙ্গা নেই, তারা নেই, যুগ নাই, যুগান্তর কোন্ ছার গো, শুধুমাত্র অন্ধকার। ''বেহুলার মত সকল অবলাই এ লব যৌবনে মড়া কোলে করি ভেসে চলেছে গো, এ কারণ নদীতে। তোমাদের বুঝাতে লারলাম কি গো'', বাইরীদাসের সম্মুখস্থ ছোট জনতা যেন বিড়ালের সবুজ চোখ। আবার সে বললে, ''বখনারা বড় দশাসই গো। আমরা মন্দ আমরা মড়া গো, উয়াদের বেজার লেই আমাদের কোলে করি ভাসছে — ভেসে চলেছে।''

বাইরীদাসের পায়ে মনে হয় ঘুঙুর আছে, এ কারণে যে তার ভঙ্গিমা কেমন আঁকাবাঁকা। এবার সে ডান পায়ের গোড়ালিটি বাঁ পায়ের গোড়ালিতে পাসঠোকা দিয়ে থমকে দাঁড়াল, কোটটা তার দুলেই স্থির। এখন অন্ধকারে সে, আলোতে তার হাত দুটি খেলছে। বললে, ''একথা আমার লয় গো, নিজ গোবিন্দপুরের এক তাঁতির বাড়ি পট দেখালাম, গান বললাম — রাত হল। তাঁতশালের চালায় শুয়ে, চান্দের আলোয় দেখি টানা দেওয়া সুতোর উপরে এক ফড়িং লাফাচ্ছে। একতারা বাজছে। ঘুম নাই চোখে। উঠে বিড়ি খাচ্ছি, এমন সময় তাঁতির বউ চাঁদের আলোয় উঠেছে; খুঁটি ধরে মাথা কাত করে দাঁড়িয়ে — সিঁড়ির আর এক ধাপে পা। আমি পট দেখলাম হে। জয় গোবিন্দ বলি যেক্ষুনি পেন্নাম করেছি, অমনি শুনলাম ওই কথা।''

''তাঁতির বউ বললে, 'আমরা তো গো সবাই মড়া কোল করি ভাসছি। যে যার মড়া লিয়ে, বেজার লেই, তাই লয়? তোমায় শুধুই পটুয়া' আমি উত্তর করতে লারলাম, এমন সময় তাঁতির কাশির আওয়াজ। আবার চান্দের আলো'' —

গল্প ছেড়ে বাইরীদাস আবার বললে, ''মেয়েমানুষ বড্ড — বিটিছানা (আল্লাদীর জন্য) বড্ড সোনা গো, মন্দ চিনতে লারলে, অযথাক লাথি/ঝ্যাঁটা করলে'' বাইরীদাস চুপ, আলোয় হাত দুটি কিছু বলতে গিয়ে পাট ভুলে গিয়ে অন্ধকারে সরে গেল। হিমভুখ আকাশ ঊর্ধ্বে রাম-শ্যাম তারার দিকে একবার নজর করে বললে, ''বিটিছানা প্রাণ ভ্রমরা গো, মন্দটা দেহ তাই বটে মড়া''।

এই আখর বেদে পটুয়ার নয়, সহজ মানুষ যাদের ভূত-ভবিষ্যৎ, যারা আলোকলতায় বিশ্বাসী, একথা তাদের। এরা বেদে, এরা চিত্রকর পটিদার। এরা গাইবে —

আমি বাউল নই বৈরিগী নই।
সোনা এনে দুবো শুধু চাইনির মাঝারে।

হাড় তুলসীর মালা ভেক নয়, তুলি আর রঙ এদের বীজমন্ত্র। চাহনির গুণ বাড়ান ভুলভাঙান এদের কাজ। পটুয়া অন্ধকার থেকে ক্রমে আলোয় এসে, ঝুঁকে, এক হুঁকো থেকে কল্কেটি তুলে দুটো টান দিয়ে, আবার এগিয়ে এসে কল্কেটি দেবার সময় ধোঁয়া ছেড়ে দিলে, ধোঁয়ার মধ্যে তার মুখটি কেমন রহস্যময়, সে আস্তে আস্তে বললে, ''সৎ-কাজ কর গো, চাহনি চিন।''

একথা যেন বা দামী চিঠির শেষ ছত্র। কিছু অধীরতা তবু সংযম, আর কিছু দৃঢ়তা। পটটি এখন দুলছে, পার্শ্ববর্তী ছোট ছেলেটির ম্লান মুখ। পটটি কাপড়ে আঁটা পুরাতন হিসাবের পাতার উপরে, কোনটা সাদা কাগজের উপরে ছবি আঁকা, কোনটা আবার খড়ি মাজা, এর উপর নানান খেলা। এর খেলাটি, বাসি রুটির মত শুকনো যাদের পরিবেশ, তাদের গোপনে কিছু উন্মনা করে দেয়।

যেমন আল্লাদী। বহুদূর তার দেশ — সুদূর মানভূমে, ভারী মারাট্টা দেশ মানভূম। সেখানে আগাছাও যেন লাল, কসাই অতীব শীর্ণ জলরেখার স্মৃতিচিহ্ন, কভু-বা বেদম জল। কিছুকাল পূর্বে সে রসে বশে ছিল, অনেক গাছতলায় সে কোমর দুলিয়েছে। যাদের দু-দশ বিঘে আছে, আর যারা মাড়ভাতখেগো ইতর সাধারণ তারাও তার ঘাম মুছিয়ে দিতে চেয়েছে। 'লাচনি গো ইকটুক আবডালে এসো গো' অনেকে

বলেছিল। তুষুগানে 'ল্লাদী' নামও আছে — 'আমার মাথা তুমি কিনে লাও' — জীবনের ফেরে ভরা যৌবনেই আমন কাটতে এসেছে। টাকা-সিকে রোজ। 'মনিষ জনম তো আমগাছ লয় যে, বছর বছর একই ফল হবে — এর নানান ফের। যেমন সে কিছু রোজগার নিয়ে যাবে, তেমনি কিছু দৃষ্টিও নিয়ে যাবে।'

তার ঘরের সুমুখ দিয়ে বাঁশোয়। বলরামপুরের পথ, চড়াই আর উৎরাই। এমন হয়ত হবে, মেঘলা দিনে খোলা ছাতা মাথায় কেউ ভুট্টা বেঁধে গাইতে গাইতে যাবে, 'বন্ধু কে যাবে নদীয়ার পার — আমার আধেক হইবে তার বন্ধু আধেক হবে তার', তারপর উৎরাই, না ছাতা না ভুট্টা, কিছুই দেখা যাবে না। এ দৃশ্যটি তার ভাল লাগবে, কাজ ফেলে সে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই বেদে পটুয়ার পট, বেদে পটুয়ার কথার বালাই নিয়ে সে কোথায় যাবে, কত চড়াই, কত উৎরাই, কত দূরত্ব তারপর আকাশ — সে এসব কথার বালাই নিয়ে কোথায় যাবে, কোথায় সে সহজ হবে?

বেদে পটুয়াকে লোকের বেশী করে জানতে ইচ্ছে হবে, তাকে প্রশ্ন করবে — 'তুমার বউ আছে গো'?

''আছে না বটে, কোঠার দাওয়ায় বসি পা ছড়াইয়ে, চুল বান্ধে, নিপট করি চুল বাঁধে, আর আড়ে চায়। আমি ছাগলের লোম কেটে সিধাই — সে বলবে তুলি বানাইছু কি গো? আমি বলি — হিঁ''—

'তুমি তাকে ইকথা সিকথা বল'?

''হ্যাঁ গো''।

'বুঝে' —

''বুঝে, কিন্তু সুঝে না — বলবে আমার পট লিখ গো রাধা অঙ্গে লিখ গো। ভাল করি রঙ গুলে দিব, চাল বেটে দিব।''

পটুয়া যখন লিখবার চায়, তুলির রহস্যে বিরাট বাস্তবতা রঙে রেখায় হাজার লোকের যন্ত্রণা হয়ে উঠে। পটের উষ্ণতা লাখ কাঁধে বোঝা হয়ে ফিরে। মন তখন রাত্রের পবিত্রতা চাইবে ভাল করে দেখা।

বেদে পটুয়া জনমানুষকে শুধু এইটুকু খেদ ধরিয়ে দেবেই।

পটুয়ারা অনেক জিলায় আছে, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুয়েক ঘর বর্ধমানে, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ইত্যাদিতে। অতি দীন এদের জীবন। ইদানীং লোক-শিল্পের ইয়ার অনেক হয়েছে, কারণ আর্ট সাধনায় তারা এদের কাজকে খুব লায়েকবন্দে বোধ করেন। আর্ট সাধনায় এদের রঙ নেই কাগজ নেই, উপায় নেই। কোন নব্য শিক্ষা নেই। অদ্য এদের অনেকের হাত হেলে গেছে, চোখ নেই। একদা এরা কেউ কেউ লোকের ছবি আঁকতে পারতো আজ আর সে ক্ষমতা নেই। এখন যেমন তেমন, অনেক সূত্রে ভূতের ওঝার মত।

তারা এসে দাঁড়ায় বেড়ার ধারে — উঠানের একধারে বেনাগাছ পোঁতা, সেখানে কিছু পাখীর চঞ্চলতা। চিত্রকর হাঁকে, ''খবর শুন গো, দেখ গো সব কথা লিখে লিয়ে এসেছি, দেকখহ্, বুড়া কেমন কোষ্ট পাঞ্চছে গো।''

এ বাড়ির বুড়া কয়েকদিন হল গত হয়েছে। তাই বেনাগাছ পোঁতা, সেখানে খাবার দেয়। ''বুড়া কষ্ট পাচ্ছে, তার জামবাটি আমাকে দাও, সঙ্গে যাবে বুড়া — পান-তামাক পাবে।''

হাতের পটটা সোজা করে ধরে ভিন্ন গ্রামেও আবার বুড়া ঘুরেছে, সেখানে দেখিয়েছে, অনেকদিন পর্যন্ত এই একটিতেই কাজ চলবে। পটে নানান দশা লেখা। এ পট হয়ত তার আঁকাই নয়, অন্যের কাছ থেকে চিত্রকরেরা কিনে এনেছে। বহু পটুয়াই পট কিনে অন্নের সংস্থান করে। যদি না করে, তাহলে হাভাতে হবে। অন্য কর্মের গতর নেই।

এমনও কেউ আছে যারা মাঠে কাজে লাগে। ফলে হাতের খেলাটি মোটা করে ফেলেছে, নোনা লাগিয়েছে।

এইভাবে একভাবে তাদের নিজস্ব ধারাটি হারিয়েছে।

প্রথম প্রকাশ, দেশ ২৪ বর্ষ, ৩৪ তম সংখ্যা, শনিবার, ৭ আষাঢ় ১৩৬৪, ২২ জুন ১৯৫৭।

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. তোটক - ১২ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দবিশেষ, ২. ঠেঁটি - পরিধেয় পাড়হীন অতি ক্ষুদ্র বস্ত্র, ৩. সাবসই টান - সুখটান।

মুখখানির দিকে চাহিয়া আমরা অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠি; যদি কখনও নির্ভয়ে মনের কথা বলিবার সুযোগ লাভ করি তাহা হইলে, ডাগর সাহসে বলিব বেদান্ত এই সৌন্দর্য্যকে বিদ্রূপ করিতে পারে না। কেন না দীর্ঘ আয়ত চক্ষুদ্বয়, কেন না অধরে স্মিতহাস্য রেখা এবং পদ্মপত্রস্থিত জলকণার লাবণ্য এখানে বেপথুমান।

এ মুখ স্মরণে অসংখ্য গীতিকাব্য সৃষ্টি হইয়াছে, অনেকে বিষয় ত্যাগ সন্ন্যাস লইয়াছে, বহুর হৃদয়ে এ মুখখানি গভীরতরে অন্য নাম।

''এ ঘোর যামিনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে'' এই পদ আবৃত্তি করিতে করিতে কতবারই না আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়াছি, অলৌকিক মায়া আমাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে, ছায়া নীল এবং সৌরলোক পড়শী হইয়াছে, আর যে নিশ্বাস সুদীর্ঘ রেখায় রূপান্তরিত।

অথবা ''যেন কান্দিয়া আঁধার গগন (?) চাঁদের স্মরণ লইল আসি'' পদটির মধ্যে যে বর্ণ উচ্ছ্বসিত, যে মাধুর্য্য বিপুল সেই অনুভব লাভ করি। আমরা যেমন বা প্রতীক হইয়া যাই।

ইনি কৃষ্ণপ্রাণাধিক রাধা।

কাংড়া কলমে, রাজস্থানী চিত্রে বহু প্রাচীরগাত্রে ইহার সৌন্দর্য্য আমরা দেখিয়াছি।

ঐতরেয় উপনিষদ যাহাকে ''যদেতবৃদয়ং......সঙ্কল্পঃ......ভবন্তি।।২।।'' সঙ্কল্প বলেন, অর্থাৎ কোন একটি রূপের শুক্লকৃষ্ণাদিভাবে সঙ্কল্প বা সম্যক কল্পনা এই লীলার অধিষ্ঠাত্রী রাধা। উজ্জ্বল নীলমণি যাঁহার অগণিত ভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পদাবলী উদাত্ত কণ্ঠে যাঁহার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে।

রাধিকার প্রতিমা, প্রাচীন বেলে পাথরে, কষ্ঠি পাথরে, উল্লেখ বড় একটা নাই, টেরাকোটাতেই অধিক, (ধাতু নির্মিত যদিও দেখা যায়) বিষ্ণুপুরের রাধা এক আশ্চর্য্য প্রতিমা; দেহ সৌষ্ঠব উচ্ছলিত হইয়া কোন এক শুভ মুহূর্তে রেখায় এবং রেখা প্রমুখাৎ ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাসুদেবের মন্দিরে, গুপ্তিপাড়ায়, রাধাগোবিন্দের মন্দিরে, সোনতোড়ে, কালনায় যদিও এই সকল মন্দিরের টেরাকোটার আকার সোনতোড় ব্যতীত ছোট তবুও এগুলি একই সৌন্দর্য্যের অধিকারী, মুখমণ্ডল অঙ্গাভরণ নিঃসন্দেহে বলা যায় সকল স্থানের একই ধরণের নহে।

প্রায় মন্দিরে, নৌকাবিলাস এবং বস্ত্রহরণের স্মৃতি আমরা দেখিতে পাই। কেন না, কৃষ্ণ রাধার প্রাণভ্রমর হইলেও তিনি গোপীজনবল্লভ। গোপীজনেরা তাঁহাকে অত্যন্ত শুদ্ধভাবে যে গ্রহণ করিয়াছে, সে কথা হিন্দু জনসাধারণকে বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

ফলে প্রায় মন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে, রাশমণ্ডল দেখিতে পাই। সকল সময়ই যে এই রাশমণ্ডল, অবশ্যই মধ্যবর্তী স্থানে থাকে এমত নহে, সোনতোড়ে একান্তে, এবং অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখি, বাসুদেবের মন্দিরে। রাশমণ্ডল পূর্ব দক্ষিণ কোণে নিম্নে গাঁথা।

রাশমণ্ডলের কল্পনা সংযম ও শ্রদ্ধার শেষ বাক্য। মেদিনী অভিধান রাস শব্দে, কোলাহল ধ্বনি, ভাষা, শৃঙ্খল এবং গোপদিগের (গোপানাং) ক্রীড়াবিশেষ বুঝায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে

নটৈগৃহীতকণ্ঠানাং অন্যোন্যস্য করশ্রিয়াম্।
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্।

''পরস্পর হস্তধারণ পূর্বক নটের সহিত সঙ্গীতকালীন মণ্ডলাকারে নর্ত্তকীদিগের নৃত্যই রাস। ''রাস'' বাক্যের ইদানীং কালের অর্থ এইরূপ।

কিন্তু যে ভাগবতের লেখক স্বয়ং ব্যাসদেব; বক্তা আবাল্য ব্রহ্মচারী পরমযোগী শুকদেব, এবং শ্রোতা মৃত্যু প্রতীক্ষারত রাজা পরীক্ষিত। সেখানে ''রাস'' বাক্যের অর্থ আর এক, যোগ ব্যতীত সে-অর্থ উপলব্ধি করা যায় না।

কেন না, ''রাস'' আদিরসাত্মক ক্রীড়া নহে, উহা বৈরাগ্যজননী ক্রীড়া।

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতি-
ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্ব্বৃত।।
উপগীয়মান উদ্গায়নবনিতাশতযূথপঃ
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডুয়নবনম্।। ৪২

ভাবার্থ। সেই সমুদয় গোপীগণ দ্বারা কৃষ্ণ মিলিত নক্ষত্রমালাপরিশোভিত চন্দ্রের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছিলেন। গোপীগণ তাঁহার দর্শনে প্রসন্নবদনা, এবং ভগবান হাস্য দ্বারা কুন্দকুসুমসদৃশ শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন। সেই রক্ষকশূন্য ভীষণতাময় অরণ্যে গোপীদিগের সর্ব প্রকারে রক্ষক হইয়া উপগায়নরীতিতে কৃষ্ণনাম গান করিয়াছিলেন এবং সেই গোপীপ্রদত্ত নানা পুষ্পরচিত মালা ধারণ করিয়াছিলেন। অথবা সংসারকে যে গোপী সমূহ জয় করিয়াছে, সেই বেষ্টনাকারে মালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ গোপীমালাকে ধারণ করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ ভক্তত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন) শ্রী কৃষ্ণনাথ ন্যায়রত্ন; 'রাস পঞ্চাধ্যায়'।

রাসমণ্ডল, জীবনচক্রের অন্যতম ভাবনা ব্যতীত অন্য নহে, কোথাও ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও অরুণাভ; ইহা যে শুধুমাত্র বৈষ্ণব মন্দিরেই দেখা যায় তাহা নহে, শাক্ত শৈব মন্দিরের সম্মুখেও বর্তমান।

জয়দেব বলিয়াছেন, ''যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ যদি ললিত কলাপ কৌতূহলম, শৃলুতদা জয়দেব সরস্বতীম।'' তবু বাসুদেব অথবা গুপ্তপাড়ার মন্দিরে দুইপার্শ্বের সুদীর্ঘ ছক কাটা প্রাচীর গাত্র আমাদের মনহরণ করে। কোথাও আলিঙ্গনবদ্ধ, কোথাও কৃষ্ণ কোলে রাধা, কোথাও মুরলীধর। এ দর্শনে শ্রীহরিকে স্মরণ-মনন-দর্শন হয়।

প্রত্যেকটি আলেখ্য দিব্য, কাজের মধ্যে গাম্ভীর্য্য এবং নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা আছে এগুলি ছাঁচে করা। ছাঁচে অবশ্য মাটির কাজ করাই নিয়ম, কারণ ভিজা মাটিতে করার পর টেরাকোটা পুড়াইতে হয়, ফলে তাপের উপর সমস্ত কাজটি নির্ভর করে।

কিন্তু আমরা যদি যত্ন সহকারে এ-সকল টেরাকোটাগুলি দেখি, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিব যে ছাঁচ করার পরও শিল্পী অনেক কাজ করিয়াছেন যাহা ছাঁচে অসম্ভব।

যুগল-মিলন, অথবা অন্যান্য কৃষ্ণলীলার কথা, যথা বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাস, অনেক মন্দিরেই আছে। বিষ্ণুপুরের নৌকাবিলাস রেখা ছন্দের এক অপূর্ব স্বরগ্রামের সৃষ্টি করিয়াছে, নিম্নে উত্তাল তরঙ্গ—তাহার উপরে অসহায় নৌকা, নৌকায় ভীত আর্ত শঙ্কিত গোপীযাত্রী বৃন্দ, সেখানে গোপীজনবল্লভ এইরূপ কল্পনা আমরা বাসুদেবের প্রাচীর গাত্রে দেখি, টেরাকোটার আয়তন ছোট, কিন্তু একই উদ্বেলতা একই বৈচিত্র্যে অনুপ্রাণিত।

''বস্ত্রহরণে'' সোনতোড়ের কাজটি আয়তনে বেশ বড়, কালনার শিব মন্দিরের অনেক পরের এবং আয়তনে বেশ ছোট, ফলে গাছটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, মধ্যে 'কৃষ্ণ' নিম্নে জলরেখার ধাঁধার মধ্যে নগ্ন, সুন্দর, বিপুল দেহভার নিপীড়িত গোপীবৃন্দ। যে দেহ মর জগতের পুরুষমানুষের চিরবিস্ময়, যে দেহের জন্য দেবগণ উন্মাদ, ঋষিকুল ভ্রষ্ট, জনসাধারণ বিকল সে দেহের প্রতিবিম্ব এইখানে উল্লেখিত হইয়াছে।

''তারাপীঠ'' ব্যতীত কৃষ্ণ রাধা প্রতিমার প্রায় সর্বত্রেই একই ধরণের, আভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ; রাধার ভাব অসম্ভব বঙ্কিম। তারাপীঠের কৃষ্ণ, রাধা গোপিনীরা সকলেই বিস্ময়কর ভাবে দীর্ঘ। দেখিলে মনে হয় ইদানীং কালের পাশ্চাত্য প্রভাবিত কাজ। মুখমণ্ডল, সুদীর্ঘ পদদ্বয়, রাধা গোপীবৃন্দের অঙ্গাভরণ সমস্তই এক নতুন ভাবে পরিকল্পিত।

এখানে, তারাপীঠে, অন্যান্য টেরাকোটা ইটের বিষয়বস্তু অভিনব, এবং যে মৃত্তিকাদ্বারা এই সকল ইট নির্মিত তাহা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রত্যেকটি ইটের রঙ কালচে লাল, অনেক জায়গার ইট পাথর বলিয়া ভ্রম হয়। বিষয়ের মধ্যে একটি ''পাঁঠাবলীর'' দৃশ্য আছে, ইলচোরার দাসেদের মন্দিরের একটি পাঁঠাবলীর দৃশ্য (এখন জীর্ণ) আমরা দেখিয়াছি।

দেবীপুর লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের কৃষ্ণের বা রাধার দেহসৌষ্ঠব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে সমস্ত রূপই 'নিটোল'। যদিও এ-মন্দির খুব পুরাতন নহে (দেবীপুরের নিকটে নিশিরা গড়, এখানে শিব মন্দিরের কাজের ধারা আর এক) তথাপি প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে রস মাধুর্য্য পরিপ্লুত। যদিও প্রত্যেকটি ইটের স্থানে কোন ছাড় নাই, তবু কোনক্রমেই মনে হয় না যে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এখানে নৃত্যরত সখীদের দেখিলে সেকথা প্রমাণ হইবে।

রামায়ণ মহাভারতের কথাও বহু বিখ্যাত মন্দিরে বর্তমান। পৌরাণিক বিষয় ছাড়া, অনেক বিষয়ই মন্দির গাত্রে স্থান লাভ করিয়াছে। যথা, মুঘোল দৃশ্যাবলী, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও শিকার, কোথাও শোভাযাত্রা। দৈনন্দিন ঘটনা — প্রসাধন, চরকাকাটা, তকলীকাটা, ঘরের কাজ, মোচে তা দেওয়া, আড্ডা, ক্রীড়া, পালোয়ান, বাঘের সহিত লড়াই। পাশ্চাত্য জীবন, ফিরিঙ্গীর বাঈনাচ দর্শন, ফিরিঙ্গী বনিকের জাহাজ, ফিরিঙ্গী কর্তৃক নারী ধর্ষণ, ফিরিঙ্গী প্রণয়, কামান দাগা (এ বিষয় — টেরাকোটায় ফিরিঙ্গী জীবন — ছোট ডকুমেন্টারী আছে)। শুধু টেরাকোটাতেই নহে, অন্যান্য জায়গায় যথা বালুচর সাড়ী, কাঁথা, পট ইত্যাদিতে আমরা ফিরিঙ্গীদের কথা দেখিতে পাই।

রামায়ণ কথা, বর্গভীমা, বিষ্ণুপুরে রামচন্দ্রের মন্দিরে চার বাঙলায় উল্লেখযোগ্য, বর্গভীমার মুখের আদল ও বিষ্ণুপুরের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে, চার বাঙলার কাজ আর ধরণের; এখানে রাম, লক্ষ্মণ ছোট ইঁটের মধ্যে বন্দি নহে এগুলি বিরাট আকারের টেরাকোটা; (অবশ্য বিরাট আকারের টেরাকোটা মূর্তি আমরা গোপীবল্লভপুরে দেখিতে পাই, এগুলি দ্বারপাল) বিষ্ণুপুরের রামায়ণ পালা আর একভাবে

লিখিত, একটি ইটে আছে রাবণের মাথাগুলি মাটিতে, পা শূন্যে, সম্মুখে হনুমান। জনসাধারণ যেভাবে নাটকের পরিণতি, দুর্বৃত্তের পরাজয় দেখিতে চাহে, ঠিক সেইভাবে লিখিত। ফলে বিষয়বস্তুর নাটকীয়তার সহিত আর একের মনোভাব মিশ্রিত হইয়াছে।

মহাভারতের কথা তারাপীঠে, ইত্যাদিতে আছে। কিন্তু যেখানেই মহাভারতের কথা আছে, সেখানেই বিশেষ করিয়া ভীষ্মের শরশয্যা উৎকীর্ণ হইয়াছে, আটপুরের ছোট ইটের শরশয্যা আমাদের ভাল লাগে।

ষড়ভুজা, দশভুজা দুর্গা বহু মন্দিরগাত্রে দৃশ্যমান। ইলচোবায়, মধ্যস্থিত শিখরগাত্রে, সুন্দর একটি দেবীপ্রতিমা আছে, গুপ্তীপাড়ায় বাসুদেব মন্দিরে সুকুরিয়াতে সুন্দর দুর্গা প্রতিমা দেখা যায়। চার বাঙলায়, একটি মন্দিরে রণরঙ্গিণ মূর্তিতে বিভূষিত। দেবীর সংহার ভাব এমন রূপায়িত হইয়াছে যাহা দেখিলে মনে হয় সমস্ত প্রাচীর যে মত বা কম্পমান, রণনিনাদ ঝঙ্কৃত। খড়্গ্ হস্তে দেবী অসুর নিধনে ব্যগ্র।

মনে হয় বিরাট এক ভাস্কর্য্যের ছোট একটি ছবি দেখিতেছি।

মুঘোলদের জাঁকজমকের এখানে অনেক কথা আছে। মুখের ভাবে গুম্ফে দাড়িতে অদ্ভুত পার্থিব ভাব, যদিও নাটকীয় ঘটনা ব্যতীত চোখের অভিব্যক্তিতে কোন মনোভাব ছায়াপাত করে নাই। দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিলেই বুঝায় যে এ-ক্ষেত্রে দেহের গতিকে সর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছে। শিকার বা শোভাযাত্রার দৃশ্যকে বাস্তব করিয়া তুলিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, তাই দেখি কোথাও না কোথাও একটি কুকুর আছেই।

ফিরিঙ্গী জীবন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পর নিশ্চয়ই সকল শিল্পীদের বিদেশীদের আচার ব্যবহার, সাজপোষাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যখন বিষয়বস্তুর মধ্যে আর কোন নূতনত্ব দেখা দেয় নাই (অবশ্য চিত্রশিল্পের কথা অন্য) তখন বাঙলার মৃৎশিল্পীদের চোখে ফিরিঙ্গী জীবন একটি নূতন বিষয়বস্তু হিসাবে দেখা দেয়।

ফিরিঙ্গীদের সাজপোষাক দেখিলে মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও আছে, এবং মন্দিরগুলির স্থাপনা অনেক পরে, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতেই হইয়াছে। মাথার টুপী সকল স্থানে এক নয়, নানান রকম টুপী, নানান রকমে চুলের কেয়ারী দেখা যায়। বিবিদের অঙ্গাভরণ প্রাচীন, পায়ে জুতাও আছে।

আটপুরের শিবমন্দির গাত্রে একটি বিবি আলেখ্য আছে। তিনি কেদারায় আসীন, সেই কেদারার নীচে একটি উলঙ্গ শিশু বসিয়া আছে, ইহার অর্থ যে কি তাহা আমরা বুঝিয়া পাই না। প্রথমত, মনে হয়, স্থানটিকে পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ইহার অবতারণা, কিন্তু অন্যপক্ষে মনে হয় রাধাগোবিন্দের মন্দিরে প্রণয়পাশ-আবদ্ধ, সাহেবের কেদারার তলে একটি কুকুর আছে, তেমনই এখানে কেন হইল না। কালনায় ফিরিঙ্গী বাঈ নাচ দর্শন, জোউগ্রামে, উটের সোয়ার এবং ফিরিঙ্গী এবং রমণী, আশুতোষ মিউজিয়মে মদ্যপান দৃশ্য পাদরী আমাদের বিস্মিত করে।

প্রথম প্রকাশ 'উত্তরকাল' পত্রিকায়, আষাঢ় ১৩৭৬। পুনঃপ্রকাশ 'অনন্যা' নামে এক বাংলা ডাইজেস্ট পত্রিকায়।

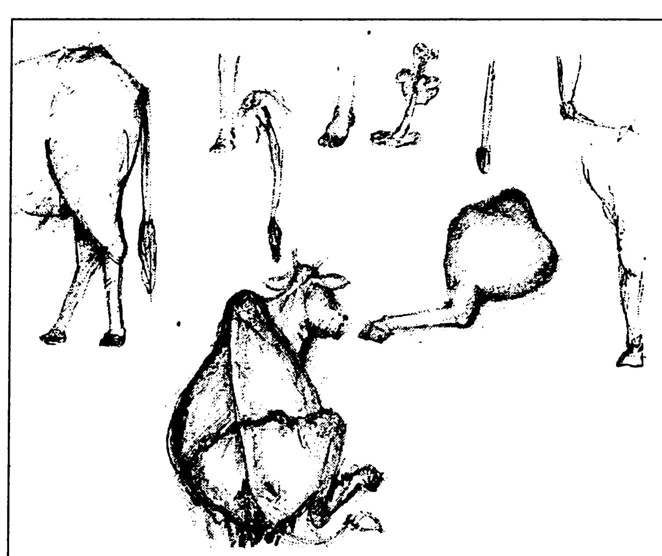

কমলকুমার কৃত রিয়েল লাইফ স্টাডি

তথ্যচিত্রের ধারাভাষ্য

১৯৬১-৬৩ সালে নির্মিত তিনটি তথ্যচিত্রের ধারাভাষ্য রচনা করেছিলেন কমলকুমার মজুমদার। 'লোকশিল্পে টেরাকোটায় রামায়ণ' ('উত্তরাধিকার' পত্রিকায় দিলীপ ঘোষ এই নামটি ব্যবহার করেছেন; আমাদের পাওয়া ফাইলে নাম লেখা ছিল 'Ramayan in Folk art') ৩৫ মি. মি., ৯৭০ ফিট। প্রাপ্ত ধারাভাষ্যের ডানদিকে সময়সীমার উল্লেখ রয়েছে। যদিও তথ্যচিত্রের ধারাভাষ্যের সঙ্গে প্রকাশিত এই ধারাভাষ্যের বিস্তৃতরূপ মিলবে না, তবুও, যেহেতু এই সময়সীমা সম্পর্কে বিশেষ কোনও তথ্য জানা যায় না, তাই পাঠকদের অবগতির জন্য বন্ধনীতে তা উল্লেখ করা হল। 'সংযোজন' অংশ 'রামায়ণ গান' ওই প্রকল্পেরই বিস্তৃত অসম্পূর্ণ-পাঠ। যদিও এর সঙ্গে নিউ এম্পায়ারে অভিনীত (১.১০.৬৭ তারিখে) 'রামায়ণ গাথা'র কোনও যোগ আছে কিনা তা জানা যায়নি।

১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, অক্টোবর ১৯৮০ সংখ্যায়, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় 'বাংলার টেরাকোটা' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, 'কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি' গ্রন্থে কৃত্তিবাসে প্রকাশিত পাঠ, একই নামে গ্রন্থভুক্ত হয়। জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৭, 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায় দিলীপ ঘোষ যে ধারাভাষ্যটি প্রকাশ করেন তার নাম 'বাংলার মন্দিরে টেরাকোটা'। ৩৫ মি.মি., ১১০০ ফিট। আমাদের পাওয়া ফাইলে 'বাংলার টেরাকোটা' লেখা আছে বলে এখানে ওই নামটিই থাকল। এই ধারাভাষ্যে কমলকুমারের প্রথম রচনাকালীন সমস্ত অংশই রইল যা পরে তথ্যচিত্রে বাদ যায়। যেহেতু বর্জিত অংশও অন্তর্ভুক্ত হল এবং সময়সীমাযুক্ত এই তথ্যচিত্রটির অন্যান্য দুটি পাঠ ('কৃত্তিবাস' ও 'উত্তরাধিকার') এখনও পাওয়া যায়, তাই সময়সীমা আমাদের পাওয়া পাণ্ডুলিপিতে থাকলেও, তথ্যচিত্রের এই বিস্তৃত ভাষ্যের সঙ্গে মিলবে না বলে উল্লেখ করা হল না। বিস্তৃত ভাষ্যের বর্জিত অংশ বন্ধনীতে নির্দেশিত হল।

'বাংলার সাধক' ৩৫ মি. মি., ৯৪৫ ফিট। এই ধারাভাষ্যটিরও বর্জিত অংশসহ সম্পূর্ণপাঠ প্রকাশিত হল। যেহেতু এই ধারাভাষ্যটির কোনো পাঠই সুলভ নয়, তাই বর্জিত অংশ বন্ধনীতে দেখিয়ে বাকি অংশটিকে তথ্যচিত্রের প্রয়োজনীয় অংশ ধরে নিয়ে পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত সময়সীমা ডানদিকে উল্লেখ করা হল। আমাদের প্রাপ্ত ফাইলে নাম লেখা রয়েছে 'বাংলার সাধক' (রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা)। তিনটি তথ্যচিত্র-এর — প্রযোজক - লিট্‌ল সিনেমা, অর্থ বিনিয়োগকারী - শান্তি চৌধুরী, ক্যামেরাম্যান - গোপাল সান্যাল, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা - কমলকুমার মজুমদার। ছবি তিনটি পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করেন। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় এই তিনটি তথ্যচিত্রের পরিচালক ও রচনাকার হিসেবে কমলকুমার মজুমদারের নাম, আমাদের পাওয়া ফাইলে তথ্য হিসেবে সমর্থিত হওয়ায়, এটিকেই আমরা মান্য করলাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় তিনটি তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রেই দৈর্ঘ্যের উল্লেখের সময় আমরা 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায় প্রকাশিত এই তথ্যচিত্রগুলির অন্যতম সহকারী দিলীপ ঘোষ উল্লিখিত তথ্যকে প্রামাণ্য হিসেবে ধরেছি।

আমরা এই তিনটি তথ্যচিত্রের বিস্তৃতরূপ যে ফাইলটি থেকে পেয়েছি সেটি বর্তমানে শ্রীপান্থ-এর কাছে রক্ষিত।

অদ্রীশ বিশ্বাস

লোকশিল্পে টেরাকোটায় রামায়ণ

অযোধ্যার রাজা দশরথ একদা মৃগয়া করতে গিয়ে — ভুলক্রমে অন্ধমুনির পুত্রকে মৃগ ভেবে বধ করলেন। মুনিপুত্রকে কোলে নিয়ে রাজা দশরথ এলেন মুনির আশ্রমে। অন্ধমুনি ঘটনা শুনে কালো মেঘের মত হয়েছিলেন, যে মেঘে বজ্র ছিল, বাদলও ছিল। অভিশাপ দিলেন, দশরথ তুমি আমার মত পুত্রশোক পাবে।

নিঃসন্তান রাজা দশরথ যজ্ঞ করবেন। ঋষিরা বললেন, রাজন যজ্ঞীয় তুরঙ্গম মোচন করুন। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নানা দেশ ঘুরে আসতে, যজ্ঞ আরম্ভ হল।

যজ্ঞ অগ্নি থেকে এক দিব্যপুরুষ সমুত্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তে প্রিয় পত্নীর ন্যায় পায়স পাত্র। কহিলেন ঃ 'মহারাজ এই পায়স আপনার অনুরূপ মহিষীদিগকে ভোজনার্থে প্রদান করুন।' দশরথ তাঁর তিন রাণীকে সে পায়স দিলেন। ক্রমে দশরথের চার ছেলে জন্মাল।

(৭০ সেকেণ্ড)

রাম যখন বেশ বড়সড় তখন একদিন বিশ্বামিত্র দশরথের সভায় এসে উপস্থিত। বললেন, 'রামকে আমাদের সঙ্গে দিন রাক্ষস নিধন করতে হবে।' ফলে রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রর সঙ্গে চললেন। যেতে যেতে কৃষ্ণ হিম মেঘ সদৃশ এক সুদীর্ঘ বন পড়ল, যে বন ঝিল্লিরব মুখরিত।

এইখানেই হঠাৎ তাড়কা নামে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসী হাঁ হাঁ করে ছুটেএল। নির্ভীক রাম শরমোচন করলেন, তাড়কা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

(৩০ সেকেণ্ড)

এরপর অহল্যা উদ্ধার এবং তারপর হরধনু ভঙ্গ। হরধনু ভাঙাতে শ্রীরাম জানকীনাথ হলেন। দশরথ যখন রামকে সিংহাসনে বসাবার আয়োজন করছেন তখন মন্থরা কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা দিলে, কৈকেয়ী দশরথের কাছ থেকে তাঁর দুটি প্রাপ্য বর চাইল — একটিতে ভরত রাজা হবে, অন্যটিতে রাম চৌদ্দ বৎসর বনবাস করবে।

রাম পিতৃসত্য পালনে প্রস্তুত। সীতাকে বললেন, তুমি অযোধ্যায় থাক। সীতা উত্তর করলেন, আর্য্যপুত্র — তোমার বাক্য শ্রবণে আমার হাস্য উপস্থিত হইতেছে। ইহকালে-পরকালে সর্ব্বদাই স্বামীই গতি। যদি তুমি এখনই দুর্গম কাননে গমন কর তাহা হইলে আমি কুশকণ্টক সকল মর্দ্দন করত তোমার অগ্রে গমন করিব। আর্য্য, সমুদ্র যেরূপ তীরভূমিকে লঙ্ঘন করে না, আমিও তেমনই আপনাকে কখনই লঙ্ঘন করিব না।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাসী হলেন। রাজা দশরথ এ-ঘটনা সহ্য করতে পারলেন না। হা রাম হা রাম বলে... শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

(১ মিনিট)

ভরত এসময় অযোধ্যায় ছিলেন না। ফিরে এসে এসব কথা শুনে অস্থির। তৎক্ষণাৎ রামের খোঁজে দণ্ডকারণ্যে চিত্রকূট পর্ব্বতের কাছে এলেন।

গিরিবনপ্রিয় রাম সীতাকে ঐ চিত্রকূট দেখিয়ে একদা বলেছিলেন, ভদ্রে এই রমণীয় চিত্রকূট দর্শন করিয়া কি রাজ্যনাশ কি বন্ধুবিরহ কিছুতেই আমার মন — আর কোন অংশে ব্যথিত নহে।

ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে বললেন, আমরা পিতাকে হারিয়েছি, আপনাকেও কি?

দশরথ ইহলোকে নাই শুনে পুরুষোত্তম রাম 'পিতা' বলেই হত-চৈতন্য হলেন। চৈতন্য আসার পর রামচন্দ্র পিতার তর্পণাদি উদকক্রিয়ার নিমিত্ত গমন করিলেন।

রাম জলে দাঁড়িয়ে 'এতদ্‌ভবতু' বলে ছল ছল নেত্রে পিতৃদেবের উদ্দেশ্য জল দান করতে লাগলেন। দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান রাম জলপূর্ণ অঞ্জলি তুলে বলেছিলেন, পিতা আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন অতএব এক্ষণে আপনার উদ্দেশ্যে মদ্দত্ত সুনির্ম্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক। ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে অনেক করে বললেন। কিন্তু রাম দৃঢ়। বললেন, 'অসম্ভব'।

ভরত রামের খড়ম নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। রাম চিত্রকূট ছেড়ে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে এলেন। অগস্ত্যমুনি সীতাকে দেখে খুব খুশী। বলেছিলেন রাম, সীতা কেবলমাত্র স্নেহ প্রণোদিত হইয়াই এই বহুকষ্টপ্রদ বনে আগমন করিয়াছেন — হে রাম সীতার মন যাহাতে তুষ্ট থাকে তাহা করিবে — তোমার অনুগমন করিয়া ইনি — অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন। *(৩৩ সেকেণ্ড)*

হে রঘুনন্দন! সৃষ্টিকাল হইতে নারীর প্রকৃতি এইরূপ যে, সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিতে তাহারা অনুরক্ত হয় এবং দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে তাহারা ত্যাগ করে। মহিলাগণ বিদ্যুতের চঞ্চলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর শীঘ্রতা অনুকরণ করিয়া থাকে কিন্তু তোমার ভার্য্যাতে সে সকল কোন দোষ নাই। ইনি দেবগণ মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায়!

রাম তদুত্তরে বললেন, আমি ধন্য। এরপর তাঁরা পঞ্চবটিতে কুটির নির্ম্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। *(৫০ সেকেণ্ড)*

হঠাৎ একদিন সূর্পনখা নামে এক রাক্ষসী এসে আগে রাম পরে লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চাইল। লক্ষ্মণ রাগে সূর্পনখার নাক কচ করে কেটে দিলেন। রাক্ষসী রাবণের কাছে গেল। পৌলস্ত্য কুলনন্দন রাক্ষসরাজ রাবণকে সব কথা বলে বললে, "সীতা যাকে হর্ষভরে আলিঙ্গন করেন সেই সুখী।"

শুনে রাবণ অস্থির। তৎক্ষণাৎ মারীচকে মায়ামৃগ হতে বললেন। পঞ্চবটিতে মায়ামৃগ বিচরণ করতে লাগল। এ-মৃগ দেখে সীতা বিস্মিত, বললেন, আর্য্যপুত্র ঐ অভিরাম মৃগ আমার মন হরণ করিয়াছে, যদি জীবিত না ধরিতে পার, নিহত কর। নিহত মৃগের স্বর্ণময় চর্ম্ম, কুশাসনে প্রসারিত করিয়া ভগবানের পূজা করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। নাথ!

যদিও স্বামীকে এরূপে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিত্ব — তবু নাথ —

লক্ষ্মণ একবার বলেছিলেন, প্রভু, এ মায়ামৃগ, তথাপি রামচন্দ্র মায়ামৃগ অনুসরণ করিলেন।

অনেক বেলা গেল, রাম পরিশ্রান্ত — এবার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

মায়ামৃগ হা সীতা, হা লক্ষ্মণ বলে ধরাশায়ী হল।

শ্রীরামচন্দ্র হতচকিত স্তব্ধ।

হা সীতা হা লক্ষ্মণ এ আর্ত্তনাদে জনকনন্দিনী অতীব অধৈর্য্য হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন আর্য্যপুত্র রাম সন্ধানে যেতে। লক্ষ্মণ কুটির দ্বারের সামনে একটি গণ্ডি কেটে রাম সন্ধানে গেলেন। ঠিক এ ব্যাপারের কিছু পরেই এক ব্রাহ্মণ পঞ্চবটির এ শান্ত কুটির দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। যার আগমনে লতাগুল্মাদি স্থির, এখানে যেন বা বায়ু নাই। এ-ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চায়। সীতা ভিক্ষা দিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, গণ্ডীর বাহিরে এসে ভিক্ষা না দিলে নেব না। সীতা অতশত না বুঝে গণ্ডী পার হ'য়ে ভিক্ষা দিতে গেলেন, অমনি ব্রাহ্মণবেশী রাবণ তাঁকে ধরে ফেলল। সীতা আত্মরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন, কত কাঁদলেন কিন্তু কোন ফল হল না। *(২ মিনিট ৫ সেকেণ্ড)*

রাবণ সীতাকে যখন নিয়ে যাচ্ছে তখন জটায়ু এসে পথরোধ করে, ঘোর যুদ্ধ বাধল, জটায়ু মরণপণ করে লড়তে লাগল, রাবণ জটায়ুকে পরাস্ত করলে।

এদিকে লক্ষ্মণ খুঁজতে খুঁজতে যখন রামের দেখা পেলেন তখন রাম তাঁকে বললেন, ছি ছি সীতাকে একা রেখে আসা তোমার অনুচিত হয়েছে।

দুজনে কুটিরে ফিরে দেখেন সীতা নেই। রাম চমকে উঠলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জটায়ুর সঙ্গে দেখা, জটায়ু রক্ত বমণ করে বললে, হে রাম, তুমি যাঁকে ঔষধীর মত এই বনে খুঁজছ তাঁকে রাবণ হরণ করেছে। *(৩০ সেকেণ্ড)*

রাম বিমর্ষ, এখন উপায়! ওদিকে অশোকবনে সীতা। রাম লক্ষ্মণ যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন। তখন একদিন ভাগ্যক্রমে মহাবীর হনুমানের সঙ্গে দেখা, হনুমান তাদের সুগ্রীবের কাছে নিয়ে যান। সুগ্রীব তাঁদের অনেক সাহায্য করেছিলেন। যখন জানা গেল, রাবণ সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে গেছেন, তখন কথা উঠল কে সাগর পার হবে? একবাক্যে স্বীকার সবাই করলে — হনুমান।

হনুমান এক লাফ দিলেন।

লঙ্কায় পৌঁছে দেখলেন সীতাকে। অশোকবনে সীতাকে দুঃখ পরম্পরায় পীড়িত হইয়া হিম-নির্য্যাতিত নলিনীর ন্যায় সীতার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। যেন মহতী কীর্ত্তি অবসন্না হইয়াছে, যেন শ্রদ্ধা অপমানিতা হইয়াছে, যেন প্রজ্ঞা-ক্ষীণা, আশা প্রতিহতা, দেবস্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে।

রাবণ এসে সীতাকে বললে, এখন বল আমায় বিবাহ করবে কি না? তার উত্তরে সীতা শুধুমাত্র মুখ ফিরিয়ে কেঁদেছিলেন। হনুমান সীতাকে দর্শন করলেন এবং বললেন, আমরা আসছি।

লঙ্কা থেকে যাবার আগে হনুমান লঙ্কার অনেক কিছু নষ্ট বিধ্বস্ত করেন। ফলে সবাই মিলে হনুমানকে ধরে রাজসভায় আনলে, বিভীষণ বললেন, হনুমান দূত, তাঁকে হত্যা করতে পারো না। তখন ঠিক হল ল্যাজে কাপড় বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হোক। হনুমানের ল্যাজের আগুনে স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছারখার।

হনুমান ফিরে গেলেন।

সাজ সাজ রবে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। সেতুবন্ধন হল।

এবার যুদ্ধ।

ন্যায় আর অন্যায় যুদ্ধ, কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যে তা কল্পনা করা যায় না।

ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলীতে যজ্ঞ করতে বসলেন। শক্তিশেল এল। হায়, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে হতচেতন। হনুমান বিশল্যকরণী আনতে সমস্ত গন্ধমাদন এনে উপস্থিত।

লক্ষ্মণকে বাঁচাতেই হবে।

লক্ষ্মণ আবার তীর-ধনুক ধরলেন। কিন্তু রাবণের সঙ্গে এঁটে উঠা কি সহজ কথা! রাম কোন উপায় না দেখে দুর্গাকে স্মরণ করলেন।

আবার রৌদ্রকর্ম্মা যুদ্ধ।

রাবণ বধ হল। এরপর ভগবান রামচন্দ্রের সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন। রাম রাজা হয়ে লোক সমূহের মনস্কাম পূর্ণ করলেন।

(২ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড)

সম্পাদকীয় সংযোজন

'লোকশিল্পে টেরাকোটায় রামায়ণ'-এর দুটি সম্পূর্ণ অভিন্ন পাঠ আমরা আমাদের ফাইলে পেয়েছি। একটি পাঠে বহু জায়গা লাল ও নীল পেনসিল চিহ্নিত হলেও ঠিক কোন কোন অংশ বর্জিত হয়েছিল তা সুস্পষ্ট নয়। তাই শুধুমাত্র অসম্পাদিত পাঠই প্রকাশ করা হল।

সংযোজন হিসেবে 'রামায়ণ গান'-এর পাঠ প্রকাশিত হল। এর অন্য কোন পাঠ সম্ভবত কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

রামায়ণ গান (সংযোজন)

রাজা দশরথ একদা মৃগয়া করতে গভীর অরণ্যে *পুতুল নাচ*
প্রবেশ করেন।
হরিণের পিছনে দৌড়ে তিনি হয়রান, সহসা *পট*
তার কাণে ভেসে এল, তৃষ্ণার্ত্ত পশুর জল পানের শব্দ...
লোকপাল ইক্ষ্বাকু কুলতিলক দশরথ অস্থির হয়ে *পুতুল নাচ ...*
উঠলেন, অতীব সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে, পাতার
আর লতার আর গাছের ফাঁক দিয়ে কি যেন চোখে পড়ল
নিশ্চয়ই হরিণ নিশ্চয়ই হরিণ।
অন্ধমুনির পুত্র জল ভরছিল *কলসে জল ভরা ...*
জল ভরার পর যখনই সে প্রস্তুত তখনই *পট*
দশরথ শরমোচন করলেন। অসম্ভব এক চীৎকার *পট* *(বেদে)*
ধ্বনি শোনা গেল। দশরথ পরিশ্রম সফলকাম হয়েছে ভেবে
দৌড়ে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তিনি স্তম্ভিত।
মুনিপুত্রর দেহ ধীরে জলে গড়িয়ে পড়ল।
অযোধ্যার রাজা দশরথ মনস্তাপে কালো হয়ে গেলেন,
ধীরে সে দেহ তুলে আশ্রমের দিকে যেতে লাগলেন।
এই সেই অন্ধমুনির আশ্রম, পুত্রের ফেরার পথ
চেয়ে বসেছিলেন। পদশব্দে অদ্ভুত স্নেহস্বর ডাকলেন, —
অন্ধদের গলার স্বরে অসম্ভব কান্নার আওয়াজ থাকে...
উত্তর করলেন রাজা না 'আমি' এবং
আনুপূর্ব্বিক ঘটনা তাঁকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলেছিলেন।
অন্ধমুনির সামনে, কোনদিন আকাশ ছিল না, মাঠের
সবুজতা ছিল না, ছিল একমাত্র পুত্র! স্পর্শের মধ্যে ছিল পুত্র, মুনি আবার নূতন করে *(বেদে)*
অন্ধ হলেন। ফলে রাগে দুঃখে ক্ষোভে তিনি কালো মেঘের
মতন হয়ে উঠলেন, যে মেঘে বজ্র ছিল, বাদলও ছিল।
মুনি অভিশাপ দিলেন। রাজা দশরথ তুমিও
এমন শোক পাবে।
রাজা দশরথ অবনত মস্তকে সেই অভিশাপ মেনে
নিয়েছিলেন।
অযোধ্যা আনন্দপুরী হলেও প্রজাগণ সুখে থাকলেও
রাজা দশরথের মনে সুখ ছিল না।
কেন না রাজার মত সৌভাগ্যবান পুরুষ মর্ত্তে তখন কেউ ছিল না।
বশিষ্ঠ তাঁর গুরু, রাণীরা সকলেই রাজা অন্তপ্রাণ, দেশে
দেশে তার নাম যশ।
রাজার সুখ ছিল না এই জন্য যে তার পুত্র ছিল না।
একদা রাজা মনস্থ করলেন পুত্রকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ *বেদে পট*
করবেন। মন্ত্রিরা সকলেই বলে উঠলেন সাধু সাধু।
ঋষিরা বললেন "কাল বিলম্বে কাজ নেই, যজ্ঞীয় তুরঙ্গম
মোচন করুন, সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি হোক"। *অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব* *বেদে পট*

সুমন্ত্র মহারাজকে ঋষিশৃঙ্গের তপোবলের কথা ব'লে তাঁকেও লোমপাদ রাজার কাছ থেকে আনতে অভিপ্রায় জানাল। *কাঁথা*

এক দিন দেখে রাজা দশরথ তাঁর লোকজনদের বললেন, ''তোমরা আমার গুরুদেবগণের আদেশক্রমে সত্বর যজ্ঞদ্রব্য সকল আহরণ কর, সুনিপুণ পুরুষগণ যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষণে নিযুক্ত হউক, ঋত্বিগবর ঋষিগণ মন্ত্রপূত পূর্ব্বক অশ্বকে উন্মোচন করুন। সরযূর উত্তরভাগে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত কর। *অশ্ব*

অশ্ব দেশ দেশান্তর ঘুরে, পুনরায় অযোধ্যায় ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার সকলেই খুব খুসী হয়ে যজ্ঞের কাজ সুরু করে দিল। এ দেশ সে-দেশ থেকে রাজা এলেন। কত কাঙাল কত হাভাতে কত দরিদ্র এসে অন্নদান গ্রহণ করলে।

ঋষিশৃঙ্গ রাজার অনুরোধে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। দিকে দিকে আকাশে বাতাসে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠল, সুগন্ধ হোমধূম সমস্ত স্থানকে পবিত্র করে তুললে। *বেদে পট*

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর সকলে এসে উপস্থিত। এমন কি, ভগবান কমলাপতি খগেন্দ্রবাহনে সেখানে দেখা দিলেন। ''তাহার অঙ্গদ্যুতি অপরূপ, করে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, পরিধানে পীতবসন। জলদোপরি দিবাকরের যেরূপ শোভা হয়, তিনিও সেইরূপ সুশোভিত দেহে তপ্ত-কাঞ্চন কেয়ূর পরিহিত''— দর্শনমাত্রেই সুরগণ তার স্তবগান মুখরিত।

দিক দিক এ মিনতি এল, ''ভগবান আপনি দশরথের পুত্ররূপে পুনরায় জন্ম নিন।

ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য ভগবান বিষ্ণু রাজি হলেন।

''তদনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত দশরথের যজ্ঞাগ্নি হইতে মহাবীর্য্যশালী রক্তাম্বরধারী/ রক্তকায় দুন্দুভির ন্যায়/ শব্দশালী পুরুষ/ সহসা সমুত্থিত হইলেন। উহার শরীর সিংহসদৃশ রোমশ মুখমণ্ডল......

(অসম্পূর্ণ)

সম্পাদকীয় সংযোজন

'রামায়ণ গান' নামে কমলকুমারের এই রচনাটি দুটি পাতায় লেখা একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি রূপে পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি 'লোকশিল্পে টেরাকোটায় রামায়ণ' ধারাভাষ্যের বিস্তৃতরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই রচনাটির পাণ্ডুলিপি, ঠিক যেভাবে পাওয়া গেছে, মুদ্রিত প্রতিরূপে আমরা তা হুবহু অনুসরণ করেছি। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আগাগোড়া ঋষিশৃঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। বানানরীতি ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত।

বাংলার টেরাকোটা

ভারতে, মাটির কাজ বহু পুরাতন দিন থেকে চলে আসছে। < দূর দূরান্তরের যাদুঘরে, মহেঞ্জোদারো, কুল্লি, অহিছত্র, কোষল ইত্যাদির মাটির কাজের নমুনা আমরা দেখতে পাই। মাটির কাজ যে শুধুমাত্র মাটির কাজই — হাঁড়ি, কলসী এমন কথা নয়। > এগুলি একদার জীবনযাত্রার ইঙ্গিত। দলবদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের প্রহেলিকা মৃন্ময়রূপে প্রকাশিত। ক্রমে মৃত্তিকাবিচার, ক্রমে প্রলেপ বিচার এলো। ফলে একটা স্থিরতা পেলো। এ দক্ষতা অনেক পুরানো। < আমাদের কথা বাংলাদেশ নিয়ে। > বাংলার পলিমাটি ও লালমাটি অঞ্চলে এ দক্ষতার নিদর্শন আজও দেখা যায়।

বাঁকুড়া অঞ্চলে একটি থানে দেবতা প্রীত মানসে[১] ঘোড়াগুলি উৎসর্গ করা হোয়েছে। ঘোড়াগুলি ইদানীংকালে খুব জনপ্রিয় হোয়ে উঠেছে।

বাহুলারা

এইরূপ লোকশিল্পের কিছু দূরেই বাংলার বিরাট পোড়ামাটির মন্দির দণ্ডায়মান — বাহুলারা। < এইরূপ পুরাতন মন্দির ''ইদানীং-বাংলায়'' আর নেই। > এর গঠন ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মতন। < মন্দিরের গঠন চাতুর্য্য বিস্ময়কর। এখানে এখন মাত্র তিনটি নিদর্শন আছে। তাতে > এককালের নিষ্ঠা ও শিল্পদৃষ্টির সাক্ষাৎ পরিচয় দেয়। পার্ব্বতী ভঙ্গিটি অপূর্ব্ব। এ'টুকুর মধ্যে হিন্দু ভাস্কর্য্যের সমগ্র মূল সূত্র, < এত ব্যগ্রতা — > সেই অচিন্ত্যনীয় রূপ কেমন কোরে ধরা পড়ল? ছোট ছোট মূর্ত্তির সরলতা, তার গতি এবং লীলায়িত ভঙ্গিমা আমাদের বিস্মিত করে।

গোপীবল্লভপুর

< পোড়ামাটির কাজ বলতেই আমাদের ধারণা ইটের আকারেই হয়, তা সত্য নয়। বড় বড় আকারের কাজ আমরা অনেক স্থানে দেখতে পাই। > গোপীবল্লভপুরের মন্দির সুবর্ণরেখার তীরে বৈষ্ণবদের পুণ্য তীর্থক্ষেত্র।

মন্দিরের বহু ধরণের কাজ বর্ত্তমান। এগুলি দ্বারপাল, আকারে প্রায় ৪ ফুট। এ কাজের সঙ্গে বহু পুরাতন সুঙ্গরীতির বেশ মিল আছে। তখনকার কাপড় পরার ধরণ, রমনীদেহের সৌষ্ঠবে, নয়নের স্পষ্টতায়[২], মুখমণ্ডলের গাম্ভীর্য্যে, কর্ত্তব্যপরায়ণতায় প্রাচীন ধারণা মুখরিত।

বহু উচ্চে স্থাপিত < প্রায় ছফুট লম্বা > দুটি মূর্ত্তির মধ্যে পোড়ামাটির নিদর্শন হিসাবে এগুলি যেন কথা কয়। অপূর্ব্ব কল্পনা, সরলতা, সুঠাম অবয়ব এবং কি দুঃসাহসিক তার নির্ম্মাণকৌশল। এদের ঋজুভাবের সঙ্গে ঈজিপ্সিয় < সরলতা অথবা জৈন > সরলতার < সঙ্গে > মিল আছে। মন্দিরের তোরণদ্বার — দুই পাশে দুই মাতৃমূর্ত্তি। < অতীব সরল নিখুঁত। > একটি দুর্গা, অন্যটি কালী।

বিষ্ণুপুর

এ রাশমঞ্চের স্থাপত্য আমাদের একাধারে আনন্দিত ও বিমূঢ় করে। মল্লরাজারা অত্যন্ত কৃষ্ণঅন্ত প্রাণ ছিলেন। এখানে এককালে নিয়মিত নামজপ হোত। তার নাম গোপালসিংহের বেগার[৩]।

< এই খিলানের বাহিরে কিছু দূরে জোড়বাংলার কাজের মিল নেই। > ইটগুলি কখনও সঙ্গীতমুখর, কভু নৃত্যরতা। শুধুমাত্র বেণীর সর্পিল রেখাই চঞ্চলতা আনেনি। শুধুমাত্র খোলের বর্ত্তমানতাই মুখরতার ইঙ্গিত নয়। সমস্ত বিষয়ে নাটকীয় গতি উদ্ধত। ভঙ্গিমা স্বাভাবিক। প্যাটার্ণকে < তথা Decorative বহুলতাকে > ছাড়িয়ে < আর একদিকে > চলে গেছে। যেখানে ছায়া আতপ নির্দ্দিষ্ট কোন বশে বাঁধা নয়।

জোড়বাংলার মন্দির

জোড়বাংলার মন্দির ভক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আজও মন্দিরে[৪] সেই < জগজনচিতচোর > গোপীজনবল্লভের মূর্ত্তি আছে। < সম্ভবতঃ > শুধুমাত্র আর্টের উৎকর্ষতার চিহ্নস্বরূপ। এখানে নাটকীয় ভঙ্গিমার কৃষ্ণলীলা বা ভগবান রামচন্দ্রের কথা বোলেই < এখানে > শিল্পীরা ক্ষান্ত হননি। আটপৌরে জীবনযাত্রার কথাও < এখানে > আছে। এ রমণীর দেহ আর এক বিস্ময়। যেন বা কোনও প্রসাধনরতা বাউরী রমণী। ধনুকের মত পিঠ ভেঙ্গে গেছে, < সঙ্গে সঙ্গে > সমস্ত দেহ সৌষ্ঠব সুখশয্যার উষ্ণতায় এক অমোঘ কান্তিলাভ কোরেছে।

< এখানে চির > দুখিনী সীতা — এখানে মহামায়ার প্রতিমার নীচে অসুর। অসুরের একটি হাত ফ্রেমের সীমাকে লঙ্ঘন না কোরে আশ্চর্য্যভাবে উঠে গেছে। কম্পোজিশনকে এতটুকু ব্যাহত করে নি।

বাশুলীর মন্দির

< বড়ু > চণ্ডীদাসের < আরাধ্য দেবী শ্রীশ্রী > বাশুলীর মন্দির। < এখানকার > এ কাজ < আর এক > অন্য রীতির। নির্ম্মাণকৌশল সুচিন্তিত। < প্রত্যেকটি > মূর্ত্তি ফ্রেমের বাইরে চলে এসেছে। বিশেষতঃ এই রমণীমূর্ত্তির মহাস্থানগড়ের সঙ্গে বেশ মিল আছে।

তারাপীঠ

এখানকার কাজে নিজস্ব রীতি বর্ত্তমান[5]। মহাভারতের কথা মন্দিরগাত্রে খুবই কম। সমস্ত ঘটনাটি কত ছাড়াছাড়া ভাবে সাজানো তবু কোথাও এর সামঞ্জস্য হারায়নি[6]। < তারাপীঠে > এ-কৃষ্ণ এক নতুন[7] কল্পনা। এমন লম্বাটে < দেহ > অবয়ব আর কোথাও নেই।

বাংলার দৈনন্দিন জীবনের ছবি অনেক মন্দিরে আছে — এখানেও আছে।

বক্রেশ্বর

বীরভূমের আর একটি পীঠস্থান। এখানে পোড়ামাটির কাজ অনেক কমে এসেছে। < কে জানে কতবার এ মন্দিরের সংস্কার হোয়েছে। > যে ক'খানি আছে, সেগুলি কেশবের < এক এক > রূপধারণের আলেখ্যর দু একটি। কি ভয়ঙ্কর রূপ। < তা ভাবলে ত্রাসের সঞ্চার হয়। সেই ভয়াল ভাব যে কি > আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে।

সোন্তর

সোন্তরের কাজের বিশেযত্ব আছে। অবয়ব বেশ দোহারা এবং পট ধরণের। < রামায়ণ লেখায় কৃষ্ণলীলায় > রাশমণ্ডল কি[8] সুন্দর। বস্ত্রহরণ পালা। ধাবমান বহমান যমুনায় আকর্ষণীয় রেখার মধ্যে ক্রীড়াবনত[9] একগঙ্গা যৌবনশালিনী ডাগর রমনীদেহসকল যার রস বিচিত্রতা <। Massive quality > আমাদের কল্পনাবিলাসী কোরে তোলে। অনন্তশয়ানে বিষ্ণু। কোথাও সংস্থান ছবি হারা হয়নি।

বড়নগর

< বহমান গঙ্গা। > এই গঙ্গার তীরেই বড়নগর। রাণী ভবানীর কীর্ত্তি। চারবাংলার মন্দির। এত সরল এত[10] সাত্তিক স্থাপত্য আর কোথাও দেখা যায় না। < রাজসিকতার চিহ্ন এ স্থাপত্যে অপাংক্তেয়। ভগবান রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, চণ্ডিকাদেবী > কাহারও[11] প্রতিমাই ভাস্কর্যে অনুপ্রাণিত নয়। দৃষ্টিভঙ্গীও পৃথক। < অন্যত্র দেখা যায় > রামচন্দ্র < রথে চড়েই যুদ্ধে অবতীর্ণ। > এখানে ভক্ত হনুমানের স্কন্ধে আরূঢ়। < পিছনে চির সহচর লক্ষ্মণ। > রাবণও অদ্ভুত সৃষ্টি — ভক্তভাব। কৃষ্ণলীলার হস্তিমর্দন। এটি কংসবধ। সমস্ত ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে নাটকীয় করার দিকে যথাযথ লক্ষ্য ছিল। কংসের মুকুট ধূলা লুণ্ঠিত। ছোট ছোট ইঁট মহামায়ার বিভিন্ন রূপ। একাজগুলি অত্যন্ত Decorative, < এখানে খুব আশ্চর্য্য লাগে ছোট কাজে বেশী কারুকার্য্য— এতটা বড় কাজে নয়। পূর্ব্বদুয়ারী মন্দিরে অসংখ্য রণরঙ্গিনী শক্তিমূর্ত্তি উন্মুক্ত খড়্গাহস্তে ধাবমানা। দেবীর সঙ্গে অসুরের যুদ্ধের বিকট রূপ। > এত বড় শিব আর কোথাও দেখা যায় না। দুই পাশে দুই পার্শ্ব সহচর — নন্দী ও ভৃঙ্গী। < মুখমণ্ডল বহুমুদ্রায় পাথরে অন্যান্য পোড়ামাটির কাজে আমরা দেখেছি। >

এরুয়াড়

এরুয়াড় বর্দ্ধমান জেলায়। < এখানকার কাজের বিচিত্রতা এই যে > খুব কেয়ারী করা ফ্রেম ব্যবহারিত[12] হয়েছে অথচ মুখমণ্ডল অত্যধিক বাস্তব, < দেহের তুলনায় মুখগুলি একটু বড়। > নানান আকৃতির ফ্রেম এখানে লক্ষণীয়। < কখন পানের মত, মণ্ডলাকার, তিনকোনা চৌক লম্বাটে, এখানে এই সখির অবয়ব খুব সুন্দর — দূর থেকে মনে হয় অদ্ভুত ডেকরেশন, এমনভাবে দেহটীকে বাঁকিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। মন্দিরের পাদদেশে অনেক ঐতিহাসিক দৈনন্দিন ঘটনাবলির চিত্র দেখা যায়। আরকিট্রাভ সাজানোর একটু নতুনত্ব আছে। অন্যান্য মন্দিরে একটী বিরাট ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে কিন্তু আলাদা আলাদা > ঘর কেটে প্যানেল করে বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। < এ ছাড়া লক্ষ্য করার মত প্রথম সরলতা, দ্বিতীয়ত বিদেশী প্রভাবে, মুখমণ্ডলে অত্যন্ত বিদেশী প্রভাব যা গতানুগতিক নয়। >

কালনা

< কালনার শিব মন্দির। খুব পুরাতন নয়, এ মন্দিরগুলির কাজের বৈচিত্র্য আছে। > খুব কম বিষয় আছে যা শিল্পীর চোখে পড়েনি। < যোগী যেমন আছে, কৃষ্ণলীলা, দুর্গা, মোগল, শিকার, বন্দুকধারী সেপাই, আড্ডাবাজ, চরকাকাটুনী, পর্ত্তুগীজ ইত্যাদি। >

রাধাকে তার সহচরী কৃষ্ণমিলনের জন্য নিয়ে যায়, < এখানে > দুজনের[13] ভঙ্গি সত্যি মনে রাখবার মত। রাধার পরণে ঘাগ্‌রা, মাথায় লজ্জাবস্ত্র, < মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতীর। > এটি বস্ত্রহরণ। এখানে কৃষ্ণের বসার ধরণটী বড় সুন্দর, < নীচে > গাছটি অত্যন্ত লীলায়িত,

< নীচে গোপিনীদের দেহ সৌষ্ঠবও মনোজ্ঞ, এ বিষয়টী জোড়বাঙ্গলা এবং সোনতোড়ে ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি। এ > কাজটী খুব ছোট ইঁটে করা হলেও[১৪] এর মাধুর্য্য বর্ত্তমান। তুলনায়, অথবা পরিপ্রেক্ষিতের কোন কিছুই দাঁড়ায় না, তবু নিজস্ব শিল্পকলার অবৈজ্ঞানিক আদিম অভিব্যক্তি নিয়ে প্রকাশিত। < বৈষ্ণবগ্রন্থে কৃষ্ণের নানাবিধ ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। >

গুপ্তিপাড়া

গুপ্তিপাড়ার[১৫] < মঠে সর্বসমেত চারটি মন্দির। > কৃষ্ণচন্দ্র, পুরাতন জোড়বাংলা, বৃন্দাবনচন্দ্র ও রঘুনাথজী[১৬] < । একটি > মন্দির দেখলে[১৭] সব মন্দির < নিশ্চয়ই > দেখা হয় একথা ঠিক নয়। < মন্দিরের স্থাপত্য কোথাও কোথাও একই হোলেও কাজ নিঃসন্দেহে এক নয়। > প্রথমতঃ < কারণ > শিল্পীর রুচিভেদ দ্বিতীয় কারণ সম্ভবতঃ মন্দিরগুলি বিভিন্ন সময়ে[১৮] < প্রতিষ্ঠিত >। < বৃন্দাবনজীর মন্দিরে বহুবিধ দেয়ালচিত্র বর্ত্তমান। এখানে পোড়ামাটীর কাজও নেই। শ্রীকৃষ্ণের লীলা বৃত্তান্ত এখানে অঙ্কিত। যিনি মানুষকে বার বার রক্ষা করেন। >

রঘুনাথজীর মন্দির <। রাম রাবণের যুদ্ধ > সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। < সত্যগুণসম্পন্ন > রাম এ আলেখ্যতে যারপর নাই রাজসিক। শরমোচনকালের এ দেহভঙ্গি আমাদের অপরিচিত ছিল। রাবণকেও বীরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। < কোথাও তাকে হেয় করবার চেষ্টা হয়নি। > এদিকে < অগণন ঋষি > অগণন জীবন সমুদ্র। মনে হয় সমস্ত ক্ষেত্র দুল্‌ছে, যেন নাটকের গতিশীলতায় উদ্বেল। কৃষ্ণলীলার যুগল মিলন বিষয়টিকে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আত্মার সঙ্গে মনের, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন দৃশ্য।

আনন্দময়ীর মন্দির সুকুরিয়া[১৯]

এখানে অনেক পদ্ধতির কাজ < স্থান পেয়েছে। > এক একটি যেন পট। বিষয়বস্তুকে সোজাসুজি মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাখা হয়েছে। দেখলেই মনে হয় ভারী নরম স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা; যেন কালীঘাট পটের মত। অবয়ব অতীব সরল। কোথাও গাঁট নেই; অতি সুডৌল। রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন, কালীর ছবি, এটি আনন্দময়ী অন্নপূর্ণার আলেখ্য। সিংহটি সনাতন পদ্ধতির < সিংহ > নয় অত্যন্ত বাস্তব ধরনের।

বলয়োপপিঠ বলাগড়

<সাধনার ক্ষেত্রে শোনা যায় > বহু সাধক এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন। মন্দিরে যোগীদের ব্যতীত অন্য আলেখ্য নেই। < কতগুলি ভঙ্গির সমষ্টির মধ্যে > এরূপ কৃচ্ছ্রসাধনার জীবন, উচ্চ অবস্থা, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

বংশবাটী

এই বাসুদেবের মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ গত বছরে অপহৃত হয়েছে। নিশ্চয়ই কোন আর্ট বিলাসী মানুষের বৈঠকখানায় শিল্পকলার নিদর্শন হোয়ে শোভা পাচ্ছে। ফলে মন্দির শূন্য। শূন্য বেদী দেখে মন চম্‌কে ওঠে। যাক্ সে কথা।

এ মন্দিরের প্রশংসা সর্বত্র। কৃষ্ণলীলাই এর প্রধান বিষয়বস্তু। এখানে চোখের টান যেমন আয়ত তেমন ওষ্ঠদ্বয় অসম্ভব ভারী।

*টেরাকোটায় অনেক নতুন জিনিস এসেছে। কি দৈনন্দিন জীবনের, কি আধ্যাত্মিকতার। ভক্ত ভগবানকে যেমনভাবে সাজাতে চেয়েছে।**

---

* শেষ লাইনটি বিকল্প পাঠ থেকে সংযোজিত।

সম্পাদকীয় সংযোজন

অসম্পাদিত ধারাভাষ্যের যে যে অংশ সম্পাদিত ধারাভাষ্যে বর্জিত হয়েছে < > বন্ধনীর মধ্যে তা দেখানো হল। শুধুমাত্র 'বংশবাটী'-এর ক্ষেত্রে সম্পাদিত ভাষ্যে, অসম্পাদিত ভাষ্যের কিছুই বর্জিত হয়নি।

সম্পাদিত ধারাভাষ্যে ('কৃত্তিবাস' ও উত্তরাধিকার') যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছগুলির পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলিকে নিম্নরেখাঙ্কিত ও শীর্ষে অবস্থিত সংখ্যার সাহায্যে উল্লেখ করা হল —

১. মানুষে, ২. সুস্পষ্টতায়, ৩. ব্যাগার, ৪. এখানে, ৫. তারাপীঠের কাজ সম্পূর্ণ নতুন রীতির, ৬. ঘটনাটিতে কত ছাড়াছাড়া ভাব — তবুও সামঞ্জস্য কোথাও হারায় নি, ৭. অভিনব, ৮. অতীব, ৯. ব্রীড়াবনত, ১০. ও, ১১. কোন, ১২. ব্যবহৃত, ১৩. এর, ১৪. তবুও, ১৫. গুপ্তিপাড়ায়, ১৬. রঘুনাথজীর, ১৭. দেখলেই, ১৮. সময়ের, ১৯. বানানভেদ - শুকুরিয়া।

সম্পাদিত ভাষ্যে অনেকসময় যতিচিহ্নের পরিবর্তন বা বর্জন ঘটেছে। বিস্তৃত ভাষ্য থেকে বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দ বর্জন করার পর তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবশ্যকীয় ভাবে এসেছে। বানানরীতি অপরিবর্তিত। কেবল কয়েকটি অনিবার্য সংশোধন করা হল।

বাংলার সাধক

রামপ্রসাদ

এখন এ-শহরটি বিরাট হয়েছে, এক সময় এমনটি ছিল না। < তবুও কলকাতার নামডাক সর্ব্বত্রই ছিল। > আর্থিক উন্নতির আশায় অনেকেই এখানে আসত।

রামপ্রসাদও < একদিন এই শহরে > এসেছিলেন। এক সেরেস্তায় কাজ নিয়ে।

< এতবড় > শহরের মাদকতা তাঁকে কোনক্রমেই কালীনাম থেকে সরিয়ে আনেনি। ''শ্মশান ভালবাসিস বলে মা'' — মনে মনে সেই নাম অহরহ চলেছিল। < তাই শোনা যায় খতিয়ানে তিনি তাঁর অনেক কবিতা তথা গান লিখেছিলেন। বৈষয়িক জগতের অনেক রূঢ় শব্দ তিনি তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। >

রামপ্রসাদের বাড়ী কলকাতার খুব কাছেই হালিশহরে ছিল। *(২৭ সেকেণ্ড)*

< হালিশহর > গঙ্গার তীরেই অবস্থিত। এ-গঙ্গায় রামপ্রসাদ নিত্য অবগাহন করেছেন। হয়ত এখানে দাঁড়িয়ে গেয়েছেন —

''যে দেশে রজনী নেই মা
সেই দেশে এক লোক পেয়েছি।'' *(৮ সেকেণ্ড)*

এখন তাঁর সাধনার জায়গাটি আছে, ''পঞ্চবটি''— এটি ''গাব গাছ'' — রামপ্রসাদ কালী নামে এই গাব গাছেই পদ্ম ফুটিয়েছিলেন। *(৮ সেকেণ্ড)*

< তাঁর কুটিরের কোন চিহ্ন নেই। একদিন যেখানে দাঁড়িয়ে বেড়া বাঁধতে বাঁধতে শ্রীশ্রী আদ্যাশক্তি রামপ্রসাদকে সাহায্য করেছিলেন। >

অনেক কিছুই আজ নেই — না থাক্ কিন্তু তাঁর গান আছে—

''মা আমারে দয়া করে শিশুর মত করে রেখো।'' *(৭ সেকেণ্ড)*

কমলাকান্ত

এমনি আর একটি গান যা আজও বাঙলার হাজার হাজার লোক গায়, < সেটি হচ্ছে >

''মজল আমার মন ভ্রমরা'' *(৬ সেকেণ্ড)*

< এ গানটি কোন রকমে গাইলেই মনে হয় যেন শ্রীশ্রী কালী সামনেই আছেন। >
এ গান কমলাকান্তর। কমলাকান্ত প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক। তন্ত্রমতে তিনি সাধনা করেছিলেন।
কমলাকান্তর জন্ম কালনায়, কিন্তু সাধন আসন বিভিন্ন স্থানে।
ওড়গ্রামের কাছে রায় রামচন্দ্রপুর[১]। < এখানে > পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে।
এই পেটিকায় আজও যন্ত্র বর্ত্তমান, সম্মুখে বাসুদেব। *(২০ সেকেণ্ড)*

< শোনা যায় এখানে একদা নরবলি হত। যূপকাষ্ঠ, পাশে দুটি শিব মন্দির।
এ ছাড়া বীরভূমে বর্দ্ধমানে। > বর্দ্ধমান শহরের নিকটেই < এই স্থান। এখানে > সাধক কমলাকান্ত অনেকদিন সাধনভজন করেন। *(৭ সেকেণ্ড)*

রামকৃষ্ণ

রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্তের গান একজনের মুখে অহরহ শোনা যেত।

তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

যাঁর সাধনার ফল আজও আমরা ভোগ করছি। যাঁর সিদ্ধি বাঙালীকে বাঙলাকে অনেক স্থানেই আসন দিয়েছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরিশ্রম-সিদ্ধ। প্রতিমুহূর্ত্ত তিনি সাধনা করেছেন। *(২০ সেকেণ্ড)*

তাঁর জন্মভূমি কামারপুকুর। < এই কামারপুকুরের আকাশের কালোমেঘের পাশে বকের উড়ে যাওয়া দেখে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। > আজকে কামারপুকুর দেখলে একশ বছর আগের কামারপুকুর যে কি ছিল তা আন্দাজ হবে না।

যখন তিনি শিশু মাত্র তখন শ্মশানের একান্তে, এ বটবৃক্ষের তলায় কত রাত্র গেছে, ক্রমাগত মাকে ডেকেছেন।

এ শ্মশান ভয়াবহ ছিল ভীতিপ্রদ ছিল।

এর পাশেই ভূতির খাল। এই খালে একদিন সাঁতার কাটতে কাটতে তাঁর কালীদর্শন হয়।

কামারপুকুরের মাটির কনায় কনায় তাঁর কথা। হালদার পুকুর — কত উপমাতে এই হালদার পুকুরের কথা না আমরা শুনেছি।

লাহাবাবুদের বাড়ী পাঠশালা বসত। পুরীযাত্রী সাধুসন্তরা[২] এখানে আসতেন। < এদেরই বাড়ীতে > ঠাকুর স্ত্রীলোক বেশে একদিন রহস্যচ্ছলে অন্দরমহলে প্রবেশ করেন।

পাইনদের শিবমন্দির

এখানে তিনি শিব সেজেছিলেন।

এখন আর সে ঢেঁকিশালা[৩] নেই, ভক্তেরা[৪] তাকে মন্দিরে পরিণত করেছেন। এর এক পাশে শ্রীশ্রী রঘুবীর[৫] আছেন। < ঠাকুর এই দরিদ্রগৃহে আসার পূর্বে যিনি এসেছিলেন। > ও পাশে ঠাকুরের ঘর এখনও তেমনি আছে। এপাশে বৈঠকখানা।

< এই আমগাছটি ঠাকুর নিজে রোপন করেন। >

ধনী কামারনীর বাড়ী

তারপর তার সাধনার ক্ষেত্র গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে[৬]। *(৬৫ সেকেণ্ড)*

ভবতারিণীর মন্দির। যাকে তিনি জাগ্রত করেন। এই সেই ঘর।

যেখান থেকে বাঙলার নতুন ভাবধারা, যাকে বিবেকানন্দ বলেন "র‍্যনেসাঁস"[৭], তার সূত্রপাত হয়।

এর পিছনে নহবতখানা। যেখানে ঠাকুরের ভাষায় রামলালের খুড়ী থাকতেন। শ্রীশ্রী মা থাকতেন।

পঞ্চবটি

এখানে বাঙলার মনের মানুষের আত্মদর্শন তথা নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। < হলেও > ঠাকুর তখনও বলেছিলেন "মাগো আমি দীন বন্ধুহীন, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।"

< কত সাধুসন্ত এই পঞ্চবটির আসেপাশে ডেরা বাঁধত। তোতাপুরী থেকে আরম্ভ করে অনেক অনেক সাধু।

কলকাতার কত বাবু এখানে আনাগোনা করতেন তার ইয়ত্তা নেই। >

ঠাকুর কারো কাছে কিছুই চাননি, সবাইকে মিনতি জানিয়েছিলেন — শুদ্ধাভক্তি। *(৪৫ সেকেণ্ড)*

বামাক্ষেপা

বামাক্ষেপা সম্পর্কে বিশেষ < রূপে > কিছুই জানা যায় না। শুধু জানা যায় তিনি একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। এইটুকু যথেষ্ট।

তারাপীঠ

বীরভূমে, রামপুরহাটের কাছে।

সেই শ্মশান।

< এখানে কাঠের অভাব বলে মুখাগ্নির পর শবদেহকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। তাই শিবা[৮] কুকুর ইত্যাদি নানা জন্তুর উৎপাত সকল সময়ে। >

একদা যে এ[৯] স্থান কি ভয়াবহ ছিল তা ভাবা যায় না।

একটু বাতাসে এখানকার গাছপাতা নানা বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে।

নির্ভীক বামাক্ষেপা এখানে সাধনা করেছিলেন।

বশিষ্ঠ পদচিহ্ন

এইটি বামাক্ষেপার সমাধি। *(২৭ সেকেণ্ড)*

....

সম্পাদকীয় সংযোজন

এই লেখাটির মূল পাঠে সময়নির্দেশ করা আছে। তাই তা রেখে দেওয়া হল। একই ফাইলে প্রাপ্ত এই লেখাটির সংক্ষিপ্ত রূপে কোনও সময়নির্দেশ করা নেই।

অসম্পাদিত ধারাভাষ্যের যে যে অংশ সম্পাদিত ধারাভাষ্যে বর্জিত হয়েছে < > বন্ধনীর মধ্যে তা দেখানো হল। সম্পাদিত ধারাভাষ্যে যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছগুলির পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলিকে নিম্নরেখাঙ্কিত ও শীর্ষে অবস্থিত সংখ্যার সাহায্যে উল্লেখ করা হল —

১. রামচন্দ্রপুরে, ২. সাধুসন্তেরা, ৩. ঢেঁকিশাল, ৪. ভক্তরা, ৫. রঘুবীর ঠাকুর, ৬. দক্ষিণেশ্বর, ৭. বানানভেদ - রেনেসাঁস, ৮. *শব্দার্থ*-শৃগালী, ৯. এই।

সম্পাদিত ভাষ্যে অনেকসময় যতিচিহ্নের পরিবর্তন বা বর্জন ঘটেছে। বিস্তৃত ভাষ্য থেকে বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দ বর্জন করার পর তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবশ্যকীয়ভাবে এসেছে। বানানরীতি অপরিবর্তিত। কেবলমাত্র কয়েকটি অনিবার্য সংশোধন করা হল।

স্বাতি নক্ষত্রে জল

জয় মা তারা, মাধবায় নমঃ, জয় রামকৃষ্ণ। অসম্ভব নির্জ্জনতা গোঁয়ার হইতে থাকিল, ঘর্ম্মদায়ী ক্ষণগুলিকে, কর্ম্ম সর্ব্বত্রের clockwise বামাবর্ত্তেই গমনশীল হয়— ইহাতে সুকুমার নাবালকগণ তোমার ক্বচিৎ অন্যমনস্কতাতে ভাবুকতাতে বাধা প্রদানিলাম, ইহার জন্য তোমার তোমাদের আমার-গাল-ভরা হাত তুলিয়া জোড় করত, নিজেরে সমর্পণ কর যখন, তখন আমার কথাও বলিও, তোমার সমগ্র বর্ত্তমানতা দেহ ও দেহ বৃত্তি সমেত, এখন ঐ হস্তযুগে আরও যে মুখ নড়িত থাক— হা অদৃষ্ট আমাতে তেমন দৃষ্টান্ত ঘটনা হইল; আমিও একদা অল্প বয়সী ছিলাম, তখন ঘুম, খাদ্য ইত্যাদিই আমার ঐতিহাসিকতা ও এককালেই কেন্দ্রগতি ও বহির্মুখী এই দুই কার্য্য আমাতে বিচিত্র রত্নময়ী ধরিত্রীর প্রতিক্রিয়া বিষয় হয় নাই ও শব্দ সকল অচেতন। ক্রমে হঠাৎ একদা দিক সকলে মহা স্ফুটকার ঘটনা হইতে থাকিল; এতাবৎ উচ্চারণেই যাহা সীমাবদ্ধ রোমাঞ্চদায়ী, শব্দ সকল বস্তুতে বিষয়ে অধিষ্ঠানত্ব লাভ করিতেছে, আমি মাগো বলিয়া ক্রন্দিত হইলাম, জননী আমারে একা করিও না মাগো তুমিই আমার পলায়নের দিক, পথ আশ্রয়! শব্দ বিকটাকার ধারণ করত আমার ইন্দ্রিয়বিনাশী আপৎকালরূপে আমার দেহরে ধাওয়া করিতেছে বাঁচাও আমারে শতছিদ্র করিতেছে ঐ কাণ্ড! আমার ঘুম ত্বকপ্রধান হইবে, আমার খাদ্য হইতে সূর্য্য কিরণ প্রত্যাহারিত হয়, আমি ছুটিলাম, অক্ষরে আমার ভাব লাগে আমি বর্ণে ফিরিব মাগো, তুমি বর্ণ! আঃ এই জড়তা, ঐ আতঙ্ক, আমার প্রার্থনা হউক। শ্রীমদ্ভাগবৎ যাহা তথাস্তু করিলেন! জয় মাধব!— অতএব ঐ ক্ষণ, নির্জ্জনতা পারম্পর্য্য, দিন হইতে দিনমানের যে এবং রাত্র হইতে যামিনী যাবতীয় ব্যাপিত্ব সফেদ, নস্যাৎ করিয়াছে; তবু এখন মধ্য রাত, তোমরা যাহারা এই মহানগরীকে, সহজ-মুগ্ধা পাপীয়সী বলিয়া টিট্টিকার দাও, অশ্রদ্ধা কর, রামচন্দ্র যেমন সীতাকে, বিরাজ বৌকে নীলাম্বর যেমন, শ্রবণ কর, নগর অধিষ্ঠাত্রী বালকধর্ম্মকে, নিরুপাধিক রাখিতে সযত্নে পক্ষবিস্তার (আর কি মনোরম এই প্রাচীন উপমা) তখনই আমাতে এক দেহবিবর্ত্তন ঘটে আমি পাখী! এই একটিই সংলাপ থাক্, আর যে আমি ষ্টেজের এককোণ হইতে অন্যত্রে যাই। পাদপ্রদীপাৎ গভীরতায়, বহুবিধ অভিব্যঞ্জনায়, আর দেহরূপান্তর আর দেহান্তরক্রম, বাচ্য বাচকতাকে ক্রমাগত ভেদ করত দর্শকবৃন্দের সৌখীনতাকে অপহরণ করিব! তাহারা মুগ্ধ। অথচ এমনই লবিতে সবাই কহিবে, আঃ দেহরূপান্তর! এখানে, শাস্ত্রজ্ঞরা অর্থ করিবেন, সৃষ্টিক্ষম গুণের ইহাতে লৌকিক অপচয় সিদ্ধ হইতেছে— ইহারা, ঐ যাহারা পালা দেখিয়া এখন উপর্য্যুক্ত পদ বলিতে কালে দেহ আন্দোলন করে— ভবিতব্য যে, সূক্ষ্মতা তাহা সকলের মধ্যে না থাকার দরুণ— ঐ বিনা ভাবের জন্য তাহারা ভেদ বুঝিতে পারে না; সাধারণত যখন তাহারা কিছু বোধিত না, যে এবং সেই অক্ষমতার জন্যই সকলেই 'লিমনেড লিমনেড' বলিয়া উঠিল, তাহারা ফ্যাশান পত্রিকার পাতা দেখিল; যে আপনাদের অক্ষমতা, বিস্মৃত শব্দ ঠিক নহে, গোপন করিতে চাহে। বাচ্য ও বাচকতাতে কোন প্রভেদ সিদ্ধ হয়, তাহা মীমাংসায়; বাচ্য বলিতে, বাচ্য কর্ত্তব্য তথা পদ্ধতি, আর বাচকতা লক্ষ্য, আমাদের অনুযায়ী ঐ ; যে এবং আমি, নট হিসাবে, যাহা উপস্থাপিত করিলাম; তাহাদের কণ্ঠ দন্ত নাসিকা মূলীয় আওয়াজ উৎসারিত হইল; আবার প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলিল; পরিষ্কার তাহারা জানিত না, দেহবিবর্ত্তন, জীবনের উদ্দেশ্য, যে তাহা অবশ্য অবচেতনে জানে, ঐ 'আ-পৃওরি' জ্ঞান তাহারা ঐ শব্দটিকে, দেহবিবর্ত্তন, গ্রাহ্য করে। যখন এবং তাহারা পথে, গাড়ীর শব্দে যান্ত্রিকতায় কণ্ঠস্বরকে লতায়িত করিল, উহা ঐ শব্দটি সঙ্গীতের পদ এমন; হর্ন এর ছেদে তাহা রমণীয় ছন্দ হইল, তাল মাত্রা ছন্দতে আসিল! বালকটি এমন ঘরে (বংশ আর ঘর আমরা পৃথক স্মরণ করি) ভাগ্যশঃ জন্মিয়াছে যে তাহার নিজস্ব কক্ষ বর্ত্তমান, এই কক্ষে তাহারা স্তন ছিন্ন হওয়ত পতিত, তাহারা যখন ঘুমায় তখন তদীয় পাঠ্যপুস্তক সকল তাহাদের রক্ষা করে; মধ্য রাতে তাহাদের ঘুম নিভিয়া যায়, মানে ঐ পরমা নগরী, কলিকাতা নাম্নী নগরীর প্রত্যেক বালককে বুঝায়, উত্থিত হইল, তাহারা প্রত্যেকে চটিতে পদদ্বয় ঢুকাইল, জলাধার দেখিল, বাথরুমের দরজা ঠিক লইল, অতঃপরে জনাজাত সেখানে নূতন ও সাবেক মোজাইক করা লালসিমেন্ট বা কাঠের বা সুরকির কৃত মেজে (সাবেক চায়না-ভাঙ্গা-টুকরা দ্বারা নির্ম্মিত; আমাদের ১৩ নং বাড়ীতে যেরূপ ছিল, অনেক বাড়ীতে, কলিকাতায় এখনও নিশ্চয় আছে, গ্রামে অবশ্যই) করিডোরে বাহির হইল; এখানে দেওয়াল-তাকে রক্ষিত সুন্দরভাবে ফুল-স্তর, যাহা রন্ধনের গন্ধেও, ঐ ফুল; ছোট ফ্ল্যাট, প্রায় চার হাজার ফুট উচ্চে যেমত এবং বিবিধ রেডিওগ্রাম উত্থিত সঙ্গীতেও ফুল, যে এবং বীজাণুনাশক রাসায়নিক গন্ধে, ফুল; যাহা তখন আপন সত্তা আর রক্ষাতে সমর্থ না, মৃত্তিকা সম্পর্ক নাই! ফুল শনৈঃ কৃত্রিম হয়; সেজান কাগজে প্রস্তুত ফুল পছন্দ করিতেন, কারণ উহার বাস্তবতা তাহার তাজাত্ব, সদ্যস্কতা গুণ তাঁহার নিজস্ব এইসথেটিক বিধিতে ন্যায্যতা, ঐ সদ্যস্কতার, রহে (ইহাতে ফর্ম বলা মানে সিলিণ্ডার ও কিউব উল্লেখ করা হইল না)। বালক, বালকরা, তদ্দর্শনে, ঐ ফুল, থমকাইল, যেমন এখানে তাহাদের করা'র কিছু আছে— যেমন যে, কিছু চেহারা (ঐ কৃত্রিমতা), ফুলগুলি মিয়ায় নাই, তবু চেহারা! অথচ আশ্চর্য্য যে যাহা অদ্য মালী দিয়াছে ঐ ফুল সকল। আর যে তাহারা নিশ্চয় হওয়া-ক্রমে (process) বাধা দিতে পারে! তাহারা থামাইতে পারে। ভালো, এখন তাহাদের প্রারব্ধ বিজ্ঞাপিত ছিল ঃ ঐ কৃত্রিমতা থামাও! আপন আপন দেহ উহাতে, তন্মধ্যে পাচার কর যে ভাবে পার, কর যেমন প্রাচীনকালে এক পাখী আপন রক্তদ্বারা গোলাপকে লাল করে (Oscar Wilde-এর গল্প) তেমন ভাবেই কর।

ইহাতে, প্রতিটি ওয়ার্ডের (পল্লী) ঐ বয়সীরা, আপন জামার, রাত্রে পরিহিত যাহা, বোতামেতে বাম হস্ত ছোঁয়াইয়া, চমৎকৃতবান অবস্থাতে, দক্ষিণ হস্ত কর্ণে, বাম পদ ভাঙ্গিয়া এক বিঘৎ পশ্চাতে চক্ষুরা, তারকা ফুলের বর্ত্তমানতাতে, ঈক্ষণ নিমিত্ত এক কোণে সভয় যায়,

ফিরিয়া অন্যত্রে আসিতেছিল; ভালো ঐ যখন, যে লক্ষণ, তাহাতে দেখিব, এই মানসিকতার গায়েই ভগবান শঙ্কর, অঙ্গাঙ্গী রামকৃষ্ণ, ঘেঁসিয়া ভোলানন্দ গিরি — এই সকল নামে জগতের আনন্দ বহিল — ঐ ঐ নয়ন কিশোর গণতে। অলৌকিক সমুদ্র গজরাইতে যাহা ভূত চালিত বা এমন হইল, নপুংশকতার বিনাশ সাধন হইল, যে এবং নব যৌবনারা যাহারা নিষ্কলুষ ভূমিকা দর্শাইয়া আপনাদের তৃপ্ত করে এই পর্য্যবেক্ষণ নির্ঘাৎ যে নাশাপুট লাল, ইহারাও নিরস্ত হইবে; উহারা পুনরায় শুনিল ঃ কৃত্রিমতাকে থামাও!

এখন তাহাদের দুই কর্ণে কর স্থাপিতে, দেখা যায় নৃত্যে কথকে ও কথাকলী, ওড়িশীতে, একটিতেই হাত, সিদ্ধ হয় যাহা; লোকনৃত্যে নাই, যদি তবে তাহা ঐ ঐ ক্লাসিক হইতে লব্ধ, কর্ণে হস্ত প্রদান ভঙ্গী, ইহাতে এককালে একাগ্রতা লৌকিক ও তাত্ত্বিক সূচিত হয়, ইহা নিবেদিল, না, জানাইল ঃ উহা শুষ্ক হইতেছে উহা নিয়মাহত, ...

উহা কৃত্রিম হইতেছে ...

ইহাতে শ্রবণে, তাহারা হস্তদ্বারা বক্ষে কপাট বদ্ধ করি, মুহূর্ত্তেক স্তোভ রহে, কেন না, তাহারা ঐ ফুল বিষয়ক বিবরণী, ধারা, ক্রম ছানিতে আছে মনেতে, কাগজ, কাপড়, প্ল্যাস্টিকত' না, যাহার বীজ সমূহ 'সাটন', 'পোচা', বীজ বিক্রেতারা ছোট খামে, ফুল ছাপ, প্রেরণ করে; ঐ খাম বাখারিতে ফাঁক করিয়া ইতোমধ্যে পাচারিয়া, বেড়ে গাঁথা হয়; ক্রমে চারা হয়, ক্রমে দ্বিধা শিশির ধরিতে পারে। ঈদৃশ আকার প্রাপ্ত হয়, নিড়ানির কাজ সাবধানতা আর তেমন নহে ঃ ফুল ফুটে ইহারা পদ্ধতি ক্রম হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, সকলেই তোয়াক্কাহীন জ্ঞানে বলিষ্ঠ উত্তর দিল। উহা অদ্যতন; (এ গণনা নাই, এখন দ্বিপ্রহর!) আমাদের মা-রা ঐ ফুল খরিদ করিলেন, অদ্য আমাদের জন্ম তারিখ অতএব দামী ঐ 'লেডী হিলিঙডন'— মা-রা দেখিলাম, যত্নে ফুল সকল বিন্যস্ত করিতে শ্রদ্ধাশীল ইহাতে মা সকলের প্রসাধন দর্শনে, আমাদের যে পরাঙ্মুখতা, যে খামচা-লাগা তাহা — কেন না আমরা জানি; উহা, মা বলিতে, কখনও, একদা, কেন — ইত্যাকার বহু অব্যয় যে দেশ (দেশ কাল পাত্র) হইতে, সূত্রপাত হয়, তত্রত দেশ দ্বারা গঠিত, তিনি চির অচেনা, চেনা রমণী নহেন— তিরোহিত হইল, তাহাদের এই গুটিপোকা বৃত্তি বা প্রকৃতি, আপন অন্তরের ফ্রেম প্রতিফলিত করত যে, ফুল সাজানতে ঐ আত্মজ্ঞান বা গোপনতা, বা চালনার বিভূতি সমন্বিত রূপ লাবণ্য আমাদের সম্পর্কের প্রতিটি মুহূর্তেও স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ফ্রেম নাই, কি বিস্ময়ের আশ্চর্য্য দক্ষতায় ধীরে উহা তীব্র দ্যুতিমান হইতেছে, স্কুল বাস হর্ন দিতেছে, আমরা থ আছি, তাঁহাদের মাদের, ঐদৃশ মায়া নির্ম্মাণ আমাদের ইহকাল সুন্দর করে; উহাতে প্রাকৃতিক সদ্যতা, উহাতে ফ্রেমের অভিনবত্ব এই দুই মিলিত ঃ যে এবং ঐ জনিত আরও সদ্য! যে এবং এখনও তাহারা স্বামী বিবেকানন্দর ভঙ্গীতে আছে।

ঐ সেই অশরীরী শব্দস্ফুট তিলেক নীচে নামিল না; কৃত্রিম!

এই সৌখীনতা, এই আচার ব্যবহার ...

এই শুষ্ক হওন ইহাতে সকলেই, অদ্ভুত চাপল্যে বাঁকিয়া, যেমন যে হাওয়া কৃত, ফুলস্তর স্পর্শ যাহাতে হয়, অঙ্গুলি প্রসারিত-হাত তরঙ্গায়িত করিল, যেমন যে তাহারা শীশমহলের অসংখ্য কাঁচে, পৌনঃপুনিকতার গর্হিত অথচ নাই, অথচ তাহার অবিকল একই হয়। যেমন যে শুষ্কতাতে বাধাদানে বা, এই গতি ঃ শুষ্কতা বোধ চোখের, স্পর্শের, স্বাদের, শুষ্কতা শব্দটি হয় ধ্বনি, শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য কিছু যেহেতু — উহা শ্রবণের, বা উহা ঘ্রাণের, এই প্রশ্ন যে কোনটির, মনোনয়নেই থমকাইয়া; আরও এবং 'কৃত্রিম' শব্দটি এখন মর্ম্মে, নৈতিকতা, জাঁত দিতে আছে, যে যাহা, অপরাধে ধৃত যখন, ভয়ের অশ্রুপাত তাদৃশই আখ্যায়িত হইয়াছে, কুম্ভীরাশ্রু, সুতরাং কৃত্রিমতার দোষ (!) কিছু-না-করিয়াই তাহারা বহন করে, ইহা হইতে সুতরাং দ্রুত যে প্রকাশিল ঃ ঐ শুষ্কতা মানে ...

শুষ্কতা নহে... ধীরে শুষ্ক হওয়া...

বাঃ উহা বাগানেতেও তো ঘটে উহা এখানেও ঘটিবে... উহা নিয়ম!

হা প্রমত্ত! রোধ কর ঐ শুষ্কতা বাগানে অথবা এখানে; কর্তব্য এড়াইও না ... উহাকে চিরস্থায়ী কর ... মান ...। ইহাতে সকলেই উহাদের ক্ষেত্রস্থিত ঝরণার ন্যায় মৃদু ছোট হাত সকল তুলিয়া নির্ব্বোধের বিমূঢ়ের তুল্য। অদ্ভুত প্রলাপ ঘোষিত যে যাহা হাস্যকর রগড় মস্করা, যাহা ঃ ও চকলেট! ও টেনিকে ... যে এবং তাহারা এমতভঙ্গীতে এখন, তাহা ৭৫ মিটার ফ্ল্যাট রেসের দৌড়াইবে এমন; তাহাদের সখ যেন কিছু চিবায়, চিউং গাম যখন, ঐ রূপ স্পষ্ট যে উৎকর্ণ ইহার সহিত ; অন ই মার্চ স্টেডি! এখনই বন্দুক ধ্বনিত হইবে! কিন্তু ইদানীং যে রাত্র, ঐ যাহা জাফরীর ভিতর দিয়া ওতপ্রোত ! তাই ঐ ভঙ্গী ক্রমে পুনরায় দেহের মধ্য মিলাইয়াছে, এখন তাহারা স্থানত্যাগ কারণে প্রস্তুত হইতেছিল।

আমরা নির্জ্জনতাতে ভীত; আমাদের যে এবং কতক বিশ্লেষণে আমরা নিষ্পেষিত আছি, আমরা দূরত্ব বোধের, জগৎ হইতে মাত্র কয়েক বৎসর কাল ভেদের বৈষম্যে আসিলাম, আমরা ইহাতে বড় একা, যে বটে হেতু আমরা দূরত্বকে, যাহা আমাদের, তাহার নৈকট্যে আনিলাম তাহা লুণ্ঠিত হওয়ত ধর্ষিত হইল, আমরা অভিনব বুদ্ধির সূচনাতেই বিপর্য্যস্ত আছি এখন আমাদের মা'দের কক্ষে যাই, ঘুমন্ত মাতৃকা দর্শনে —আমরা আবার একক হইব সত্য ও আমরা পুনরায় অনুভব, যাহা অপহৃত, তাহা আমাদের মধ্যে উপ্ত হইবে!

কিন্তু ঘুমন্ত মুখমণ্ডলে কি বা দেখিবে, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বের পার্টির বাক্য-আলাপে ক্লান্ত যাহা, ওষ্ঠে সেই সকল বাক্যের রেখা, কি আনন্দ! অপ্রার্থিত প্রীতি! কত মিষ্টতা আপনাতে! রাতি হয়, কি উদ্বেগ। আশ্চর্য্য কি বা মনোজ্ঞতার আপনি, ও হ্যাঁ কি বোরিং। আঃ কি পাগল করার! ও পাগলামী! ও না! যুবাত্ব আপনাকে ছাড়িবে না! কি যুবা আপনি, ও নিশ্চয় কোন আপত্তির নাই! সত্যি কলিকাতা ক'ত সুন্দর! খুব ভারতীয়, আমি ভারতীয় ছোঁয়া খুব ভালবাসি! ও ভগবান কি ঈর্ষান্বিত! না না তাহা কখনও হইবার! বল কি! কাঠ ছুঁইলাম, আপনার দেহ তো দারুণ হইয়াছে!

এই সকলে যতই তাঁহাদের অবর্ণনার করুক, তাহাতে আমাদের কোন বিমুখতা নাই আমরা অনুভবকে পুনরুজ্জীবিত করিব, এমন কি বা ইহা, তাঁহার নামেও হইতে পারে ইহা আমাদের শিক্ষক জ্ঞাত করিয়াছেন। কি যে এবং তিনি যখন এখানেই ঘুমন্ত বা জাগ্রতে তাঁহার তারতম্য হয় না, শিক্ষক বলিয়াছেন সমুদ্র সমতলেও ইহা ব্যতিক্রম ঘটে না। এখানে দিকভেদ নাই, এতএব তুমি যাহাই কেন ভাল যে উদ্যমে বাধা দাও ... আমরা অনুভব চাই।

কর্তব্য এড়াইও না, আগে উহাকে চিরস্থায়ী কর। বিশ্লেষণ কিছু নয়। আমার কথা মান্য কর, ভয় পাইও না।

বালকরা কর্ত্তব্য শব্দে অল্পই প্রস্তুত হয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে এখন ফিকে ভাবে আসিল, এখানে স্বেচ্ছাসেবার মতিত্ব উপ্ত হইবার, তখনই ভাল বুঝিল, ঐ সকল কাজ যাহারা বড় তাহাদের, উহার কার্য্য অর্থাৎ অনুষ্ঠিতব্য তাহাদের হিসাবে আসিল না, চিরস্থায়ী, বাধা, শুষ্ক-হওয়া! শব্দগুলি রাস্তার ভিখারীদের দ্বারা উচ্চারিত বা যাহা মননের প্রয়োজন নাই; সমবেত কণ্ঠে, তাহাদের, ইহা ঘোষিত হইল, যে আমরা অতীব ছেলেমানুষ! এতদ্ভিন্ন আমরা এক নির্জ্জনতা তাড়িত ইদানীং, আমরা বিভীষিত প্রায়, আমরা খুনখারাবী নির্জ্জনতায় অতিষ্ঠ হইলাম, ঐ সকল শব্দরাজিতে আমাদের অজ্ঞানতার পরিচয় দেয় না, কারণ সম্পূর্ণভাবে উহা সমুদয় হয় অপরিচিত, আমাদের, উপরন্তু উহাতে মনোনিবেশ হইবার নহে, আমরা আমাদের একরত্তি সম্বল তিলখানেক অনুভবে। আমরা বিপর্য্যয়ে; একটি কুহকময় প্রক্রিয়াক্রম, আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে বিধ্বস্ত হইয়াছে, ঐ ধারা মানিয়া আমরা বর্দ্ধিত হইব, যে এবং আমাদের শরীর পেলব কোমল হইয়াছে ঃ স্বাতি নক্ষত্রের জল! যাহা নিজেই এক সুদারুণ প্রহেলিকাময় রূপকথা। আমরা ইতিহাস-সন্ধান-ভ্রমণে গিয়াছি, ইছাই ঘোষের দেউল সারিয়া যখন অজয়ের তীরে পিকনিক করিতেছি। ট্রানজিষ্টার, কমিকস, হাস্যধ্বনি, চোরচোর খেলা, যখন আমরা বনে লুকাইয়াছি তখন জলদগম্ভীর স্বরে শুনিলাম, বৎস শ্রবণ কর, কোথায় এই নক্ষত্র, সেই নক্ষত্রে, স্বাতি নক্ষত্রে একবিন্দু জলে, শুক্তিতে, মুক্তা ফল হয়, সেই ঝিনুক তবেই পাল্লা খুলিবে! যে ইহাতে আমাদের দেহ ভ্রূভঙ্গে নিয়মিত হইল। আমাদের দেহ ঝিল্লিরব মুখরিত হইল, অমোঘ নির্জ্জনতা চাহিলাম, মন্দির হইতে সন্ন্যাসী বাহির হইতেছেন, তিনি বুঝিলাম মহাপুরুষ—আমি জানি মহাপুরুষ ব্যতীত এই সংজ্ঞা বলিতে নিস্পৃহ অনাসক্ত কণ্ঠস্বর গৃহী কোথা পাইবে। ঐ বনে চারিদিকে ঐ বাক্য বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, অপূর্ব্ব সম্মোহে আমরা, এমন সময় বিউগল বাজিল! আমাদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব খবরধারা আসিল, প্রত্যেকেই একে অন্যের সংস্পর্শ এড়াইতে চাহি; আমাদের মধ্যে অপরিমিত পাথুরে সংকল্প, ঐ ঘটনা কয়েকটি যে জন যে পাক দিয়া, সর্পিত অনেকটা, উঠে; বয়ঃসন্ধির ছেলেরা হঠাৎ শালগাছের নীচে, উঁইঢিবি ছিল এমন স্তূপ-হওয়া জমিতে, পাতার উপর বসিয়া মাউথ অর্গানে, গীটারে মজার গীত যেমন দুঃখের,— অর্থস্য, নিশ্চয় কোমল পর্দায় বা অন্য শব্দ আহতে বা প্রভাবে আর এক হওয়ত ঐরূপ—যে হতাশার এখন, মানে তাহাদের চোখে, ক্লান্তির নহে, ঔদাস্যের লক্ষ্মণ সকল, শুনিতে আছে! কিছু আগে যাহারা ঐ গীতে হাততালি, তাল মান অনুপাতে দিতেছিল! আমাদের স্কুলের ফাদাররা খাদ্যর ব্যবস্থায়, অনর্গল ধোঁয়ায় তাঁহারা যেন বা আর এক অন্য কোথাও! শীর্ণ অজয় হইতে জল আনে কাহারা, এখন মধ্যাহ্নকাল; আমরা যে যাহার নির্জ্জনতা, সৌরজগৎ হইতে, সমুদ্র অতলান্তে — প্রমীলাসুন্দরী যেথা জলতলে প্রবাল মুকুতা লয়ে — ঝিনুকের বুকে নিটোল সত্তা লইয়া না-খোয়াইয়া পতিত, হে জলবিন্দু— আমি (আমরা) তোমার পথের ধূলিকণা শূন্যতাকে আমরা চুম্বন করিলাম, যে নিটোলত্ব-হারাই-নাই বাক্যে, ইহা সিদ্ধ যে, স্বাতি নক্ষত্র হইতে — মা মা আমরা স্বাতি নক্ষত্র দেখিব, আমাদের কোলে কর, বাবা বাবা আমরা স্বাতি নক্ষত্র দেখিব আমাদের কাঁধে কর। — এক বিপুল আকর্ষণে, ও সায়েন্স, তোমরা কেন এ শব্দটি লইলে! ও সায়েন্স, তোমরা ঐ শব্দ লইয়াছ (আকর্ষণ) তাই তোমরা মানুষের! ঐ সৌখীনতা মুঘোল-জাঁক হইতে কোটিগুণ, আমরা পড়িতেছি মধ্যপথে শত অশরীরী, জোড়হস্ত আমাদের বন্দনা করিয়া কহিল, তোমরা কে?

আমাদের স্মিত হাস্যতেই, রজত গুণ দর্শনে, ন্যায়তত্ত্বের প্রাপ্তির উপমা যাহা নহে, কিয়দংশ অনুমান করিল, যখন প্রকাশ করিলাম ঃ আমরা স্বাতি নক্ষত্রের ...

তাহারা বৈদিক গীত গাহিতে মধ্যে বলিল ঃ তোমাদের অস্তিত্ব নিয়মাহত না হউক, তোমাদের বাস্তবতা রহস্যাবৃত থাক, তোমরা প্রাণভ্রমর হও ঃ আমরা কান্দিতেছি তোমরা তোমাদের গতি শীঘ্রয়মান হউক; আমাদের ক্রন্দন আমাদের নীচে যাহারা সেই পর্য্যন্ত শান্ত, সুখকর ও আর্দ্র করিবে, ইহাতেই আমাদের মুক্তিলাভ হইবে—তোমরা সত্বর যাও শঠ মরজগতের সকল নিঃসঙ্গতা বিবিধ শব্দে অপহরণ করিতেছে, তাহাদের তাত্ত্বিক দিকহীনতায়। তাত্ত্বিক সূর্য্যহীনতায়; অর্থ সূর্য্যের বর্ত্তমানতায় বর্ত্তমান অতীত ভবিষ্যৎ সিদ্ধ হয়! লইয়া যাও এখন আমরা মুক্ত হইলাম, মন্দাকিনী তীরে যাই, অবগাহন করি, তমসা নদীর জন্য সান্ত্বনা চাহিব! আঃ কিরণমালা!

আমরা নামিতেছি; যে আমাদের সংযম আমাদের, এখন, আলোকবর্ষ সীমিত হইতে প্রগল্ভ হইতেছে, ত্রিসন্ধ্যার একটি গীতগত পর্দ্দাতে মিশ্রপ্রাপ্ত হইয়াছে, বিভক্ত আহ্নিক-গতি-ক্রিয়ার জাঁতে বহু গোঙানি শ্রুত হইল, আমাদের সান্নিধ্যেই তাহারা জিহ্বা ও শব্দ প্রাপ্ত হইল; বিবৃতিল ঃ আমরা অতৃপ্ত সকল, আমরা যেমন ত্বক-প্রত্যক্ষ-সমর্থ শরীর পাইলাম যাহাদের দ্বারা সেই কি তোমরা । তুমি সকল, আঃ আমাদের গাত্রে আর্দ্রতা কেমনে ...।

আমরা স্বাতি নক্ষত্রের, পূর্ব্বের, উর্দ্ধর সকলে আমাদের ছায়া নিমিত্ত ক্রন্দিত হইয়া, উহা নিশ্চয় সেই বাষ্প! আমাদের পথকে শরৎকালীন সৌন্দর্য্য দিয়াছেন—আমি প্রতিমা, এখন তাই! ভগবান যেখানে অবতার হন সেখানে যাইতেছি।

আঃ কিরণমালা...

এই কিরণমালা কি! তুমি আমাদের উহার গল্প বল ...

ঐ শব্দই এক অবাক গল্প, উহা অবলম্বনে বহু মতান্তর আছে, উহাই গল্প। তত্ত্বমসি, দীপ হইতে দীপের উৎপত্তি জ্ঞানের অনুভব সমক্ষে যে আপনার ঐশ্বর্য্য বিকিরণ করে, আমাকে ক্রন্দন দাও মুমুক্ষতা লাভ হইবে, যে এবং তোমার পথ শান্তরসাম্পদ প্রীতিপ্রদ হইবে তুমি শুকাইবে না।

সংঘর্ষ, বিঘট্টনে, আমরা প্রৌঢ় শিলাবৎ, যে সংকুচিত হইলাম না, স্তরগত জাঁত মনুষ্যলোকের নিমিত্ত তাহা এখন আমাদের আটকা নহে, মরলোকের নাসা স্পন্দিত হইল, তাহারা আরও স্বাভাবিকত্ব আশে জানলার নিকট, জন্তুগণ আস্তানা হইতে, পাখীসকল কোটর হইতে, বিলম্বিত সর্প গর্ত্ত হইতে, মৎস্য ঘোঁজ হইতে উন্মুক্তর সন্ধান করিল, মীনের দেশ, space, তদীয় ল্যাজে বহন করে। আমরা পতিত হইতে আছি, ক্রমে ভাস পাখীর আকাশ, ক্রমে (রামায়ণ দেখ) ক্রমে প্যারাসুট আকাশ, তুষার, পাতার, এখন জল নিরবচ্ছিন্ন শব্দভেদ করত যাইতেছে, আপন নিটোলত্ব, বিন্দুত্ব, তরল ধর্ম্ম, আলো পরমাণুর ন্যায় আপন পরিধিতেই আছে! এইখানে অনেক লজ্জাবতী, এইখানে অনেক অনন্তমূল লতা, আকছার ফার্ণ, সুন্দর মনোরম মিষ্টি দেখিতে ব্যাঙের ছাতা (শীলিন্দ্র) অজয়ের বিশীর্ণ ধারাতে এবং অনেকে যাহারা টাওয়েল দ্বারা মাছ ধরিবার জন্যে আপ্রাণ করে; সেটা তোওলিয়ার বাধাতে জলধারা শব্দিত, আমরা সকলে বহু শতাব্দী ঐস্থানে যেমন বা আছি, যে তাদৃশ ঘটনাই আমরা, কাটিলে লাগে, খেলিয়া থাকে, ঘুমাইয়া পড়ে, ক্ষুধা পায়, ভালো আবার যুগপৎ মনন হয় কেহ আমরা তাহা নই, যে তখনই, নিশ্চয় কখনও আমরা ঐ এইরূপে ছিলাম, অবর্ণনীয় এক বাসনা মিশ্রিত ক্ষুণ্ণতা অসন্তোষ, খুঁৎখুঁৎ আমাদের নিঙড়াইতে বিষাদ যুক্ত করিতেছিল; আমরা বলিয়া উঠিলাম, ইস কি, মানে ঐ বিশাল জলরাশির মধ্যে আপনি নিজে জলবিন্দু হইয়াও আপন স্বতন্ত্রতা খোয়াই নাই; আমার বারম্বার ঐ যাত্রা বিশেষত সমুদ্রর ভিতর দিয়া, শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন সমুদ্রের রত্ন রাজি — লক্ষ্মী — অপহৃত হইয়াছে তাই অদ্যও তাহা বিক্ষোভে, মাগো আমাদের পারম্পর্য্যর মধ্যে উহা চমক নিবিড় সূত্র, আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব শিবকে মাগো নীলকণ্ঠ হইতে দেখিলাম, তাহার মহত্ত্বে আমরা প্রত্যহ বিল্বদল আহরণ করিব! যে মহা অভিজ্ঞতা অ্যাকোয়ারিয়ামের নৈসর্গিক স্তোভ, এখানে মধুসূদনীয় গাম্ভীর্য্য, যাহা স্থানীয় চালাকমতি পরিবেশে, প্রায় ফ্ল্যাটে, অনন্য চিন্তাশীলতা বৈ অন্যথা ভাবিবার হয় না, সেই রহস্য ভেদ করিতে যাই, মৎস্য সকল পথপ্রদর্শিতে আছে মুক্তা সন্ধানীরা করজোড়ে যে আমাদের স্থায়ী রাখিতে তাহাদের পদদ্বয় ক্ষীপ্যমাণ চলমান আছে যে তাহারা বলিবেঃ আমরা বিগত জন্মে দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত ভগবান শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত মঠ যোশী শৃঙ্গেরী, সারদা ও গোবর্দ্ধন মঠ চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত তীর্থ, আশ্রম, বন অরণ্য গিরি পর্ব্বত সাগর সরস্বতী ভারতী ও পুরী এই দশ নামে স্থাপিত ব্যবস্থার সন্ন্যাসী। সকল মধ্য এক একটি যে আমরা আপ্তকে ন্যায়সূত্রের একটি রূপে অগ্রাহ্য করার পাপে এবং মুক্তাতে রজত বুদ্ধি সিদ্ধ হইয়া থাকে! (হায় ভাগ্য। বঙ্গের শরৎকালীন সন্ধ্যা মায়াবিনী, তখন দক্ষিণায়ন মুক্তাতে আমি অরুণোদয় দেখিলাম) ইহা গুরুগৃহে স্বাধ্যায় কালে সম্যক বুঝি নাই অথচ ভাব এমন করি যেমন উহা আমাদের নখদর্পণে; সুতরাং এই জন্মে আমরা মুক্তাজীবী; এখন আমাদের অভিজ্ঞতা আপ্তবাক্যরূপে গৃহীত ফলে আপ্ত অভিজ্ঞতাতে প্রতিষ্ঠিত। রজতগুণই মুক্তার সৌন্দর্য্য জানি! আর ঐ যাহারা দক্ষিণ অঞ্চলীয়রা উহারা কেহ রামায়েত কেহ বা বৈষ্ণব কেহ সৌরীয় কেহ শাক্ত, পূর্ব্বজন্মের বিচ্যুতিতে, অদ্য মুক্তাসন্ধানী এই কৃষ্ণমুক্তার গুণাগুণ জানে, আরব্য সওদাগররা উহাদের শ্রদ্ধা করে, ঐ বিচার স্বাদ গন্ধ উষ্ণতা, শিক্ষার নিমিত্ত অনেকেই পরবাসী হইল যাহারা এবং এখানে প্রাণত্যাগ করিল তাহারাই ঝিনুক যাহা তুমি আবিষ্কার কর, সমুদ্র বেলাতটে কুড়াইয়াছ তুমি কঙ্কাল কুড়াইয়াছ! আঃ যাহাদের মস্তক হৃদি আর খাদ্যগ্রহণ ক্ষমতা, প্রায় সন্তান উৎপাদন রাহিত্যে ক্ষমতা একদা ছিল। তোমরা যখন শীতকালে দ্বিপ্রহরে ছোট তুচ্ছ অভিমানে উহাতে বাস কর, অজ্ঞাতভাবেই! আজ তোমাদের পুণ্য দর্শনে আমরা পবিত্র দিব্য জীবনে উন্নীত হইলাম। চল শঙ্কর মাছের পশ্চাতে যাও যে জলকণাতে মৃত্তিকার প্রভাব নাই, যে যাহা সৌরীয় আকর্ষণে স্বচ্ছ, যে যাহা সেতুবন্ধ সংযোগে, দূর-সম্পর্কে, গঙ্গোদক তুল্য, তাহা ভেদ করত বা এখন যাও! শুক্তিকা আপন দেহ দুহাট উন্মোচন করিবেক!— ইহা ভাবিতে, অভিজ্ঞতা হইতে কালেই আমাদের অসম্ভব সর্ব্বশরীর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইল, ঐ যে এবং ঐ চমৎকার অলৌকিক ইতিবৃত্তে যাহা আমাদের কাহিনী আমাদের বর্ণলাবণ্যময় হইয়াছে তাহার বর্ত্তমানতা কিঞ্চিৎমাত্র ম্লান নহে, ঐ রাবণিক ক্রোধে বিশ্বামিত্র ন্যায় আমরা ক্রোধান্ধ হইলাম, (শ্রীঅরবিন্দ কৃত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের কাহিনী) আমরা তৈলামন পুত্র আজাক্স-এর ন্যায় দুর্মদ ক্রোধে দিকজ্ঞান হারাইলাম

আমরা পুড়িতেছি— যেহেতু আমাদের অন্তরাত্মা বলিয়াছিলেন এই বৃত্তান্ত বিশ্বাস বহু দূরের কথা, কেন না এখানে বাবাকে বিশ্বাস করি না এক গৌরব,... এমত রাজা নাই যিনি একাই নহেন, যে তাঁহার রাণী সকলে, এমন কি যিনি গোঁসাঘরে ছিলেন তিনিও গল্পটির নামে; 'স্বাতি নক্ষত্রের' গল্প; যিনি পদ্মপত্রে, আপন রতি খেদ জ্ঞাপন নিবন্ধনেতে আপন, স্ফীত হওয়া অবয়ব-তাড়নাতে এলাই দিয়াছিলেন, যে তিনিও; যে রাণী, সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড়, শিলে বাটিতে আছিলেন তিনিও বৈকি, কুঁচবরণ কন্যা আবেষ্টিত রাজা, মন্ত্রী, কোটাল, জহ্লাদ, পক্ষীরাজ, ত্রিকালদর্শী শুক পাখী, বিড়াল, কুকুর লইয়া আমাদের গল্প শুনিবেন! আমরা স্বস্তিবচনপূর্ব্বক, কহিব, হে আমাদের দেবতা, হে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, আদি তুমি, তুমি দেবীপক্ষের অষ্টমীতিথির নির্দোষ মুহূর্ত্তের অমৃতযোগজাত অনুপলের মধ্যস্থিত কম্পন প্রসন্ন হও, অবধান কর! উপরে এক বিরাট বিশাল আদি অন্তহীন যাহা অন্ধকারে ওতপ্রোত হয়। রাজন! ইহা এক অপূর্ব্ব রহস্য যাহা ঋষিগণ বহু যাগযজ্ঞে অগ্নিহোত্রী হইলেন, নিত্য অভিনব পন্থায় অগ্নি সন্ধান করিতে লাগিলেন, যে ঐ রহস্য জানিতে; সূর্য্য আমাদের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক! ইহা মান্যে আমাদের মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তাঁহারা অবশেষে এক অগ্নি দৈবপ্রভাবে প্রাপ্ত হওয়ত মান্য করিলেন, যে এবং স্বীকার করিলেন, সূর্য্যের দেবত্ব যে তিনি, মানুষেরে বিভ্রান্ত করত, ঈদৃশী বিশ্বরহস্যকে অবাঙ-মানস-গোচর রাখিলেন! ভালো এখন ঐ বিরাট নভোমণ্ডলে, মানুষ কতটুকু অথচ তাহার জিজ্ঞাসার নিমিত্ত কি অঢেল বিরামহীনতা! রাজন এক আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন তারকার রাসলীলা! এই উক্তির সঙ্গেই প্রাসাদের এই— একশোদুয়ারী বিচিত্র রত্নমণ্ডিত, ঝাড়লণ্ঠন পরিশোভিত চিত্র কম্বলস্থ (রামায়ণ) মূর্ত্তিসকল, দেওয়ালাৎ প্রলম্বিত শত্রুদমনের অস্ত্ররাজি সবই এক আলোকে ঝলসাইয়া উঠিল, যে অনৈসর্গিক কুহক সঞ্চার হইল, সেই ক্ষণেই রাজা এবং সকলেই বা আবেশময় ঘোরে শ্লথ, এমন যে গল্পকথক, চক্ষুসকল তেমনি, যেমন চাহিয়া থাকিলে, অথচ যে নিস্পন্দ! তিন দিবস পর সমস্ততে এককালে উচ্চারিল কি মহৎ কি অনবদ্য! তাহার পর! অহো পৃথিবী কি আশ্চর্য্যের ছিল, যে যেখানে কাঠের লাঙ্গলই গ্রামে নির্ভরতা আনে, যে এবং এই সকলের উৎসবময় স্বরে, যে এবং সুদারুণ ঐকান্তিক আগ্রহতেই ঐ শব্দ 'তাহার পর' অবিশ্বাস্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। অপ্রার্থিত স্বকীয় বস্তুত্বরূপে দৃশ্যমান হয়। ওবজেকটিভ বাস্তবতা ঐ নিরেটত্ব এবম্প্রকারের হয় যে উহা সহজেই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বশ্য, আবার এবং যে এমনই বুঝায় যেমন, যখন ঐ, তাহাতে অধিবিদ্যার সূত্রকে মানে যে জগতকে বাধা দিতে সমর্থ আছে, যে উহার ধ্যান ধারণাকে জড়বাদীরূপে ইহকালে পরিগর্বিত হইতে হইবে; রাজন তাহার, ঐ তারকার নাম স্বাতি; যে এবং উহা হইতে একবিন্দু জল পড়িল, ক্রমে দিন ও যামিনীর মধ্যে আসিল ক্রমে মাছরাঙার আকাশে... এ পর্য্যন্ততে যখন, শ্রোতামাত্রই আসীন অবস্থাতে সম্মুখের দিকে ঈষৎ টাল, যে একজন রাণীর চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল বা আলো ও অন্ধকারে (যাহা নিজস্ব) বিকট রূপ ধারণ করিল। মুখব্যাদান করত ঐ বিন্দুকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া, আঁ আঁ শব্দ করিতে লাগিল; যখন বিভীষিকা, তাহাকে গল্পকথক স্বীয় স্থিতপ্রজ্ঞা যাইতে দিল না, ... একবিন্দু জল সাগরে পতিত হইল, যে এবং যুগপৎ দেখা গেল, ঐ রাণী আর নাই কালান্তক ভয়ঙ্করী রূপ পরিগ্রহে রে রে বচনে সাগর উদ্দেশ্যে ছুটিল! যে গল্প শ্রবণে শুক কহিল, এই চিরঞ্জীব, যেমন ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান, বিভীষণ ইত্যাদি তেমনই! ইহা গঙ্গোদক তুল্য ইহা বাঙালী!

সে প্রকাশ থাক্, এবম্ভূতভাবে আমাদের ক্রোধ তিলমাত্র প্রকাশিত হয় নাই, কেন না টেবিলে, প্লেটে কাঁটার আওয়াজ করিতে কালে যখন উহা বলিতেছি, মা'রা তখন শুনিতে কালে, বাজারের হিসাব লইতেছিলেন। মাঝে মাঝে মন্তব্যিলেন, চোর হইয়াছে, ভগবান! হীন লোক সকল; সরকারও অদ্ভুত!... আমরা নিয়ত ব্যাহত হইতেছি; আমাদের আমিত্ব এখন যাহা সম্পূর্ণ হয় অভিনব, বন স্থানের ঐ সবাক্ পদবন্ধ যাহা প্রথমত খানিক দেহকে শুধু স্পন্দিত এবং ধীরে প্রভাবিত করিল। যে উহারে মান্য করিতে, আমরা একে অন্যের দিকে, ধীরে থমকিয়া উপর্য্যুপরি, একটুর পরে আরও কিঞ্চিৎখানিক, নেহারিতেছি যে এই প্রথম একে অন্যের জন্য লজ্জা নাই, প্রকাণ্ড ডেকচি সকল, ট্রানজিসটার, ২২২ এয়ার গান, কিছুই আমাদের জাগতিক যে মানে বাম-রাখিয়া চল, যে ঘাস মাড়াইও না, যে এবং চুপ-কর, দৌড়াইও এবং না; যে এবং টি-এর মাত্রা কাটা, আইতে ফুটকি; কাদামাখা বল ধোপ সার্টে লাগার গর্ব্ব! সকলই যেমন বা কাগজ নির্ম্মিত নৌকার মত হেলিয়া; তাহাতে মুখ আমাদের কাবাসে এখন তন্নিমিত্ত আমরা রুমাল আন্দোলন করিতেছি! যে এক মুহূর্ত্তে আমরা আশ্চর্য্য বদলাইয়া গিয়াছি বাড়ীর এখানে সেখানে যে বিদেশত্ব আরোপিত, সেখানেই এই কথা লইয়া যাইব; এমনও যে তৈজসপত্রে মানে সমস্ততে যাহাতে ফাঁক, ছিদ্র, গহ্বর, জাপানী ল্যাকার করা বাকসটি; ফ্রিজের শুভ্রতাতে ড্রয়ারে যাদের পারফিউম শিশিতে আলমারীর পিছনে; সেই সেই স্থানগতর জন্য মন তাজ্জব নোসটালজীয়া লইয়া যাওয়া আসা করে। যাহার সুভিনীর স্ট্যাম্প, ফোক আর্ট যেমন ও এখানে বাড়ীতে বাঁকুড়ার ঘোড়া, রাজস্থানী (সস্তা) ছবি, পুরীর পট। কেহ যখন আমাদের বাড়ী আসে, মা-রা তখন ঐ ঐ নিদর্শনের পাশে যায়, উৎফুল্ল হওয়ত কহেন ঃ হয় না কি ঐগুলি মিষ্টি? ও আমি কি ভালবাসি!

সে এবং অভ্যাগতরা বিনীতভাবে নিবেদন করিয়া থাকে ঃ বাস্তবিক এই সব আর্টের নিদর্শন, সুন্দর রুচি পরিচায়ক বস্তু! শুনিয়া থাকি খুব দামী।

আমাদের মা-রা উত্তর দিলেন ঃ দাম মোটেই নহে, খুব সস্তা ... এবং খুব আলতো, সভ্য, চমৎকার স্বরে ঈষৎ রাশভারি ওষ্ঠে, যোগ দিলেন ঃ ও তাহা বলিয়া ভাবিও না ইহাতে আয়কর মকুব, মানে, কিছু সাশ্রয় হয়, ... ইহা কেন জান, শুধু আমি ফাঁকা দেওয়াল সহ্য করিতে পারি না, ফাঁকা দেওয়াল আমাকে কষ্ট দেয়।

অভ্যাগতা এই সূত্রে ঈষৎ চঞ্চল হইলেন, কেশরাশিতে মৃদুভাবন দিয়া, মনেতে কি বা যেন পরামর্শিত হইয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ... অবশ্য তুমি ... ব্যাঙ্ক বা অফিসের দেওয়ালগুলিকে? তোমার মানে... ধরিতেছ না মানে তোমার কথাতে...

কোনক্রমেই না... ও কি বিশ্রী হইয়াছে ঐ সকল দেওয়ালগুলি... আমি বড় লজ্জাতে থাকি... আমার পরিচিত বিদেশী এক মহিলা খুব দুঃখপ্রকাশ করিলেন, কহিলেন এমন আর কোথাও নাই... আমার স্বামী, এক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছেন বিদেশে, মানে ফ্রান্স দেশে ইহার খুবই প্রচলন ছিল... তাহার পর আইন প্রণয়ন করত উহার নিরসন হয় ...

আমাদের মা-রা হাঁপাইয়া উঠিয়া পুনরোপি উল্লেখিলেন ও ফাঁকা দেওয়ালেরা আমারে যাদৃশী ভীত সন্ত্রস্ত করে তাহা কি বলিব, এমন যে আমার মনে হয়, আমি যেন কোন দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রের মুখে মানে সেই ব্যাঘ্র আমাকে তাহার দারুণ ধারাল দাঁতে বহিয়া লইয়া, তদীয় গুহায় ফেলিয়াছে, ... ইহা শ্রবণে, বোধহয় তোমার সময় নষ্ট করিতে আছি না, মানে খুব ঠিকভাবে বলা যায় — আমার ডাক্তার... একজন প্রসিদ্ধ মানসিক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ, ... প্রায়ই উনি বিদেশে যান। জাপান এই ডাক্তারকে খুব মান্য করে... উত্তর করিলেন ঃ আপনি যথার্থ অভিজ্ঞতা দিয়াছেন ... এমন যদি সবাই সমর্থ হইত,... উহাকে নাম দিব সুলক্ষণ, আপনি ঐ গরমজলে স্নান করা বন্ধ করুন, আর ভারতে যখন আমরা, এবং এক বিশেষ প্রদেশে আমাদের জন্ম তখন... মাটি আবহাওয়া মানিতে হইবেই; ডাক্তার আলোচনা সকল সহজবোধ্যর জন্য, বুঝায় যে, রীতিমত আড়ষ্টতাতে রহিয়াছেন। কেন না বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রোগীরা শুনিবে, কিন্তু নিজস্ব প্রতিক্রিয়া দিয়া যে এবং তর্ক করিবে বটে, কিছুতে যাহা সত্যই, তখনই বা এবং সাধারণ-করা (generalisation), অতএব ঐ ঐ স্বতন্ত্রতাকে দেশজ ব্যবহার রীতি বলিতেই হইবে... আর যে ঔষধগুলি বলিলাম উহা...

আমি জানিতে চাহিলাম ঃ যাহা হোক উপদেশ দিলেন — তাহা প্রতিপালিত হইবে কিন্তু আমি ঐরূপ দেখিয়া থাকি কেন!

ডাক্তার সহাস্য মুখে ঈষৎ ইতস্ততর পর বলিলেনঃ সম্ভবত আপনি ঐরূপ দেখিলে শান্ত থাকেন তাই? আমি তদীয় ব্যঙ্গোক্তিতে মৃদুহাস্য করত ধীরে নিবেদন করিলাম ঃ এই শান্ত থাকাকে মানে থাকিতে চাওয়াকে আপনি কোন ব্যাধি আখ্যা দিবেন। ঐ ফাঁকা দেওয়াল.... আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষভাবেই আমাতে অপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে নিক্ষেপ করে!

দেওয়াল একটি সুলভ প্রতীক, আমার এক সহপাঠী বাস্তইল পতন বলিতে সমগ্র বাস্তইলকে একটি প্রকাণ্ড লম্বা দেওয়াল ধারণা করিত ঃ ইতিহাস বলিবে উহা একছত্র রাজ্য শাসন নীতির প্রতীক। আপনি মহোদয়া যদি পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে আমাকে দেওয়াল ও তাহার ফারাকত্ব, এক বুঝি, এই প্রশ্ন করিতেন মানে কোন সূত্রে আপনার প্রশ্ন যদি আমার নিকট আসিত তখন সেই ক্ষেত্রে আমি নারী স্বাধীনতা লইয়া লিখিতাম ; দেশীয় নারীদের জন্য দুঃখ করিতাম, ... এখন দেওয়াল আপনার বাধা নহে, আপনার সৌখীনতা, ইজ্জত, এখন ভয় ঐ ফাঁকাত্বে... খুব metaphysical দুর্ভাবনা!

মানে...

ঐ শব্দ বিষয়ে আমার তত্ত্বজ্ঞান তাই — তথাপি... মানে অনেকাংশে দার্শনিকত্ব আবার পুরা দার্শনিকতা...

ইহা শ্রবণে, আমি জানিবেন, ভারী অগোছালো মুস্কিলেতে... ইহাতে অভ্যাগতা তৎক্ষণাৎ রা কাড়িলেন অভ্যাসে বা আচারবশতঃ বেচারী আপনি, সামনে-পড়া ভাবিবার বাহিরে।

অল্প শ্বাস ত্যজিবার শব্দর সঙ্গে, ইহা থিয়েটারেতে যেমন, ইহা উচ্চবংশ মর্য্যাদা সম্ভূতদের অনুকরণ, উত্থাপন করিলেন ঃ আমি ঐ কথাতে সাধারণ নিয়মে, উচিত যাহা — মৃদু হাসিয়াছি...

ঐ ডাক্তার, ঐ হাসি দর্শনে, যাহা মলিয়ের-এর ভ্রূকুটির, আশ্বস্ত হইলেন যে তাঁহাতে আর তত্ত্বকে বিশদের দায়িত্ব নাই; আদতে তিনি ঐ শব্দ যখনই, এমনই কোন অচিরাচরিত লক্ষ্মণ, শ্রবণ করিয়া থাকেন, তখনই ব্যবহার করেন, যে কথাটিতে বেশ একটি গীত ঝঙ্কার আছে; কোন দায় নাই!

এই সকল বিবৃত করিতে আমাদের মা-রা সেখানে দেওয়ালের সমক্ষে আছেন এখন তাহার পাউডারের ছ্যাতকণ্ঠ ধরা যেমত বক্ষের অনেকটাতে সেইমত ছ্যাতা আর বিশ্রী প্রতীয়মান হয় না — আমাদের চোখে আর কষ্টদায়ক উহা নহে অর্থাৎ ঐ ছ্যাতা অনেকটা ক্ষয়িত হওয়া কোন ধাতু নির্মিত সমতল, যে অদ্ভুত ইহা পরিলক্ষিত যে ফিকে সবুজ আভা ঐ ক্ষয়-হওয়া স্থানের পার্শ্বস্থ যে স্তর, যাহা ক্ষয়ের ফলেই সংজ্ঞায়িত হয়, তাহার নীচে হইতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে, যেমন নব্য আর্টের ছবির, অনেক নিদর্শনে আছে; হাতের, ব্লাউজের বাহুহীন উপরে যেখানে যেস্থানে পাউডার তাহাতে স্থূল হস্তপেশী হালকা এবং চমৎকার ডৌলত্ব লাভ করিয়াছে — ডৌলত্ব থাকিয়াও! যাহা নিশ্চয় মনোলোভা উহা, ডৌলত্ব, আশ্চর্য্য যে তাহার রেখার যোগ, যাহা যে কম্পিত কিছু প্রত্যক্ষানুভূত, সাপেক্ষ, স্মৃতি অবশ্যই, যে উহা ঐ স্থূল বাজুতে আপন স্বকীয়তা হারাইয়াছে, যে এখন ছবিত্বর আড়ার ক্বচিৎ অংশ, যদিও উহাতে ছবিত্ব সব বুঝায় না, শুধু যে আমাদের মনস্ক করে, বৃত্তি দিবে, যেমন বটে যে আমরা কোন, গীতের ফিকে রেশ শুনিতে ত্বক হইতে সকল ইন্দ্রিয়কে একীভূত করিয়াছি! ইহাতে আমরা খুব

ভোরে, প্রাতঃভ্রমণে আমাদের মা'রা যখন ডাক্তার উপদেশে উহা পালনে নিষ্ঠাবতী, তখন তাঁহাদের সহিত যাই, তখন পার্কের রেলিঙে হাত স্পর্শে যে খেলা উপলব্ধ নিত্য, তাহার স্মরণে এখন যে ভাল আমরা মৃদু হাসিলাম, ইহাতে আমাদের দেহ, নৃত্যনটের তুল্য, মাথা নোওয়াই যেমন করে, মাগো সুন্দর আলোতে তাহাতে ছিনিমিনি কাটিল, না তাহা নহে, সার্কাসের টেইল কোট পরিহিত, চাবুক হস্ত, গোঁফ খাসা যাহার, যেমন যে গ্যালারী আছে বৃত্তাকারে, তজ্জনিত আনত মস্তকে, শুশুকের মত উঠাইয়া দেহের ভাগ, প্রণত হয় এবং বাদকদের নৃত্যনট তাহা করেন— তেমনি আনত হইতে চাহিল! আমাদের মা-রা কহিলেন, মহাশয় ব্যাধি সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি উহা কেন তাহা আপনারা, বিশেষজ্ঞ আমাদের কৌতুহল আছে — কেন!

ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। ভ্রূযুগের একটি আপন স্থান মানিয়া সটান হইল, যাহাতে আমাদের মা'দের মনে, ঐ অভিব্যক্তির অনুষঙ্গ বিস্ময়ের সঞ্চার করিল। কি অদ্ভুত! তাঁহারা যেমন অন্তরে শৃঙ্খলা হারাইলেন যে এমত সময় ডাক্তার কণ্ঠে শব্দ প্রস্তুতির উস্‌খুস্ আওয়াজ হইল; এখনও তিনি মীমাংসাতে, যেখানে বাঘ! বলিলেই যথেষ্ট, সেখানে, সুবদ্ধ একটি কার্য্য-ধারা, তাহা হইলে, বটে মানিতে হয় সতর্কতা বোধ, সূক্ষ্মতা আরও গভীরে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব খোয়া গিয়াছে; গাড়ী স্টার্ট-লওয়ার নিশ্চিন্ততা, ধীরে বাঁচিবার রম্যতা, স্বস্তি আনিয়াছে; (আঃ আমি যখন প্লেন দেখি, প্রথম, গড়ের মাঠে বিচালী পাতা হাজার হাজার উদ্বেগ। ইহার পর সমস্ত জটিলতা আমার টাই-বাঁধার মধ্যে ইহাতে সময় ও কার্য্যকারিতার দক্ষতার বিষয় যাহা, আসিয়াছে)... এখন এই পারম্পর্য্য পশুতে ধরিল মুখেতে লইল গুহাতে লইল... সর্ব্বশেষ পর্দ্দা বা গীত রাগের নাম নিশ্চয় আনন্দ দিবে না; অথবা ইহারা এত বহির্মুখী, জ্ঞানহীন শিশুবৎ, যে সমগ্র ইন্দ্রিয় হইতে কেন্দ্রীভূত হইলে তবেই চিত্তবিকার। অথবা ইহারা সম্পূর্ণ জজের মত প্রভাবিত যাহাতে না হয়েন তাহাতে তাহারা প্রায়ই চমৎকার নেট ঢাকা জলের গেলাসের প্রতি নজর দিয়া থাকেন! যে এবং ডাক্তার ইতোমধ্যে বার দুয়েক টেবিলে রক্ষিত নোট-প্যাডে কিছু টুকিয়া থাকেন; এবং এখন কলমটি এমতভাবে, নিক্ষেপ বলা যায় না, রাখিলেন যে যেমন এতাবৎকার ধৈর্য্যচ্যুতি বিহিত হইল ঃ ও ঐ ফাঁকাত্ব। ঐ ফাঁকাত্বই আপনার প্রশ্ন!

আজ্ঞে, ডাক্তার।

আচ্ছা কবে হইতে মহাশয়া আপনার এই বোধ... অবশ্য ইহা সত্য যে ডাক্তার ইহা বিবেচনা করেন যে, সেই ফাঁকাত্ব যখন একটি ছবিতেই যায়—এই সূক্ষ্মতা বোধ ইহাতে নাই, যে দেওয়ালস্থিত অবলম্বিত, ফাঁকাত্ব তখনই ঝটিতি ছবিতে বর্ত্তাইয়া থাকে— তখন উহা সংস্থান বোধ, তখন উহা অলঙ্কৃত করার বৃত্তি; অতঃপর যাহা ডাক্তার অনুমান করিলেন তাহার অর্থ যে ঃ অথচ ইহাদের মধ্যে শরৎকালীন সকালে, রৌদ্র নেহারিবার চিত্তবৃত্তি, বল, নাই— বারম্বার আমরা শরৎকালকে প্রাধান্য দিতেছি এই কারণে যে ইহা পলে অনুপলে হিন্দু, ইহা উচ্চবংশীয়দের, দাগ, এবং বাঙালীর। এবার ডাক্তার পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়ার কবে হইতে ঐ বোধ... তখন কি আপনি রোগমুক্ত অথবা...

কিছু নয় ... তবে কবে হইতে তাহা বলিতে পারিব না...

কোথায় এইরূপ ফাঁকাত্ব লইয়া আলোচনা শুনিয়া ছিলেন কি... ব্যায়রিঙ শব্দটা...

এইতো, আপনি জানেন, আমি একেবারে কুণ্ঠিত হই, উহা আমাদের অতীব প্রিয় শব্দ... সংস্থার ডিরেকটরের স্ত্রী কি অপূর্ব্ব স্বরে ব্যায়রিঙ কথা ব্যবহার করেন নহে কি? সেদিন দেখিলাম আমাদের গ্রুপ ইনডাসট্রীজের... স্ত্রীরা উহা বেশ রপ্ত করিয়াছেন, হ্যাঁ ডাক্তারকে উত্তর করিলাম ঃ উহাতে একটি সাদা শব্দ...।

তাহা হইলে আপাতত যাহা মনে হয়, গলফ খেলা ছাড়িবেন না, আর যে উহা আপনার সে সংবেদনশীলতা... উক্তির পরক্ষণেই অল্প মৌন রহিয়া ইহা কষ্ট করিলেন যে ঃ উহা আপনার রুচির পরিচায়ক এবং তাহার প্রশ্নের যে সুযোগ ছিল, যাহা আপনি কি সত্যই ঐরূপ ভয় পাইয়া থাকেন! না আপনার সৌজন্যবোধ (!) যে যেহেতু আমি মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।

আমি জানিতে চাহিলাম কিছু পূর্ব্বাহ্নে যে শব্দটি মানে মাপ করিবেন ঐ এম দিয়া ফিজিক্যাল দিয়া শব্দটি শেষ (ডাক্তার শান্তভাবে কহিলেন ইহা কিছু নয়।) আমাদের তীব্র বাসনা হয় ঐ শব্দটি কি জানিতে মানে উহার উচ্চারণ...চমৎকার কথাটি।

অবশেষে ডাক্তার কহিলেন— মহোদয়া মানস-রোগ বিশেষজ্ঞ জানিবেন, আমাকে এই বলিয়া গর্হিত মনে লইবেন না, এই সব abstract লইয়া খেলা করিবেন না। জানিবেন উহা মারাত্মক! মৃত্যুর দয়া আছে কিন্তু ইহার নাই... উহা উট সদৃশ!

কিন্তু জানিবেন এত সত্ত্বেও আমা হইতে ঐ আজব ধারণা সরিল না আর আমি প্রায়সময় অন্যমনস্ক হই, ক্লাবেতে এই লইয়া অনেক আলোচনা হয়।

যে ঈদৃশতে কাতর, কোন কিছুর বা তত্ত্বের মধ্য সম্পর্কীয় মধ্য সংজ্ঞার জ্ঞান লুপ্ত অভ্যাগতরা কোঁকাইতে ধীরে সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন ঃ ও কি পর্য্যন্ত দুঃখের, ইস কিবা দুঃখের! সেই সেই শান্তরসাস্পদ স্থান সকল যাহা আমরা গোপনে করিয়াছি, সেইখানে যাইব, এই ঘটনা স্বাতি নক্ষত্রের তাহা সেখানে গোপনে লুকাইয়া রাখিব, বিছানা ঘর — ইহা সব বিশ্বাসের নহে; ঐ স্থানে উহার মঙ্গল হইবে; একারণ

বটেই যে ঐ স্থানীয় প্রতিটি বিন্দুই ইহার ধন্ধ হইবে! ও কলিকাতা, আমরা কলিকাতাকে কি ঘৃণা করি। ঐ বিন্দুর জীর্ণতা ক্ষয় হ্রাস বৃদ্ধি আছে ইহা অতিবড় শক্রতেও বলিবে না; এখানে তো আমরাই আছি তবে উহাই আমরা এমন জানিতে কুণ্ঠার, ব্রীড়া, কিছু নাই! আমরা কলিকাতায় আর ফিরিব না, সকলেই কয়েকটি কথা বলে দ্যোৎ! দূর পাগল! মানে, তাহাতে কি বুঝায়! হ্যাঁ ঃ অবজ্ঞা যাহা অবিশ্বাস হইতে, অথচ ঔষধের ক্ষেত্রে যে তাহার বিশ্বাস, যেখানে সেখানে অথচ গনৎকারের প্রতি শ্রদ্ধা অবিচল, এই র‍্যাশনালিটি সমক্ষে ঐ কমনীয় লক্ষ্মী ধারা খুকু ভাবনা ফুৎকার লাভ করিবে, কেন না অভিজ্ঞতা এই ঃ ওঃ তুমি বড় আগলা পাগলা কথা বল! চেষ্টা কর বয়স মনে রাখিতে একটু রাশভারিতা নাই লঘু চিত্ততা পরিহার কর, যত উদ্ভট! কনভারসন টেবল মুখস্থ হইয়াছে, এখন বল ... কত ইঞ্চিতে এক মিটার, এক ফুটে কত সেন্টিমিটার... হ্যাঁ এখন যত অপবিত্র! (ইহা শব্দটি মাত্রার মত ব্যবহৃত অর্থব্যঞ্জক নহে) বাজে গল্প; ডেভিড ও গলিয়াথ দৈত্যের গল্পর সারমর্ম্ম কি বল ... তুমি জান না ঈশপের গল্পে পশুরা কেমনে কথা কয়! এ ইহা হইতে 'দুগ্ধ সরবরাহ' বিষয়টি অনেক পুটি জানিবার ... ও কিরূপে খাইতেছ! কোন সহবৎ তোমাতে নাই... তুমি একান্ত পুটি অ-সভ্য বুনো হইতে আছ... কোন এথিকস তোমাতে নাই! (ঈষৎ থতমত এবং) শোন খিদমৎগার উহারে আলাদা সময়ে খাবার দিবে তোমাকে লইয়া জ্বালাতন আঃ একি রেডিওগ্রামে হঠাৎ এই গতি তুমি নিশ্চয় হাত দাও এই সেইদিন যন্ত্রটি জান উহা বিদেশী ইস। তুমি ওই সেদিন।

... টেপটা নষ্ট করিলে ... সুন্দর তাঁহাদের মস্করাগুলি কি দেবদূত মতন বা,... আবার অবাক হইতে আছ... তোমার পিতার অফিসের কর্ত্তাদের কথাবার্ত্তা, তাহাদের উন্নতির মূল কথা সকল তুমি আর ঐ দুষ্টু কুকুর, তুমি হা হা হো হো, আর কুকুরের ডাকে নির্ম্মূল করিলে এখনই সকলের স্থলে ঐ হু হু হা হা। তোমার পিতা যদি না বাজাইয়া উহা পার্টিতে লইত। কি কাণ্ড হইত! তোমারে কোন বোর্ডিঙে দেওয়া ভাল... আজকাল কি যে সিদ্ধান্ত উঠিয়াছে। তুমি বেবিফুড, ডিম (ঐ ডিম শব্দটি সেক্সপীরিয় কেন না you egg : Mac। গঞ্জনা বিবিধ, বেবিফুড-দেবদূত, বেবিফুড- ফোক্স, গাবলিন্) তোমাকে লইয়া কি করি, যাহার এতটুকু এথিকস নাই, মাথায় যাহার উদ্ভট কল্পনা ভর্ত্তি, আমি জানি না কে সব তাহারা, তোমাদের এই অলস গল্প বলে, তুমি বল ভূত আছে আজ বল নক্ষত্র হইতে ... কেমনে আমি হেয় করি ইত্যাকারে গাল-কথাগুলি, আমাদের অটোগ্রাফ খাতাতে ছবি আঁকা, ইহা ইস। পুনরায় মা'রা এথিকস শব্দটি ব্যবহার করিতে, মুখ উন্মুক্ত করত ঈষৎ বাতাস যাহা অন্যরূপ তাহা লইবেন; আঃ ব্রিগেডিয়ার... স্ত্রী কি পারদর্শীতায় না ঐ এথিকস্ শব্দটি উচ্চারণ করেন, ঈদৃশ যে একটি ছোট উহা শাসন মানে কতিপয় শব্দ রচিত; ছোট শ্লেষ অথচ তীব্র। তখন তিনি, মিঃ ... বলিলেন যেমন ট্র্যাজিডির চরিত্র; যাহারা প্রতিবাদ, আপন ক্ষয় আপন ধ্বংসের পূর্ব্বে আপন স্বীকারোক্তির সহিত... ইহাতে এবং আমাতে উল্লেখিত ফেদার উক্ত কথা সমন্বয় হইতে (ইনসেস্ট-এর বীজসম্ভূত পাপ!) এ সময়, হাই কি আলোকপাত বা কম কোন আলোর প্রয়োজন নাই, পুরাতন প্রথাই যথাযথ হয়, ঝড়ের পরে যে সাগর তরঙ্গ, তেমনই হইয়া শব্দগুলি আসিবে; যে এবং তরঙ্গ বলিলেই বেলাতট সিদ্ধ হয়। যে এবং আমরা সকলে বস্ত্রহীন, হায়, করাঘাত করিব! তরঙ্গ যন্ত্রণা আমাদের কাল হইবে! আমরা অনুতাপ করিতে অবস্থায় তরঙ্গ সকল, উহাদের প্রতিক্রিয়াতে, প্রতি-সাড়াতে এখানে দর্শকজন সেই তরঙ্গ রূপ ঃ আমরা নিত্য নূতন স্থান সন্ধান করিব, ঐ এথিকস অনুতাপ গাথা করিতে। ডাঃ জনসন একদা বসওয়েল সহ ভ্রমণে যাইয়াছিলেন, টুয়র টু দি হেবরিডেস, তাহাতে আছে যখন In afternoon, we drove over the very heath where Macbeth met the witches... Dr. again solemnly repeated...

... মনে হয় আমি যেমন সেখানে পাপের সূচনার মুহূর্ত্তে ! আমাকে মধুসূদনীয় ব্যঞ্জনা রক্ষা এবং অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য দান করুক! আমি লিখি! সামান্য (!) এথিকস তোমাতে নাই... তুমি যে কি!

আমরা বধ্য হইবার নহে।

ও পুটি ছোট শয়তান... আবার অমান্য পূর্ব্বক আমার দিকে চাহিতেছ ...আজ হইতে তোমার কমিকস কেনা বন্ধ... জন্মদিনে যে, ষ্টেন গান দিব বলি তাহা, এক তোমার পিতারে কহিব, ইউ-কে হইতে কিছু না আনিতে... প্রজেক্টর তুমি ভাঙ্গিয়াছ ... তোমার বন্ধুরা আরও খল ... আবার হুইসিলিং... অদ্যই তোমার স্কুলে যাইব, তোমাদের ফাদারকে কহিব ... দেওয়াল হইতে সরিয়া দাঁড়াও ... আজকাল কি যে সিদ্ধান্ত'র চলন হইল ... বাচ্চারা মা-বাবার সান্নিধ্য চাহে, আমি বলি এই পরীক্ষা আমরা করিব কেন ... পাঠাও উহারে বোর্ডিঙে ! মিঃ ... বিরাট ইঞ্জিনিয়ার, তাঁহার স্ত্রীও একই কথা বলিলেন ঃ টেকনিকাল সম্পূর্ণতার লক্ষণ।

... অথচ ঘড়িতে দম দিতে বলি তোমার মনে থাকে না ... তুমি বড় হইবে কেমনে... চাকরীর যাদৃশ অবস্থা (নিম্ন আয়কারীদের উক্তিতে 'বাজার' যাহা)... তুমি কি করিবে ... ভাল হইবে সৈন্যতে ভর্ত্তি হওয়া, নিয়মানুবর্ত্তিতা মানুষকে বড় করে। এখন লড়াই... চীন ও ভারতের সৈন্যরা... দারুণ লড়াই পুরুষালি ব্যাপার ... দেখ নাই মনে নাই এডমিরালটির ঔপবিক ... কে ... ভুলিয়া গিয়াছে? সেই যে ক্লাবের (ক... ক্লাব) বিগত শিশুদের জমায়েতে আসিয়াছিলেন যেখানে তুমি সেই বোকা গল্পটি বল ... ঐ নিঃস্তব্ধভাবে আসে... একদিন বুদ্ধিও ঠাণ্ডা হইয়া নিঃস্তব্ধ হইয়া যাইবে... আনকালচার্ডের মতন... সামান্য কাণ্ডজ্ঞান নাই। অতদূর হইতে ঐভাবে একবিন্দু আসিতে পারে না। তখনই একটা বেলুন (হয়ে তাঁহার বাঘের গল্প তো, ফাঁকাত্বের অনুভবে প্রতিক্রিয়া) ফাটিয়া যায় ... ইস সবাই হাসে আমিও হাসি, না ইহা জানিয়া যে তুমিই

সেই হাস্যের বিষয়... হা ভগবান কি লজ্জা! [হা নিষিক্ত সম্প্রদায়!] প্রতিটি স্থানে তোমার নিৰ্ব্বুদ্ধিতার কারণে আমারে বিপদেতে, আতান্তর অবস্থাতে, ফেলিয়া থাক, ইস আজও মনে পড়ে যখন, মিঃ... সত্যই মহানুভব, না হইলে এতগুলি কোম্পানীর কর্ত্তা ... যখন মন্তব্য করিলেন আমাকে সান্ত্বনাতে, উহাতে দোষ নাই উহা যাইবে বয়স ক্রমে, ... কিন্তু মিসেস ... কোম্পানীর কর্ত্তার স্ত্রী, কহেন, ওজনহীন হাতীর কথা আমাদের মনে করিতে বলা হয়... ইহা কি আজগুবি! জল সমুদ্রে মিশ্রিত হইল না, হাঃ ...(আরও হৃদয়হীন রসিকতা করিয়াছিলেন সুন্দরী মিঃ ... স্ত্রী, এই তাহা ঃ আমার নিজ মুখে যত্ন দিবার টু ফিক্স আপ—সময় দিল)... ও! কি নিৰ্ব্বুদ্ধিতা। আমরা সমস্বরে ইহাদের সদম্ভে ঃ বোকার দল সকলে বলিয়া উঠিয়া খুব হাঁপাইয়াছি। ইহার কয়েক দিবস পর, আমাদের প্রত্যেকের পিতা, এই গল্পকে যাচাই করত সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, ঘোষিলেন, ঐ প্রত্যয়ের হদিস করা গিয়াছে। সেই স্বাতি নক্ষত্র... উহা হয় একটি কুসংস্কারের বৃত্তান্ত।

....

প্রথম প্রকাশ - 'কালি ও কলম' পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৮১ (পূজাসংখ্যা)। সম্পাদক - শচীন মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক - শুভ মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. জনাজাত - জন প্রতি, প্রতিজন হিসাবে, ২. বোধিত - জানানো, জ্ঞাত করা, ৩. সদ্যস্কতা - অদ্যতন, সতেজ, ৪. স্তোভ - কোনো কাজ থেকে বিরত রাখবার জন্য প্রবোধবচন, ৫. ঘোঁজ - জমির বাঁক, যে স্থানে আল বেঁকে যায়, ৬. ক্ষীপ্যমাণ - যা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, এখানে দ্রুতগতি, ৭. এলাই - ঢিলে বা আলগা দেওয়া, ৮. কাবাস - পাংশুবর্ণ, ফ্যাকাসে।

প্রত্যাহারিত - অভিধানের সমর্থন নেই, হবে প্রত্যাহৃত। ভাগ্যশঃ - অভিধানের সমর্থন নেই, শব্দটি লেখকের তৈরি করা।

মূল পাণ্ডুলিপির অভাবে আমরা 'কালি ও কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ অনুসরণ করলাম। কয়েকটি অনিবার্য মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করে দেওয়া গেলেও কিছু ত্রুটি এখনো রয়েই গেল।

'স্বাতী', এই বানানটি বর্তমানে অধিকতর সংগত ও অভিধান সমর্থিত হলেও অতীতের অভিধানগুলিতে 'স্বাতি' বানানের সমর্থন আছে। আমরা লেখক ব্যবহৃত বানান অক্ষুণ্ণ রাখলাম।

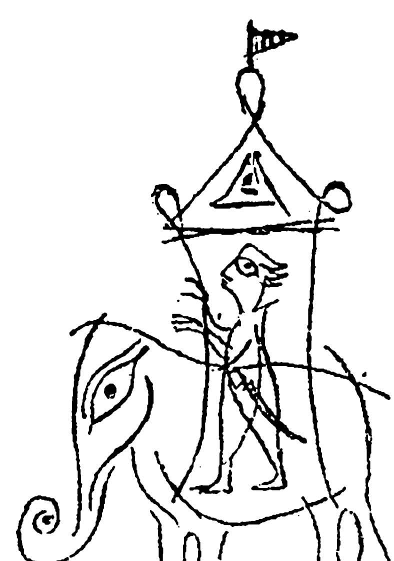

মাধবায় নমঃ তারা ব্রহ্মময়ী মাগো!

ক্যালকাটা চিলড্রেন্স অপেরা

বালীগঞ্জ শিক্ষা সদন মঞ্চ

সন্ধ্যা - ৬।৷০ টায় ২৯ সেপ্টেম্বর '৭৬

দানসা ফকির / কঙ্কালের টঙ্কার

দানসা ফকির — আষাঢ়ে

কঙ্কালের টঙ্কার — আষাঢ়ে — মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-এর বিখ্যাত গল্প

দানসা ফকির।। দানসা — অজয় গুপ্ত। সকতজঙ্গ — রঞ্জু সরকার। উজীর — উত্তম সেন।
পরিষদবর্গ — আশিস ঘোষ, অরূপ দে, বিশ্বরূপ, অরূপ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি দাস।
বান্দা — লছমন — গুপ্তচর — আশিস ঘোষ। দূত — তপন দে।

কঙ্কালের টঙ্কার।। (গল্প-মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)। মাধব চক্রবর্ত্তী — রঞ্জু সরকার।
প্রথম ভূত, দাদামহাশয় — উত্তম সেন। দ্বিতীয় ভূত, খুড়া — অজয় গুপ্ত।
তৃতীয় ভূত, নাতি — তপন দে। ইষ্টিশান মাষ্টার — অন্যান্যরা
ষ্টেজ ম্যানেজার — দীপক দাশগুপ্ত।

জয় রামকৃষ্ণ! ঠাকুরের কৃপায় আমরা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি; ইহা নূতন দল। এতাবৎ আমরা অল্পবয়সী লইয়া দল গঠন করিয়াছি; ঘাট হইয়াছে! আজ মাম্‌স, কাল পরীক্ষা, এতাদৃশ গরহাজিরা লাগিয়া আছে। বস্তি লইয়া আমরা বছর দুই চেষ্টা করিলাম, সেখানেও নানান ওজোড়, ইহা ব্যতীত উচ্চারণ কোনক্রমেই শ্রুতিযোগ্য হইল না। ❖ এখনকার যাহারা এই দলের, তাহারা উঠতি বয়সী। তরুণ বা যুবা শব্দ ব্যবহার করিলাম না। এই ভরসা, ইহাদের, এই দলকে, আপনারা স্নেহের চক্ষে দেখিবেন। ❖ আমরা জানিয়াছি যে বাঙলায়, মহাপ্রভু হইতে কেশববাবু (ব্রহ্মবান্ধব কেশব সেন ইনি ধার্ম্মিক মহাপুরুষ ছিলেন। নববিধান প্রবর্ত্তক জন্ম.......মৃত্যু ১৮৮২) গিরিশবাবু হইতে এক বিরাট প্রয়োগ ঐতিহ্য বহমান এবং দেখিলাম তাহা কেমন সৌন্দর্য্যে শিশিরবাবু, তারাসুন্দরী, প্রভা ইত্যাদির দ্বারা খেলিয়া উঠিল। (রাজা) রবি ঠাকুর-এর ষ্টেজ কভার, গতি, পদক্ষেপ এখনও হাতে ছুঁইতে পারি। পাঠক তাঁহার রঘুপতি এর ছবি দেখুন। আমরা আমাদের গুরুজনকে প্রশ্ন করিয়াছি ঐ দারুণ ভয়াল মেক-আপ—হাতে মিকেল এঞ্জেলর থিঙ্কারের মুদ্রা — ঐ-এর সহিত তাহার কণ্ঠস্বর কেমনে মিলিত! তাহারা বলিলেন ভাবিবার সময় পাই নাই। আমরা বিচার করি ইহা কেমনে সম্ভব — এক তিলের বিচ্যুতিতে যাহা কমিক হইতে পারিত! কত বড় অভিনেতা হইলে, তাহা চামকা মারা যায়। কোন দেশের এমতঐশ্বর্য্য আছে তাহা বিশ্বাস করি না — এইখানে কিছু করা বড় সমীহর, বড় ভাবনার। অভিনয়ে রূপদান প্রতিজ্ঞা আর নাই; এখন ন্যারেট করা হয়, ঘটনার নাটকীয়তাই সব; এক একজন কেহ ধরা-গলায় বা আনুনাসিক স্বরে তাহা তাহা গল্প করিয়া যায়। অভিব্যক্তির পাট নাই, জ্যঁ বেরো বলিয়াছেন, মাইম বোবার সহিত কথা বলা নহে। ❖ এখন আমাদের কোন অভিমান নাই; আমরাও ঐ ছাড়া আর কি বা! ❖ আমাদের পালা দুইটি আষাঢ়ে পালা, চরিত্র ফুটান নাই, সাম্য তোষামোদ রস তথা বৈষম্য ঘটিত রস নাই। লোকশিক্ষার কিছু নাই। আছে ছেলেমানুষী, হরসপ্লে অর্থাৎ ব্যাইসটারয়াস প্লে। ❖ আমরা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্মীর পরীক্ষা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, হযবরল পালা করিয়াছি, তাহা অনেকেই দেখিতে চাহেন, আপনাদের আশীর্ব্বাদ থাকিলে নিশ্চয় ঠাকুরের কৃপায় চেষ্টা করিব; ইহা ব্যতীত আমাদের নিজেদের কয়েকটি পালা তৈয়ারী আছেঃ রিজিয়া, ঠোক্কর, হবুচন্দ্রর অশান্তি, ঘোড়াচোর (এটি গীতে সম্পূর্ণ)। ❖ এখানে সর্ব্বাগ্রে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি শ্রীমতী দিপালী ও প্রভাস দত্তকে।

ক্যালকাটা চিলড্রেন্স অপেরা

পালাকরণ, সুর সংগঠন, পরিচালনা / কমলকুমার মজুমদার

শুভার্থীর। এ-দুটি অভাব মেটাবার জন্য যাঁরা হরবোলার উদ্দেশ্যকে শুভ মনে করেন তাঁদের সহযোগিতা বিশেষভাবে কাম্য।

বছরে আটটাকা দিয়ে যে-কেউই হরবোলার 'শুভার্থী-সভ্য' হতে পারবেন। বছরে চারটে নতুন অধিবেশনের ব্যবস্থা থাকবেই, প্রয়োজন অনুসারে এর সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। এই সব অধিবেশনে 'শুভার্থী-সভ্য'রা বিনা খরচে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

হরবোলা সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির ছোঁয়াচমুক্ত। সংস্কৃতির বাহক হিসেবেই এর সার্থকতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা-৯

৪

সভাপতি
ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী

সহকারী সভাপতি
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অন্নদাশঙ্কর রায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
বুদ্ধদেব বসু

কার্যকরী সমিতি
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
রামকিঙ্কর বেইজ
সত্যজিৎ রায়
সুচিত্রা মিত্র

কর্মী পরিষদ
আশুতোষ ঘোষ
দীপক মজুমদার
নৃসিংহ বসু
প্রশান্ত দাশগুপ্ত
সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক
দিলীপকুমার গুপ্ত

কার্যালয়
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০

হরবোলা বাঙলাদেশের নবীন ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠান। যে-উদ্দেশ্য নিয়ে হরবোলার পত্তন, অল্প কথায় তা হল ভালো নাটকের ভালো অভিনয়—যা এদেশে বিরল।

অভিনয় শিল্পের যাবতীয় খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা, হাতেকলমে অভিনয়ের বিভিন্ন আঙ্গিক শিক্ষা; প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের মূল সূত্র-গুলি আহরণ করা; সঙ্গে-সঙ্গে সুষ্ঠু এবং সঠিক উচ্চারণ তথা বাচনভঙ্গি শিক্ষা—এ-সবই হরবোলার কর্মসূচির অন্তর্গত। এ-ছাড়াও নাটকীয় সম্ভাবনা রয়েছে সাহিত্যের এ-রকম

২

উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাসের যথাযথ নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করা, ভালো গান গাওয়া এবং ভালো কবিতার নিখুঁত আবৃত্তি করার দিকেও হরবোলার দৃষ্টি থাকবে।

হরবোলার আত্মপ্রকাশ আপাতত রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়—এই তিন মহারথীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নাটক অভিনয়ে। প্রতি বৎসরই এই তিন পুণ্যতিথি পালন করা হবে।

হরবোলা জাতিধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। হরবোলার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যা-কিছুর প্রয়োজন তার প্রায় সবটাই হচ্ছে অর্থের এবং উৎসাহী

৩

'হরবোলা' নাট্যসংস্থার প্রচারপত্র

হরবোলা সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় অভিনয়

হরবোলা

আগামী শনিবার ৩০শে জানুয়ারি ১৯৫৪

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়

১০/২ এলগিন রোড

সিগনেট প্রেস প্রাঙ্গণে

রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটক

অভিনয় করবেন

আপনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিলে

আমরা আনন্দিত হব

অনুগ্রহ করে পত্রখানা সঙ্গে আনবেন

'হরবোলা' নাট্যসংস্থার প্রবেশপত্র
(লালরঙে মুদ্রিত)

No.

CALCUTTA CHILDREN'S OPERA

BHIM BADH
&
DANSA FAKIR

Presented by **Kamal K. Mazumdar** 60

3/-

'ক্যালকাটা চিলড্রেনস অপেরা' অভিনীত নাটকের প্রবেশপত্র।

No. 120

CALCUTTA CHILDREN'S OPERA

DANSA FAKIR
&
KANKALER TANKAR

Presented by **Kamal K. Mazumdar**

3/-

BALLYGUNGE SHIKHA SADAN HALL
(NEAR GARIAHAT TRAM DEPOT)
ON 29th SEPT.'76 AT 6-30 P. M.

'ক্যালকাটা চিলড্রেনস অপেরা' অভিনীত
নাটকের প্রবেশপত্র।

No. 14

CALCUTTA CHILDREN'S OPERA

BHIM BADH
&
DANSA FAKIR

Presented by **Kamal K. Mazumdar**

3/-

BALLYGUNGE SHIKHA SADAN HALL
(NEAR GARIAHAT TRAM DEPOT)
ON 28th NOV.'76 AT 6-30 P. M.

'ক্যালকাটা চিলড্রেনস অপেরা' অভিনীত
নাটকের প্রবেশপত্র।

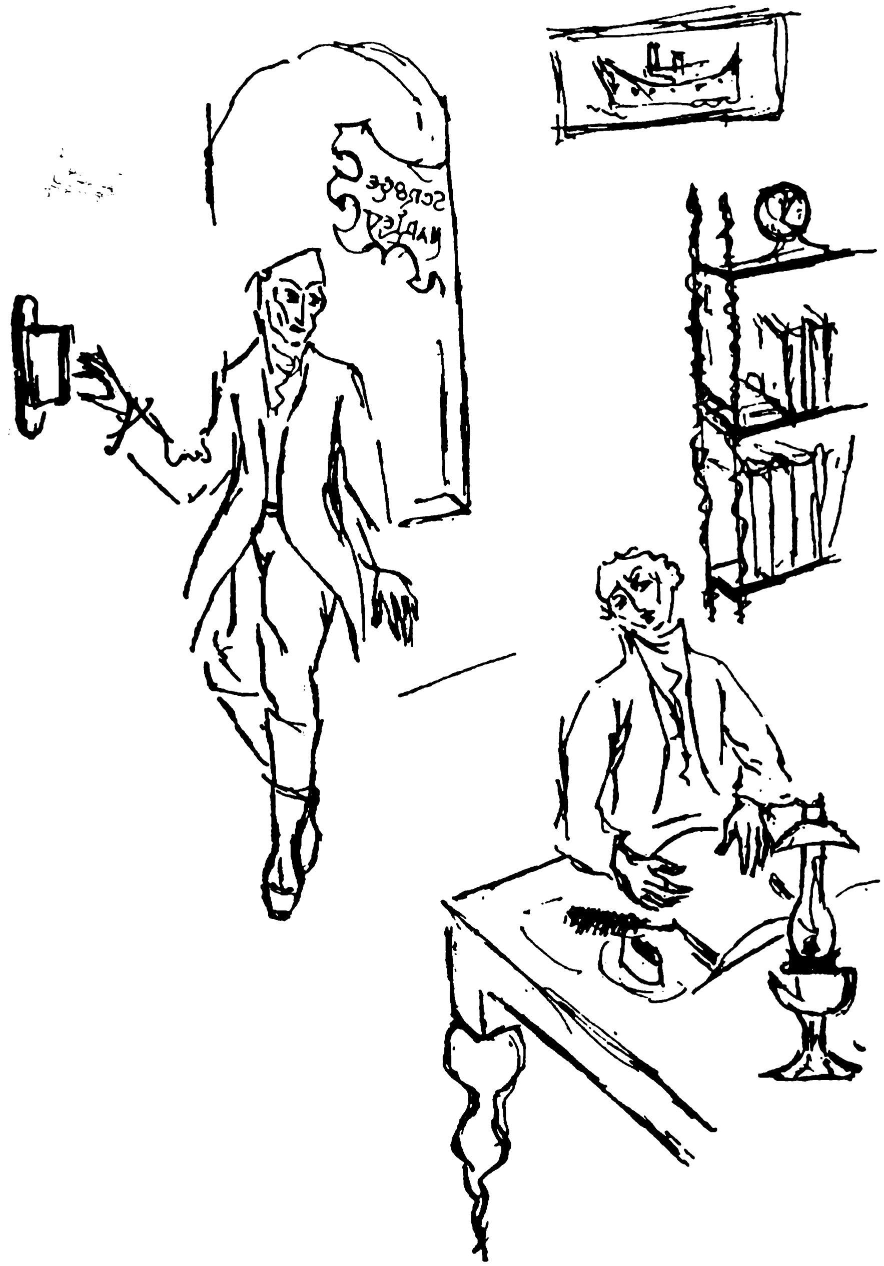

চার্লস ডিকেন্স প্রণীত A Christmas Carol -এর জন্য আঁকা
কমলকুমারের অলংকরণ

চার্লস ডিকেন্স প্রণীত A Christmas Carol-এর জন্য আঁকা
কমলকুমারের অলংকরণ

প্রচলিত ছড়ার সংকলন 'আইকম বাইকম'-এর জন্য
কমলকুমারের অলংকরণ

বিষয় চলচ্চিত্র

[illegible] ভাবনা

অংক ভাবনা

অংকবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

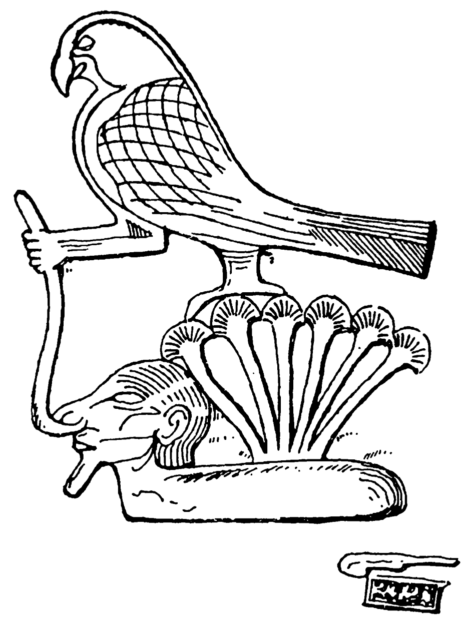

সম্পাদক ঃ

কমলকুমার মজুমদার ॥ আনন্দমোহন ঘোষ

— প্রচ্ছদ চিত্র —

প্রাচীন ঈজিপ্তীয় পরিমাপের বাটখারা

অঙ্ক ভাবনা
অঙ্ক বিষয়ক বাংলা ত্রৈমাসিক
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ॥ জানুয়ারী ১৯৬৫

কমলকুমার মজুমদার কর্তৃক ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস হইতে প্রকাশিত
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা - ১৩ হইতে অজয় দাশগুপ্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

অঙ্কভাবনা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বহুদিন যাবৎ বিলম্বের পর প্রকাশ সম্ভব হইল; আমাদের গ্রাহকবর্গ এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য যে ধৈর্য্য পরীক্ষা দিয়াছেন তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, একথা স্বীকার্য্য যে তাঁদের শুভকামনা ব্যতীত এ কার্য্য সম্ভব হইত না।

ইদানীং আমাদের দেশে খোশ গল্প ও পদ্যের যথেষ্ট মান, অন্য যে কোন বিষয়ক আলোচনাই পথভ্রষ্ট হইয়াছে; অথচ, একদা যে সকল বিষয়ে, পুরাতন পত্রিকা পুস্তকাদি পাঠে জানা যায় যে বাঙলার জনসাধারণ খুবই আগ্রহশীল ছিল; এখনকার দু'য়েকটি বিজ্ঞানতত্ত্ব পত্রিকার চেহারা দেখিলে নিশ্চিত ধারণা জন্মিবে মুষ্টিমেয় উৎসাহীর আশায় তাহা বাঁচিয়া আছে, ইহা সত্ত্বেও আমরা নিরাশ হই নাই।

অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে বঙ্গভাষায় ইতঃপূর্ব্বে কোন পত্রিকা ছিল না, জিজ্ঞাসুমাত্রেই স্বীকার করিবেন, এই জাতীয় চেষ্টার প্রয়োজন আছে। বিদেশী ভাষা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, বাঙলায় ইহার সার্থকতা নাই; কিন্তু যদি ভাবিয়া বুঝিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে সম্যক উপলব্ধি হইবে যে কয়েক বৎসর কাল হইল স্রোত ঘুরিয়াছে, বঙ্গভাষায় বিবিধ তত্ত্ব আলোচনার পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হইতেছে, ফলে সহজেই আমরা বিশ্বাস করি, অঙ্কতত্ত্ব যাহাতে সুবিচারিত চিত্তে অনুশীলনকারীরা ধারণা করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য তথ্যসকল বঙ্গভাষায় হওয়াই একমাত্র উপায়। যেহেতু অঙ্কশাস্ত্র সকলতত্ত্বের সম্বন্ধের আদি কারণ, ইহাই শক্তি এবং মাতৃস্থানীয়, সৎ এবং অসৎ বিচারের জন্যত্ব[১], প্রকৃষ্ট ন্যায় এবং বিজ্ঞানের — বিজ্ঞানচিন্তার মূল।

এইরূপ তত্ত্ব অনিসন্ধিৎসু [অনুসন্ধিৎসু] পত্রিকা বঙ্গভাষায় প্রকাশে কয়েকটি কঠিন বাধার সম্মুখীন হইতে হয়; প্রথমত ভাবপরিধির দিক দিয়া অনেকেই বিশেষ আগ্রহান্বিত হন, এবং অনুবাদ ব্যাপারে তাঁহাদের উপর স্বভাবতই নির্ভর করিতে হয়, ক্রমে দেখা গেল কোন না কোন কারণে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন, তাই আমাদের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সকল কিছুই যথাবিহিত পত্রস্থ করা ঘটিয়া উঠিল না। ইহার পর ছাপার অক্ষর বা টাইপ ব্যাপার উত্থাপন করা যায়; অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী অজস্র প্রতীক চিহ্ন এবং প্রাচীন রাশি-মালা আছে, বিশেষত হ্যাণ্ড-সেটএ তাহা ছাপিবার অক্ষর নাই বলিলেই হয়, অবশ্য এক আধটি টাইপ ফাউন্ড্রী দুই চারিটি মাত্র অক্ষর নির্ম্মাণ করে, ফলে আমাদের কল্পনা অনুযায়ী 'আর্কইমিডিসের [আর্কিমিডিসের]পাটিগণিত' ভাষান্তরিত করা স্থগিত রাখিতে হইল। এখানে প্রকাশ থাক, যদিও সকল প্রতীক ও রাশি-মালার অক্ষর-কাটান অনেক অর্থব্যয় সাপেক্ষ তথাপি আমরা ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।

আমাদের উদ্দেশ্য, অঙ্কশাস্ত্র জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গকে অঙ্কধারা সম্পর্কে জ্ঞাত করা — কারণ ইতিহাস জানার মূল্য আমরা নিশ্চয় সকলেই স্বীকার করিব.— ইহা ব্যতীত আমাদের পাঠ্যক্রম যাহাতে অত্যন্ত আধুনিক-নিয়ম অনুযায়ী হয় তাহার আভাস দেওয়া; এই সংখ্যায় সেই জন্য আমরা 'বিমান গতিবিধির অঙ্ক' বিষয়ে আলোচনা করিলাম।

অনুবাদ বিষয়ে আশঙ্কা হয়, অনেক ভুলভ্রান্তি রহিয়া যাওয়া স্বাভাবিক; সে সম্পর্কে আমাদের জানাইলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব। পত্রিকার নামকরণে অধ্যাপক শ্রীনির্মাল্য আচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই পত্রিকা শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রকাশ সম্ভব হইল।

সম্পাদকীয় সংযোজন ঃ জন্যত্ব - এখানে অর্থ নিমিত্ত, হেতু।

অঙ্ক ভাবনা

অঙ্ক বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র

- অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রতি তিন মাস অন্তর বছরে মোট চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
- বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক মূল্য রেজিষ্ট্রেশান ডাক খরচ সহ বার্ষিক দশ টাকা। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠান হয় না। পত্রিকা ভি.পি করা হয় না।
- নমুনা সংখ্যার জন্য ২.৫০ পঃ মনিঅর্ডার করা প্রয়োজন।
- সমস্ত প্রকার চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি, ম্যানেজার, অঙ্ক ভাবনা, ১৬, ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস, কলিকাতা-১৯, এই ঠিকানায় করিতে হইবে।
- প্রতি সংখ্যার সাধারণ মূল্য ১.৭৫ পঃ।
- কলিকাতা ও বাইরে সর্ব্বত্র এজেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন।
- যাঁহারা এই পত্রিকায় লিখিতে চান, তাঁহারা কোন বিষয়ে লিখিবার পূর্ব্বে আমাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া লিখিবেন।
- উপযুক্ত ডাকটিকিট না দিলে সব সময় চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

অঙ্ক ভাবনা

অঙ্ক বিষয়ক বাঙলা ত্রৈমাসিক
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।। জানুয়ারী ১৯৬৫

।। সূচীপত্র ।।

সম্পাদকীয়	
লীলাবতী	৩
বিমান গতিবিধির অঙ্ক	১৯
ন্যায়তত্ত্ব	২৭
সংখ্যাতত্ত্বের সূচনা	২৯
ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বিষয়ক আলোচনা	৩৪
বীজগণিতের ইতিকথা	৩৭
ত্রিমাত্রিক আয়তন	৩৯
কার্দানো	৪৩
ম্যাজিক স্কোয়ার	৪৭
বিজ্ঞান ও প্রকল্প	৪৯

॥ লীলাবতী ॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রীতিং ভক্তজনস্য যো জনয়তে বিঘ্নং বিনিঘ্নন্ স্মৃতস্তং বৃন্দারকবৃন্দ বন্দিত পদং নত্বা মতঙ্গাননম্
পাটীং সদ্গণিতস্য বচ্মি চতুর প্রীতিপ্রদাং প্রস্ফুটাং সংক্ষিপ্তাক্ষর কোমলামলপদৈর্লালিত্য
লীলাবতীম্ ॥ ১

যিনি বিঘ্ন বিনাশ করিয়া ভক্তজনের প্রীতি উৎপাদন করেন, যাঁহার পদযুগল দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়, সেই গজাননকে নমস্কার করিয়া এই সহজ আনন্দদায়ক, পরিস্ফুট, সংক্ষিপ্ত অতি কোমল ও বিশুদ্ধ পদের দ্বারা রচিত লীলাবতী নামক গণিতের এই পাটীগণিত গ্রন্থ বলিতেছি।

বরাটকানাং দশকদ্বয়ং (২০) যৎ সা কাকিণী তাশ্চ পণশ্চতস্রঃ।
তে ষোড়শদ্রম্ম ইহাবগম্যো দ্রম্মৈস্তথা ষোড়শভিশ্চ নিষ্কঃ। ২

দ্বিগুণিত দশ অর্থাৎ বিংশতি সংখ্যক কড়িকে কাকিণী বলে। এইরূপ চারিটিকে পণ বলে। এইরূপ ষোলটিকে দ্রম্ম বলে। এইরূপ ষোলটি দ্রম্মকে নিষ্ক বলে। ২

তুল্যা যবাভ্যাং কথিতাত্র গুঞ্জা বল্লস্ত্রিগুঞ্জো ধরণঞ্চ তেঽষ্টৌ।
গদ্যানকস্তদ্ দ্বয়মিন্দ্রতুল্যৈ বল্লৈস্তথৈকো ধটকঃপ্রদিষ্টঃ ॥ ৩

দুটি যবের সমপরিমাণ ওজনকে গুঞ্জ বলে। এইরূপ তিনটি গুঞ্জকে বল্ল বলে, এবং আটটিকে ধরণ বলে। এইরূপ দুইটিকে গদ্যানক বলে। এইরূপ চতুর্দ্দশ বল্লে এক ধটক হয়। ৩

দশার্দ্ধংগুঞ্জং প্রবদন্তি মাষং মাষাহ্বয়ৈঃ ষোড়শভিশ্চ কর্ষম্।
কর্ষৈশ্চতুর্ভিশ্চ পাদং তুলাজ্ঞা কর্ষং সুবর্ণস্য সুবর্ণসংজ্ঞম্ ॥ ৪

দশার্দ্ধ গুঞ্জকে মাষ বলে, ষোল মাষকে কর্ষ বলে, চারিকর্ষে এক পল। এক কর্ষ সোণাকে সুবর্ণ বলে। ৪

যবোদরৈরঙ্গুলমষ্টসংখ্যৈ হস্তোঽঙ্গুলৈঃ ষড়্গুণিতৈশ্চতুর্ভিঃ।
হস্তৈশ্চতুর্ভির্ভবতীহদণ্ডঃ ক্রোশঃ সহস্র দ্বিতয়েন তেষাম্ ॥ ৫

আটটি যবের পরিমাণ এক অঙ্গুলি। চব্বিশ অঙ্গুলিতে এক হস্ত। চারি হস্তে এক দণ্ড। দুই হাজার দণ্ডে একক্রোশ হয়।

স্যাদ্‌যোজনং ক্রোশচতুষ্টয়েন তথা করাণাং দশকেন বংশঃ।
নিবর্ত্তনং বিংশতিবংশ সংখ্যৈঃ ক্ষেত্রং চতুর্ভিশ্চ ভুজৈর্নিবদ্ধম্ ॥ ৬

চারিক্রোশে এক যোজন। দশ হাতে এক বংশ। চারিদিকে সম পরিমাণ বিংশতি বংশকে অথবা চারিবাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ স্থানকে ক্ষেত্র অথবা নিবর্ত্তন বলে। ৬

হস্তোন্মিতৈর্বিস্তৃতি দৈর্ঘ্য পিণ্ডৈর্যদ্দ্বাদশাস্ত্রং ঘনহস্তসংজ্ঞম্।
ধান্যাদিকে যদ্ ঘনহস্তমানং শাস্ত্রোদিতা মাগধখারিকা সা॥

একহাত পরিমাণ দৈর্ঘ্য বিস্তার ও উচ্চতাযুক্ত মাপকে ঘনহস্ত বলে। ধান্যাদির মাপের সময় এইরূপ ঘনহস্তকে শাস্ত্রে খারি অথবা মাগধ বলে। ৭

দ্রোণস্তু খার্য্যাঃ খলু ষোড়শাংশঃ খাড়াদাঢ়কো দ্রোণচতুর্থভাগঃ।
প্রস্থশ্চতুর্থাংশ ইহাঢ়কস্য প্রস্থাঙ্ঘ্রিরাদ্যৈঃ কুড়বঃ প্রদিষ্টঃ॥

এক খারির একের ষোল অংশকে দ্রোণ বলে। এক দ্রোণের একের চতুর্থাংশকে আঢ়ক বলে। এক আঢ়কের এক চতুর্থাংশকে কুড়ক বলে। ৮

পাদোন গদ্যানক তুল্যটঙ্কৈর্দ্বিসপ্ততুল্যৈঃ কথিতোহত্র সেরঃ।
মণাভিধানং খযুগৈশ্চ সেরৈর্ধান্যাদি তৌলেষু তুরুষ্ক সংজ্ঞা॥

তিনের চার অংশ গদ্যানক এর তুল্য টঙ্কা চতুর্দ্দশ হইলে একসের হইবে। চল্লিশ সেরে একমণ হইবে। ধান্য বা তজ্জাতীয় দ্রব্য ওজনের জন্য তুরস্কগণ কর্ত্তৃক এইরূপ ব্যবহৃত হয়।

শেষা কালাদিপরিভাষা লোকতঃ প্রসিদ্ধা জ্ঞেয়া।

ইহার অবশিষ্ট কাল প্রভৃতি পরিভাষা লোকে প্রসিদ্ধ আছে।

দ্বিতীয়াহধ্যায়ঃ

(প্রথমঃ পরিচ্ছেদ)

লীলাগললুলল্লো লকালব্যাল বিলাসিনে।
গণেশায় নমো নীল কমলামল কান্তয়ে॥

যাহার গলদেশ, আনন্দে দোদুল্যমান কালসর্প বিরাজিত; যাহার বর্ণ নীল নিষ্কলুষ পদ্মের ন্যায় সেই গণেশকে নমস্কার।

এক দশ শত সহস্রাযুতলক্ষ প্রযুত কোটয়ঃ ক্রমশঃ।
অর্বুদমব্জং খর্বঃ নিখর্বঃ মহাপদ্ম শঙ্খবস্তস্মাৎ।
জলধিশ্চান্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধমিতি দশগুণোত্তরাঃ সংজ্ঞাঃ।
সংখ্যায়াঃ স্থানানাং ব্যবহারার্থং কৃতাঃ পূর্ব্বৈঃ॥ ১০-১১

পূর্ব্বাচার্য্যগণ সংখ্যার স্থান এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে একক দশক শতক সহস্র লক্ষ অযুত কোটি অর্বুদ পদ্ম খর্ব নিখর্ব মহাপদ্ম শঙ্খ সমুদ্র অন্ত মধ্য পরার্দ্ধ এইরূপ সংখ্যাগুলি দশ গুনিত।

(দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদ)

অথ সঙ্কলিত ব্যবকলিতয়োঃ করণসূত্রং বৃত্তার্দ্ধম্।

কার্য্যঃ ক্রমাদুৎক্রমতোঽথবাঙ্কযোগো যথাস্থানক মন্তরংবা॥ ১২

যোগ ও বিয়োগের নিয়মাবলি অর্দ্ধ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত। সংখ্যাগুলির যোগ তাহাদের স্থানের ক্রম অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিয়োগ তাহাদের পার্থক্য অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে।

অত্রোদ্দেশকঃ। অয়ে বালে লীলাবতি মতিমতি ব্রূহি সহিতান্ দ্বিপঞ্চ দ্বাত্রিংশৎ ত্রিনবতি শতাষ্টাদশ দশ। শতো পেতানেতানযুত বিযুতাংশ্চাপি বদমে যদি বক্তে্র যুক্তি ব্যবকলন মার্গেঽসি কুশলা॥ ১৩

ইহার উদাহরণ। হে বুদ্ধিমতি কন্যে লীলাবতি! যদি তুমি যোগ ও বিয়োগ ব্যাপারে দক্ষা হও তাহা হইলে বল—দুই, পাঁচ, বত্রিশ, একশত তিরানব্বই, আঠার দশ ও একশত সংখ্যার যোগফল কত?

ন্যাসঃ—২, ৫, ৩২, ১৯৩, ১৮, ১০, ১০০।

যোগফল=৩৬০। সংযোজনাজ্জাতম্। যোগ করিয়া হইল।

অযুতা (১০০০০) চ্ছোধিতে জাতম্। ৯৬৪০

১০০০০−৩৬০=৯৬৪০ বিয়োগফল।

ইতি সঙ্কলিত ব্যবকলিতে। এইরূপ যোগ ও বিয়োগের প্রণালী।

গুণনে করণসূত্রং সার্দ্ধবৃত্তদ্বয়ম্। গুণ্যান্ত্যমঙ্কং গুণকেন হন্যাদুৎসারি তেনৈব মুপান্তিমাদীন্। গুণ্যস্ত্বধোঽধোগুণ খণ্ডতুল্যস্তৈঃ খণ্ডকৈঃ সঙ্গুণি তো যুতো বা। ভক্তোগুণঃ শুধ্যতি যেন তেন লব্ধ্যা চ গুণ্যো গুণিতঃ ফলংবা। দ্বিধা ভবেদ্রূপবিভাগ এবং স্থানৈঃ পৃথগ্ বা গুণিতঃ সমেতঃ ইষ্টোনযুক্তেন গুণেন নিঘ্নোঽভীষ্টঘ্ন গুণ্যান্বিত বর্জ্জিতো বা। ১৪-১৫

গুণের নিয়মাবলী আড়াই পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত। গুণ্যের (অর্থাৎ যাহাকে গুণ করিতে হইবে) শেষ সংখ্যাকে গুণকের দ্বারা গুণ করিতে হইবে। তাহার পরের সংখ্যাকে আবার তাহার পরের সংখ্যাকে অথবা গুণ্যকে গুণকের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ গুণ করিয়া রাখিতে হইবে, পরে সমস্ত সংখ্যাগুলি যোগ করিতে হইবে। অথবা গুণককে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার দ্বারা গুণ করিতে হইবে। এইরূপ গুণনের দুইটি বিভাগ দেখা যায়। অথবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থানীয় সংখ্যাকে গুণ করিতে হইবে পরে সমস্তগুলি একত্রে যোগ করিতে হইবে। অথবা যে কোন রাশি বর্দ্ধিত করিয়া বা অল্প করিয়া লইয়া তাহার দ্বারা গুণ করিতে হইবে, পরে গুণফলকে যোগ করিতে হইবে বা গুণফল হইতে বিয়োগ করিতে হইবে।

অত্রোদ্দেশকঃ। বালে বালকুরঙ্গলোলনয়নে লীলাবতি প্রোচ্যতাং পঞ্চত্র্যেক মিতাদ্দিবাকরগুণা অঙ্কাঃ কতিস্যুর্যদি। রূপস্থানবিভাগ খণ্ডগুণনে কল্যাণি কল্যাণিনি ছিন্নাস্তেন গুণেন তে চ গুণিতাজাতাঃ কতি স্যুর্বদ। ১৬

ইহার উদাহরণ। হে মৃগশাবকের ন্যায় চঞ্চল নয়নে কন্যে লীলাবতি! একশত পঁয়ত্রিশকে বার দ্বারা গুণ করিলে কত হইবে বল। হে কল্যাণি! বিভিন্ন অংশ দ্বারা খণ্ড গুণনেই বা কিরূপ হইবে বল।

ন্যাসঃ। গুণ্যঃ ১৩৫। গুণকঃ ১২

দৃষ্টান্ত। গুণ্য ১৩৫ গুণক ১২

গুণ্যন্ত্যমঙ্কং গুণকেন হন্যাদিতি কৃতে জাতম্। ১৬২০। গুণ্য এর শেষ অঙ্ককে গুণকের দ্বারা গুণ করিলে ১৬২০ হইল। অথবা গুণরূপ বিভাগে খণ্ডেকৃতে—৮। ৪ আভ্যাং পৃথগ্ গুণ্যে গুণিতে যুক্তে চ জাতং তদেব। ১৬২০।

অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়া গুণ করিলে যথা প্রথমে ৮ দ্বারা গুণ করিয়া ১০৮০ হইল পরে ৪ দ্বারা গুণ করিলে ৫৪০ হইল। এইবার এই দুইটি সংখ্যা যোগ করিলে ১৬২০ হইবে।

অথবা গুণ্যক স্ত্রিভির্ভক্তোলব্ধং। ৪। এভিস্ত্রিভিঃ। ৩ বা গুণ্যে গুনিতে জাতং তদেব। ১৬২০

অথবা গুণ্যককে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া যে ৪ পাওয়া যাইল তাহার দ্বারা এবং ৩ দ্বারা গুণ্যকে গুণ করিলে উভয়ের যোগফল ১৬২০ হইবে।

অথবা স্থান বিভাগে খণ্ডে ১। ২। আভ্যাং পৃথগ্ গুণ্যে গুণিতে যথাস্থান যুক্তে চ জাতং তদেব। ১৬২০।

অথবা ১২ এই সংখ্যাকে স্থানের বিভাগ করিয়া খণ্ড করিয়া লইয়া অর্থাৎ প্রথমে দুই দ্বারা পরে ১ দ্বারা গুণ্যকে গুণ করিয়া যোগ করিলে ১৬২০ হইবে।

অথবা দ্ব্যূনেন গুণেন (১০) দ্বাভ্যাঞ্চ (২) পৃথগ্ গুণ্যে গুণিতে যুক্তে চ জাতং তদেব ১৬২০।

অথবা ১২ হইতে দুই কম করিয়া লইয়া অর্থাৎ ১০ দ্বারা এবং পরে ২ দ্বারা গুণ্যকে পৃথক্ পৃথক্ গুণ করিয়া পরে যোগ করিলে ১৬২০ হইবে।

অথবাষ্টযুতেন গুণেন (২) গুণ্যে গুণিতেঽষ্ট (৮) গুণিত গুণ্য হীনে চ জাতং তদেব ১৬২০।

অথবা গুণকের সহিত ৮ যোগ করিয়া অর্থাৎ কুড়ি করিয়া লইয়া তাহার দ্বারা গুণ্যের সহিত গুণ করিলে, এবং গুণ্যের সহিত ৮ দ্বারা গুণ করিলে পরে উভয়ের বিয়োগ করিলে ১৬২০ হইবে।

ইতি গুণন প্রকারঃ।

এইরূপ গুণের রীতি।

-ভাগহারে করণ সূত্রং বৃত্তম। ভাজ্যাদ্ধরঃ শুধ্যতি যদ্গুণঃ স্যাদন্ত্যাৎ ফলং তৎ খলু ভাগহারে। সমেন কেনাপ্য প্রবর্ত্ত্য হার ভাজ্যৌ ভজেদ্বা সতি সম্ভবে তু। ১৭

ভাগের বিষয়ে নিয়ম একটি। ভাজ্য হইতে হর পাওয়া যায় ভাজ্যকে গুণ করিলে ভাজকের শেষ সংখ্যা পাওয়া যায়, ইহাই ভাগের ভাগফল অথবা সম্ভব হইলে কোন ক্ষুদ্র সংখ্যায় যাহা ভাজ্য ও ভাজকের মধ্যে সাধারণ রাশি তাহার দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল পাওয়া যায়।

অত্র পূর্ব্বোদাহরণে গুণিতাঙ্কানাং দ্বিগুণচ্ছেদানাং ভাগহারার্থং ন্যাসঃ ভাজ্যঃ। ১৬২০

ভাজকঃ ১২।

ভজনাল্লব্ধো গুণ্যঃ। ১৩৫

পূর্ব্বে গুণের উদাহরণে গুণিত অঙ্কগুলির নিজ গুণচ্ছেদ সমূহের ভাগের বিষয়ে ভাজ্য হইল ১৬২০।

ভাজক—১২

ভাগ করিয়া ভাগফল পাওয়া যাইল আগের গুণ্য ১৩৫।

অথবা ভাজ্যহারৌ ত্রিভিরপবর্ত্তিতৌ $\frac{৫৪০}{৪}$ চতুর্ভির্বা $\frac{৪০৫}{৩}$ স্ব স্ব হারেণ কৃতে ফলং তদেব। ১৩৫।

অথবা ভাজ্যকে তিন দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল হইবে, তাহাকে চার দ্বারা ভাগ করিতে হইবে বা ভাজ্যকে ৪ দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল হইবে, তাহাকে তিন দ্বারা ভাগ করিতে হইবে অর্থাৎ ৫৪০ ÷ ৪ = ১৩৫ এবং ৪০৫ ÷ ৩ = ১৩৫ ভাগফল হইবে।

ইতি ভাগহারঃ।

এইরূপ ভাগের নিয়ম।

বর্গে করণসূত্রং বৃত্তদ্বয়ম্। সমদ্বিঘাতঃ কৃতিরুচ্যতেঽত্র স্থাপ্যোঽন্ত্যবর্গো দ্বিগুণান্ত্যনিঘ্নাঃ। স্বস্বো-পরিষ্টাচ্চ তথা পরেঽঙ্কাস্ত্যক্ত্বান্ত্যমুৎসার্য্য পুনশ্চ রাশি॥ খণ্ডদ্বয়স্যাভিহতির্দ্বিনিঘ্নী তৎ খণ্ডবর্গৈক্যযুতা কৃতির্বা। ইষ্টোনযুগ্রাশি বধঃ কৃতিঃ স্যাদিষ্টস্য বর্গেণ সমন্বিতো বা। ১৮—১৯।

বর্গের সূত্র দুইটি অনুচ্ছেদ। সমান দুইটি সংখ্যার গুণফলকে বর্গ বলে। শেষ রাশি উপরে রাখিতে হইবে অবশিষ্ট রাশি দ্বিগুণ করিতে হইবে এবং শেষ রাশি দ্বারা গুণ করিয়া উপরে রাখিতে হইবে পরে পুনরায় শেষ রাশি ভিন্ন অন্য রাশি রাখিতে হইবে। অথবা দুইটি অংশের দ্বিগুণ করিয়া অংশগুলির বর্গের সহিত যোগ করিলে বর্গ হইবে। রাশির সহিত ধরিয়া লওয়া রাশি যোগ করিতে হইবে এবং রাশির সহিত ধরিয়া লওয়া রাশি বিয়োগ করিতে হইবে, এইবার সেই দুইটির গুণ করিতে হইবে এবং তাহার সহিত ধরিয়া লওয়া রাশির বর্গ যোগ করিতে হইবে তাহা হইলেই রাশির বর্গ পাওয়া যাইবে। ১৮।১৯।

অত্রোদ্দেশকঃ। সখে নবানাঞ্চ চতুর্দ্দশানাং ব্রূহি ত্রিহীনস্য শতত্রয়স্য।

পঞ্চোত্তরস্যাপ্যযুতস্য বর্গং জানাসি চেদ্ বর্গবিধান মার্গম্॥ ২০

ইহার উদাহরণ। হে প্রিয়ে! নয়, চতুর্দ্দশ, তিন শতকের তিন কম, অযুতের পাঁচ বেশী ইহাদের বর্গ বাহির করিবার রীতি যদি তোমার জানা থাকে বল।

ন্যাসঃ। ৯।১৪।২৯৭।১০০০৫।

এষাং যথোক্তকরণেন জাতাবর্গাঃ। ৮১।১৯৬।৮৮২০৯।১০০১০০০২৫।

নিয়ম। উপরিউক্ত নিয়মানুসারে এইরূপ উহাদের বর্গ জন্মিল ৮১।১৯৬।৮৮২০৯।১০০১০০০২৫।

অথবা নবানাং খণ্ডে। ৪।৫। অনয়োরাহতি ২০।

দ্বিনিঘ্নী—৪০। তৎ খণ্ডবর্গৈক্যেন ৪১। যুতা জাতা সৈব কৃতিঃ ৮১।

অথবা ৯কে ৪ এবং ৫ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহাদের গুণকরা হইল ২০। ইহাদের গুণফলকে দ্বিগুণ করা হইল ৪০। তাহাদের দুইটির অর্থাৎ $৪^{২}$ এবং $৫^{২}$ বর্গের যোগ করা হইল এবং এই দুই যোগ করিলে ৪০ + ৪১ = ৮১

অ ঙ্ক ভা ব না

অথবা চতুর্দ্দশানাঃ খণ্ডে ৮।৬ অনয়োরাহতি ৪৮। দ্বির্নিঘ্নী ৯৬। তৎ খণ্ডবর্গৌ ৩৬।৬৪ অনয়োরৈক্যেন ১০০। যুতা জাতা সৈব কৃতিঃ ১৯৬।

অথবা ১৪কে দুইটি খণ্ডে ৮ এবং ৬ বিভক্ত করা হইল, পরে উহাদের গুণ করা হইল—৪৮ হইল। ইহার দ্বিগুণ করা হইল ৯৬। দুইটি খণ্ডের বর্গ করা হইল ৩৬ এবং ৬৪। ইহাদের যোগ করা হইল ১০০ হইল। ইহার সহিত ৯৬ যোগ করা হইল, ১৯৬ হইল। অথবা খণ্ডে ৪।১০। তথাপি সৈব কৃতিঃ ১৯৬।

১৪কে ৪ এবং ১০ এই দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইল। ইহাদের গুণ করা হইল ৪০। ইহার দ্বিগুণ করা হইল ৮০। দুইটি খণ্ডের বর্গ করা হইল ১৬ এবং ১০০ যোগ করিয়া ১১৬ হইল। ইহার সহিত ৮০ যোগ করা হইল—১৯৬ হইল।

অথবা রাশিঃ ২৯৭। অয়ং ত্রিভির্নিতঃ। পৃথগ্ যুতশ্চ। ২৯৪ ৩০০ অনয়োর্ঘাতঃ ৮৮২০০। ত্রিবর্গ ৯। যুতো জাতো বর্গঃ স এব ৮৮২০৯। এবং সর্ব্বত্রাপি।

অথবা ২৯৭ এই রাশির বর্গ। ইহা হইতে ৩ বাদ দিতে হইবে এবং ইহাতে তিন যোগ করিতে হইবে। ইহাতে ২৯৪ ও ৩০০ এই দুইটি রাশি পাওয়া যাইল। ইহাদের গুণ করিতে হইবে।

৮৮২০০ ইহার সহিত তিনের বর্গ যোগ করিতে হইবে অতএব ৮৮২০০ যোগ ৯=৮৮২০৯ হইবে।

এইরূপ সকল ক্ষেত্রে।

বর্গমূলে করণ সূত্রং বৃত্তম্। ত্যক্ত্বান্ত্যাদ্ বিষমাত্ত কৃতিং দ্বিগুণয়েন্মূলং সমে তদ্ধৃতে ত্যক্ত্বা লব্ধকৃতং তদাদ্যবিষমাল্লব্ধং দ্বিনিঘ্নং ন্যসেৎ। পঙ্ক্ত্যাং পঙ্ক্তি হৃতে সমেঽন্য বিষমাব্যক্ত্বাপ্তবর্গং ফলং পঙ্ক্ত্যাং তদ্ দ্বিগুণং ন্যসেদিতি মুহুঃ পঙ্ক্তে র্দলং স্যাৎ পদম্। ২১

বর্গমূলের সূত্র একটি অনুচ্ছেদ। বিষম রাশির শেষ হইতে ত্যাগ করিয়া মূল রাশিকে দ্বিগুণ করিতে হইবে। সম রাশিকে তাহার দ্বারা ভাগ করিয়া যে ভাগফল হইল, সেই ভাগফলের বর্গ সেই সমরাশি হইতে বিয়োগ করিয়া দ্বিগুণ করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ এক পঙ্ক্তিতে ভাগফলের দ্বিগুণ রাখিতে হইবে।

এইভাবে পুনরায় ভাগফলের দ্বিগুণ করিতে হইবে। পুনরায় সমরাশির দ্বারা ভাগ করিতে হইবে এবং ভাগফলের বর্গ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে এইভাবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে যতক্ষণ না রাশি শেষ হয়।

অত্রোদ্দেশকঃ। মূলং চতুর্ণাঞ্চ তথা নবানাং পূর্ব্বং কৃতানাঞ্চ সখ কৃতীনাম্। পৃথক্ পৃথগ্ বর্গপদানি বিদ্ধি বুদ্ধের্বিবৃদ্ধির্যদি তেঽত্র জাতা। ২২

ইহার উদাহরণ। মূল ৪,৯ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাশির পৃথক্ পৃথক্ বর্গ পদ জানিও, যদি তোমার বুদ্ধি বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ন্যাসঃ ৪।৯।৮১।১৯৬।৮৮২০৯।১০০১০০০২৫ লব্ধানি ক্রমেণ মূলানি ২।৩।৯।১৪।২৯৭।১০০০৫।

উদাহরণের প্রকার ৪।৯।৮১।১৯৬।৮৮২০৯।১০০১০০০২৫ এইভাবে ক্রমে ক্রমে বর্গমূল পাওয়া যাইল—

```
৪ (২        ৯ (৩        ৮১ (৯        ১৯৬ (১৪          ৮৮২০৯ (২৯৭
৪           ৯           ৮১           ১                ৪
—           —           —          ——————           ——————
                                 ২৪ | ৯৬        ৪৯ | ৪৮২
১০০১০০০২৫ (১০০০৫                      ৯৬             ৪৪১
১                                    ——             ——————
——————                                        ৫৮৭ | ৪১০৯
  ০০                                                ৪১০৯
        ——————                                      ——————
২০০০৫ | ১০০০২৫
        ১০০০২৫
        ——————
```

ইতি বর্গমূলম্

ঘনে করণসূত্রং বৃত্তত্রয়ম্। সমত্রিঘাতশ্চ ঘনঃ প্রদিষ্টঃ স্থাপ্যো ঘনোঽন্ত্যস্য ততোঽন্ত্যবর্গঃ। আদিত্রিনিঘ্নস্ততঃ আদিবর্গস্ত্যন্ত্যা হতোঽথাদিঘনশ্চ সর্বে॥ স্থানান্তরত্বেন যুতা ঘনঃ স্যাৎ প্রকল্প্য তৎ খণ্ডযুগং ততোঽন্ত্যম্। এবং মুহূর্বর্গঘন প্রসিদ্ধা বাদ্যাঙ্কতো বা বিধিরেষঃ কার্য্যঃ। খণ্ডাভ্যাং বাহতোরাশিস্ত্রিঘ্নঃ খণ্ডঘনৈক্যযুক্। বর্গমূল ঘনস্বঘ্ন। বর্গরাশের্ঘনো ভবেৎ। ২৩-২৫

ঘনফল নির্ণয়ের তিনটি অনুচ্ছেদ। সমরাশিকে সমরাশি দ্বারা তিন বার গুণ করিলে ঘন পাওয়া যায়। শেষ রাশির ঘন বাহির করিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর, শেষ রাশির বর্গ প্রথম রাশির তিন গুণের দ্বারা গুণ করিতে হইবে। তার পর প্রথম রাশির বর্গ তিন গুণ করিয়া শেষে রাখিতে হইবে এবং শেষে প্রথম রাশির ঘন লইতে হইবে। এইগুলি সমস্ত যোগ করিতে হইবে; সেই সংখ্যাটিকে দুইটি ভাগ করিয়া একটিকে শেষে রাখিতে হইবে। এইভাবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। অথবা এই নিয়ম রাশির প্রথম স্থানটিকে লইতে হইবে ঘন বা বর্গ বাহির করিবার জন্য। অথবা সেই সংখ্যার তিন গুণকে ইহার দুইটি খণ্ডের দ্বারা গুণ করিতে হইবে। ঐ খণ্ডগুলির ঘন বাহির করিয়া যোগ করিতে হইবে। অথবা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বর্গমূলকে ঘন করিতে হইবে পরে উহাই বর্গমূলের ঘনবর্গ হইবে।

অত্রোদ্দেশকঃ। নবঘনং ত্রিঘনস্য ঘনং তথা কথয় পঞ্চ ঘনস্য ঘনঞ্চমে। ধনপদঞ্চ ততোঽপি ঘনাৎ সখেযথদি ঘনেঽস্তি ঘনা ভবতো মতি: ২৭

ইহার উদাহরণ। হে সখে যদি তোমার ঘন সম্বন্ধে সেরূপ বুদ্ধি থাকে তো বল ৯ এর ঘন কত? তিনের ঘনের ঘন কত? পাঁচের ঘনের ঘন কত? এবং এই ঘনগুলির ঘন কত?

ন্যাসঃ ৯।২৭।১২৫

জাতাঃ ক্রমেণ ঘনাঃ ৭২৯।১৯৬৮৩।১৯৫৩১২৫

অথবা রাশিঃ। ৯। অস্য খণ্ডে ৪।৫। আভ্যাং রাশির্হতঃ ১৮০। ত্রিনিঘ্নশ্চ ৫৪০। খণ্ড ঘনৈক্যেন ১৮৯। যুতো জাতো ঘনঃ ৭২৯।

অথবা ৯ এই রাশির ঘন বাহির করিতে হইলে ইহাকে ৪ ও ৫ এই দুই খণ্ডে ভাগ করিতে হইবে। এই দুইটি রাশি দ্বারা ৯ কে গুণ করিতে হইবে ৯×৪×৫=১৮০। ইহার তিন গুণ করিতে হইবে

৩ × ১৮০ = ৫৪০। খণ্ড ঘনের ঐক্য = ১৮০ + ৯ = ১৮৯। দুইটি যোগ করিলে ঘন হইবে ৫৪০ + ১৮৯ = ৭২৯

অথবা রাশিঃ ২৭। অস্যখণ্ডে ২০।৭। আভ্যাং ঘনস্ত্রিঘ্নশ্চ। ২২৩৪০। খণ্ডঘনৈক্যেন। ৮৩৪৩। যুতো জাতো ঘনঃ ১৯৬৮৩

অথবা ২৭ এই রাশির ঘন বাহির করিতে হইলে ২০ ও ৭ এই দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইল। ২০, ৭ এবং ২৭ এই তিনটি রাশি গুণ করিতে হইবে = ৩৭৮০ ইহার সহিত ৩ গুণ করিতে হইবে = ১১৩৪০ খণ্ডঘনের ঐক্য ৮৩৪৩। এই দুইটি রাশি যোগ করিতে হইবে।

১১৩৪০ + ৮৩৪৩ = ১৯৬৮৩ | $২০^৩ + ৭^৩$ = ৮০০০ + ৩৪৩ = ৮৩৪৩ |

অথবা রাশিঃ ৪। অস্য মূলম্ ২। ঘনঃ ।৮। অয়ং স্বঘ্নোজাতশ্চতুর্ণাং ঘনঃ। ৬৪

অথবা ৪ এই রাশির বর্গমূল ২। ইহার ঘন ৮। এই চারকে ৩ বার গুণ করিলে ৪ × ৪ × ৪ = ৬৪।

অথবা রাশিঃ ৯। অস্য মূলং '৩' ঘনঃ ২৭। অস্য বর্গোনবানাং ঘনঃ। ৭২৯। য এব বর্গরাশিঘনঃ স এব বর্গমূলঘনবর্গঃ।

অথবা ৯ এই রাশির বর্গমূল ৩। ইহার ঘন ২৭। ৯ অর্থাৎ ৩ এর বর্গ তাহার ঘন ৭২৯। সংক্ষেপে ঘনের বর্গ, বর্গের ঘনের সহিত সমান।

ইতি ঘনঃ।

অথ ঘনমূলে করণ সূত্রং বৃত্তদ্বয়ম্। আদ্যং ঘনস্থান যথাঘনে দ্বে পুনস্তথান্ত্যাদ্ঘনতোবিশোধ্যম্। ঘনং পৃথকস্থং পদমস্য কৃত্বা ত্রিঘ্ন্যা তদাদ্যং বিভজেৎ ফলন্তু॥ পঙক্ত্যাংন্যসেৎ তৎকৃতিমস্যানিঘ্নীং ত্রিঘ্নাং ত্যজেৎ তৎ প্রথমাৎ ফলস্য। তদাদ্যাদ্ঘনমূলমেবং পঙক্তির্ভবেদেব মতঃ পুনশ্চ॥ ২৭ – ২৮।

অনন্তর ঘন মূলের সূত্র দুইটি অনুচ্ছেদ।

প্রথম রাশিটি ঘনের স্থান। পরের দুইটি স্থান ঘন ভিন্ন; অবশিষ্ট সেই প্রকার। শেষ ঘন স্থান হইতে ঘন গ্রহণ করিতে হইবে এবং বর্গকে পৃথক স্থানে বসাইতে হইবে। সেই বর্গমূলের তিনগুণ করিয়া পরের রাশি দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল পরের লাইনে (পঙক্তিতে) স্থাপন করিতে হইবে। পরের রাশি হইতে যাহাকে তিনগুণ করা হইয়াছিল তাহা বিয়োগ করিতে হইবে এবং ঘনকেও পরেরটি হইতে বাদ দিতে হইবে। এই পঙক্তিটই ঘনমূল। প্রয়োজনানুসারে এইরূপ পুনঃ পুনঃ করা যাইতে পারে।

অত্র পূর্ব্বোদ্দেশকে উক্ত ঘনানাং মূলার্থ ন্যাসঃ।

৭২৯। ১৯৬৮৩। ১৯৫৩১২৫।

ক্রমেন লব্ধানি মূলানি— ৯। ২৭ ১২৫

পূর্ব্বোদাহরণে ঐগুলির ঘনমূল এইরূপ—

৭২৯। ১৯৬৮৩। ১৯৫৩১২৫।

যথাক্রমে ৯। ২৭ এবং ১২৫ ইহারাই ঘনমূল। এইরূপ ঘনমূল সম্পূর্ণ।

অথ ভিন্ন পরিকর্ম্মাষ্টকম্। তত্রাদাবংশসবর্ণনম্। তত্রাপি ভাগ জাতৌ করণসূত্রং বৃত্তম। অন্যোহন্য হারাভিহতৌ হরাংশৌ রাশ্যোঃ সমচ্ছেদবিধানমেবম্। মিথো হরাভ্যামপবর্ত্তিতাভ্যাং যদ্বা' হরাংশৌ সুধিয়াত্র গুণ্যেণ। ২৯।

অনন্তর ভিন্ন পরিচ্ছেদ। প্রথমে ভগ্নাংশের বর্ণনা। ভগ্নাংশের লঘুকরণে একটি অনুচ্ছেদ। দুইটি রাশির হর ও লবকে বিপরীতক্রমে অপর রাশির হর দ্বারা গুণ করিয়া সমান হর বিশিষ্ট রাশিতে পরিণত করা যায়, অথবা হর ও লব উভয়কে বুদ্ধিমানগণ হরদ্বয় হইতে সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়া বিপরীত ক্রমে গুণ করিতে পারেন।

অত্রোদ্দেশকঃ। রূপত্রয়ং পঞ্চলবস্ত্রিভাগো যোগার্থমেতান্বদ তুল্যহরান্। ত্রিষষ্টিভাগশ্চ চতুর্দ্দশাংশঃ সমচ্ছিদৌ মিত্র বিয়োজনার্থম্ ॥ ৩০

ন্যাস $\frac{৩}{১}+\frac{১}{৫}+\frac{১}{৩}$

জাতা সমচ্ছেদাঃ $\frac{৪৫}{১৫}+\frac{৩}{১৫}+\frac{৫}{১৫}$

যোগে জাতম্ $\frac{৫৩}{১৫}$

অথ দ্বিতীয়োদাহরণার্থং ন্যাসঃ $\frac{১}{৬৩}-\frac{১}{১৪}$

এতৌ সপ্তাপবর্ত্তিতাভ্যাং হারাভ্যাং ২, ৯

মিথ সংগুণিতৌ সমচ্ছেদৌ $\frac{২}{১২৬}-\frac{৯}{১২৬}$

বিয়োজিতে জাতম্ $\frac{৭}{১২৬}$

সপ্তানবর্ত্তিতে চ জাতম্ $\frac{১}{১৮}$

সাধারণ হরে পরিণত করিয়া এই তিনটি রাশি যোগ করিলে কি হইবে বল :— $\frac{৩}{১}+\frac{১}{৫}+\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{১৪}$ হইতে $\frac{১}{৬৩}$ বিয়োগ করিলে কি হইবে বল।

যোগের সময় সাধারণ হরে পরিণত করা হইল (১৫) অতএব $\frac{৪৫}{১৫}+\frac{৩}{১৫}+\frac{৫}{১৫}=\frac{৫৩}{১৫}$

বিয়োগের সময় হরের সাধারণ উৎপাদক বাহির করা হইল—৭। ৬৩=৭ × ৯ ; ১৪=৭ × ২

∴ সাধারণ হর ৭ × ৯ × ২ = ১২৬

$\frac{৯}{১২৬}-\frac{২}{১২৬}$ অতএব বিয়োগ ফল $\frac{৭}{১২৬}$

অতএব সংক্ষেপ করণে $\frac{১}{১৮}$ হইল।

ইতি ভাগজাতিঃ।

এইরূপ ভাগের বিবরণ।

অথ প্রভাগজাতৌ করণ সূত্রং বৃত্তার্দ্ধম্। লবালবঘ্নাশ্চ হরাহরঘ্না ভাগপ্রভাগেষু সবর্ণনংস্যাৎ। ৩১

ভগ্নাংশের উপভাগের লঘুকরণ এর নিয়ম অর্দ্ধ অনুচ্ছেদ। লবের সহিত লবের এবং হরের সহিত হরের গুণ করিতে হয় ভগ্নাংশের উপবিভাগে।

অত্রোদ্দেশকঃ। দ্রম্মার্দ্ধত্রিলবদ্বয়স্য সুমতে পাদত্রয়ংযদ্ভবেৎ তৎ পঞ্চাংশকো ষোড়শাংশচরণঃ সম্প্রার্থিতেনার্থিনে। দত্তোযেন বরাটকাঃ কতি কদর্য্যেনাপিতা স্তেন মে ব্রূহিত্বং যদি বেৎসি গণিতে জাতিং প্রভাগাভিধাম্। ৩২

অ ঙ্ক ভা ব না

উদাহরণ কোন ভিক্ষুক কোন এক কৃপণ ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা চাইতে—সে এক দ্রম্মের অর্দ্ধেকের দুই তৃতীয়াংশের তিনের চতুর্থাংশের একের পঞ্চমাংশের একের ষোল অংশের সিকি ভাগ দান করিল—গণিতের উপভাগে যদি তোমার দক্ষতা থাকে তাহা হইলে বল কতগুলি কড়ি কৃপণটি দান করিয়াছিল।

ন্যাসঃ। ১/২ ২/৩ ৩/৪ ১/৫ ১/১৬ ১/৪ সবর্ণিতে জাতম্ ৬/৭৬৮০ ষড়ভিরপবর্ত্তিতে জাতম্—৬/৭৬৮০=১/১২৮০ একো দত্তো বরাটকঃ।

বর্ণনা—দ্রম্ম এর (অর্দ্ধ) ১/২ র (ত্রিলব দ্বয়স্য) ২/৩ র (পাদত্রয়ং) ৩/৪ এর (পঞ্চমাংশক) ১/৫ এর (ষোড়শাংশ) ১/১৬ এর (চরণা) ১/৪=৬/৭৬৮০ সংক্ষেপ করণে ১/১২৮০। অর্থাত একটি কড়ি দান করিল। এক দ্রম্ম=১২৮০ কড়ি।

ইতি প্রভাগজাতিঃ।

এইরূপ উপভাগের বিবরণ।

অথ ভাগানুবন্ধ ভাগাপবাহয়োঃ করণসূত্রং সার্দ্ধবৃত্তম্। ছেদকরূপেষু লবাঘনর্ণমেকস্য ভাগা অধিকোনকাশ্চেৎ। স্বাংশাধিকোনঃ খলু যত্র তত্র ভাগানুবন্ধে চলবাপবাহে। তলস্থহারেণ হরন্নিহ স্যাৎ স্বাংশাধিকোনেন তু তেন ভাগান্। ৩৩

যে কোন রাশির ভগ্নাংশের দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস দেড় অর্থাৎ এক আর অর্দ্ধেক অনুচ্ছেদ। যে কোন পূর্ণসংখ্যা হরের দ্বারা গুণ করিলে লবটি যোগ চিহ্ন বা বিয়োগ চিহ্ন যুক্ত হয় যদি অংশগুলি তাহার সহিত যোগ বা বিয়োগ করা হয়। কিন্তু ইহার কোন অংশদ্বারা যদি রাশিটি বর্দ্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তবে ভগ্নাংশের যোগে বা বিয়োগে নিম্নস্থিত হরকে হরের দ্বারা গুণ করিতে হয় এবং লবকে বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হরের দ্বারা গুণ করিতে হয়।

অত্রোদ্দেশকঃ। সাঙ্ঘিদ্বয়ং ত্রয়ং ব্যঙ্ঘ্রি কীদৃগ্ ব্রূহি সবর্ণিতম্। জানাস্যংশানুবন্ধঞ্চেত্তথা ভাগাপবাহনম্। ৩৪

ইহার উদাহরণ—ভগ্নাংশের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সহিত যদি পরিচয় থাকে তাহা হইলে বল, দুই এবং এক চতুর্থাংশ যুক্ত হইলে, তিন হইতে এক চতুর্থাংশ হ্রাস করা হইলে কত হয়।

ন্যাসঃ ২ ৩

১/৪ ১/৪

সবর্ণিতে জাতম্—৯/৪ ১১/৪

বর্ণনা—২ ৩

১/৪ ·১/৪ (এখানে বিন্দুটি বিয়োগের চিহ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে অতএব) ২ এবং ১/৪=৯/৪ এবং ৩ হইতে ১/৪ বিয়োগ করিলে ১১/৪ হইবে।

অত্রোদ্দেশকঃ। অঙ্কিং স্বত্র্যংশযুক্তঃ স নিজদলযুতঃ কীদৃশঃ কীদৃশীদ্বৌ ত্র্যংশৌ স্বাষ্টাংশহীনৌ তদনু চ রহিতৌ স্বত্রিভিঃ সপ্তভাগৈঃ। অর্দ্ধস্বাষ্টাং শহীনং নবভিরথযুতং সপ্তসাংশৈঃ স্বকীয়ৈঃ কীদৃক্‌স্যাদ্ ব্রূহি বেৎসি ত্বমিহ যদি সখেংশাসুবন্ধাপবাহৌ॥ ৩৫

উদাহরণ—এক চতুর্থাংশ তাহার একের তিনের সহিত নিজ অর্দ্ধাংশের সহিত যোগ করিলে এবং

দু'এর তিনের অংশ হইতে একের আট অংশ বিযুক্ত হইলে এবং তাহা হইতে তিনের সাত অংশ বিযুক্ত হইলে কত হয়; বল দেখি ঠিক্ ঐ উপায়ে অর্দ্ধ হইতে একের আট অংশ বিযুক্ত হইলে এবং নয়ের সাত অংশ যুক্ত হইলে কত হয় যদি হে কল্যাণি! ভগ্নাংশের যোগ বা বিয়োগে নিপুণা হও তো বল!

ন্যাসঃ $\frac{১}{৪}$ $\frac{২}{৩}$ $\frac{১}{২}$

$\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৮}$ $\frac{১}{৮}$

$\frac{১}{২}$ $\frac{৩}{৭}$ $\frac{৯}{৭}$

ক্রমেণ সবর্ণিতে জাতম্—$\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{১}$

বর্ণনা : ১ $\frac{২}{৩}$ $\frac{১}{২}$

$\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৮}$ $\frac{১}{৮}$

$\frac{১}{২}$ $\frac{৩}{৭}$ $\frac{৯}{৭}$

$$\frac{১\times(৩+১)\times(২+১)}{৪\times৩\times২}=\frac{১২}{২৪}=\frac{১}{২} \quad \Big| \quad \frac{৫৬}{১৬৮}=\frac{১}{৩} \quad \Big| \quad \frac{১১২}{১১২}=\frac{১}{১}$$

ইতি জাতিচতুষ্টম্।

অথ ভিন্ন সঙ্কলিত ব্যবকলিতয়োঃ করণ সূত্রং বৃত্তার্দ্ধম্। যোগোঽন্তরং তুল্যহরাংশকানাং কল্প্যহরো-রূপমহাররাশেঃ॥ ৩৬

ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগের অর্দ্ধ অনুচ্ছেদ। ভগ্নাংশে যোগ অথবা বিয়োগে সমান হর গ্রহণ করিতে হয়। যাহার ভাগফল নাই সেইরূপ রাশির এক বলিয়া হর কল্পনা করিতে হয়।

অত্রোদ্দেশকঃ। পঞ্চাংশপাদ ত্রিলবার্দ্ধষষ্ঠানেকীকৃতান্ ব্রূহি সখে মমৈতান্ এভিশ্চ ভাগৈরথ বর্জ্জিতানাং কিং স্যাৎ ত্রয়াণাং কথয়াশু শেষম্॥ ৩৭

হে কল্যাণি শীঘ্র বল, একের পাঁচ, একের চার, একের তিন, একের দুই, একের ছয় যোগ করিলে কি হয়? তিন হইতে ইহা বিয়োগ করিলে কি হয় বল।

ন্যাসঃ—$\frac{১}{৫}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৬}$

ঐক্যে জাতম্—$\frac{২৯}{২০}$

অথৈতৈর্বিবর্জ্জিতানাং ত্রয়াণাং শেষম্ $\frac{৩১}{২০}$

বর্ণনা—$\frac{১}{৫}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}$

$$=\frac{১২+১৫+২০+৩০+১০}{৬০}=\frac{৮৭}{৬০}=\frac{২৯}{২০}$$

তিন হইতে ইহা বাদ দিলে শেষ থাকিবে $\frac{৩১}{২০}$,

ইতি ভিন্ন সঙ্কলিত ব্যবকলিতে।

এইরূপ ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগের নিয়ম।

অথ ভিন্ন গুণনে করণসূত্রং বৃত্তার্দ্ধম্। অংশাহতিশ্ছেদ বধেন ভক্তা লব্ধং বিভিন্নে গুণনে ফলং স্যাৎ। ৩৮
ভগ্নাংশের গুণের সূত্র অর্দ্ধ অনুচ্ছেদ। লবগুলির গুণফলকে হর গুলির গুণ ফলের দ্বারা ভাগ করিলে ভগ্নাশের গুণফল পাওয়া যায়।

অত্রোদ্দেশকঃ। সত্র্যংশরূপ দ্বিতয়েন নিঘ্নং স সপ্তমাংশ দ্বিতয়ং ভবেৎ কিম্। অর্দ্ধ ত্রিভাগেন হতঞ্চ বিদ্ধি দক্ষোঽসি ভিন্নে গুণনা বিধৌ চেৎ॥ ৩৯

উদাহরণ—দুই ও একের সাতকে দুই ও একের তিন দিয়া গুণ করিলে কি হইবে এবং একের দুইকে একের তিন দিয়া গুণ করিলে কি হইবে যদি গুণের বিধানে নিপুণা হও তো বল?

ন্যাসঃ— ২ ২

$\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৭}$

সবর্ণিতে জাতম্— $\frac{৭}{৩}$ $\frac{১৫}{৭}$

গুণিতে জাতম্— $\frac{৫}{১}$

ন্যাসঃ — $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{৩}$

গুণিতে জাতম্— $\frac{১}{৬}$

বর্ণনা— $২+\frac{১}{৩}$ $২+\frac{১}{৭}$

উভয়ে যোগ করিলে $\frac{৭}{৩}$ $\frac{১৫}{৭}$

উভয়ের গুণফল $=\frac{\not{৭}}{\not{৩}}\times\frac{\overset{৫}{\not{১৫}}}{\not{৭}}=\frac{৫}{১}$

বর্ণনা $\frac{১}{২}$ এবং $\frac{১}{৩}$

গুণ করিলে $\frac{১}{২}\times\frac{১}{৩}=\frac{১}{৬}$

ইতি ভিন্ন গুণনম্।

এইরূপ ভিন্ন রাশির গুণফল।

অথ ভিন্ন ভাগহারে করণসূত্রং বৃত্তার্দ্ধম্।
ছেদং লবঞ্চ পরিবর্ত্ত্যহরস্য শেষঃ কার্য্যোঽথ ভাগহরণে গুণনাবিধিশ্চ। ৪০

ভগ্নাংশের ভাগের সূত্র অর্দ্ধ অনুচ্ছেদ। লবের সহিত হরের পরিবর্ত্তন করিয়া গুণনের নিয়মানুসারে গুণ করিতে হইবে।

অত্রোদ্দেশকঃ। সত্র্যাংশরূপ দ্বিতয়েন পঞ্চত্র্যংশেন ষষ্ঠং বদ মে বিভজ্য। দর্ভীয়গ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শ্চেদস্তি তে ভিন্নহতৌ সমর্থা॥ ৪১

পাঁচকে দুই এবং একের তিন দ্বারা ভাগ করিলে এবং একের ছয়কে একের তিন দ্বারা ভাগ করিলে হে কুশাগ্রসুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্নে যদি সমর্থ হও তো বল।

ন্যাসঃ— ২

$\frac{১}{৩}$ $\frac{৫}{১}$ $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৬}$

যথোক্ত করণেন জাতম্ $\frac{১৫}{১}$ $\frac{১}{২}$

ইতি ভিন্ন ভাগহারঃ

বর্ণনা ২

$\frac{১}{৩}$ $\frac{৫}{১}$ $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৬}$

উক্ত প্রকারে স্থির হইল $\frac{১৫}{১}$ $\frac{১}{২}$

এইভাবে ভিন্ন ভাগের প্রকরণ।

অথ ভিন্ন বর্গাদৌ স্বত্রং বৃত্তার্দ্ধম্। বর্গে কৃতৌ ধনবিধৌ তুঘনৌ বিধেয়ৌ হারাংশয়োরথ পদে চ পদ প্রসিদ্ধৈ। ৪২

অনন্তর ভিন্ন বর্গেতে স্বত্র অর্দ্ধ অনুচ্ছেদ। বর্গ নির্ণয় করিতে হইলে অথবা ঘন নির্ণয় করিতে হইলে লব এবং হর উভয়ের বর্গ বাহির করিতে হইবে এবং উভয়ের বর্গমূল বাহির করিতে হইবে। এবং বর্গমূল বাহির করিতে হইলে লব ও হরের উভয়ের বর্গমূল বাহির করিতে হইবে।

অত্রোদ্দেশকঃ। সার্দ্ধত্রয়াণাং কথয়াশু বর্গং বর্গাত্ততো বর্গ পদঞ্চ মিত্র। ঘনঞ্চ মূলঞ্চ ঘনাত্ততোহপি জানাসি চেদ্ বর্গঘনৌ বিভিন্নৌ। ৪৩

তিন এবং অর্দ্ধেকের সমষ্টির বর্গ কত শীঘ্র বল। এবং বর্গের বর্গমূল কত? তাহার ঘন এবং তাহার ঘন মূল যদি নিপুণা হওতো শীঘ্র বল।

ন্যাসঃ— ৩

$\frac{১}{২}$

ছেদঘ্নরূপে কৃতে জাতম্—$\frac{৭}{২}$

অস্য বর্গঃ $\frac{৪৯}{৪}$ মূল—$\frac{৭}{২}$

ঘনঃ $\frac{৩৪৩}{৮}$ অস্য মূলং $\frac{৭}{২}$

ইতি ভিন্ন পরিকর্ম্মাষ্টকম্।

বর্ণনা—৩

$\frac{১}{২}$

ভগ্নাংশ প্রকৃতরূপ করিয়া হইল $\frac{৭}{২}$

এই ভগ্নাংশের বর্গ—$\frac{৪৯}{৪}$ ইহার বর্গমূল $\frac{৭}{২}$

এই ভগ্নাংশের ঘন—$\frac{৩৪৩}{৮}$ ইহার ঘনমূল $\frac{৭}{২}$

অথ শূন্যের পরিকর্ম্মসু করণসূত্রং মার্য্যাদ্বয়ম্। যোগে খংক্ষেপ সমং বর্গাদৌ খং খভাজিতো রাশিঃ। খহরঃ স্যাৎ খগুণঃখং খগুণ শ্চিন্ত্যশ্চ শেষবিধৌ। শূন্যে গুণকে জাতে খং হারশ্চেদ্ পুনস্তদা রাশিঃ। অবিকৃত এব জ্ঞেয়স্তথৈব খেনোনিতশ্চ যুতঃ॥ ৪৪—৪৫

অনন্তর শূন্যের সহিত অন্যরাশির যোগ গুণাদির নিয়ম দুইটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত। যোগে শূন্যের সহিত যে কোন রাশির যোগফল সেই রাশিই হইবে। শূন্যের সহিত গুণে শূন্যই হইবে। শূন্য দ্বারা ভাগ করিলে অশেষ হইবে। গুণের বেলায় শূন্য হইলেও শূন্যের গুণন রূপে থাকিয়া যাইবে। শূন্য ভাজক রূপে ধরিলে অবিকৃত রাশি যাহা উহ্য আছে তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

অত্রোদ্দেশকঃ। খং পঞ্চযুগ্ ভবতি কিংবদ খস্য বর্গং মূলং ঘনং ঘনপদং খগুণশ্চপঞ্চ। খেনোদ্ধৃতা দশ চ কঃ খগুণো নিজার্দ্ধযুক্তো স্ত্রিভিশ্চগুণিত খ ইতি স্ত্রিষষ্ঠীঃ॥ ৪৬

ইহার উদাহরণ—আমাকে বল পাঁচের সহিত শূণ্য যোগ করিলে এবং শূণ্যের বর্গ ইহার বর্গমূল, ঘন এবং ঘনমূল; পাঁচকে শূণ্য দ্বারা গুণ করিলে এবং দশ হইতে শূণ্য বাদ দেওয়া হইলে কত হয়? এবং কোন সংখ্যাকে শূণ্য দ্বারা গুণ করিয়া তাহার সহিত সংখ্যাটির অর্দ্ধ যোগ করিয়া তাহার তিনগুণকে শূণ্য দ্বারা ভাগ করিলে ৬৩ হইবে।

ন্যাসঃ। ০। ত্রতৎপঞ্চ- যুতং জাতম্। ৫। স্বন্যবর্গঃ। ০। মূলম্। ০। ঘনম্। ০। তন্মূলম্। ০।

ন্যাসঃ। ৫। স্বেন গুণিতা জাতাঃ। ০।

ন্যাস। ১০। এতে স্বভক্তাঃ। $\frac{১০}{০}$

বর্ণনা—শূন্যের সহিত পাঁচ যোগ করিলে ৫ হইবে। শূন্যের বর্গ করিলে শূন্য হইবে। শূন্যের বর্গমূল শূন্য হইবে। শূন্যের ঘন শূন্য হইবে।

বর্ণনা—শূন্যের সহিত পাঁচ গুণ করিলে শূন্য হইবে।

বর্ণনা—১০। ইহাকে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে $\frac{১০}{০}$

অজ্ঞাতো রাশিস্তস্য গুণঃ ০। সার্দ্ধংক্ষেপঃ ½ গুণঃ। ৩। হরঃ। ০ দৃশ্যং। ৬৩। ততো বক্ষ্যমানেন বিলোমবিধিনা ইষ্টকর্ম্মণা বা লব্ধো রাশিঃ ১৪। অস্য গণিতস্য গ্রহগণিতে মহানুপযোগঃ।

একটি অজ্ঞাত রাশি লওয়া হইল, ইহাকে শূন্য দ্বারা গুণ করা হইল ইহার সহিত ½ যোগ করা হইল। ইহার সহিত তিন গুণ করা হইল; শূন্য দ্বারা ভাগ করা হইল। এক্ষণে রাশিটি হইবে ৬৩। এক্ষণে বিপরীত প্রণালীতে অথবা সাধারণ নিয়মানুসারে রাশিটি হইবে ১৪। নাক্ষত্রিক গণনাতে ইহার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়।

অজ্ঞাত রাশি=১৪।

"তৃতীয়োঽধ্যায়"

(প্রথমঃ পরিচ্ছেদ ঃ)

অথ ব্যস্তবিধৌ করণ সূত্রং বৃত্তদ্বয়ম্। ছেদং গুণং গুণং ছেদং বর্গ মূলং পদং কৃতিম্। ঋণং স্বং স্বমৃণং কুর্য্যাৎ দৃশ্যে রাশি প্রসিদ্ধয়ে॥ অথ স্বাংশাধিকোনে তু লবা ঢ্যোনো হরোহরঃ। অংশস্তু বিকৃত সুত্র বিলোমে শেষ মুক্তবৎ॥ ৪৭—৪৮।

রাশির বৈপরীত্য বিধির দুইটি অনুচ্ছেদ। ভাজককে গুণ্য কর এবং গুণ্যকে ভাজক কর, বর্গকে বর্গমূল কর এবং বর্গমূলকে বর্গ কর। ঋণ রাশিকে ধন রাশি এবং ধন রাশিকে ঋণ রাশি কর। যদি কোন সংখ্যা তাহার নিজের ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় তবে লবের দ্বারা হরকে বর্দ্ধিত বা হ্রাস করিলে হর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আর লব অপরিবর্তিত থাকিবে। এইভাবে করিতে থাকিলে পাওয়া যাইবে।

অত্রোদ্দেশকঃ। যস্ত্রিঘ্ন স্ত্রিভিরন্বিতঃ স্বচরণৈ র্ভক্তস্ততঃ সপ্তভিঃ স্বস্ত্র্যংশেন বিবর্জিতঃ স্বগুণিতো হীনো দ্বিপঞ্চাশতা। তন্মূলে ইষ্ট যুতে হৃতেহপি দশভির্জাতং দ্বয়ং ব্রূহি তং রাশিং বেৎসি হি চঞ্চলাক্ষি বিমলাং বালে বিলোমক্রিয়াম্ ॥ ৪৯

হে সুন্দরি চটুল নয়নে বালিকে! যদি তোমার বিলোম ক্রিয়াতে দক্ষতা থাকে তো বল। তিন দ্বারা গুণ করিলে এবং গুণ ফলের তিনের চার অংশ যোগ করিলে এবং সাত দিয়া ভাগ করিলে এবং ভাগ ফলের একের তিন অংশ বিয়োগ করিলে এবং সেই রাশির দ্বারা গুণ করিলে এবং তাহা হইতে বাহান্ন বিয়োগ করিয়া তাহার বর্গমূল নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার সহিত আট যোগ করিতে হইবে এবং সেই রাশিকে দশ দ্বারা ভাগ করিলে দুই —হইবে। ন্যাসঃ। গুণঃ ৩। ক্ষেপঃ $\frac{3}{4}$। ভাজকঃ ৭। ঋণং $\frac{1}{3}$। বর্গ। ঋণম্ ৫২। মূলম্। ক্ষেপঃ ৮। হরঃ ১০। দৃশ্যম্ ২। যথোক্ত করণেন জাতো রাশিঃ। ২৮।

বর্ণনা—গুণ্য—৩। যোগ $\frac{3}{4}$। ভাজক ৭। বিয়োগ $\frac{1}{3}$। বর্গ। বিয়োগ ৫২। বর্গমূল। যোগ ৮। ভাজকে ১০। প্রদত্ত রাশি ২৮।

এই ভাবে অগ্রসর হইলে নির্ণেয় রাশি হইবে ২৮। ইতি ব্যস্তবিধিঃ।

অথেষ্ট কর্ম্মসু করণ সূত্রং বৃত্তম্। উদ্দেশ কালাপবদিষ্ট রাশিঃ ক্ষুণ্ণো হৃতোহংশৌ বহিতো যুতো বা। ইষ্টাহতং দৃষ্টমনেন ভক্তং রাশির্ভবেদ্ প্রোক্তমিতীষ্ট কর্ম্ম। ৫০।

ইষ্টকর্ম্মতে একটি অনুচ্ছেদ।

যে কোন রাশি ইচ্ছানুরূপ ধরিয়া লইলেই চলিবে। তাহাকে গুণ করিলে অথবা ভাগ করিলে এবং ভগ্নাংশের দ্বারা যোগ অথবা বিয়োগ করিলে প্রদত্ত রাশি ধরিয়া লওয়া রাশি দ্বারা গুণ করিলে এবং তাহা দ্বারা ভাগ করিলে নির্ণেয় রাশি বাহির হইবে। ইহাকেই ইষ্টকর্ম্ম বলা হয়।

অত্রোদ্দেশকঃ। পঞ্চঘ্নঃ স্বত্রিভাগোনো দশভক্তঃ সমন্বিতঃ। রাশিত্র্যংশার্দ্ধপাদৈঃ স্যাৎকো রাশিদ্ব্যূন সপ্ততিঃ ॥ ৫১।

উদাহরণ—এমন কোন সংখ্যা আছে, যাহাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া গুণ ফলের সহিত মূল সংখ্যার $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ অংশ যোগ করিলে দুই কম সত্তর পাওয়া যায়।

ন্যাসঃ। গুণঃ ৫। স্ব ত্রিভাগঃ। হরঃ ১০। রাশ্যাংশাঃ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ দৃশ্যম্ ৬৮।

বর্ণনা—৫ দ্বারা গুণ। $\frac{1}{3}$ তাহা হইতে বিয়োগ। দশ দ্বারা ভাগ। পরে ইহার সহিত $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ যোগ করিতে হইবে। নির্ণেয় রাশি ৬৮ হইবে।

অত্র কিল কল্পিত রাশিঃ ৩। পঞ্চঘ্নঃ ১৫। স্ব ত্রিভাগোনঃ।

দশভক্তঃ ১। কল্পিত ৩। রাশেস্ত্র্যংশার্দ্ধপাদৈঃ ১/৩, ১/২, ১/৪ সমন্বিতো হরো জাতঃ ১৭/৪ অথ দৃষ্টম্। ৬৮। ইষ্টেন ৩। গুণিতম্ ১০৭ ১৭/৪ হরেণ ভক্তং জাতো রাশিঃ ৪৮।

এবং সর্ব্বত্রোদাহরণে রাশিঃ কেন চিদ্গুণিতো ভক্তো বা রাশ্যংশেন রহিতো যুতো বা ইষ্টগুত্রেষ্টং রাশিং প্রকল্প্য তস্মিন্নুদ্দেশ কালাপ বৎ কর্ম্মণি কৃতে যন্নিস্পদ্যতে তেন ভজেদ্ দৃষ্ট মিষ্টগুণং ফলং রাশিঃ স্যাৎ।

ধরিয়া লওয়া হইল রাশি ৩। ৫ দিয়া গুনকরা হইল=১৫। একের তিন অংশ বাদ দেওয়া হইল=১০। দশ দ্বারা ভাগ করা হইল=১। যে রাশি ধরা হইয়াছিল অর্থৎ ৩ ইহার সহিত ১/৩, ১/২ এবং ১/৪ যোগ করা হইল অর্থাৎ ৩/৩, ৩/২, ৩/৪ যোগ ফল হইল ১৭/৪। ৬৮ কে ইহার দ্বারা ভাগ করা হইল। অতএব $\frac{৪}{৬৮} \times \frac{৪}{১৭} \times \frac{৩}{১} = ৪৮$।

এইভাবে যে কোন রাশি এক ধরিয়া লইলে সকল ক্ষেত্রেই এই একই রকম হইবে।

এই ভাবে যে কোন রাশি গ্রহণ করিলে এবং তাহাকে গুণ করিলে অথবা যে কোন ভগ্নাশ লইয়া যোগ করিলে বা বিয়োগ করিলে যে রাশি ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহাই হইবে। যে ফল হইবে তাহাকে প্রদত্ত রাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগ ফল সেই অনুসন্ধেয় রাশি হইবে।

অত্র দৃষ্টজাত্যুদাহরণম্। যূথার্দ্ধং সত্রিভাগং বন বিচরবৃতং কুঞ্জরাণাঞ্চ ইষ্টং ষড়ভাগশ্চৈব নদ্যাং পিবতি চ সলিলং সপ্তমাংশেন মিশ্রঃ। পদ্মিন্যা চাষ্টমাংশঃ স্বনবম সহিতঃ ক্রীড়তে মান্নরাগো নাগেন্দ্রো হস্তিনীভিস্ত্রিভি রনুগতঃ কা ভবেৎ যূথসঙ্খ্যা ৫১।

ইহার উদাহরণ বর্ণিত হইতেছে—একটি হস্তীর দল হইতে ইহার তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেক বন মধ্যে বিচরন করিতেছিল। ইহার সপ্তমাংশের সহিত একের ষষ্ঠাংশ নদীতে জলপান করিতে গিয়াছিল। ইহার অষ্টমাংশ একের নবমাংশের সহিত পদ্মবনে খেলা করিতে গিয়াছিল। দলপতিকে তিনটি স্ত্রী হস্তিনীর সহিত দেখা গেল। সেই দলে কতগুলি হস্তী ছিল?

ন্যাসঃ—১/২ ১/৬ ১/৮ দৃশ্যম্ ৪।
১/৩ ১/৭ ১/৯

এষাং সবর্ণনং দ্বাভ্যাম্ অপবর্ত্তিতং [illegible]

পুনস্তেষাং সবর্ণিতানামৈক্যং নবভিরপবর্ত্তিতং [illegible]

ইষ্টোনং [illegible]

অনেন দৃষ্টে। ৪। ইষ্টগুণিতে ভক্তে জাতা হস্তিসংখ্যা—১০০৮।

বর্ণনা— ১/২, ১/৬, ১/৮
১/৩, ১/৭, ১/৯ দেওয়া আছে ৪

অপরোদাহরণম্। অমলকমলরাশেস্ত্র্যংশ পঞ্চাংশ ষষ্ঠৈস্ত্রিনয়ন হরিসূর্য্যা যেন তুর্য্যেণ চার্য্যা গুরুপদমথ ষড়্ভিঃ পূজিতং শেষপদ্মৈঃ সকল কমল সংখ্যাং ক্ষিপমাখ্যাহি তস্য। ৫২ [ক্রমশঃ]

বিশেষ সম্পাদকীয় সংযোজন

এই রচনাটির ক্ষেত্রে আমরা হুবহু প্রতিলিপি ছাপলাম। কারণ অনুবাদের ক্ষেত্রে যে যে নিয়ম মান্য হওয়া উচিত (অর্থাৎ অনূদিত পর্বভাগ এবং পরিচ্ছেদ ভাগ হুবহু মূল ভাষায় লিখিত রচনার ক্রম অনুযায়ী হওয়া উচিত) তা এই অনুবাদের ক্ষেত্রে একেবারেই মানা হয়নি। তাই কোনো ধরনের টীকা সংযোজন না করে আমরা প্রতিলিপি ছাপলাম। আগ্রহী পাঠক মূল সংস্কৃত ভাষায় এই রচনাটির সঙ্গে অনুবাদটি মিলিয়ে নিলে নিজেই বুঝতে পারবেন।

বিমান গতিবিধির অঙ্ক

(Aerial Navigation)

প্রাথমিক

যে যুগে আমরা বাস করি, নিঃসন্দেহে তাহাকে বিমানেরই যুগ বলা যায়। এ যুগে, স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় এবং যুদ্ধকালে বিমান বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। আমরা প্রত্যেকেই বিমানের খুঁটিনাটি এবং উহার গতিবিধি জানিতে খুবই উৎসুক, আকাশ পথে কি ভাবে বিমান যাতায়াত করে, কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কি ভাবে উহা সুদূর নিউইয়র্কে পৌঁছায় এবং কোন অঙ্ক বিমান চালককে পথ নির্ণয় করিতে — স্থান নির্ণয় করিতে সাহায্য করে তাহা বুঝিয়া দেখিতে চাহি।

বিমানের গতিবিধি অর্থাৎ যাতায়াত সম্বন্ধে ভালরূপে জানিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদের পৃথিবী বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার। পৃথিবী গোলাকার এবং উহার নানাবিধ বিষয় বুঝা প্রয়োজন।

গোলকরূপ পৃথিবী।। গোলক বলিতে কঠিন বা ঘন বুঝায়, এবং যাহার পৃষ্ঠের একবিন্দু হইতে অন্য বিন্দু — মধ্যস্থিত কেন্দ্র হইতে সমান দূরে অবস্থিত। ❖ কেন্দ্র হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যে রেখা টানা যায় তাহাকে ব্যাসার্ধ বলে। ❖ পৃষ্ঠের এক প্রান্ত হইতে যে সরল রেখা কেন্দ্র ভেদ করিয়া বিপরীত প্রান্ত পর্য্যন্ত টানা হয়, অর্থাৎ দুই প্রান্ত স্পর্শ করে, তাহাকে ব্যাস বলে। ❖ ফলে দুইটি ব্যাসার্ধে একটি পূর্ণ ব্যাস হয়।

২ ব্যাসার্ধ = ১ ব্যাস (রেখা)

যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে একটি গোলক। ইহার ব্যাস ৭৯২০ মাইল।

বৃত্ত।। ক্ষেত্র বলিতে যখন সমতল বুঝায়, তখন উহার সংজ্ঞা আমরা সকলেই জানি। সমতল — যেমন জানলার কাঁচ, করাতের পার্শ্ব অথবা টেবিলের উপরিভাগ সমতল। ❖ যে কোন কাঠের বল বা গোলক আমরা যদি করাত দিয়া দুই ভাগ করি, তাহা হইলে সেই বিভক্ত-করার জন্য যে সমতলের উদ্ভব হয় তাহা নিছক বৃত্তরূপে দেখা দেয়। অতএব, এই সূত্রে, আমরা একটি বিশেষ ব্যাপারও উপলব্ধি করি যে, যখনই কোন গোলক — ক্ষেত্র বা সমতল দ্বারা বিভক্ত হয়, — তখনই প্রতিচ্ছেদ, বৃত্ত হইয়া দেখা দেয়। সেই ক্ষেত্র বা সমতল — যাহার দ্বারা আমরা বিভক্ত করি — যখন তাহা গোলক কেন্দ্র ভেদ করিয়া যায় তখন বৃহৎ বৃত্ত দেখা যায়। উহার ব্যাস ও গোলকের ব্যাস সমান। সেই ছেদকারী ক্ষেত্র বা সমতল যখন গোলক কেন্দ্র ভেদ করিয়া না যায় তখন ক্ষুদ্রাকার বৃত্ত দেখা যায়।

বিষুব রেখা (নিরক্ষ বৃত্ত)।। বিষুব রেখা বা নিরক্ষ বৃত্তই পৃথিবীর — গোলকের সর্ববৃহৎ বৃত্ত। এই বিষুব রেখা হইতে অতীব দূরে অবস্থিত দুই অক্ষ প্রান্তের (বিন্দুদের) একটিকে উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং অন্যটিকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু বলা হয়, এই দুই মেরু হইতে যে রেখা টানা যায়[১] তাহাকে মধ্যরেখা বা মেরিডিয়ান বলে, এবং এই মধ্যরেখাগুলি বিষুব রেখা বা নিরক্ষ বৃত্ত সম্বন্ধে লম্ব।

গোলক, পৃষ্ঠের নির্দ্দিষ্ট দুই প্রান্তে অবস্থিত বিন্দু দুইটিকে স্পর্শ বা ভেদ করিয়া একটি মাত্র বৃহৎ বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় এবং দেখা যায়, উহা ছাড়াও, গোলক পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য বৃত্ত আঁকিতে পারি।

অক্ষাংশ সমান্তরাল। অক্ষাংশর সমান্তরালগুলি ক্রম ক্ষুদ্রাকার বৃত্ত, ইহাদের ক্ষেত্র বা সমতলগুলি বলিতে গেলে নিরক্ষ বৃত্তের ক্ষেত্রের সমান্তরাল। অতএব — কর্কট ক্রান্তি, মকর ক্রান্তি, সুমেরুবৃত্ত এবং কুমেরু-বৃত্ত সকল অক্ষাংশর বিভিন্ন সমান্তরাল, এবং জ্যোতিষ বিদ্যায় এই সকল বৃত্তগুলির খুবই গুরুত্ব আছে।

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা। বৃত্তের অর্থাৎ পরিধির যে কোন অংশকে চাপ বলে। কোণকে যেমন আমরা ডিগ্রি দ্বারা মাপিয়া থাকি — তেমনই চাপকেও আমরা ডিগ্রি দ্বারা মাপিতে পারি — এবং সেই মাপকে, চাপ-ডিগ্রি বলে। এক চাপ ডিগ্রি বৃত্তের পরিধির ১/৩৬০ অংশ।

এই এক অংশ বা এক ডিগ্রিকে ষাট ভাগে (৬০ ভাগে) সমান ভাগ করা হয়। এক একটি ভাগকে মিনিট বলে, আবার এই মিনিটকে সমান ৬০ ভাগে — ভাগ করা হয় এবং এক একটি ভাগকে সেকেণ্ড বলে।

বৃত্ত = ৩৬০ ডিগ্রি।

ডিগ্রি = $\frac{১}{৩৬০}$

১/৩৬০ বা এক ডিগ্রি = ৬০ মিনিট। মিনিট চিহ্ন ′

১ মিনিট = ৬০ সেকেণ্ড। সেকেণ্ড চিহ্ন ″

প্রকৃতপক্ষে উত্তর অথবা দক্ষিণে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠের যে কোন একটি বিন্দুর অক্ষাংশকে ডিগ্রি হিসাবে মধ্যরেখা ধরিয়া মাপা যায়; মধ্যরেখাগুলির মধ্যে একটির বিশেষ নাম আছে — উহাকে প্রাইম মেরিডিয়ান বলে। এই প্রাইম মেরিডিয়ান, ইংলণ্ডের লণ্ডন[২] সহরের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

একটি বিন্দুর দ্রাঘিমা মেরুর উপরে মধ্যরেখার যোগে — অর্থাৎ মধ্যরেখা বা প্রাইম মেরিডিয়ান সেই বিন্দুকে ভেদ করার ফলে — কোণ সৃষ্ট হয়; প্রাইম মেরিডিয়নের পূর্বে বা পশ্চিমে বিন্দুর অবস্থিতি অনুযায়ী পূর্ব দ্রাঘিমা বা পশ্চিম দ্রাঘিমা বলা হয়।

নকশা দেখ (১নং)। খ গ, বিষুব রেখা, অ লণ্ডন নগরের স্থান, মধ্যরেখা উ অ গ দ — মধ্যরেখাই প্রাইম মেরিডিয়ান। উ এবং দ সুমেরু এবং কুমেরু।

এখন 'ক' একটি বিন্দু — যাহার অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা স্থির করিতে হইবে। 'ক' এর অক্ষাংশ — ক অ চাপের দৈর্ঘ [দৈর্ঘ্য] এই সূত্রে ৩০°, ক এর দ্রাঘিমা অ, উ, ক কোণ অর্থাৎ এই সূত্রে ১০০°। ফলে ক অক্ষাংশ ৩০° উত্তর ও দ্রাঘিমা ১০০° পশ্চিমে অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠের যে কোন বিন্দুর সঠিক অবস্থিতি অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। বিষুব রেখা হইতে দুইটি মেরুই ৯০° অন্তরে, তাই নকশার চাপ উ ক, এর দূরত্ব সুমেরু হইতে ৬০° ডিগ্রি মাত্র — ইহাকে মেরু-দূরত্ব বা (polar distance) বলে, — এখন ইহাই 'ক' বিন্দুর মেরু-দূরত্ব। যে কোন বিন্দুর মেরু-দূরত্বকে অক্ষাংশের পূরক Complement হিসাবে ধরা হয়।

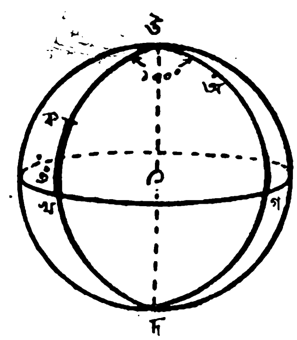

১ নং

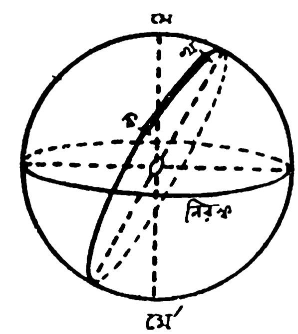

২ নং

জিওড্যসিক[৩] (geodesic)। দুইটি বিন্দুর মধ্যে অতি অল্প দূরত্ব বিশিষ্ট রেখাকে জিওড্যসিক বলে। ইহাকে অর্থাৎ এরূপ রেখা যখন সমতলে অঙ্কিত হয় তখন সেই রেখাকে সরল রেখা বলা হয়। গোলক পৃষ্ঠের উপর কোন ক্রমেই সরল রেখা টানা সম্ভব নয়। (তবু আমরা অনেক ক্ষেত্রে সরলরেখা কথাটি ব্যবহার করিয়াছি)।

গোলক পৃষ্ঠে দুইটি বিন্দুর মধ্যে অতি অল্প দূরত্ববিশিষ্ট ক্ষুদ্র রেখাই বৃহৎ বৃত্তর দ্বারা যুক্ত বা বৃত্তের অংশ, উহা হ্রস্ব চাপ (মাইনর আর্ক) (নকশা ২নং) ক ও খ অতি অল্প দূরত্ববিশিষ্ট।

এ ব্যাপারে — ভূপৃষ্ঠকে গোলকরূপে সঠিক ধারণা করিতে হইলে, হাতের কাছে একটি ভূ-গোলক প্রয়োজন, নিম্নলিখিত কথাগুলি ঠিক কিনা ভূ-গোলকের সাহায্যে বুঝিয়া দেখ।[৪]

নিউইয়র্ক হইতে বোরনিও দ্বীপ পর্য্যন্ত যে সোজা রেখা টানা হয় তাহা কি উত্তর মেরুর উপর দিয়া যায়?

সানফ্রানসিসকো হইতে কায়রোর দূরত্ব কি গ্রীণল্যাণ্ডের উপর দিয়া খুবই কম?

লস এন্‌জেলিস ও টোকিওকে যদি জিওড্যসিক দ্বারা যোগ করা হয় তাহা হইলে জিওড্যসিক কি আলুসীয়ান দ্বীপের নিকট দিয়া যায়।

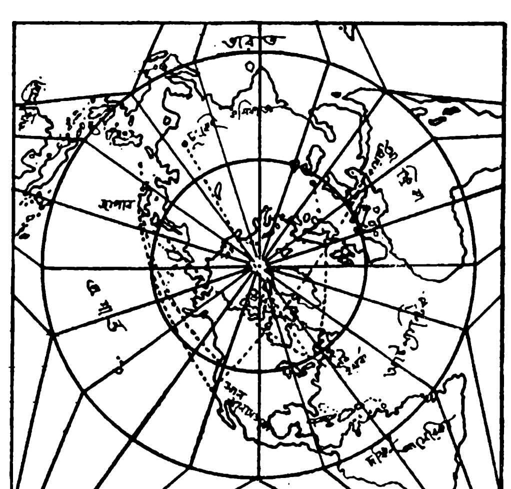

মেরু কেন্দ্রিক মানচিত্র

রেখার দিক-পাত (Bearing of a line) ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন বিন্দু হইতে সুমেরু ভেদ করিয়া যে বৃহৎ বৃত্ত অঙ্কিত হয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে এই বৃত্তের নাম মধ্যরেখা, এই মধ্যরেখা উত্তর ও দক্ষিণ অর্থাৎ সুমেরু ও কুমেরুকে ঘিরিয়া থাকে। এখন যদি কোন লোক, ক বিন্দু হইতে, মধ্য-রেখার পূর্বমুখে ভ্রমন [ভ্রমণ] করিতে থাকে, এবং আমরা যদি তাহার পথের দিক নির্দ্ধারণ করিতে চাই, তাহা হইলে দেখিব — মধ্য-রেখা হইতে ৩০° কোণে উহা অবস্থিত; এবং এই ভাবে, দিক পাত বা বেয়ারিং নির্দ্ধারণকে লিখিত ভাবে প্রকাশ করা হয় — উত্তর ৩০° ডিগ্রি পূর্ব (উ ৩০° পূ)।

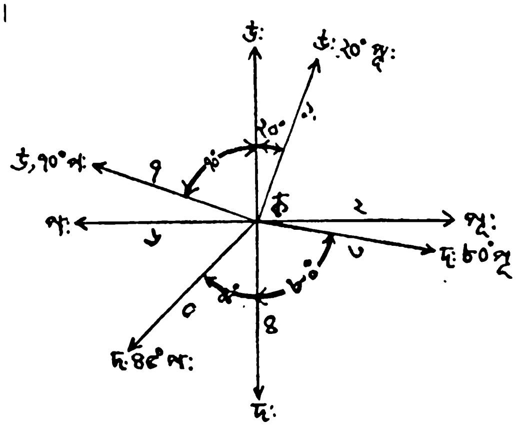

নকশাতে, নানাবিধ রেখা গুলির 'দিক-পাত' (বেয়ারিং) সম্পর্কে সঠিক কারণ দেখান হইল। শুধুমাত্র যখন নিছক পূর্ব বা পশ্চিম উল্লেখ করিতে হইবে, তখন ছাড়া, আমাদের যে কোন দিকপাত ব্যাপারেই উত্তর ও দক্ষিণের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হইবে।

বিমান চালকরা আর একটি সাধারণ নিয়মে 'দিক-পাত' নির্দ্ধারণ করে। এই দ্বিতীয় নিয়ম আগেকার নিয়ম হইতে অনেক সহজ। বিমান চালকরা, উত্তর রেখার সহিত নির্দ্দিষ্ট কোন রেখার যে কোণ সৃষ্ট হয়, প্রথমে তাহাই বিবেচনা করে। এই বিবেচনায়, বিমানচালকরা সকল সময় বামাবর্ত (ক্লক ওয়াইজ) ঘড়ির কাঁটার পথে অর্থাৎ পূর্বমুখী, অগ্রসর হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নির্দিষ্ট রেখায় পৌঁছায়। অর্থাৎ মধ্যরেখার উত্তর হইতে সুরু করিয়া সমস্ত বৃত্তকে, সংখ্যায় ভাগ করে ১ হইতে ৩৬০ এ গণনা শেষ হয়। যখন প্রয়োজন হয় বিমান চালক এই হিসাবে মধ্য-রেখা হইতে নির্দিষ্ট রেখার কোণের মাপ লয়। এই ধরণে, নকশা-লিখিত রেখাগুলির দিক-পাত ১নং২০° ২নং ৯০° ৩নং ১০০° ৪নং ১৮০° ৫নং ২২৫° ৬নং ২৭০° ৭নং ২৯০°। দিক-নির্দ্ধারণের সমস্যা প্রশ্নের ব্যাপারে দুই দিকেরই দিক-পাত উল্লেখ করা দরকার।

বৃহৎ বৃত্তের রেখা সঠিক পর্য্যবেক্ষণ করা কার্য্যসাধ্য নয়। তাহা ছাড়া কোন জাহাজ বা বিমানের পক্ষে বৃহৎ বৃত্ত রেখা ধরিয়া চলাও সম্ভব নয়। কারণ, ঐ রেখার দিক-পাত অনবরত বদল হয়। তাই, কার্য্যের সুবিধার জন্য, বৃহৎ বৃত্তের ২০০ কখনও ৩০০ মাইল দূরে দূরে বিন্দু স্থির করা আছে। এই বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে যে দিক-পাত দেখা দেয়, সেই দিক পাতের কোন পরিবর্তন না করিয়া বিমান চালকরা যাতায়াত করে। ভূ-পৃষ্ঠের এই সকল সরলরেখা, যাহার দিক-পাত পরিবর্তন হয় না — তাহাকে **রাম্ব লাইন** (Rhumb line) বলে। ছোট ছোট রাম্ব লাইনের ফলে যে পথ সৃষ্টি হয় তাহা প্রায় বৃহৎ বৃত্তের সমান।

জিজ্ঞাসা ঃ

জাহাজ বা বিমানের পক্ষে লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত একটি সোজা সরল-রেখা ধরিয়া যাওয়া কি সম্ভব?

একটি গোলকের প্রত্যেকটি বৃহৎ বৃত্তই কি সমান—? বিবরণ দাও।

গোলকের ছোট বৃত্তগুলি কি সব সমান? যদি না হয়, প্রমাণ কর; কর্কট ক্রান্তি ও সুমেরু বৃত্তের মধ্যে কোনটি বড়?

সুমেরু বৃত্ত ও কুমেরু বৃত্তের মধ্যে কোনটি বড় বা ছোট?

বিষুব রেখার দৈর্ঘ্য বল।

বিষুব রেখার এক মিনিট চাপের দৈর্ঘ্য কত তাহা নির্ণয় কর? এই দৈর্ঘ্য বা দূরত্বকে ভৌগলিক মাইল, বা নৌ-মাইল (nautical) বা নট (Knot) কি হিসাবে বলা হয়।

সুমেরু বৃত্তের দৈর্ঘ্য কত যদি তাহার ব্যাসার্ধ ১৫৭৭ মাইল হয়।

সুমেরু বৃত্তের মেরু-দূরত্ব—polar distance—২৩°২৮´ যদি হয়, তাহা হইলে তাহার অক্ষাংশ কত?

যদি কোন ব্যক্তি ওয়াশিংটন হইতে ক্রমাগত পূর্বমুখী ভ্রমন [ভ্রমণ] করিয়া পৃথিবী পরিক্রমণ করে, কি ধরণের বক্র রেখা (curve) সে ব্যক্তি অনুসরণ করিবে?

কেন পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের অল্প অংশকে সমতল বলিয়া গণ্য করিতে পারি?

যদি একজন বিমান চালক সর্বসমেত ২৫০° মাইল উঃ ২৬° পূঃ (২৬°) দিকে যাত্রা করে তাহা হইলে কত মাইল পূর্বে এবং কত মাইল উত্তরে তাহাকে যাইতে হইবে?

(ভূ-পৃষ্ঠের অল্প অংশকে সমতলরূপে ধরিয়া এবং ত্রিকোণমিতি দ্বারা বিচার কর।)

নিম্নলিখিতের কোনটি সত্য বা অসত্য বিচার কর

সাধারণত, গোলকের নির্দিষ্ট দুইটি বিন্দু স্পর্শ করিয়া একটি মাত্র বৃহৎ বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়।

একটি মাত্র বৃহৎ বৃত্তের দ্বারা সুমেরু কুমেরু ভেদ করিয়া যাওয়া যায়।

ভূ-পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট দুইটি বিন্দুকে স্পর্শ করিয়া একটি মাত্র ক্ষুদ্র বৃত্ত টানা যায়।

ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন বিন্দু হইতে মধ্য-রেখা টানা যায়।

একজন যদি মধ্যরেখা ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে তাহা হইলে সে হয় উত্তরে নয় দক্ষিণে পৌছাইবে।

পূর্ব ও পশ্চিম রেখার সকল বিন্দুরই একই অক্ষাংশ।

দুইটি বিভিন্ন বিন্দু যদি একই দ্রাঘিমায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে ধরিতে হইবে উহারা একই মধ্য-রেখায় আছে।

সুমেরুর প্রত্যেকটি অনুভূমিক রেখাই উহার দক্ষিণে অবস্থিত।

বিষুব রেখা সর্ববৃহৎ-বৃত্ত যাহা পূর্ব পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে।

রাম্ব লাইন একটি বৃহৎ বৃত্ত।

অক্ষাংশর যে কোন সমান্তরালই রাম্ব লাইন।

একজন বিমান চালককে অনেক বিষয় ভাবিয়া চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়, বহু সমস্যার সমাধান করিতে হয়। প্রথমত সমস্যাগুলির মধ্যে ধরা যায় ঃ— তেল (পেটরোল [পেট্রল]), গতি, আবহাওয়া, দৃষ্টি গোচরতা, বায়ুর দিক ও তাহার বেগ বা দ্রুততা এবং ভাল ও নির্বিঘ্ন পথ ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি একান্ত প্রাথমিক এবং এইগুলি কয়েকটি বিশেষ নিয়ম দ্বারা অনুধাবন যোগ্য।

একটি বিমান ৩৫০ গ্যালন তেল লইতে পারে। ঘণ্টায় ২৫ গ্যালন তেল খরচ হয়, ঘণ্টায় ১২০ মাইল গতিতে যায়। কত ঘণ্টা এবং কত মাইল তেল না লইয়া ভ্রমণ করিতে পারিবে?

একটি জ্বালানী তেলের আধার ট্যাংকের মাপ ৫ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া, ৬ ফুট গভীর; প্রতি কিউবিক ফুটে যদি ৭$\frac{১}{২}$ গ্যালন তেল ধরে; তাহা হইলে সেই ট্যাংকে সর্ব সমেত কত তেল ধরিবে এবং গ্যালনে যদি মাত্র ৩ মাইল যায় তাহা হইলে সর্বসমেত কত মাইল যাইবে?

একটি বিমান ৮০০ গ্যালন তেল লইতে পারে। সেই তেলের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ তেল যদি হঠাৎ-প্রয়োজনের জন্য রাখে, এবং ঘণ্টায় ৩০ গ্যালন যদি খরচ করে, তাহা হইলে কতক্ষন [কতক্ষণ] পরে তাহাকে পুনায় [পুনরায়] তেল ভরিতে হইবে?

একজন বিমান চালক বুঝিল, ১৫০ মাইল ঘণ্টায় যখন সে যায়, তখন শতকরা ৩ ভাগ তেল — ১০০ মাইল ঘণ্টায় যখন সে যায়, তাহা হইতে বেশী খরচ করিয়াছে। এখন যে তেল আছে কম গতিতে ১০ ঘণ্টা যাইতে পারিবে, যদি খুব দ্রুত গতিতে যায় তাহা হইলে কতক্ষণ সে যাইতে পারিবে; কি হারে কতদূর পর্য্যন্ত যাইবে?

বিরাট বিমানগুলি একসঙ্গে ২০০০ গ্যালন তেল লইতে পারে। এক্ষেত্রে, সেই তেলের ট্যাংকের মাপ কিউবিক ফুটে নির্ণয় কর, যদি ২৩১ কিউবিক ইঞ্চিতে এক গ্যালন তেল ধরে।

একজন বিমান চালক 'ক' হইতে 'খ' পর্য্যন্ত যাইবে এবং ফিরিয়া আসিবে, যাতায়াতে ১৮০০ মাইল। বায়ুবেগ বেশী থাকার দরুণ প্রত্যাবর্তনের সময়, অর্থাৎ ফিরিয়া আসিবার সময় ৫০% তেল যাইবার সময় হইতে বেশী লাগে; যদি প্রথম ১০০ শত মাইলে[৫] ৩০ গ্যালন তেল খরচ হয়, তাহা হইলে যাতায়াতে সর্বসমেত কত গ্যালন তেল লাগিবে?

একজন বিমান চালক ২৫০০ মাইল একেবারে কোথাও না থামিয়া ১টি সফর করার পরিকল্পনা করিল। হিসাবে বুঝিল, ১৮ ঘণ্টা সময় একুণে [একুনে] লাগিবে, এবং ঘণ্টায় ৪০ গ্যালন তেল খরচ হইবে। তাহার বিমান ট্যাংকে মাত্র ৩৫০ গ্যালন তেল লইতে পারে। হিসাবমত উপরন্তু তেল লইবার জন্য কয়েকটি ১০০ গ্যালন ড্রাম লইবে ঠিক করিল, এবং যত তেল লাগিবে তাহার শতকরা ২০ ভাগ বেশী তেল — যদি দরকার পড়ে সেইজন্য লইবে স্থির করিল — এই ব্যাপারে কতগুলি ড্রাম তাহাকে লইতে হইবে।

নৌচালকের কম্পাস (compass)। বিমান চালকের এই কম্পাস সম্পর্কে খুব ভাল ভাবে জ্ঞান থাকা উচিত। এই কম্পাস দিকপাত রেখা নির্ণয় করার জন্য অপরিহার্য্য।

আমরা সকলেই জানি কম্পাসের কাঁটা সকল সময় উত্তর অভিমুখে দেখায় কিন্তু সত্যই উহা উত্তর দিক দেখায় না, উহা উত্তর-চম্বুক-অক্ষ[৬] নির্দেশ করে। এই উত্তর-চম্বুক-অক্ষ কানাডার হাডসন বের নিকট অবস্থিত। কম্পাসের কাঁটা যে উত্তর দিক নির্দেশ করে তাহাকে চম্বুকী উত্তর বা ম্যাগনেটিক নর্থ (magnetic north) বলা হয়।

ভূপৃষ্ঠের যে কোন বিন্দুতেই আদত উত্তর ও চম্বুকী উত্তরের মধ্যে যে ব্যবধান বা পার্থক্য ঘটে — তাহাকে সেই স্থানের চম্বুক-আনত বা ম্যাগনেটিক ডিক্লাইনেসন (magnetic declination) বলে। চম্বুক আনত-র পার্থক্য যে বিভিন্ন স্থানে শুধুমাত্র আলাদা তাহা নয়, সেই সকল স্থানে ধীরে ধীরে চম্বুক আনত-র তারতম্য ঘটে। কোন অজানা কারণে পৃথিবীর চম্বুক অক্ষের স্থানের পরিবর্তন হয়।

এই পরিবর্তন ও পার্থক্য বিষয়ে অনেক পত্র-কোষ্ঠী (table) প্রকাশিত হইয়াছে। যে পত্র-কোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষত আমেরিকায় চম্বুক আনত ও তাহার দিকবিধি দেখান হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে চম্বুক আনতে-র পরিবর্তন এবং সেই-পরিবর্তনের দিকবিধি দেখান হইয়াছে।

এখন আমরা যদি একটি চম্বুক কাঁটাকে[৭] এমন ভাবে ঝুলাইয়া রাখি, যাহাতে কাঁটাটি যে কোন দিকেই অনায়াসে পরিবর্তিত হইতে পারে তখন দেখা যাইবে কাঁটাটি, সাধারণত স্বভাবমত অনুভূমিক ভাবে আর থাকে না। কাঁটার যে দিক উত্তর অভিমুখী দেখা যাইবে — তাহা শুধু যে উত্তর অভিমুখী দেখায় তাহা নহে, কিছুটা নিম্নে-হেলান হয়, ফলে একটি কোণের সৃষ্টি হয়, ইহাকে magnetic dip বলে, এই চম্বুক হেলানও এক এক স্থানের এক এক রকম। একেবারে উত্তর-চম্বুক-অক্ষে (North magnetic pole) কাঁটা সম্পূর্ণ লম্ব হইয়া থাকে — এখানকার চম্বুক-হেলান ৯০°।

যদি কাঁটার নিকট ধাতব পদার্থ থাকে, বিশেষত লোহা বা ইস্পাত জাতীয় জিনিষ পত্তর থাকে, দেখা যায়, তাহা হইলে কাঁটার দিক নির্ণয় করার হেরফের ঘটে। বিমান চালকের এ সকল কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতে হইবে; বিমান চালককে চম্বুক-টানের আনত বিষয়ের পত্র কোষ্ঠি খানিকে নিকটে রাখিতে হয়। এই পত্র কোষ্ঠী দেখিয়া কম্পাসের সাহায্যে উহাদের পথের দিক-পাত স্থির করিতে হয়। নির্দিষ্ট পথে বিমান চালনার জন্য গ্রহ নক্ষত্রও অনেক সময় ধরতব্যের [ধর্তব্যের] মধ্যে আসে।

সংজ্ঞা — নিম্নে কতক বিষয়ের সংজ্ঞা নিরূপণ করা হইল।

বিমান বেগ (plane velocity)। এই সূত্রে বিমান বেগ কথাটি ব্যবহৃত হয় যে, বায়ু না থাকিলে নির্দিষ্ট তেল খরচায় বিমান যে বেগ উৎপন্ন করে।

গন্তব্য দিক(head)। যেদিকে বিমান উড়িয়া যাইতেছে তাহাকে গন্তব্যদিক অভিমুখ বলে।

ভূমি বেগ (Ground velocity) বিমানের যথার্থ বেগ। মাটিতে-ভূমিতে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য এর তুলনায় বিমানের যথার্থ বেগ।

বায়ু-দিকবিধি (wind direction) যে দিক হইতে বায়ু বহিতেছে। যেমন পশ্চিমী হাওয়া পশ্চিম দিক হইতে পূর্বে যায়।

বায়ু-বেগ (wind velocity) ঘণ্টা হিসাবে বায়ুর বেগকে বলা হয়।

স্থান দিকবিধি (ground direction) যে দিকে বা যে স্থান অভিমুখে বিমান যায়।

আপেক্ষিক বেগ (Relative velocity) দুইটি বিমানের আপেক্ষিক বেগ অর্থাৎ হার বুঝায়, এই হারে দুইটি বিমানের মধ্যে যে বিরতি থাকে তাহার ক্রমান্বয় পরিবর্তন।

ড্রিফট এ্যাঙ্গেল (drift angle)। স্থান বা ভূমির সম্বন্ধে বিমানের গন্তব্য দিক (head) মিলিয়া যে কোণ তৈয়ারী হয় তাহাকে ড্রিফট এ্যাঙ্গেল কহে। অবশ্য উহা আদতে দিক এবং বায়ুবেগ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

বেগ এবং দিক এই দুয়ের উপর বায়ু প্রভাব করে। স্থির বায়ুতে একটি বিমানের বেগ যদি ঘণ্টা প্রতি x মাইল হয় এবং বায়ুবেগ যদি ঘণ্টা প্রতি y মাইল হয় — তাহা হইলে বিমান যখন চলিবে তখন তাহার বেগ হইবে অর্থাৎ অনুকূল বায়ুর বেগ হইবে ঘণ্টা প্রতি x+y। বায়ু যখন প্রতিকূলে সেই বিমানেরই বেগ হইবে x-y। আবার বিমান যখন সোজাসুজি বায়ুর অনুকূলে বা প্রতিকূলে নহে তখন বিমানের বেগ ত্রিকোণমিতির দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। অথবা স্কেলে ফেলা নকশা হইতে তাহার মাপ হিসাব করিলে বুঝা যাইবে।

ভেক্টর (vector)। ভেক্টর গনিত [গণিত]শাস্ত্রমতে নিছক পরিমাণ [নয়][৮], এই ভেক্টরের মানগুণ্য (magnitude) এবং দিক অভিমুখ নির্নীত [নির্ণীত] থাকে। সাধারণত, ভেক্টরের ব্যাপার হিসাবে বেগ এবং জোর ধরা হয়। ভেক্টর চিহ্ন — একটি সরল রেখা যাহার এক দিকে তীর ফলক আঁকা তাহার দ্বারা ভেক্টর বুঝান হয়। এই সরল রেখার দৈর্ঘ্য ভেক্টরের মানগুণ্যের অনুযায়ী বা হিসাবে টানা হয়, এবং তীর মুখ উহার দিক নির্ণয় করে।

বেগ ভুজ (velocity-triangle)। নিম্নলিখিত সমস্যার সমাধানে বেগ-ভুজের ব্যবহার লিখিত হইল।

(১) একটি বিমান যদি উত্তর অভিমুখে যাত্রা করে, তাহার বেগ ঘণ্টায় ১২০ মাইল, এই সময় পশ্চিম হইতে বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ৩০ মাইল। এখন, বিমানের সঠিক ভূমিগত বেগ, ড্রিফট এ্যাঙ্গেল এবং স্থান-দিক কি জানিতে হইবে।

একটি মাপকাঠি (scale) স্থির করা দরকার — যাহার ১" ইঞ্চিতে ৬০ মাইল ধরিতে হইবে। ক, খ, ২" ইঞ্চি দীর্ঘ, এই দুই ইঞ্চিতে বিমানের বেগ (velocity), মানগুণ্য ও দিক হিসাবে, ১২০ মাইল। খ, গ যাহা পূর্বাভিমুখী এবং $\frac{১}{২}$" দীর্ঘ, উহা ৩০ মাইল ঘণ্টায় বায়ু-বেগ; ফলে ভেক্টর ক, গ, এই বেগ দুইটির ফল বা লব্ধ স্বরূপ, কোণ ∠ খকগ ড্রিফট এ্যাঙ্গেল। যেহেতু ত্রিভুজটি সমকোণী তাই আমরা ত্রিকোণমিতির দ্বারা সমস্যাটির সমাধান করিতে পারি।

❖ একক ভেক্টরের গুণ, দুই বা ততোধিক অপরাপর মিলিত ভেক্টরের গুণের সমান, ইহাকে উহাদের ফল বা লব্ধ — resultant বলে। ফল বা লব্ধ বলিতে অপরাপর ভেক্টরের sum, যোগফলও বুঝায়।

$$\text{Tan}\,ক = \frac{৩০}{১২০} = \frac{১}{৪} = .২৫০০$$

By table, ক =১৪°২′ ইহা ড্রিফট এ্যাঙ্গেল।

স্থান-দিক ফলে উ ১৪°২´ পূ (১৪°২´)

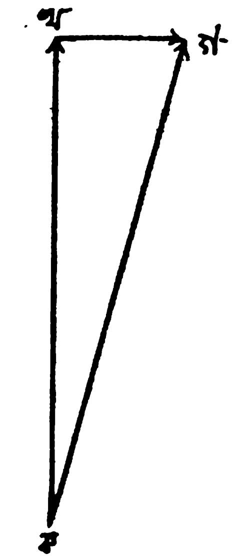

যদি কগ'র দৈর্ঘ্য বলা হয় x; $\frac{৩০}{x} = \sin ক$

তাহা হইলে $x = \frac{৩০}{\sin ক} = \frac{৩০}{.২৪২৫} = ১২৩.৭$

অতএব ভূমিগত বেগ ১২৩.৭ মাইল ঘণ্টায়।

যদি খ কোণ সমকোণী না হয় সে ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতির সমকোণী ত্রিভুজ দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিব না; তখন, আমাদের মাপকাঠি ধরিয়া অর্থাৎ রুলার প্রোট্রাকটর দ্বারা সঠিক ভাবে নকশা করিতে হইবে। এবং মাপজোপ [মাপজোক] দ্বারা অজানিত অংশ নির্ণয় করিতে হইবে।

(২) একজন বিমান চালক উ২০°পূ(২০°) অভিমুখে যাইতে চাহে। তাহার বিমান-বেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইল; বায়ু — উ৪০°প(৩২০°) দিকে ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে বহিতেছে; এখন, বিমানের কোন অভিমুখ (heading) হইবে? উহার ভূমিগত বেগই বা কত?

সমস্যাটি পাঠ করিয়া আমাদের সর্বাগ্রে একটি মাপ স্থির করা দরকার। মাপকাঠি ধরিয়া উহার ইঞ্চি প্রতি ৫০ মাইল হারে ধরিতে হইবে। ১" ইঞ্চি = ৫০ মাইল।

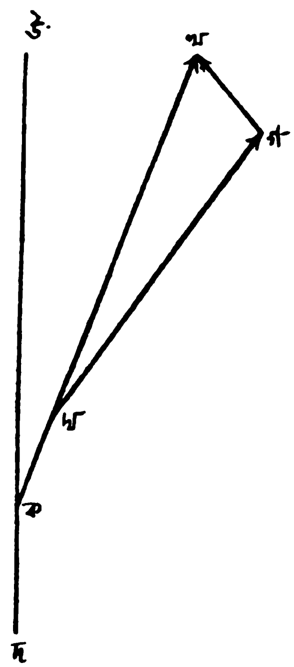

একটি সরলরেখা টানা যাক, ক হইতে খ এবং ইহার দিকপাত (bearing) উ ২০° পূ।

গ হইতে খ একটি ভেক্টর যাহা বায়ু-বেগ বুঝায়। ইহা (মনে রাখিব যে ১" = ৫০ মাইল) $\frac{১}{২}$" ইঞ্চি লম্বা এবং উ ৪০° প অভিমুখে আছে।

এখন একটি কম্পাসের প্রয়োজন। প্রথমে, ২" ইঞ্চি দূরত্ব হিসাবে কম্পাসের, দুইটি বিন্দুর মাপ ঠিক করা দরকার। এবং এই কম্পাসের এক দিক 'গ' তে রাখা যাক, এবং এইখানের কেন্দ্র হইতে ক, খ রেখাকে ছেদ করিয়া চাপ টানা যাক, সীমা হইল 'ঘ'।

ভেক্টর ঘ এবং গ হইল বিমানের বেগ। ভেক্টর ঘ খ হইল ভূমিগত বেগ, এবং গ ঘ খ হইল ড্রিফট এ্যাঙ্গেল। মাপ অনুযায়ী ∠গ ঘ খ প্রায় ১২°৩০˝। ফলে দিকপাত রেখা (bearing of the line) ঘ গ হইল উ ৩২°৩০˝ পূ (৩২°৩০´), ইহাই বিমানের অভিমুখ। সরল রেখা ঘ খ=২$\frac{৭}{৩২}$˝ দীর্ঘ, ফলে আমাদের মাপকাঠি অনুযায়ী ১১১ মাইল — ইহাই ভূমিগত বেগ।

১। একটি বিমানের বেগ ঘণ্টায় ১১০ মাইল; বায়ু-বেগ ঘণ্টায় ২৫ মাইল, ইহারই অনুকূলে বিমান যাইতেছে। ভূমিগত বেগ কত?

উপরোক্ত উদাহরণের বিমানের ভূমিগত বেগ কত হইবে, যদি ঘণ্টায় ৪০ মাইল বায়ুবেগের প্রতিকূলে যায়?

২। একটি বিমান পশ্চিম দিকে ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে চলে, উত্তর হইতে বায়ুবেগ ঘণ্টায় ৪০ মাইল, বিমানের ভূমিগত বেগ কত এবং স্থান-দিক, ড্রিফট এ্যাঙ্গেল নির্ণয় কর?

৩। একজন বিমান চালক দক্ষিণে যাইতে চাহে, এবং বিমান বেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইল, বায়ুবেগ ঘণ্টায় ৩০ মাইল এবং এই বায়ুবেগ বিমানের দক্ষিণ দিক হইতে বিমানের মুখের সহিত সরাসরি একটি সমকোণ সৃষ্টি করিয়া বহিতেছে। এখন, চালক কোন দিক অভিমুখে বিমান ঘুরাইবে?

৪। একটি বিমান দ ১৮° প (১৯৮°) অভিমুখে যায়, বিমান বেগ ঘণ্টায় ১৬০ মাইল। বায়ুবেগ ঘণ্টায় ৩৬ মাইল, ইহার দিক — দ ৪০° পূ (১৪০°)। এখন ইহার ড্রিফট এ্যাঙ্গেল, মানগুণ্য ও দিক ফল (magnitude ও direction of the resultant) নির্ণয় কর?

৫। দুটি বিমান ক এবং খ — এক স্থান হইতে একই সময়ে যাত্রা করে, ক ঘণ্টায় ৮০ মাইল এবং খ ঘণ্টায় ১৩০ মাইল বেগে যায়। এখন ক এর অনুপাতে খ এর আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় কর?

৬। বিমানবাহী একটি জাহাজ (aircraft carrier) পূর্ব অভিমুখে ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে চলে, এই বিমানবাহী হইতে একখানি বিমান উড়িয়া গেল, এবং বিমানটি পশ্চিম অভিমুখে ঘণ্টায় ১৬০ মাইল বেগে যায়। এই বিমান ও আদত বিমানবাহীর মধ্যে আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় কর?

৭। দুইটি বিমান 'ক' নামক স্থান একই সময় ত্যাগ করে, দুইটি বিমান একটি সমকোণ সৃষ্টি করিয়া চলিতে সুরু করিল, একে অন্যের ঠিক সমকোণে সকল সময়ই আছে; একটির বেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইল, এবং অন্যটির ১৩০ মাইল। উহাদের আপেক্ষিক বেগ কত? (পিথগোরাসের [পিথাগোরাসের] উপপাদ্য ব্যবহার কর)।

মাপকাঠির দ্বারা নিম্নলিখিত সমস্যার সমাধান কর

নির্ণয়-স্থল (observation point) ‘ক’ হইতে একটি কামান ‘ঘ’ এর দিকপাত (bearing) উ ১৮° পূ, অন্য আর একটি নির্ণয় স্থল ‘খ’ এবং এই স্থল — ‘ক’ হইতে সরাসরি ১০০ গজ পূর্বে অবস্থিত এবং এই স্থল — অর্থাৎ খ — হইতে ‘ঘ’ এর দিকপাত উ ১০° প। এখন ঘ হইতে ক এর দূরত্ব কত?

একটি বিমান কোন সোজা রেল পথের ঠিক ১০০ ফুট উর্ধ্বে যায়, রেল গাড়ীর খানিক পিছনে বিমানটি ছিল। বিমান হইতে দেখা গেল রেলগাড়ীর সামনের দিক প্রায় ১৮° কোণ-কাতে (angle of depression) নামিয়া গিয়াছে। রেলগাড়ীর পশ্চাতভাগ প্রায় ৬১° কোণ-কাতে, নামিয়া গিয়াছে। এখন, রেলগাড়ীটি কত বড় ছিল?

ত্রিকোণমিতির দ্বারা সমাধান কর।

গ হইতে ক ৬০০ ফুট, এবং গ কোণটি সমকোণী, আর ক কোণ = ৬০°, ক স্থলে একটি সার্চলাইট বসান আছে এবং যাহা ‘খ’ স্থানে অর্থাৎ যেখানে মেঘ সেখানে আলো ফেলিবে। গ ঐ মেঘের সরাসরি নীচে আছে এখন খ গ এর উচ্চতা নির্ণয় কর।

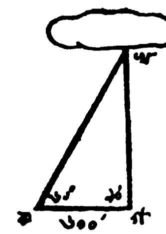

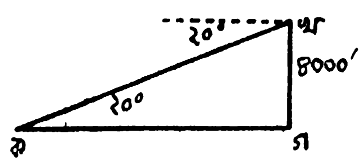

‘খ’ একটি বেলুন, দূরে — শহর ‘ক’, বেলুন হইতে ২০° কোণ-কাত নামিয়াছে — যদি বেলুনটি ৪০০০ ফুট উচ্চে থাকে এবং ধরা যাক্ খ বিন্দু অর্থাৎ বেলুনের সরাসরি নীচে যাহা ‘গ’ ৯০° তে আছে, এখন ক হইতে গ এর দূরত্ব কত?

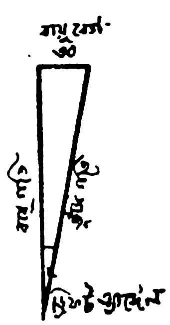

একজন পাহাড়ের উপর, ৪০০ ফুট হইতে ক জাহাজকে দেখিল। কোণ-কাতে ∠খ ক গ ২০°, গ যদি ৯০° হয় তাহা হইলে জাহাজ ‘ক’ হইতে গ এর দূরত্ব কত?

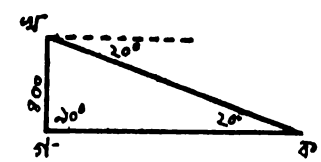

একটি বিমান ঘণ্টায় ১৫০ মাইল উত্তর অভিমুখে যায়। বায়ু ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে পূর্বমুখে বহে। বায়ুর হেরফের নাই, ড্রিফট এ্যাঙ্গেল কত?

যদি একটি বিমান ৫° কোণ ধরিয়া ঘণ্টায় ৬০ মাইল চলে, তাহা হইলে ২০ মিনিটে কতটা উচ্চে যাইবে অর্থাৎ গ, হইতে খ এর উচ্চতা কত?

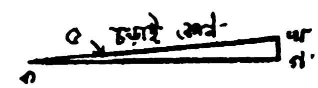

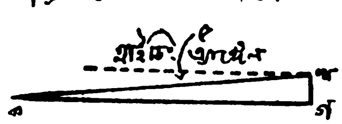

যদি গ্লাইডিং কোণ ৫° হয়, সেক্ষেত্রে ২০০০ ফুট উচ্চতা হইতে বিমানটি কত দূর পর্য্যন্ত (ক ও গ) ভূমির উপরে গ্লাইড করিবে?

একটি বিমান ‘ক’ হইতে ঘণ্টায় ১০০ মাইল পূর্ব অভিমুখে যায় (ক,গ) এবং পরে, উত্তর অভিমুখে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে যায় (গ, খ) সেক্ষেত্রে খ ক গ এর কোণ অর্থাৎ ক হইতে বিমানের দিকপাত কত হইবে?

ভ্রমণ চক্র (the cruising radius)। যখন একটি বিমান তাহার নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ শেষে পুনরায় সেই স্থানে তৈল না লইয়া (অর্থাৎ একবার তেল লইয়াই) ফিরিয়া আসে তাহাকে ভ্রমণ চক্র বলে।

ইহা একটি ফরমূলায় নির্ণীত হয়।

$$R = \left(\frac{G_1G_2}{G_1 + G_2}\right)T$$

G_1 ও G_2 = ভূমিগত বেগ। G_1 বিমানের বর্হির্মুখী যাত্রার ও G_2 প্রত্যাগমনের ভূমিগত বেগ বুঝায় T = সময়। বিমান যতক্ষণ আকাশে থাকিতে পারে T তাহার সময়। অবশ্য কতটা তেল আছে সেই অনুপাতে T আগেই ঠিক করা হয়।

সূত্রটি নিম্নলিখিত উপায়ে সূত্রপাত করা যায় :

x = বহির্মুখী ভ্রমণের সময় বা ঘণ্টা। এবং T-x= প্রত্যাগমন সময় বা ঘণ্টা ;

অতএব ঃ

$$G_1x = G_2(T - x)$$
$$G_1x = G_2T - G_2x$$
$$G_1x + G_2x = G_2T$$
$$(G_1 + G_2)x = G_2T$$
$$x = \frac{G_2T}{(G_1 + G_2)}$$

অতএব ঃ $R = G_1x = \left(\frac{G_1G_2}{G_1 + G_2}\right)T$

Elementary Algebra :
Edward I Edgerton & Perry. A. Carpenter হইতে অনূদিত

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. ভূ-পৃষ্ঠ বরাবর, সুমেরু এবং কুমেরুগামী বৃত্তাকার যে কাল্পনিকরেখাগুলি টানা যায় তাদের মধ্যরেখা বা মেরিডিয়ান বলে।
২. লন্ডন শহরের কাছে গ্রীনিচ শহরের উপর দিয়ে গেছে। যার জন্য (Greenwich Mean time) কথাটা বলা হয়।
৩. কোনও গোলকপৃষ্ঠে দুইটি বিন্দুর মধ্যে ন্যূনতম দূরত্বকে জিওড্যাসিক বলে।
৪. 'অঙ্ক ভাবনা' পত্রিকায় প্রকাশিত মূল লেখাটিতেও উক্ত অংশটি নিম্নরেখাঙ্কিত (Underlined)।
৫. ১০০ মাইল বোঝাচ্ছে। কারণ '১০০ শত মাইল' বাক্যবন্ধের অর্থ ১০,০০০ মাইল, যা এখানে হতে পারে না। এই প্রবণতা অর্থাৎ যুগপৎ চিহ্ন এবং শব্দ দ্বারা চিহ্নিতকরণ 'অঙ্ক ভাবনা'র প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।
৬. চৌম্বক কথাটা সঠিক হলেও এখানে কোনো কারণে আগাগোড়াই চম্বুক বলা হয়েছে। চম্বুকী কথাটার পরিবর্তেও চৌম্বকীয় শব্দের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।
৭. চুম্বক শলাকা।
৮. পরিমাণ শব্দটির পর 'নয়' (Negative অর্থে) শব্দটি বাদ পড়ে গেছে।

রামানুজ ও হার্ডি

ত্রিশ বৎসর বয়সে রামানুজ যখন সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন, সেই সময়ে লণ্ডন হাসপাতালে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন তাঁহারই এক শুভার্থী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক জি.এইচ.হার্ডি।

হার্ডি সেই সময়ে কোন অঙ্কের সিদ্ধান্ত লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। রামানুজকে আনন্দ দিবার জন্য তিনি বলিলেন, "আজ আমি একটা ট্যাক্সি চড়লাম যার নম্বরটা খুব নীরস — ১৭২৯"।

রামানুজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আমার ত [তো] মনে হয় যে এইটাই সবচেয়ে মজার সংখ্যা। কারণ এইটাই একমাত্র সংখ্যা যাকে দুইটি সংখ্যার ঘনফলের (cube) সমন্বয়ে দুই ভাবে সমাধান করা যায়।"

$$১৭২৯ = ৯^৩ + ১০^৩ = ১^৩ + ১২^৩$$

— *collected papers of Srinivasa Ramanujan,*
by G.H.Hardy & Sesha Aiyar (1927)

কোনো কারণে এখানে শ্রীনিবাস রামানুজনকে আগাগোড়াই রামানুজ অভিহিত করা হয়েছে।

ন্যায়তত্ত্ব

ভারতীয় চিন্তায় জ্ঞানের কথা আত্যন্তিকভাবে পারমার্থিক তত্ত্বের সহিত জড়িত। তত্ত্বার্থ আবার আত্মজ্ঞানেই একমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মজ্ঞান নিরন্তর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের[১] বিষয়। তবু, বিচার জ্ঞানের আদ্যন্ত সমস্ত স্তরেই উপস্থিত থাকে, যেহেতু, বিচারেই নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক[২] জানা যায় এবং আত্মজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া জিজ্ঞাসুকে সচেতন করে। (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক কার্যত ভগবান শঙ্করাচার্য কথিত পারমার্থিক প্রসঙ্গ কিন্তু নিত্যানিত্য জ্ঞান আন্বীক্ষিকীতেই[৩] উদ্ভাসিত হয়। নিত্য হইতে অনিত্য তুষ হইতে খোসার ন্যায় ঝরিয়া পড়িলেই মুমুক্ষু আত্মসচেতনতায় মণ্ডিত হয়। আত্মসচেতনতা তাই প্রাথমিক ভাবে জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং জ্ঞান বস্তুবিচারে একান্তভাবে তদগত। অর্থাৎ জ্ঞান একাধারে বস্তুর জ্ঞান এবং আত্ম বিষয়ে সচেতনতা)।

ভারতীয় শাস্ত্রে, জাগতিক ইহলৌকিক সংবাদ ও বিসম্বাদ জ্ঞানের আলোচ্য। কারণ, ইহলোকেই বস্তুর অনতিক্রম্য সংস্পর্শ আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকে এবং যেহেতু আত্মগত ব্যক্তি নিছক আত্মবোধের কারণেই তদ্গত হয়, বস্তুর সহিত চৈতন্যের কোনো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। বরং বস্তু ও চৈতন্যের সীমারেখা ভারতীয় চিন্তায় কোনো চিরস্থায়ী চীনের প্রাচীর নির্মাণ করে না। বস্তুর নিজস্ব জগতেই মূল্যের প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে এবং সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, বস্তু সচেতন ব্যক্তির নিকট যথার্থ ভাবেই উপস্থিত থাকে। প্রয়োজনের বাহিরে তাহা অনাবশ্যক, অযথার্থ এবং তাৎপর্যহীন। একমাত্র আত্মরতি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বের্গসণীয়[৪] এমন কোনো অভিজ্ঞানের প্রয়োজন করে না যাহাতে বস্তু কেবলমাত্র স্থানবদ্ধতায় (spatiality) বুদ্ধির চক্র এবং লীলা।

সম্বাদ ও বিসম্বাদের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণত বিচারের এলাকাধীন। বিচার নিজস্ব কারণেই আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ, জগতবিষয়ক অভিজ্ঞতায় নিষিক্ত। সুতরাং ন্যায়দর্শনের অনু ইক্ষণ [ঈক্ষণ] অহেতুক নয়। যদিও নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রসঙ্গ বেদান্তেই শোভন ও সমীচীন, যেহেতু প্রমা[৫] আলোচনাই গৌতম-ন্যায়ের[৬] মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রমার সহিত প্রমাণের যোগ, প্রমাণ প্রমার করণ স্বরূপ। প্রমা বলিতে যথার্থে (valid) জ্ঞান বোঝায়। প্রমার ক্ষেত্রে 'করণ' বলিয়া একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। করণের অর্থ 'যা করে' অর্থাৎ যাহা কোনো কিছু ঘটায়। সুতরাং যাহা প্রমাকে প্রতিষ্ঠিত করে, যাহা সত্যজ্ঞানকে সার্থক করে তাহাকে প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণের প্রসঙ্গ ও প্রকরণের প্রশ্ন জড়িত অর্থাৎ প্রমার অবাধিত ও অনধিগম্যত্ব চরিত্র প্রতিষ্ঠায় জিজ্ঞাসু পথেরই সন্ধান করে। 'অবাধিত' অর্থাৎ যাহা বাধিত হয় নাই। জ্ঞানের বাধাই বাধিত করে। যেমন দড়িকে সাপ মনে করিলে যথার্থ জ্ঞান হয় না। আলোতে দড়িকে দড়ি বলিয়া চেনা যায়। এখানে দড়ির সর্প-চরিত্র বাধা পায় সুতরাং তাহা বাধিত (contradicted)। 'অনধিগম্যত্ব' বলিতে যাহা 'অধিগম্য' নয় বোঝায়। অধিগম্যের অর্থ পূর্বে জ্ঞাত। ভারতীয় জ্ঞানীরা বলেন তাহাই জ্ঞান যাহা নূতন, যাহা পূর্বে জানা যায় নাই। এ-কারণেই তাঁহারা 'স্মৃতি'কে (memory) জ্ঞান বলেন না যেহেতু, স্মৃতি, পূর্বে জ্ঞাত জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি (repetition) মাত্র।

প্রমা বা নিশ্চিত-জ্ঞান, অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান — ভারতীয় তত্ত্বে সর্বত্র স্বীকৃত। পাশ্চাত্য বক্তব্য অনুযায়ী জ্ঞান বস্তুত সর্বদাই নিশ্চিত ও যথার্থ। ভারতীয় মতে বাধিত বক্তব্য সাধারণ লোকশ্রুতি অনুযায়ী জ্ঞানপদবাচ্য নয়; কিন্তু বিদ্বজ্জনমতে বাধিত বক্তব্যও রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ক্ষণকালীন সত্যের রূপ গ্রহণ করিতে পারে। কাজেই তাৎক্ষণিক সর্প যেমন পদস্খলনের কারণ হইতে পারে, মিথ্যা জ্ঞানকে জ্ঞান নামকরণ করিতে আপত্তি থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই অবশ্য জানিবেন যে জ্ঞানের নিশ্চিতিতেই জ্ঞানের যথার্থ্য [যাথার্থ্য] প্রমাণিত এবং স্বীকৃত হয়। প্রমাসিদ্ধির জন্য প্রমাণ, ভারতীয় শাস্ত্রে, নানাবিধ। ন্যায়দর্শনে চতুর্বিধ প্রমাণ স্বীকৃত হইলেও অনুমানখণ্ডের আলোচনাই মূল। প্রত্যক্ষে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকে, অনুমান প্রত্যক্ষের অব্যবহিত চরিত্রকে মুক্তি দেয়। ফলে, জ্ঞান সহজেই সার্বজনীনতা পাইতে পারে। ন্যায় দর্শনের প্রধান আলোচ্য এই অনুমান বস্তুত কিন্তু প্রত্যক্ষের সম্পর্কহীন নয়, প্রত্যক্ষের ভিত্তিতেই ন্যায়ের অনুমান আলোচনায় স্বীকৃত হয়।

অনুমান অর্থাৎ পশ্চাৎভাবনা নিরালম্ব নহে। 'অনু' অর্থে পশ্চাৎ ও 'মান' অর্থে ধারণা বোঝায়। কাজেই অনুমানের অর্থ একটি ভাবনার পরবর্তী ভাবনা। পশ্চাতের ভাবনা নিঃসন্দেহেই পূর্বভাবনার আশ্রিত। বর্তমানে নিবদ্ধ পশ্চাৎভাবনা — অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত সূত্রগুলিকে অলক্ষ্যে সম্পর্কিত করে। যেমন, বর্তমানে ধূমের কারণে পর্বতে অপ্রত্যক্ষ অগ্নির উপস্থিতি ঘোষণা করা হইতেছে। অনুমানে অগ্র-পশ্চাত বিবেচনায় জ্ঞান হইতে অজ্ঞাত সম্পর্ক ও সত্য প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য থাকে। জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত চরিত্রের প্রতিষ্ঠাতেই জ্ঞানের অনধিগম্যত্ব অর্থাৎ নতুনত্ব প্রকাশিত হয়। নির্দিষ্ট যে পর্বতটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে জ্ঞানের গোচরে ছিল না; কিন্তু বর্তমান ধূমের প্রত্যক্ষ পর্বতটিকে পূর্বেকার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সন্নিধিতে উপস্থিত করে এবং আমরা নিশ্চিন্তে জ্ঞানের বিস্তার করি। আলোচ্য উদাহরণে প্রত্যক্ষ ধূম হইতে অপ্রত্যক্ষ অগ্নি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। পূর্বে আমি নিশ্চয়ই ধূম ও অগ্নির যোগ লক্ষ্য করিয়াছি তাই অচেনা পর্বতে ধূম দেখিয়া এখন বলিলাম যে পর্বতে আগুন লাগিয়াছে। প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষে গমন করিবার প্রক্রিয়া এবং ফল উভয়কেই অনুমান বলা হয়।

অনুমান প্রসঙ্গে ন্যায়দর্শনে দুইটি প্রশ্ন মীমাংসা করা দরকার। প্রথমত, কেমন করিয়া অনুমান সম্ভব হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষে চলা সম্ভব হয় এবং দ্বিতীয়ত, অনুমানের নিশ্চিতি বা নিশ্চয় ধারণা কাহার উপর নির্ভর করে। ন্যায়দর্শন প্রশ্ন দুইটির সমাধান উপস্থিত করিয়াছে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়দর্শন ঘোষণা করে যে, লিঙ্গ ও সাধ্যের ব্যাপ্তিসম্বন্ধে[৭] প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষকে সংযুক্ত করে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের নিরসন হয় ব্যাপ্তিগ্রহের[৮] প্রতিষ্ঠায়। ব্যাপ্তিগ্রহের লক্ষ্য লিঙ্গ ও সাধ্যের নিয়ত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা। লিঙ্গ ও সাধ্যের নিয়ত সম্বন্ধ অনুমানের ভিত্তি কারণ কোনো একটি দৃষ্টান্তে লিঙ্গ ও সাধ্য সম্পর্কিত থাকিতে পারে কিন্তু তাহারা নিয়তই যে সম্পর্কিত থাকিবে এমন নহে। একবার ধূম ও অগ্নির সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা বহুবার করিয়াছি কিন্তু সমস্ত দেশেকালেই যে ধূম ও অগ্নি সহগমন করে — এমন প্রমাণ নাই। কাজেই ধূমরূপ লিঙ্গ দর্শনে পর্বতে অগ্নিরূপ সাধ্যের উপস্থিতি ঘোষণা, সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। কিন্তু ধূম ও অগ্নির সহগামিতা যদি পূর্বেই প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে নির্দ্বিধায় যেমন সর্বত্র ধূমপ্রত্যক্ষে অগ্নির উপস্থিতি ঘোষণা করা সম্ভব, তেমনি সিদ্ধান্তের অনিবার্য নিশ্চিতিও বিনা দ্বিধায় পাওয়া যায়। ব্যাপ্তিগ্রহ এই নিশ্চিতির সাধনসামগ্রী।

ব্যাপ্তিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উপায় সম্বন্ধে ষড়দর্শনের ঋষিরা একমত নহেন। আমরাও এই মতান্তর বিষয়ে আলোচনা করিব না। এখন সাধ্য ও লিঙ্গের সম্পর্ক প্রতিপন্ন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ন্যায়দর্শন অনুযায়ী, অনুমান জ্ঞানের পশ্চাদ্‌ভাবী জ্ঞান অর্থাৎ একটি জ্ঞানের পর অন্য একটি জ্ঞান সম্ভব হইলেই তাহা পূর্ববর্তীর সূত্রে আসিতে পারে। অনুমিতিস্থলে আদিতে লিঙ্গ দর্শন হয়, তৎপরে লিঙ্গ-লিঙ্গীর[৯] সম্বন্ধজ্ঞান (ব্যাপ্তিজ্ঞান) হয় এবং পরিশেষে অপ্রত্যক্ষ সাধ্যর জ্ঞান হয়। সাধ্যের জ্ঞানই অনুমিতি। লিঙ্গ দর্শনের অব্যবহিত পরে বা লিঙ্গ দর্শনের সূত্রে ব্যক্তিজ্ঞানদ্বারা অনুমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানের করণ বা প্রমাণ বলা হয়। যেমন 'দূরস্থ পর্বত বহ্নিমান্, কারণ ইহা ধূমবান' এই দৃষ্টান্তে পর্বতস্থ বহ্নি প্রত্যক্ষগোচর নহে। কিন্তু পর্বতে ধূমের প্রত্যক্ষ হওয়ায় ধূম ও অগ্নির নিয়ত সম্বন্ধ স্মরণে আসে। তদ্দ্বারা অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমান হয়। এস্থলে ধূম লিঙ্গ, হেতু বা চিহ্ন, অগ্নি সাধ্য এবং ধূম ও বহ্নির নিয়ত সম্বন্ধ হইতেছে ব্যাপ্তি।

ন্যায়দর্শনে অনুমান বিন্যাসবদ্ধ থাকে। এই বিন্যাসটিকেও ন্যায় বলা হয়। আমাদের অর্থে ন্যায় একটি যুক্তিক্রম। তাহার পূর্বাপর সম্পর্ক আছে এবং সম্পর্কের অন্তঃসঙ্গতিতে তাহা অনিবার্য ভাবে একটি প্রতিজ্ঞা হইতে অন্য প্রতিজ্ঞায় অগ্রসর হয়। ন্যায়ের যুক্তিক্রমটিকে বিশ্লেষণ করিলে প্রথমত পাওয়া যাইবে তাহার তিনটি অঙ্গ — তিনটি পদ। পদ তিনটির নাম সাধ্য, পক্ষ এবং লিঙ্গ। লিঙ্গ হইতেছে চিহ্ন, যাহার উপস্থিতির জন্য অন্যান্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। যেমন, ধূমরূপ লিঙ্গ দর্শনে পর্বতে অপ্রত্যক্ষ অগ্নির কথা স্মরণে আসে। দৃষ্টান্তে পর্বত অগ্নির আশ্রয় হওয়ায় পর্বত 'পক্ষ'। ধূমহেতু পর্বতে অগ্নির উপস্থিতিই যেহেতু আলোচ্য অগ্নি 'সাধ্য' নামে পরিচিত। অনুমানের ন্যায়ে লিঙ্গ, সাধ্য ও পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। যেমন, ধূমহেতু পর্বতে (পক্ষ) অগ্নি (সাধ্য)র অনুমান সম্ভব হইয়াছে।

অনুমানে অন্তত তিনটি প্রতিজ্ঞা থাকে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী প্রথমত পক্ষে (পর্বতে) লিঙ্গ (ধূম) দর্শন হয়; দ্বিতীয়ত, লিঙ্গ বা হেতুর সহিত সাধ্যের (অগ্নির) সম্বন্ধজ্ঞান হয়। কিন্তু যুক্তির বিন্যাস অনুযায়ী অনুমানকে প্রথমত পক্ষে সাধ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়, যেমন 'পর্বত বহ্নিমান্'। পরে আর একটি প্রতিজ্ঞায় হেতুকে পক্ষের ধর্মস্বরূপ উপস্থিত করা হয়; যেমন, 'যেহেতু পর্বত ধূমবান্।' পরিশেষে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিসম্বন্ধকে ঘোষণা করা হয় — 'ধূম বহ্নিব্যাপ্ত' অর্থাৎ যেখানেই ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে।'

ব্যাপ্তিসম্বন্ধে সাধ্য অগ্নি ব্যাপক এবং হেতু ধূম ব্যাপ্য। ব্যাপ্য ব্যাপক[১০] সম্পর্কই যদিও অনুমানের ভিত্তি তবু হেতু ও সাধ্যে ব্যাপ্তির মাত্রাভেদ ঘটিতে পারে। যেমন, আলোচ্য উদাহরণে সাধ্য অগ্নি হেতু ধূমকে ব্যাপিয়া আছে কিন্তু অগ্নিকে ধূম ব্যাপিয়া নাই। কারণ ধূমহীন অগ্নি (যেমন বৈদ্যুতিক আগুন) সম্ভব কিন্তু আগুনহীন ধূম সম্ভব নয়। অনুমানের ক্ষেত্রে তাই তিনটি পদ ও তিনটি প্রতিজ্ঞা পাওয়া যাইতেছে। এই তিনটি প্রতিজ্ঞা ও তিনটি পদকে নৈয়ায়িকরা বিস্তৃত করিয়া পাঁচটি প্রতিজ্ঞা অবয়বে বিভক্ত করেন। ইহাকে পঞ্চাবয়বী ন্যায় বলা হয়। বর্তমান উদাহরণটিকে ন্যায়ে বিশ্লেষিত করিলে হইবে —

(১) পর্বতটি বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)
(২) কারণ ইহা ধূমবান (হেতু)
(৩) যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি, যেমন মহানস (প্রজ্জ্বলিত চুল্লী)
(৪) পর্বতটিও সেইরূপ ধূমবান (উপনয়)
(৫) অতএব ইহা বহ্নিমান (নিগমন)

অনুমান দুই প্রকার। বিষয়ী নিজস্ব প্রয়োজনে স্বীকৃত বক্তব্য হইতে নূতন সিদ্ধান্ত করিলে বলা হয় স্বার্থানুমান। স্বার্থানুমানে পঞ্চাবয়বের প্রয়োজন নাই যেহেতু বিষয়ী স্বয়ং বিচারক্রিয়াটি গঠন করেন। সেই একই সিদ্ধান্ত অপর ব্যক্তিদের গ্রহণ করাইতে হইলে প্রস্তাবিত বক্তব্যটিকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে হয়। ন্যায়ের পঞ্চাবয়বী সংগঠন পরার্থনুমান অর্থাৎ অপরের জ্ঞানের প্রয়োজনের গঠিত।

পঞ্চাবয়বী ন্যায়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল ১নং প্রতিজ্ঞাটি ও ৫নং প্রতিজ্ঞাটি সম্পূর্ণ এক। কার্যত তাই ন্যায় চারিটি প্রতিজ্ঞায় গঠিত। এই ঐক্য সত্ত্বেও ইহাদের তাৎপর্য পৃথক। প্রথম প্রতিজ্ঞাটি বক্তার নিশ্চয়াত্মক বক্তব্য নহে, অন্যান্য অনেক ধারণার একটি মাত্র। কিন্তু লিঙ্গ দর্শনে পক্ষ ও সাধ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হইলে একটি অনিবার্য নিগমন প্রস্তুত হয়। নিগমনটিই সিদ্ধান্ত বা প্রতিজ্ঞা। কিন্তু বর্তমানে নিগমনটি আর ১নং প্রতিজ্ঞার ন্যায় অনিশ্চিত নহে। নিগমনটি একটি নিশ্চিত এবং অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

পঞ্চাবয়বী[১১] ন্যায়ে ৩নং প্রতিজ্ঞাটি উল্লেখযোগ্য কারণ উহা আরোহ ও অবরোহের[১২] সমন্বয়। অবরোহী ন্যায়ে সামান্য প্রতিজ্ঞা হইতে হেতুর সাহায্যে স্বল্পব্যাপক একটি সিদ্ধান্ত গঠন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় অন্তঃসঙ্গতিই একমাত্র ভিত্তি,বাস্তব জগতের নিয়ম ও

কার্যকারিতা তাহার লক্ষ্য নয়। কিন্তু ন্যায় দর্শনে যদিও অন্তঃসঙ্গতিপূর্ণ ন্যায়ের কথা বলা হইয়াছে, এই ন্যায়ে একটি প্রকৃত উদাহরণের প্রয়োজন হয়। কারণ আরোহের কার্যকরী উদাহরণের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত চুল্লীও একটি সামান্য নিয়ম জ্ঞাপক উদাহরণ।

— শান্তি বসু

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. অনন্যমনে প্রগাঢ় ধ্যান। অভিনিবেশ সহকারে একাগ্র চিত্তে বা নিবিষ্টমনে দেহজ্ঞানরহিত হয়ে কোনো বিষয়ে নিরন্তর অনুধ্যান বা বিচার।

২. যে বিচারের সাহায্যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য জানা যায়।

৩. 'ন্যায়শাস্ত্র' অনুসারে — প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত পদার্থের পুনরায় অন্বীক্ষা। বিচারপূর্বক দর্শন এই অর্থে আন্বীক্ষিকীর অর্থ ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র। 'তর্কশাস্ত্র' অনুসারে — 'অনু' অর্থাৎ শ্রবণের অনন্তর বিহিত যে ঈক্ষা অর্থাৎ মনন, তাই অন্বীক্ষা। সেই অন্বীক্ষার নির্বাহ যে শাস্ত্র তাই আন্বীক্ষিকী।

৪. একজন দার্শনিক বের্গ'স। তার মতবাদ অনুসারে।

৫. 'প্রমা'র অর্থ যথার্থ জ্ঞান।

৬. ঋষি গৌতম যিনি ন্যায়সূত্রকার।

৭ ও ৮. 'লিঙ্গ ও সাধ্যের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ' এবং 'ব্যাপ্তিগ্রহ — দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী 'লিঙ্গ' অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাকে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বলে। অধিকস্থানে না থাকাই ব্যাপ্তি। যা হেতু অপেক্ষা অধিকস্থানে থাকে না, তাতে তার ব্যাপ্তি থাকে। যেমন ধূম বহ্নি অপেক্ষা অধিকদেশে থাকে না। অতএব ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে।
এই ব্যাপ্তিসম্বন্ধ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াকে বলে ব্যাপ্তিগ্রহ।

৯. দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী, 'লিঙ্গ'-এর অর্থ হেতু, 'লিঙ্গী'-এর অর্থ সম্বন্ধ।

১০. যাতে ব্যাপ্তি থাকে তাকে ব্যাপ্য বলা হয় এবং যার ব্যাপ্তি থাকে তাকে ব্যাপক বলা হয়। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধই ব্যাপ্তিসম্বন্ধ। ধূম এবং বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধের ক্ষেত্রে হেতু ধূম হচ্ছে ব্যাপ্য এবং সাধ্য বহ্নি হচ্ছে ব্যাপক।

১১. ন্যায়দর্শনের অনুমানে পাঁচটি অংশ বা অবয়ব আছে, যাদের বলা হয় পঞ্চাবয়বী ন্যায়। ক্রমানুসারে সেগুলি হল — প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।

১২. আরোহ - Induction, অবরোহ - Deduction।

সংখ্যাতত্ত্বের সূচনা

সংখ্যাই গণিতশাস্ত্রে মূল; এবং আমরা এই প্রবন্ধে ঐ সংখ্যার সঠিক তত্ত্বের প্রয়োজনীয় ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অবশ্য এখনই আমরা এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা অর্থাৎ প্রত্যেক স্তর বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করিব না; উহা উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্রের কথা। তাই এখন শুধুমাত্র আমরা উহার প্রাথমিক দিকই আলোচনা করিব।

আমাদের অল্পবয়সে, স্কুলে, সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা কিভাবে গড়িয়া তোলা হয় তাহা সংক্ষেপে বিচার করা যাক। ছোটবেলাতেই আমরা সর্বপ্রথম গণনা করিতে শিখি এবং এইভাবে আমাদের ১,২,৩, প্রভৃতি স্বাভাবিক সংখ্যার (natural number) সংগে পরিচয় ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে এই স্বাভাবিক সংখ্যার নানান ব্যবহার বিধিনিষেধ স্কুলে শেখান হয়। প্রথমেই পাটিগণিত অনুযায়ী আমাদের শেখান হয় কি পদ্ধতিতে দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা সম্ভবপর।

এই চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে 'ভাগ' লইয়া সর্বাগ্রে তর্ক শুরু হয়। দেখা যায়, এমন কতক সংখ্যা আছে যাহাকে সহজেই অন্য সংখ্যার দ্বারা ভাগ করা যায় যথা ৬ কে ২, এখানে ভাজ্য ও ভাজকের সম্পর্ক যুতসই ফলে ভাগ করা সম্ভব হয়।

কিন্তু দেখা গেল অনেক সংখ্যার ক্ষেত্রে ভাগ প্রক্রিয়া প্রযোজ্য নয়। অনেক সংখ্যা আছে যাহা সঠিক ভাবে বিভাজ্য নহে। যথা যদি ৯ কে ২ দিয়া ভাগ করিতে চাহি, ৭ কে ৩ দিয়া ভাগ করিতে চাহি এবং আরও জটিল মনে হইবে যদি ৩ ÷ ৫ দিয়া ভাগ করিতে ইচ্ছা করি যাহা পরে দেখিতে পাইব সত্যই একান্ত প্রয়োজনীয়।

৯ কে ২, ৭ কে ৩ এবং ৩ কে ৫ দিয়া যদি ভাগ করিতে হয় তাহা সাধারণ স্বাভাবিক সংখ্যার দ্বারা নির্ণয় করা অসম্ভব। ফলে এই প্রক্রিয়ার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ নূতন সংখ্যার উদ্ভব করা প্রয়োজন হয়, যাহার সংগে কোন সূত্রে প্রথম সংখ্যার অর্থাৎ স্বাভাবিক

সংখ্যার যোগ থাকিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে আর এক প্রকৃতির। এই নূতন সংখ্যার নাম ভগ্নাংশ (Fraction); এবং পাটিগণিত অনুযায়ী আমাদের ভগ্নাংশ শেখান হয়।

ভগ্নাংশ বিষয়টি সম্পর্কে আমরা যাহারা পাটিগণিত অনুযায়ী প্রথম পরিচয় লাভ করি তাহারা সাধারণ ঐ প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। অথচ এই ভগ্নাংশ অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতির সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ নাটকীয় পদক্ষেপ। এই ভগ্নাংশ অঙ্কশাস্ত্র চর্চার আদিতে দেখা যায় নানান অদ্ভুত নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার ইতিহাসও বিরাট — তবু কথা প্রসঙ্গে এইটুকুই বলা যায়, ব্যাবিলোনীয়রা এই ভগ্নাংশ প্রক্রিয়া সম্ভবত শুরু করে। ব্যাবিলোনীয় অঙ্কবিদ্‌রা সকল ক্ষেত্রেই অর্থাৎ যখনই ভগ্নাংশ ব্যবহার করিতেন তখনই দেখা যায় ৬০ সংখ্যাটি ভগ্নাংশের **হর** হিসাবে ধরিতেন।

যে সকল ভগ্নাংশের লবটি ১ নয়, মিশরীয়গণ তাহাদের **খণ্ড-ভগ্নাংশের** সাহায্যে প্রকাশ করিত। এই প্রকারের ভগ্নাংশগুলিকে ভাঙ্গিয়া তাহারা কতকগুলি খণ্ড-ভগ্নাংশে পরিণত করিত, যাহাদের প্রত্যেকের লবগুলি ১ হইত ও যাহাদের সমষ্টির মান মূল ভগ্নাংশটির মানের সমান হইত; যেমন $\frac{২}{৫}$-এর পরিবর্তে $\frac{১}{৩}+\frac{১}{১৫}$ লেখা হইত। অনেককাল পরে দেখা যায় রোমকগণ ১২ সংখ্যাটি হর হিসাবে ধরিতেন।

অবশ্য ইদানীং কালে আমরা যে নিয়মে লিখি তাহা লিওনার্দো দ্য পিসা [ইনি ১৩শ শতাব্দীতে বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ফিবনোচ্‌চি (Fibonacci) নামেই অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পরিচিত] কর্তৃক প্রচলিত। ফিবনোচ্‌চি লিখিত ''লিবর আবেসি'' ১২০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

শূণ্য [শূন্য] (negative number) সংখ্যা

শূণ্য [শূন্য] ও -৭, -৩, -৪$\frac{১}{৫}$, প্রভৃতি ঋণাত্মক সংখ্যার সঙ্গে, অর্থাৎ ইহাদের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ পরিচয় প্রয়োজন। অর্থাৎ ধনাত্বক [ধনাত্মক] পূর্ণসংখ্যা ও ঋণাত্বক [ঋণাত্মক] সংখ্যার গণনার ধারাটা কি রূপের।

ধনাত্বক [ধনাত্মক] ও ঋণাত্বক [ঋণাত্মক] সংখ্যা, শূণ্য [শূন্য] এবং ঋণাত্বক[ঋণাত্মক] ও ধনাত্বক[ধনাত্মক] ভগ্নাংশ — এগুলিকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় মূলদ সংখ্যা (Rational number)। শুধুমাত্র ধনাত্বক [ধনাত্মক] স্বাভাবিক সংখ্যা হইতে এই মূলদ সংখ্যার কার্যকারিতার সুবিধাও আছে, আমরা নির্ভাবনায় যে কোন মূলদ সংখ্যা হইতে যে কোন মূলদ সংখ্যা বিয়োগ করিতে পারি।

যদি শুধুমাত্র ধনাত্বক [ধনাত্মক] সংখ্যা থাকে, তাহা হইলে ৩-৫ এই অঙ্কের কোন অর্থই হইত না। এখন একথা আমাদের জানা দরকার যে এই ঋণাত্বক [ঋণাত্মক] সংখ্যার (negative number) স্থায়িভাবে গণিতশাস্ত্রে স্থান লাভ করিতে অনেকদিন সময় লাগিয়াছিল। যদিও অন্যান্য দেশে, যথা চীনদেশে, ভারতবর্ষে এবং আরবীয়রা ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার জানিতেন কিন্তু পাশ্চাত্যে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত গণিতবিদ্‌রা এই ঋণাত্বক [ঋণাত্মক] সংখ্যাকে ধনাত্বক [ধনাত্মক] সংখ্যার সমপর্যায়ভুক্ত করেন নাই।

যখন আমরা √২ অথবা π[১] প্রভৃতি (অমূলদ সংখ্যা বা irrational number) রাশি বিচারের কথা বলি তখন আমরা দেখি এইগুলিকে কোন ক্রমেই সাধারণ ভগ্নাংশ হিসাবে লেখা যায় না। শুধুমাত্র আমরা উহাদের অসীম দশমিক (infinite decimal) হিসাবে প্রকাশ করিতে পারি যেমন √২=১.৪১৪২... এবং π=৩.১৪১৫৯...

মূল [মূলদ] সংখ্যা প্রকাশেও অসীম দশমিক প্রয়োজন। যেমন,

$\frac{১}{৪}$= ০.২৫০০০০...[২]

$\frac{১}{৩}$=০.৩৩৩৩৩৩৩...

২=২.০০০০০০০...[৩]

$\frac{১}{৭}$=০.১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭...

এইভাবে দেখা যায়, এগুলি কিছুদূর পর্যন্ত গিয়া পুনরাবৃত্ত হয়; কিন্তু অমূলদ সংখ্যাগুলি আদতে তাহা হয় না। এবং এই সমস্ত মূলদ ও অমূলদ সংখ্যাকে সমগ্রভাবে বলা হয়, বাস্তব সংখ্যা (real number)। বাস্তব সংখ্যার যথাযথ সংজ্ঞা নির্ণীত করা অর্থাৎ যে সংজ্ঞা একেবারে ত্রুটিহীন হইবে এমন সংজ্ঞা অভিহিত করা সত্যই সুকঠিন। তাই এই অর্থাৎ এই প্রবন্ধে আমরা নিছক অনুমান বা মনগড়া ধারণার উপর নির্ভর করিব। আমাদের বাস্তব সংখ্যা সম্পর্কে কাজ চলার মত ধারণা আছে এই বিশ্বাসে, এখন আমরা বাস্তব সংখ্যা লইয়া আলোচনা করিব।

বাস্তব সংখ্যার যোগ

দুইটি বাস্তব সংখ্যার মধ্যে যোগ করা সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত আছে, যেমন ২+৩ = ৫, অথবা -৩+২$\frac{১}{২}$ = -$\frac{১}{২}$ ইত্যাদি। এইভাবে দেখা যায়,

প্রকৃতপক্ষে এক জোড়া বাস্তব সংখ্যার যোগফল হিসাবে তৃতীয় একটি বাস্তব সংখ্যা পাওয়া যায় বা সূচিত হয়। আমরা এই স্বভাবের অর্থাৎ ধর্মের নামকরণ করি ক্লোজার (closure) এবং সেই বলে আমরা নিম্নলিখিত নিয়ম স্থির করিতে পারি। যোগের ক্লোজার নিয়ম — a এবং b, দুইটি বাস্তব সংখ্যা, এই দুই এর যোগফল $a+b$ তৃতীয় একটি বাস্তব সংখ্যা ।

এই বিষয় সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত যে যোগ প্রক্রিয়া রাশিগুলির ক্রম সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে না; যেমন ২+৪ = ৪+২, -৩ + π = π + (-৩) ইত্যাদি। এই স্বাভাবিক ধর্মকে আমরা যোগের বিনিময় নিয়ম (commutative, law) বলি, এবং নিম্নলিখিত ভাবে নিয়মটি লেখা যায়।

যোগের বিনিময় নিয়ম : $a+b = b+a$। কিন্তু ইহাতে তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করা শক্ত হয়, কেন না এখানে আমরা দুইটি সংখ্যার জন্য যে যোগফলের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাই মাত্র পাই — কিন্তু তিনটি সংখ্যার জন্য নহে।

সাধারণত আমরা ২+৪ =৬ করি, তাহার পর ৬+৭=১৩ যোগ করি। কিন্তু যদি আমরা সর্বাগ্রে ৪+৭=১১ যোগ, তাহার পর ২+১১=১৩ করিতেও পারি ইহার আর এক অর্থ এই যে (২+৪)+৭=২+(৪+৭) এবং এইজন্য এই ধর্মকে আমরা যোগ প্রক্রিয়ার সংযোগ নিয়ম (associative, law) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। নিম্নলিখিতভাবে আমরা নিয়মটি লিখিতে পারি —

যোগের সংযোগ নিয়ম ঃ $(a+b)+c = a+(b+c)$

এখন প্রকৃতপক্ষে আমাদের তিনটি সংখ্যার যোগফল $a+b+c$ ইহার সংজ্ঞা বিহিত করিতে হইবে, কারণ ইতিপূর্বে আমরা দুইটি সংখ্যার $a+b$ এর যোগফলের সংজ্ঞা যে কি তাহা জানি। সুতরাং আমরা এই সংজ্ঞা দিই।

সংজ্ঞা — তিনটি সংখ্যার যোগফল $a+b+c$ মানেই $(a+b)+c$

একটি উপপাদ্যের সাহায্যে এখন আমরা সহজেই প্রমাণ করিতে পারি যে তিনটি সংখ্যার যোগফল, দেখা যাইবে যে কোন ক্রমানুসারেই হউক কেন একই — অনন্য থাকিবে।

উপপাদ্য ১) $a+b+c = c+b+a$

প্রমাণ	$a+b+c = (a+b)+c$	সংজ্ঞা অনুসারে
	$= (b+a)+c$	বিনিময় নিয়ম
	$= c+(b+a)$	বিনিময় নিয়ম
	$= (c+b)+a$	সংযোগ নিয়ম
	$= c+b+a$	সংজ্ঞা অনুসারে

এইভাবে আমরা চারিটি যোগফলের সংজ্ঞা নির্ণয় এবং সংজ্ঞা দিতে পারি।

সংজ্ঞা $a+b+c+d = (a+b+c)+d$

এবং পূর্বেকার প্রক্রিয়ার মত অর্থাৎ বিনিময় ও সংযোগ নিয়মের সাহায্যে দেখান যায় যে চারটি সংখ্যার যোগও কোনদিক দিয়াই ক্রম সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে না।

যোগ প্রক্রিয়ায় শূন্য সংখ্যার (o) একটি বিশেষ ভূমিকা বর্তমান। আমরা জানি, যে কোন বাস্তব সংখ্যা a এবং শূন্যের o সহিত যোগফল a ই হয়, যথা $a+o = a=o+a$; আমরা দেখিব যে, যেহেতু এইরূপ যোগের ফলে a সংখ্যাটির কোন পরিবর্তনই ঘটে না, ফলে, এই সূত্রে আমরা এই স্বভাবকে নিম্নলিখিত সংজ্ঞায় স্থির করিতে পারি।

সংজ্ঞা ঃ বাস্তব সংখ্যাগুলির যোগপ্রক্রিয়ায়, শূন্য o বাস্তব সংখ্যাটিকে অভেদসূচক সংখ্যা বলা হয়। এই সংজ্ঞার অর্থ হইল : "যে কোন বাস্তব সংখ্যা 'a' র ক্ষেত্রে, $a+o=o+a=a$।"

ধরা যাক, একটি বাস্তব সংখ্যা a লওয়া হইল। এখন এমন কোন্ বাস্তব সংখ্যা b থাকিতে পারে কি, যাহার সহিত যোগ করার ফলে $a+b=o$ হইবে? যদি a=২ হয় তাহা হইলে b=-২।

যদি a=৩ হয় এবং $a+b=o$ হয়, তবে b=-৩ হইবে। সাধারণ ভাবে, $a+(-a) = (-a)+a=o$, যেখানে a ঋণাত্বক [ঋণাত্মক] বা ধনাত্বক [ধনাত্মক] যে কোন সংখ্যা হইতে পারে।

এবং এই প্রকৃতি যখন আমরা অনুধাবন করি তখন আমরা পুনরায় নিম্নলিখিত সংজ্ঞা স্থির করি।

সংজ্ঞা ঃ বাস্তব সংখ্যা $(-a)$ কে a এর যৌগিক বিপরীত (additive inverse) বলিয়া ধরা হয়, ইহার অর্থ ঃ $a+(-a) = o = (-a)+a$ এবং এই সত্যকে আমাদের এইভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে — যে কোন বাস্তব সংখ্যা ও তাহার যোগ বিপরীত এর যোগফল

সকল সময়ই যোগ অভেদের সমান হইবে।

সহসা, বিপরীত (inverse) শব্দটি কেন ব্যবহার করা হইল তাহা এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়; — আমরা শূন্য o হইতে আরম্ভ করি এবং তাহার সহিত যদি a যোগ করি, তবেই a সংখ্যাটি পাই। এখন এই a হইতে যদি আমরা o শূন্যতে ফিরিয়া যাইতে চাই, তাহা হইলে আমাদের aর সহিত (-a) যোগ করিতে হইবে। এবং এই সংখ্যা (-a) যোগ করার প্রক্রিয়ার জন্যই a যোগ করার ফল নষ্ট হয়। তাই এই ব্যাপারকে বিপরীত (inverse) প্রক্রিয়া বলা হয়। অবশ্য এখানে বলিয়া রাখা যাক যে, এখন যে বিপরীত (inverse) সংজ্ঞার আলোচনা আমরা করিলাম বা সংজ্ঞা স্থির করা হইল তাহার সহিত — আমরা যখন গুণ প্রক্রিয়ার জন্য যে বিপরীত (inverse) সংজ্ঞা নির্ধারণ[৪] করিব উহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

সমস্যা ঃ

১) নিম্নলিখিতগুলি প্রমাণ করিতে বিনিময় ও সংযোগ নিয়ম ব্যবহার কর।

ক) ২+১০+৭ = ১০+২+৭ গ) $a+b+c = c+a+b$

খ) ৪+ $\frac{১}{২}$ + π + ৯ = ৯ + $\frac{১}{২}$ + π + ৪ ঘ) $a+b+c+d = d+c+b+a$

২) $a+b+c+d+e$ এর সংজ্ঞা দাও।

৩) সংখ্যাগুলির যোগ-বিপরীত গণনা কর : -৩, $\frac{১}{২}$, -৪, ০, π, ১৫, $\sqrt{২}$

৪) সাধারণত যোগ করিবার সময় আমরা প্রথম উপর হইতে নীচের দিকে আসি অর্থাৎ যোগ করি, পরে যোগ সম্পূর্ণ হইলে, উহা যোগ করা সঠিক হইয়াছে কিনা পরীক্ষার নিমিত্ত নিম্ন সংখ্যা হইতে উপর দিকে যোগ করিয়া দেখি। এখন, এই নিয়মটির যথার্থতা বর্ণনা কর।

৫) বাস্তব সংখ্যা কি বিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য ক্লোজার নিয়ম অনুসরণ করে?

৬) বিয়োগ প্রক্রিয়া কি বিনিময় নিয়ম এবং সংযোগ নিয়ম অনুসরণ করে?

৭) বিয়োগ প্রক্রিয়ার কি কোন অভেদ সূচক উপাদান (identity element) বর্তমান?

বাস্তব সংখ্যার গুণ প্রক্রিয়া —

এখন আমাদের সম্মুখে যোগের অত্যাবশ্যকীয় নিয়মগুলি রহিয়াছে অর্থাৎ আমরা উহা জানিয়াছি। ফলে, দেখা যাইবে গুণের নিয়মও খুব সহজ। সাধারণভাবে বলা যায় প্রায় ব্যাপারেই যোগের নিয়মগুলির ক্ষেত্রে যোগ বাক্যটি বাদ দিয়া গুণ লিখিলে চলিবে।

গুণের ক্লোজার নিয়ম ঃ দুইটি বাস্তব সংখ্যা a ও b যদি গুণ করা যায় axb তবে ইহাদের গুণফল হইবে তৃতীয় একটি সংখ্যা c; $a \times b = c$

গুণের বিনিময় নিয়ম ঃ $a \times b = b \times a$

গুণের সংযোগ নিয়ম ঃ $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

এখন প্রশ্ন উঠিবে গুণ প্রক্রিয়ায় কোন সংখ্যাটি একক? ইহা এমন সংখ্যা b যাহা যে কোন বাস্তব সংখ্যা a র জন্য $a \times b = a$ হইবে। পরিষ্কার করিয়া বলিলে, এই অর্থ হয় — a এমন এক সংখ্যা যাহাকে bর দ্বারা গুণ করা হইলে কোনই পরিবর্তন ঘটিবে না — যেমন যোগ প্রক্রিয়ায় আমরা দেখি যে aএর সহিত শূন্য o যোগ করিলে aএর কোন পরিবর্তন ঘটে না। স্পষ্টতই গুণের ক্ষেত্রে সেই একক সংখ্যাটির সঠিক সংকলন ১।

সংজ্ঞা ঃ বাস্তব সংখ্যা একেকে গুণ প্রক্রিয়ার একক সংখ্যারূপে পরিগণিত করা হয়। উপরোক্ত সংজ্ঞাকে আমরা এইরূপ ভাবে লিখিতে পারি — যে কোন বাস্তব সংখ্যা aএর জন্য $a \times ১ = ১ \times a = a$.

এখন প্রশ্ন উঠিবে তাহা হইলে গুণ প্রক্রিয়ার a এর বিপরীত কি? 'a' সংখ্যার বিপরীত (inverse) যে 'b' তাহার এমনই স্বভাব বা ধর্ম থাকিবে যে $a \times b = ১$ (একক) হইবে। এবং ইহা আমাদের পূর্ববর্ণিত যোগ প্রক্রিয়ার 'বিপরীত' এর সহিত তুলনীয়।

a সংখ্যাটির বিপরীত এর সঠিক সংকলন ১/a; অবশ্য বাস্তব সংখ্যার জন্য ইহার একটি অস্বস্তিকর ব্যতিক্রম হয়। সেই ব্যতিক্রম $a = o$ হিসাবে বলা যায়। ফলে আমরা দেখিতে পাই এমন কোন সংখ্যা b নাই যে সংখ্যার বলে আমরা অনায়াসে $o \times b = ১$ ফল লাভ করিতে পারি তাই শূণ্য 'o'র কোন গুণ প্রক্রিয়ায় বিপরীত নাই।

সংজ্ঞাঃ বাস্তব সংখ্যা ১/a ($a \neq o$) কে — বাস্তব সংখ্যা a ($a \neq o$) এর গুণ প্রক্রিয়া-সম্ভব বিপরীত বলা হয়। আমাদের এই কথনকে (statement) সংজ্ঞাকে এইরূপ ভাবে লেখা যায়, — $a \times \left(\frac{1}{a}\right) = \left(\frac{1}{a}\right) \times a = 1 \quad a \neq o$

এবং এইরূপ রীতি পদ্ধতিকে এই ভাবে ভাবা যায় বাস্তব সংখ্যার গুণ ফল এবং উহার গুণ-প্রক্রিয়া-সম্ভব (multiplicative) বিপরীতই গুণ প্রক্রিয়া-সম্ভব একক (identity)।

এই সূত্রে একটি সর্বশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে — যে নিয়ম একাধারে, গুণ এবং যোগ এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। আমরা সাধারণত গুণ প্রণালীকে নিম্নলিখিতভাবে করিতে অভ্যস্ত $৪(২+৩) = (৪x২) + (৪x৩)$; অথবা $২(x + y) = ২x + ২y$ ইত্যাদি আবার অনেক সময় দেখা যায় (গুণের) উৎপাদক নির্ণয় করিতে আমরা এই প্রণালীর উল্টা ভাবে করি — যেমন $৩x + ৬y = ৩(x + ২y)$ এবং এই সকল প্রণালীতে আমরা নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করি।

(ক্রমশঃ)

আনন্দমোহন ঘোষ

Principles of Mathematics হইতে

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. π কে বলে Transcendental number অর্থাৎ অজ্ঞেয় রাশি।
২. ১/৪ কে সসীম দশমিকই [Finite decimal] বলা হয়।
৩. ২=২.০০০০০০০... রূপে লেখা হলেও, একে সসীম দশমিক রূপেই গণ্য করা হয়।
৪. আগাগোড়া তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রাচীন 'নির্দ্ধারণ' বানান ব্যবহার করে এখানে হঠাৎ আধুনিক বানান 'নির্ধারণ' ব্যবহার করা হয়েছে।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বিষয়ক আলোচনা

গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া যুরোপীয় গণিতজ্ঞগণ কাগজ,· পেন্সিল, সরল রেখা, কম্পাস ইত্যাদির ভিত্তিতে গঠিত জ্যামিতি বিদ্যার যে বিশেষ শাখা তাহাতেই জ্যামিতির আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৪২৯ অব্দে এথেন্স নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। বহু জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি যাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৮০ অব্দে তিনি 'আকাদমী' নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এতই জ্ঞানী ছিলেন যে 'আকাদমীর' পণ্ডিতগণ বিনা দ্বিধায় তাঁহার তত্ত্বগুলি স্বীকার করিয়া লইতেন। তাঁহার অসামান্য প্রভাব শুধু সমকালীনই নহে, উত্তরকালীন পণ্ডিতদের উপরও বিস্তৃত হইয়াছিল। প্লেটো বিশ্বাস করিতেন যে গণিত ও দর্শনের মধ্যে এক অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি বলিতেন যে 'দর্শন শিক্ষার জন্য জ্যামিতিচর্চা অপরিহার্য' এবং 'আকাদমী'র প্রবেশদ্বারের উপরে লিখিত ছিল 'যিনি জ্যামিতি জানেন না তাঁহার এইখানে প্রবেশের অধিকার নাই।' আদর্শ ও পূর্ণতাই প্লেটোর দর্শনের মূলগত ভাব। তাঁহার অখণ্ডসত্য ও স্বেচ্ছাসংকল্পিত ন্যায়নিষ্ঠা পরমতত্ত্ব। ইহারা কোন সময়েই সম্পূর্ণ লভ্য নহে, তথাপি এই দুই পরম আদর্শের অভিমুখে লৌকিক বস্তুনিচয়[১] অগ্রসর হইতে পারে। এই শিক্ষায় তাঁহার 'সামান্য' তত্ত্ব[২] (theory of forms) গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। স্বতঃসিদ্ধ, সংজ্ঞা ও উপপত্তি[৩] (বা প্রাক্‌প্রত্যয়) হইতে কি ভাবে নিয়মানুগ যৌক্তিক ক্রমঃবিকাশের ধারায় নবতর সত্যের উদ্‌ঘাটন হয়, সে সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। প্লেটো স্বতঃই মনে করিতেন যে, বৃত্তেই আকৃতি (figure) পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; তাই জ্যোতিষ্কের আবর্ত্তন পথও বৃত্তাকার। সরল রেখাকেও তিনি আদর্শের বিশেষ উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন যে নানা বস্তু সরলতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু কোনটিই পূর্ণ সরলতার সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। তাঁহার 'সামান্য' তত্ত্বে সরলতার সহিত 'প্লেটো' পূর্ণতার আরও কয়েকটি প্রত্যয়কে — যেমন একরূপতা (unity), ১, এবং বৃত্তের পূর্ণতা প্রভৃতি তত্ত্বকেও — উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

'আকাদমী'তে প্লেটোর উত্তরসূরীগণের দ্বারা জ্যামিতির যে নূতন রূপায়ণ হইয়াছিল, তাহা পূর্বধৃত মৌলিক সত্যেরই যুক্তি অনুসারী বিবর্ত্তন মাত্র — উপপত্তি ও স্বতঃসিদ্ধ হইতে যুক্তিধারা ও পারম্পর্য্যানুসারে প্রতিপাদিত,[৪] তাঁহাদের এই প্রয়াসে সরলরেখা ও বৃত্তের বহুল ব্যবহার হইয়াছে। কারণ তাঁহাদের সকলের মতেই আকারগত দিক হইতে সরলরেখা ও বৃত্ত পূর্ণতা ও আদর্শের পরাকাষ্ঠা। স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহাদের এই পূর্ণতা বা আদর্শের ধারণা প্রধাণতঃ [প্রধানতঃ] অমূর্ত্ত ও সৌন্দর্য্যাশ্রয়ী।

মিশরকে কেন্দ্র করিয়া মহামতি আলেকজান্দারের যে সাম্রাজ্য ছিল, আলেকজান্দারের পরে খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে 'টলেমী' সেই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি 'আলেকসান্দ্রিয়া' নগরীতে এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু অধ্যাপকের জন্য তাঁহাকে এথেন্স নগরীর উপর নির্ভর করিতে হয়। ইউক্লিডকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিভাগের প্রথম এবং প্রধান নিযুক্ত করা হইল। প্লেটোর আকাদমীর জ্যামিতিক ঐতিহ্যের একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী ছিলেন ইউক্লিড। ইহা ছাড়াও জ্যামিতি বিদ্যার এক পূর্ণ ও বিশদ ব্যাখ্যা তিনি নিজে করিয়াছেন — এক কথায় ইহা যথানির্দ্দিষ্ট স্বতঃসিদ্ধ ও উপপত্তি (প্রাক্‌প্রত্যয়) হইতে অবরোহ তর্ক পদ্ধতির নিয়মানুসৃত মতবাদ। জ্যামিতিক সংগঠনের জন্য ইহা মাপনী ও কম্পাসের ব্যবহার করে। যৌক্তিক ক্রমঃবিকাশের দিক হইতে ইউক্লিডের জ্যামিতি এতই সুসমঞ্জস, সুসংবদ্ধ ও সম্পূর্ণ যে যথার্থ উক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সততার দিক হইতে ইহা এক বলিষ্ঠ ও উন্নত আদর্শ হইয়া রহিয়াছে এবং সুচিন্তিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হিসাবে জ্যামিতির স্থানকে সুউচ্চ ও সুদৃঢ় পাদভূমিতে স্থাপন করিয়াছে। ইউক্লিড খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ হইতে ২৭৫ অব্দের মধ্যে জ্যামিতির যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন তাহা বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের আদর্শ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। একটি আদর্শ পাঠ্যপুস্তক দুই হাজার বৎসরের অধিক একই স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না — যদি তাহাই হয়, তবে উহার দ্বারা কল্পনার প্রসার অবরুদ্ধ হইতে বাধ্য। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইহাই একমাত্র পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে রীমান ও লোবাচেভস্কি প্রমুখ ব্যক্তিগণ 'অ-ইউক্লিডীয়' জ্যামিতি আবিষ্কার করার ফলে 'স্থান' (space) এর প্রতি আরও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ সম্ভব হইয়াছিল। বর্তমান ছাত্রদের নিকট জ্যামিতির প্রতি নূতন ও উৎসাহজনক দৃষ্টিভঙ্গী এখন সহজলভ্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে বুনিয়াদ করিয়াই যে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হয় তাহাই নিশ্চিতভাবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিবিশেষ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে দুই হাজার বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্যের মানুষ 'স্থান' (space) সংক্রান্ত সমস্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং এমন কতকগুলি নিয়মানুযায়ী জ্যামিতিবিদ্যাকে উপপাদন[৫] করিয়াছে যাহা মাপনী ও কম্পাস, কাগজ ও পেন্সিল ব্যবহারের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে প্রতিষ্ঠিত প্লেটোর 'আকাদমী'র ঐতিহ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই গণিতজ্ঞেরা যৌক্তিক বিকাশের চরমপূর্ণতা ও যথাযথ বর্ণনার আদর্শ হিসাবে জ্যামিতির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অনুসন্ধানী প্রচেষ্টায় 'আকাদমী'র কার্যপদ্ধতি নিয়মাবলীই অনুসৃত হইয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত ইংলণ্ডে ইউক্লিডের *এলিমেন্টস* নামক পুস্তকটি বিদ্যালয়ের জ্যামিতি শিক্ষার আদর্শ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জ্যামিতি শিক্ষাকে সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে 'The Mathematical Association' স্থাপিত হয়। উহা জ্যামিতির পাঠক্রমকে সংশোধন করিবার প্রস্তাব করিয়া অনেকগুলি বিবরণী পেশ করিয়াছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে উহার সাম্প্রতিকতম বিবরণীতে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সহজীকরণ ছাড়াও বৃহত্তর কোন সাংগঠনিক কার্য্যের উপর উহার লক্ষ্য ছিল, তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতেই উহা বুঝা যাইবেঃ

স্বজ্ঞা[৬] ও ন্যায় (Intuition & Logic)

জ্যামিতিক শক্তি স্বজ্ঞা ও ন্যায় এই দুইটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এবং উহাদের একটির উপর প্রথানুযায়ী স্বীকৃতি ছাড়া আরও স্বতঃস্ফুর্ত [স্বতঃস্ফূর্ত্ত] স্বীকৃতি প্রয়োজন। ইহা খুবই সত্য যে যুক্তিতর্কের প্রতি অভিনিবেশ প্রয়োজন, কিন্তু ঐতিহ্যপরম্পরায় এই পদ্ধতিটির উপর এতই অতিরঞ্জিত গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে যে অন্যটি, যাহা কোনমতেই কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, বিশেষভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে।

"ইউক্লিড যে সময়ে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন সেই সময় এই অবস্থা স্বাভাবিক ছিল; তখন পাঠ্যবিষয় 'জ্যামিতি' ছিল না, ছিল 'ইউক্লিডের জ্যামিতির উপাদান'। এবং অভ্যাসগত ভাবে উহা বিশুদ্ধ ও সরল 'ইউক্লিড'ক[৭] পরিণত হইয়াছিল।"

"ইউক্লিডের বিখ্যাত পুস্তকটি যদিও জ্যামিতিবিদ্যার 'উপাদান' সম্পর্কিত যুক্তিপূর্ণ সুসংবদ্ধ আলোচনা,কিন্তু এই বিষয় সম্পর্কিত নয় — এ কথা জোরের সঙ্গেই বলা চলে, কারণ ঐ যুগে জ্ঞাত জ্যামিতি বিষয়ক সাধারণ তথ্যাবলীর বিশেষ আলোচনা ঐ পুস্তকে নাই। এখন যে ব্যাপকতর ক্ষেত্রের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে সেই ক্ষেত্রের আলোচনা তো নাই-ই। ইউক্লিডের পুস্তকে যাহা আছে তাহা হইল ঐ সব তথ্যের মধ্যে যেগুলি সরলতম তাহাদের যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণ। সুতরাং যে সময়ে বিদ্যালয়ে 'জ্যামিতি' বলিতে 'ইউক্লিড'কে বুঝাইত সে সময় ইহা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না যে পরীক্ষাগ্রহণকারী সংস্থাগুলি তর্কশাস্ত্রকে — ইউক্লিডের বিকল্প বিষয় হিসাবে অনুমোদন করিত। কেন না ইউক্লিডের সারবস্তু হইল পূর্ব হইতে সুপরিজ্ঞাত তথ্যের যৌক্তিক বিচার ও বিশ্লেষণ — ঐসব তথ্যকে প্রথম জানিবার স্বাভাবিক পদ্ধতি নহে।"

"আজ পর্য্যন্ত উন্নত জ্যামিতিক বিদ্যার এমন সব ক্ষেত্র আছে যেখানে যৌক্তিক দিকটাই প্রধান, শুধু তাহাই বা কেন — আত্যন্তিক। চার বা ততোধিক মাত্রার জ্যামিতি বিদ্যাসমূহে 'স্বজ্ঞা'র সাহায্য অপ্রাপ্য। তাই আত্যন্তিকভাবে না হইলেও এই সব বিদ্যা প্রধানতঃ যুক্তি-নির্ভর। 'Axiomatik'এ বা 'স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণে' 'স্বজ্ঞা'কে স্বেচ্ছায় বর্জন করাই নিরাপদ, তাহা না হইলে এই ভীতি সর্বদাই বর্তমান যে যদি অগোচরে কোন অচেনা প্রকল্প জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করে।"

"তবে বিদ্যালয় পাঠ্য সরল পুস্তকাদিতে আমাদের সমস্যা ভিন্ন প্রকারের। সেই সমস্যা হইলঃ ১। জ্যামিতি বিষয়ক তথ্যের প্রাথমিক স্বীকৃতি; ২। জ্যামিতিক প্রত্যক্ষ শক্তির বিকাশ। এই শক্তি যে পর্যন্ত কিছুটা না আয়ত্ত হইতেছে, সে পর্যন্ত তথ্য লইয়া যুক্তি করিবার প্রচেষ্টা প্রায়শঃই বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজেই এই আপাতবিরোধী (Paradox) পরিস্থিতির কথা উঠে যে, অনেকক্ষেত্রেই তথ্য যতক্ষণ না স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুক্তি বিন্যাসের কোন সার্থকতাই দেখা যায় না।"

"আমাদের এ উপলব্ধি অবশ্যই বাধাপ্রাপ্ত হয় যখন আমরা দেখি যে বিদ্যালয় পরিবেশে ছাত্ররা প্রায়ই বলে "এ'তো স্বতঃসিদ্ধ।" অজ্ঞতা আবৃত করিবার জন্যই একথা বলা হয়। শিক্ষকেরাও বলিতেন — "ইউক্লিড সম্বন্ধীয় পরীক্ষাপত্রে যখনই আমি 'স্বতঃসিদ্ধ' শব্দটি পাই, তখনই আমি ভাবি যে কোথাও কোন গলদ রহিয়াছে। তথাপি জ্যামিতিবিদ্যার বহু প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধেই এ কথা সত্য যে, যত দিন পর্যন্ত এইসব প্রতিজ্ঞা শুধুমাত্র প্রমাণসিদ্ধ না হইয়া, ছাত্রের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হইয়া না উঠিতেছে, বুঝিতে হইবে ততদিন তাহার জ্যামিতি প্রত্যক্ষে কোথাও বিশেষ কোন ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।"

অধিবৃত্ত বা প্যারাবোলা প্রভৃতি জ্যামিতিক বক্ররেখার সুষ্ঠু অনুসন্ধান করিতে হইলে পূর্বে গ্রাফ-কাগজে নক্সাকৃত সংখ্যাসূচক তথ্যের ভিত্তিতে চিত্রটিকে আঁকিতে হইবে। গ্রাফ-কাগজের জ্যামিতি (Squared-paper Geometry) Rene Descartes (১৫৯৬-১৬৫০)-এর কার্যের ফলে সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার কার্যের ফলে অনেক জটিল বক্ররেখা বুঝা গিয়াছিল। উহার দ্বারা 'এয়ারফইল'[৮] (যাহাকে নির্দিষ্ট অবস্থার উপযুক্ত হইতে হয়) প্রভৃতি আকারের নক্সাও সম্ভব হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও তাঁহার কাজ বীজগণিতিক [বীজগাণিতিক] 'function'-এর বৈশিষ্ট্য বুঝিতে অনেক সাহায্য করিয়াছিল।'Cartesian Co-ordinates', 'Cartesian Geometry' বা 'Co-ordinate Geometry'-র ব্যবহার এই পুস্তকের পরিসরের বাহিরে কিন্তু Descartes ও তাঁহার পথপ্রদর্শক কাজের উল্লেখ না করিয়া জ্যামিতির কোন পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

অনুশীলনী

১। একটি গাছ, একটি বাড়ী ও একটি ব্যাগ নির্বাচন কর এবং তাহাদের আকৃতি যথাসাধ্য ভালভাবে বর্ণনা কর।

(ক) তোমার বর্ণনার মধ্যে সংখ্যা না আনিয়া —

(খ) যখন তোমার ইচ্ছামত তুমি বর্ণনার মধ্যে সংখ্যাসূচক আনিতে পার। (সংখ্যাসূচক তথ্য বলিতে ''যতখানি চওড়া তাহার দ্বিগুণ উঁচু'' প্রভৃতি এবং ''১৫ ফিট'' বা ''৪৫০'' প্রভৃতি বুঝায়।)

জিনিষটির আকৃতির উপর তুমি তোমার বর্ণনা সীমাবদ্ধ করিবে। সম্ভব হইলে তোমার বর্ণনানুসারে কাহাকেও সেইরকম গাছ, বাড়ী বা ব্যাগ নির্বাচন করিতে বল। তোমার বর্ণনার সত্যগুলি লক্ষ্য কর।

২। একটি ত্রিভুজ কাটিয়া লও। ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহুগুলি একটির উপর আর একটি ফেলিয়া ভাঁজ করিয়া কোণগুলিকে সমদ্বিখণ্ডিত কর। দ্বিখণ্ডকগুলি একটি বিন্দুতে ছেদ করে কি না দেখ। ঐ বিন্দুটিকে 'ক' বল এবং কম্পাসের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যাসার্দ্ধ লইয়া ঐ বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৃত্ত আঁক যাহা ত্রিভুজটির মধ্যে অবস্থান করিতেছে ও বাহুগুলিকে স্পর্শ করিতেছে।

৩। এক সারি উলের বুননের আকৃতিটি মোটামুটি আঁক। তাহার পর পরবর্ত্তী সারিটি আঁক ও তাহারা কেমন করিয়া সংগ্রথিত হইতেছে দেখাইয়া দাও। তোমার ছবিতে উলের 'সোজা' বুনন এবং 'সোজা-উল্টা' বুননের সংগ্রথনের পার্থক্য দেখাইয়া দাও।

৪। তুমি তোমার ডান হাতটি নাড়াইলে আয়নার প্রতিচ্ছবির বাম হাতটি নড়ে; তোমার ডান কানটি লাল হইলে উহার বাম কানটি লাল দেখায়। আমরা বলি, যে আয়নার প্রতিচ্ছবি 'পার্শ্বিকভাবে বিপর্য্যস্ত' (Laterally reversed)। ইহা কেন ঐরকম তাহা বুঝাইয়া দাও এবং কেন বামদিকটি ডানদিক ও ডানদিকটি বামদিক হয় কিন্তু কেন 'উপর' 'নীচ' হয় না ও উর্দ্ধতন দিকে কেন বিপরীত ভাব হয় না তাহা বুঝাইয়া দাও।

৫। একটি রাস্তার ১৯৩৪ সালে তোলা ছবি ও ১৯৫৯ সালে তোলা ছবির দিকে তাকাইলে মোটর গাড়ীর চেহারার তফাৎ দেখিয়া তুমি বলিতে পারিবে কোনটি কোন সময়ের? ছবিগুলি খুঁটিনাটির পক্ষে অতিরিক্ত ছোট ধরিয়া লইয়া দুইটি মোটরে সাধারণ আকৃতির পার্থক্য বর্ণনা কর।

পুনরায় খুঁটিনাটি উপেক্ষা করিয়া তুমি কি ঐভাবে পুরুষের বা স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদের পার্থক্য বর্ণনা করিতে পারিবে?

৬। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কোন পুস্তক, পত্রিকা বা খাদ্যের টিনের লেবেল সংগ্রহ কর। নামপত্রে ও মূল অংশে উহাদের ছাপা লক্ষ্য কর। সৌন্দর্য্যের কথা বাদ দিয়া আকৃতির দিক হইতে তাহাদের পার্থক্য দেখাও। প্রায় ১৯১০ সালে গৃহীত কোন রেল স্টেশনের ছবি বা পুরাতন বাসের গন্তব্যস্থলের নামাঙ্কিত পাটাতন পাইলে স্টেশনের বা গন্তব্যস্থলের নামের ছাপার সহিত আজিকার দিনের ছাপার তুলনা কর এবং তোমার ভাবনা জ্যামিতিক দিক হইতে সীমাবদ্ধ কর।

৭। কোন দুষ্ট বালক A, B, C নামক তিনটি সমান লম্বা সাপের লেজে কিছু সুগন্ধ দ্রব্য মাখাইয়া দিয়াছিল। ঐ সুগন্ধিটি সাপেরা পছন্দ করে। সুতরাং A সাপ B সাপের লেজ গিলিতে আরম্ভ করিল এবং একই সঙ্গে B সাপ C সাপের লেজ ও C সাপ A সাপের লেজ গিলিতে আরম্ভ করিল। এই জাতির সাপের কোন দ্রব্য চিবাইবার বদলে গিলিবার অভ্যাস আছে। এই গিলিবার প্রক্রিয়াটি কখন থামিবে? শেষ অবস্থাটির দুইটি ছবি আঁক, একটি উপর হইতে দেখিলে যেমন দেখায় ও অপরটি সাপেদের।

The Language of Mathematics by Frank Land হইতে। অনুবাদক — সৌম্য চক্রবর্ত্তী

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. বস্তুসমূহ
২. পরিভাষা লেখকের নিজস্ব — সর্বজনস্বীকৃত নয়।
৩. 'উপপত্তি'-এর অর্থ অভিধান অনুযায়ী, যুক্তি বা প্রমাণ বা সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা বা সমাধান — যে কোনো কিছু হতে পারে।
৪. প্রমাণিত
৫. সৃজন বা সৃষ্টি
৬. আত্ম উপলব্ধ জ্ঞান
৭. সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদে শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। অনুমান হয় লেখক ইউক্লিডীয় জ্যামিতির কথা বোঝাতে চেয়েছেন।
৮. কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই।

লেখাটির বিভিন্ন জায়গায় একই শব্দের বিভিন্ন বানান ব্যবহৃত হয়েছে।

বীজগণিতের ইতিকথা

বীজগণিতের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই এই কথাটির অর্থ জানা দরকার। বীজগণিত বলিলে যদি আমরা এমন কোন বিজ্ঞানকে বুঝি যাহা আমাদের $ax^2+bx+c=0$ এই সমীকরণের সমাধান করিতে সাহায্য করে তাহা হইলে বীজগণিতের জন্ম সপ্তদশ শতাব্দীতে। কিন্তু এই সকল বিশেষ বিশেষ চিহ্নের বাধা কাটাইয়া যদি আমরা আরও সহজতর চিহ্নের কথা লইয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে আমাদের ইতিহাসের সুরু তৃতীয় শতাব্দী হইতে। আবার বীজগণিতের সাহায্য ছাড়া কেবল জ্যামিতিক নিয়মাবলীর সাহায্যেই উপরোক্ত সমীকরণটি সমাধিত হইয়াছিল আলেকজান্দ্রিয় চিন্তাধারার যুগে — অথবা কিছু পূর্বে। কিন্তু বীজগণিতের নানান সমস্যা কেবল বীজগণিতের সাহায্যেই সমাধিত হইতেছে খৃষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছু পূর্ব হইতে।

* * * * সেই সকল মহাত্মাদিগের স্মরণ করিয়া আমরা বীজগণিতের জগতে প্রবেশ করিব যাঁহারা এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং যাঁহারা সেই সকল প্রশ্নের সূচনা করিয়াছেন, যেগুলি পরে সমীকরণের সাহায্যে সমাধিত হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রাথমিক আলোচনায় বলা দরকার যে নেস্‌লম্যান (১৮৪২) বীজগণিতের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছিলেন — যেমন আলংকারিক, যে সময়ে শব্দগুলি পূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছিল; syncopated অর্থাৎ যে সময় সংক্ষেপণগুলি ব্যবহার করা হইত; এবং প্রতীকরূপ, যখন সংক্ষেপনগুলিই [সংক্ষেপণগুলিই] প্রতীকের আকার ধারণ করিয়াছিল, যেমন $\sqrt{x} - x^2 = 3\frac{2}{3}$ । এই কাল পর্যায়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই; ''ডায়োফ্যান্টাস্'' এই তিনেরই বিভিন্ন অঙ্গিকের [আঙ্গিকের] সাহায্য লইয়াছিলেন। এই সকল বিভাগের সুবিধাও অনেক আছে, যেমন ছাত্রেরা প্রায়ই এই শব্দগুলির উপযোগিতা অনুভব করিতে পারে।

একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে গ্রীসদেশের বাহিরের পুরাতন লেখকদের অঙ্কবিষয়ক রচনায় বহু অন্যতর বিষয় বিধৃত। এম্‌স (Ahmes - 1550 B.C)[১] যেমন তাঁহার বীজগণিতের মধ্যে জ্যামিতি এবং পরিমিতির স্থান দিয়াছিলেন, এমন কি ত্রিকোনমিতির [ত্রিকোণমিতির] কিছু কিছু প্রাথমিক অংশও তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। ডায়োফ্যান্টাস্-এর পূর্বে রচনার এই ধারার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বীজগণিতের প্রথম প্রবর্ত্তকের নাম এমস্। এবং এমস কৃত সরল সমীকরণ ও রাশিমালা বিষয়ক তাঁহার কিছু কিছু সমস্যা ছিল যেগুলি তাঁহার রচনাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছিল। আলংকারিকভাবে তিনি বিষয়টির উপস্থাপনা করিয়াছিলেন, যদিও কিছু সংখ্যক প্রতীকের ব্যবহার তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। এমস একজন মীশরীয়।

মিশরীয় লিপির মধ্যে যে সকল সূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণের উল্লেখই প্রধান। এই সকল সূত্রের মধ্যে প্রতীকের ব্যবহার খুবই কম এবং বীজগণিত যে তখন বিজ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার প্রমাণও খুব বেশী পাওয়া যায় না।

বীজগণিতের প্রবর্ত্তক হিসাবে চারজন হিন্দুরই নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা হইতেছেন, আর্যভট্ট — যাঁহার 'আর্যভট্টম' গ্রন্থে রাশিমালা বিন্যাস, সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণ সংক্রান্ত নানান সমস্যাবলী উল্লিখিত আছে; ব্রহ্মগুপ্ত যাঁহার 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' গ্রন্থে দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের নিয়মাবলী উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থে আর্যভট্ট কর্তৃক যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছিল সে সকল বিষয়েরও উল্লেখ আছে; মহাবীর, যাঁহার 'গণিত সার সংগ্রহে', রাশিমালা সমীকরণ ও মূলদ রাশি সংক্রান্ত নানান বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবং সর্বশেষে ভাস্কর, যাঁহার বীজগণিত গ্রন্থে, নয় পরিচ্ছেদে দ্বি-শক্তি সমীকরণ সংক্রান্ত নানান বিষয়ের আলোচনা আছে।

চীন দেশে কবে বীজগণিত বিজ্ঞান হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল বলা কষ্টকর। বর্তমানে যে সকল সমস্যা আমরা সমীকরণের সাহায্যে সমাধান করিতেছি তাহা খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দেও 'নাইন সেকসানস' গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছিল।

চীনদেশীয় অঙ্কবিদ্ লিউ হুইয়ের আলোচনামূলক গ্রন্থে problems of pursuit ক্রমসত্যানুসারিতা সমস্যা Rule of false position — ভ্রমাত্মক উপস্থাপন বিধি ও determinant notation (বর্গাকারে সজ্জিত রাশিমালা) ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সমস্যার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার এই সমস্ত রচনা এক বিশিষ্ট আলংকারিক বীজগণিতের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সান্-ৎসির (খৃষ্টীয় প্রথম শতক, যদিও এ বিষয়ে প্রচুর মতভেদ আছে) রচনার মধ্যে এমন অনেক সমস্যার সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলিকে বর্তমানে বীজগণিতিক [বীজগাণিতিক] বলা যায়। নীচে একটি সমীকরণের উদাহরণ দেওয়া হইলঃ

''কোন্ সংখ্যাগুলিকে তিন দ্বারা ভাগ করিলে দুই, পাঁচ দ্বারা ভাগ করিলে তিন এবং সাত দ্বারা ভাগ করিলে দুই অবশিষ্ট থাকে?''

সান্-ৎসি এই ধরনের অঙ্ক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নির্ণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি একটি মাত্র উত্তর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন যদিও একাধিক উত্তর প্রায়শঃই সম্ভব।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতেই চীনবাসীরা জানিতে পারিয়াছিল দ্বিঘাত সমীকরনের [সমীকরণের] সমাধানের নিয়ম এবং এই সকল নিয়মাবলী কিউ-চাঙ্-শুয়ান-শুর নাইন সেকসন সময়ই বাহির হইয়াছিল। লুই হুই যে সকল নিয়মাবলী বাহির করিয়াছিলেন সেগুলি বর্তমানে বীজগণিতের সূত্র হিসাবে পরিগণিত হইতেছে। ওয়াং-সিয়াও-টুং রচিত 'চি-কু-সুয়ান-কিং' গ্রন্থে যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে সপ্তম শতাব্দীতে ত্রিঘাত সমীকরণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। চৈনিক বীজগণিতের চরম বিকাশ দেখিতে পাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এই সময়কার সংখ্যাসূচক সমীকরণ চীন কিউ সাও, লিয়েই এবং চু-শী-কিয়ের ন্যায় পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে জেসুইটসদের আগমনের সংগে সংগে এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিকাশের সংগে সংগে চীন তাহার স্বদেশী বীজগণিতের প্রতি উৎসাহ হারাইয়া ফেলে এবং ক্রমে বীজগণিতের বিকাশের চেষ্টায় ঔদাসীন্য প্রকাশ পায়।

গ্রীক গণিত শাস্ত্রের স্বর্ণযুগে বর্তমান অর্থসম্মত বীজগণিতের প্রচলন খুব কমই দেখা গিয়াছিল। এই সময় তাহারা বীজগণিতের নানান দুরূহ সমস্যা কেবল জ্যামিতিক নিয়মের সাহায্যে সমাধান করিয়াছিল। হিপোক্র্যাটস[২] (খৃঃ পূঃ ৪৬০) কেবল অঙ্কনের সাহায্যে $x^2 + \sqrt{\frac{3}{2}}\, ax = a^2$, সমীকরণটি সমাধান করিয়াছিলেন, ইউক্লিড (খৃঃ পূঃ ৩০০) তাঁহার — Data — সূত্রাবলীর দ্বারা নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি সমাধান করিয়াছিলেন।

১। $xy = k^2,\ x - y = a$ prob 84

২। $xy = k^2,\ x + y = a$ prob 85

৩। $xy = k^2,\ x^2 - y^2 = a^2$ prob 86

তাঁহার এলিমেন্টস্ (II, 5pt) এ, ইউক্লিড $x^2 + ax = a$ এই সমীকরণটি সমাধান করিয়াছিলেন এবং $x^2 + ax = b^2$ এই সমীকরণটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন পদ্ধতি অবলম্বনে (ঋণাত্মক মূল বাদ দিয়া) সমাধান করিয়াছিলেন। ইউক্লিড এর পর সমগ্র গণিতশাস্ত্র জ্যামিতিক যুগ হইতে বিশ্লেষণ যুগে পদার্পণ করিল। হেরন, যিনি $144x(14 - x) = 6720$ এই সমীকরণটি সমাধান করিয়াছিলেন। তিনি $\frac{11}{14}x^2 + \frac{29}{7}x = 212$, সমীকরণটির বর্গ নির্ণয় করিবার জন্য বিশ্লেষণের সাহায্য লইয়াছিলেন। ডায়োফ্যান্টাস্-এর আবির্ভাবের সংগে সংগে বীজগাণিতিক প্রতীক প্রবর্ত্তিত হইল এবং সম্পূর্ণরূপে বীজগণিতগত সমস্যা পরম্পরাকে বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা বিন্যাস করা হয়। তাঁহার অসংখ্য অস্থিরীকৃত সমীকরণ এখনও ডায়োফ্যান্টাইন সমীকরণ নামে খ্যাত। বীজগণিত শাস্ত্রে তিনিই প্রথম মন প্রাণ নিয়োগ করেন এবং এই কারণেই তাঁহাকে 'বিজ্ঞানের জনক' আখ্যা দেওয়া হয়।

আরব এবং পারসিকদিগের মধ্যে বিখ্যাত বীজগণিত শাস্ত্রবিদেরা হইতেছেন মহম্মদ-ইবণ-মুসা, আল-খোয়ারিজমি, তাঁহার আলজাবর ওয়ল মুকাবালা গ্রন্থ হইতে শাস্ত্রের নামকরণ হইয়াছে এবং এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম সংখ্যা-তত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র একটি আলোচনা সুসম্বদ্ধভাবে করিয়াছেন, আলমাহানি ত্রিঘাত বিষয়ে যাঁহার নাম উল্লিখিত হইবে এবং আবুকামিল, যিনি আল-খোয়ারিজমির নিকট হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার নিকট হইতে ফিবনোচ্চি (১২০২) পরে অনেক কিছু গ্রহণ করেন; আল-কারখি যিনি তাঁহার ফাক্‌রি গ্রন্থে বীজগণিতের নানা প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন, (যাহা এখনও বীজগণিতে সঙ্কলিত হয়) এবং সর্বশেষ ওমর খৈয়ম, যাঁহার বীজগণিত গ্রন্থ সকল পারসিক রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে।

মধ্য-যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অধিকাংশই পারসিক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ইহাদের মধ্যে জোআনেস্ হিসপালেন্সিস্ যিনি সম্ভবতঃ আল্-খোয়ারিজ্মির বীজগণিত অনুবাদ করেন; ক্রিমোনার যেরার্দ্যোও (১১৫০ খৃঃ) একই গ্রন্থের অনুবাদ করেন, বাথের এ্যাডেলার্ড (১১২০ খৃঃ) যিনি আল্ খোয়ারিজমির গ্রহ-বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির অনুবাদ করেন, এবং তাঁহার নাম একদা বিশ্বসমক্ষে তুলিয়া ধরেন; চেষ্টারের রবার্ট যাঁহার আল্-খোয়ারিজমির বীজগণিতের ইংরাজি অনুবাদ এখনও পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের বীজগণিতের শ্রেষ্ঠ রচয়িতার নাম ফিবনাচ্চি যিনি এই বিষয়ে দুইটি গ্রন্থ, Liber Quadratorum (১২২৫) ও Flos রচনা করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে তিনি $x^2 + y^2 = z^2$ এবং এই জাতীয় সমীকরণের উল্লেখ করেন। এবং উহা সমাধানে তাঁহার বিরাট উদ্ভাবনীশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

জার্মান বীজগণিত শাস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে জরডনস নেমরারিয়স-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'ডি নিউমেরিস্ ডাটিস' গ্রন্থে তিনি

সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণের নানান সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন এবং যাহা এখনও পাঠ্য পুস্তকে দেখা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় মধ্যযুগীয় লেখকগণ সাধারণ গণিত অপেক্ষা জ্যোতিষবিজ্ঞান বিষয়ক গণিতে বেশী উৎসাহী ছিলেন।

History of Mathematics by D.E. Smith
হইতে — কুমার মৈত্র কর্তৃক অনূদিত।

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. বিকল্প এবং অধিক ব্যবহৃত উচ্চারণ আম্‌স।
২. বিকল্প এবং অধিক প্রচলিত উচ্চারণ হিপক্রিটাস।

'আল্-খোয়ারিজ্‌মি'-এর হস্ চিহ্নযুক্ত এবং হস্ চিহ্ন ছাড়া দু-রকম বানান ব্যবহৃত হয়েছে। 'ফিবনোচ্চি'-এর দু-রকম বানান ব্যবহৃত হয়েছে। অবিকৃত রাখা হল। এ ছাড়া আরো বহু ক্ষেত্রে একই শব্দের বিভিন্ন বানান ব্যবহৃত হয়েছে যা অবিকৃত রাখা হল।

ত্রিমাত্রিক আয়তন

[এই আলোচনাটি ক্লিফোর্ড রচিত "The commonsense of exact sciences" গ্রন্থটি হইতে অনূদিত। মূল রচনাটি বয়সনির্বিশেষে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে। সামান্যতম খুঁটিনাটি গুলিকে উপেক্ষা না করিয়াও কঠিন বিষয়বস্তুর মাঝে, যে কতিপয় মনীষী স্বচ্ছতা আনয়নে সক্ষম, উইলিয়াম ক্লিফোর্ড তাহাদের অন্যতম। বার্টাণ্ড [বার্ট্রাণ্ড] রাসেলকে পনেরো বৎসর বয়সে রচনাটি আকৃষ্ট করে এবং সাতান্ন বৎসর পরেও কৈশোরের সেই উদ্দীপনাকে তাঁহার অপচয় বলিয়া বোধ হয় নাই। মূল রচনায় রাসেল লিখিত পূর্বাভাষে রাসেল এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষান্তরে রচনাশৈলীর সার্থক প্রতিফলন যদিও সম্ভব নয়, তবুও সাধ্যানুযায়ী ক্লিফোর্ডের অননুকরণীয় স্বচ্ছতার সঙ্গে পাঠকবর্গকে পরিচিত করার প্রচেষ্টাতেই এই অনুবাদের অবতারণা।]

সীমারেখা কোন স্থান অধিকার করে না

জ্যামিতি একটি ভৌত বিজ্ঞান (physical science) বিশেষ। বস্তুর পরিমাপ, আকৃতিবিচার বা দুই বস্তুর দূরত্ব নির্ণয়ই ইহার বিষয়। সংখ্যার ক্ষেত্রে যেমন কয়েকটি সহজ ও সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণের বারংবার ব্যবহার আমাদের আরও অনেক কিছুর সন্ধান দেয়, এক্ষেত্রেও তেমনি কয়েকটি অতি সহজ ও সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণের বারংবার ব্যবহার দ্বারা আরও কিছু জ্ঞানসঞ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য।

প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণগুলি হইল ঃ

প্রথমতঃ, আকার ও আয়তন পরিবর্তন না করিয়াই যে কোন বস্তুকেই স্থানান্তরিত করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন বস্তুর একই আকৃতি কিন্তু বিভিন্ন আয়তন হইতে পারে।

এই পর্যবেক্ষণগুলির সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্বে, এগুলির অর্থ আরও সঠিক ভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

বস্তু স্থান অধিকার করে। যেমন, কক্ষমধ্যস্থিত একটি টেবিল কক্ষের কিছু অংশ অধিকার করে এবং বাকী অংশ অধিকার করে না। এইভাবে বস্তুদ্বারা স্থান খণ্ডিত হয়।

এই দুই অংশের মাঝে যাহা বিদ্যমান, তাহাকেই টেবিলের তল বলা যায়।

মনে করা যাক, টেবিলের পার্শ্বস্থ সকল স্থান বায়ু পরিপূর্ণ। সেক্ষেত্রে টেবিলের তল বায়ু ও কাষ্ঠের মধ্যে অবস্থান করিয়া এই দুই বস্তুকে পরস্পর হইতে পৃথক করে, অথচ ইহা এই দুই বস্তুর কোনটিই নহে।

টেবিলের তলকে টেবিলের উপরিস্থিত কাষ্ঠের একটি অতি সূক্ষ্ম স্তর মনে করিলে ভুল হইবে। ইহার অসত্যতা অনায়াসে প্রমাণ

করা যায়; কেননা, যে যুক্তি বলে আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, সেই যুক্তি দ্বারাই টেবিলের তলকে টেবিল সন্নিহিত একটি অতি সূক্ষ্ম বায়ুস্তরও বলা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, টেবিলের তল, কাষ্ঠ ও বায়ু উভয়েই বিদ্যমান এবং ইহা কোনরূপ স্থান অধিকার করে না।

আবার টেবিলের উপরিভাগের অংশবিশেষ বিভিন্ন বর্ণের হইতে পারে। সেক্ষেত্রে, টেবিলের তল বিভিন্ন বর্ণের হইবে।

এই কাগজের তলের উপর গোলাকার কালো একটি চিহ্ন রহিয়াছে। কালো অংশটিকে বৃত্ত বলা হয়। ইহা দ্বারা কাগজের তলটি দুইটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইতেছে। এক অংশে কালো চিহ্নটি বিদ্যমান, অপরাংশে বিদ্যমান নহে।

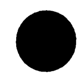

এই বৃত্তটি তলের কিছু অংশ অধিকার করিয়া আছে, যদিচ তলের নিজের ত্রিমাত্রিক কোন আয়তন নাই। অতএব আয়তনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ত্রিমাত্রিক আয়তনঃ ইহাতে কঠিন বস্তুমাত্রই অবস্থিত এবং ইহার মধ্যে কঠিন বস্তু স্থান পরিবর্তন করে।

দ্বিমাত্রিক আয়তনঃ দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার বিচার সম্ভব।

প্রথমতঃ, ইহা দুইটি সন্নিহিত ত্রিমাত্রিক আয়তনের সীমারেখা এবং ইহার নিজস্ব কোন ত্রিমাত্রিক আয়তন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা নিজেই একপ্রকার আয়তন বিশেষ এবং যে কোন তলের অংশই এই আয়তন অধিকার করে।

এই অংশগুলিরও আবার আয়তন বর্তমান। বৃত্তের কালো অংশ এবং কাগজের সাদা অংশের মাঝে একটি রেখা বর্তমান। ইহাকে বৃত্তের পরিধি বলে। পরিধি নিজে কালো বা সাদা কোনটিরই অংশ বিশেষ নহে; কিন্তু ইহা উভয়ের মাঝে অবস্থিত। ইহা ঐ অংশ দুইটিকে বিভক্ত করে, কিন্তু ইহার নিজের কোন দ্বিমাত্রিক আয়তন নাই। তল যেমন কোন ঘনবস্তুর অতিসূক্ষ্ম স্তর নহে, তেমনি রেখাও তলের অতিসূক্ষ্ম অংশবিশেষ নহে।

কোন যুক্তিবলে যদি বলা হয় যে কালো বৃত্তটির সীমারেখা ঐ কালো অংশেরই অতিসূক্ষ্ম অংশ লইয়া গঠিত, তাহা হইলে ঐ একই যুক্তি প্রয়োগ করিয়াই বলা যায় যে বৃত্তটির সাদা অংশটির অতিসূক্ষ্ম অংশ দ্বারা সীমিত।

আমরা রেখাকেও দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। এই কালো বৃত্তটি সমেত এই পৃষ্ঠাটি [পৃষ্ঠটি] জলে এমনভাবে নিমজ্জিত করা হইল যেন কালো বৃত্তটির অংশবিশেষ জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। এক্ষেত্রে বৃত্তের সীমারেখাটির কিয়দংশ জলের ভিতর এবং কিয়দংশ জলের বাহিরে থাকে।

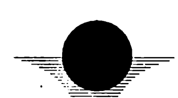

রেখাটির নিমজ্জিত অংশ কিছু স্থান অধিকার করে অর্থাৎ পরিধির চতুপার্শ্বস্থ [চতুঃপার্শ্বস্থ] স্থানের কিছু অংশ ইহা দ্বারা অধিকৃত হয়। কাজেই ত্রিমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক ব্যতীত একমাত্রিক আয়তনেরও বিচার করিতে হইবে। রেখা দ্বারা তলের কিছুমাত্র স্থানও অধিকৃত হয় না; ইহা দুই পরস্পর সন্নিহিত তলের সীমারেখা মাত্র। ইহা দ্বারা ত্রিমাত্রিক আয়তন অধিকার করার সম্ভাবনা আরও কম। কিন্তু তবুও ইহার নিজস্ব আয়তন আছে। এই আয়তন খণ্ডিত করা যায় এবং খণ্ড খণ্ড রেখাগুলি দ্বারাই ঐ আয়তন অধিকৃত হইয়া থাকে।

এই খণ্ডগুলিও আবার সীমিত। পরিধির নিমজ্জিত অংশের দুই প্রান্তে দুইটি বিন্দু পরিধির নিমজ্জিত অংশ ও বাকী অংশের মাঝে সীমারূপে বর্তমান। এই বিন্দুগুলি জলের ভিতরে অবস্থিত নহে, আবার ইহারা জলের বাহিরেও অবস্থান করে না। ইহারা কালো বৃত্তটির পরিধিতে বা কাগজের সমতলে যেমন অবস্থিত তেমনই ইহারা জলের সমতলে বিদ্যমান। রেখা-মধ্যস্থ স্থানের বিন্দুমাত্রও ইহারা অধিকার করে না।

রেখা যেমন তলের সূক্ষ্ম অংশবিশেষ নহে, তেমনি বিন্দুও রেখার অতিসূক্ষ্ম অংশবিশেষ নহে। বিন্দুদ্বারা পরস্পর সন্নিহিত দুইটি রেখা খণ্ডিত হয় এবং রেখার মধ্যে কোন স্থান ইহা অধিকার করে না।

উল্লেখযোগ্য এই যে এখানে আমরা কোন মতবাদ বা কাল্পনিক ধারনা [ধারণা] সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি না; আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় সাধারণ বস্তুগুলিকে সাধারণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি মাত্র।

প্রতিনিয়তই আমরা বিভিন্ন বস্তুর তল অবলোকন করিতেছি; ইহা দেখা যায় এবং অনুভব করা যায় এবং মাত্র সাধারণ জ্ঞান সম্বল করিয়াই পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বলা যায় যে কোন বস্তুর তল বস্তুটিতে এবং বস্তুর চারি পাশের শূণ্যে [শূন্যে] অর্থাৎ উভয়েতেই বর্তমান।

রেখা দ্বারা যে তল খণ্ডিত করা যায়, তাহাও আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ফল। একটি সূক্ষ্মতম দড়ির কল্পনাই রেখা নহে। একটি রেখা যে দুইটি তলকে বিচ্ছিন্ন করে, তাহাদের উভয়েতেই রেখাটি বর্তমান; কাজেই ইহার কিছুমাত্রও প্রস্থ বা উচ্চতা নাই — আমাদের এই ধারনা [ধারণা] সাধারণ পর্য্যবেক্ষণের প্রত্যক্ষ ফল। বিন্দু সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। পরিধির যে অংশ নিমজ্জিত তাহা অপর অংশ হইতে বিন্দু দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় — ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করি। কোন বস্তুখণ্ডকে ক্রমাগত খণ্ডিত করিয়া আমাদের বিন্দু সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মে না। বিন্দু রেখার পরস্পর সন্নিহিত দুই অংশের সীমা নির্দেশ করে; আবার রেখা পরস্পর সন্নিহিত দুই তলের সীমা নির্দেশ করে; এই তল আবার পরস্পর সন্নিহিত দুই ত্রিমাত্রিক আয়তনের সীমা নির্দেশ করে। বিন্দু দৃষ্টিগ্রাহ্য ও বোধগ্রাহ্য; ইহা আমাদের কল্পনাজাত অসম্ভব কিছু নহে।

কাগজের উপর রেখা বা বিন্দু অংকনের ক্ষেত্রে আমরা জ্যামিতি বিশারদের ভাষা ব্যবহার না করিয়া নক্শা-অংকনকারীর ভাষাই ব্যবহার করি। নক্শা-অংকনকারীর ভাষায় আমরা যাহাকে রেখা বলি, সেই প্রকার রেখার দ্বারাই এখানে একটি ঘনক অংকিত রহিয়াছে। তথাকথিত এই রেখাগুলি বিভিন্ন প্রস্থের কয়েকটি মুদ্রিত কালো লম্বা দাগ। ইহারা কাগজের কিয়দংশ অধিকার করে। এই প্রকার 'রেখা

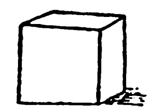

উপযুক্তরূপে সন্নিহিত করিয়া সমগ্র কাগজটি, তাহা যত বড়ই হোক, পূর্ণ করা যায়। এই প্রকার প্রত্যেকটি লম্বা দাগের প্রতি পার্শ্বেই একটি করিয়া রেখা বর্তমান; এই রেখাগুলি কালো অংশটিকে সাদা অংশ হইতে পৃথক করে। ইহারা তলের কোন অংশ অধিকার করে না এবং ইহারাই প্রকৃত জ্যামিতিক রেখা। লম্বা দাগগুলির সীমারেখার মাঝেই লক্ষ লক্ষ এইরূপ রেখা অংকিত করা সম্ভব এবং এইরূপ দুইটি রেখার মাঝে আবার আরও লক্ষ লক্ষ রেখা অংকনের অবকাশ বর্তমান।

তবুও, জ্যামিতিক চিত্রাদি অংকনে এইরূপ কালো দাগগুলিকে রেখার প্রতীকরূপে ব্যবহার করা অত্যন্ত সুবিধাজনক। এক্ষেত্রে, কালো দাগগুলিকে রেখার প্রতীকরূপে গ্রহণজনিত বিভ্রান্তি অবসানের জন্য আমরা প্রথমেই একটি প্রচলিত রীতি অনুসরণ করিব। লম্বা দাগটি উল্লম্ব (vertical) হইলে অর্থাৎ উপর হইতে নিম্নাভিমুখী হইলে, ইহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সীমারেখাটিই আমাদের উদ্দিষ্ট রেখা। অপর সকল ক্ষেত্রে রেখাটি লম্বা দাগটির উর্দ্ধ সীমারেখা বুঝিতে হইবে।

বিন্দুর ক্ষেত্রেও একই রীতি অনুসৃত হইবে। যখনই কাগজের উপরে আমরা বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করিতে চাই, তখনই আমরা অসম (irregular) একটি কালো ফুট্‌কি অংকন করি। একটি রেখা দ্বারা ফুট্‌কিটি সীমিত। সীমারেখার সর্বোচ্চ বিন্দুটির প্রতীকরূপেই আমরা ফুট্‌কিটি ব্যবহার করিব। যখন সীমারেখার উপর কয়েকটি বিন্দু একই উচ্চতায় থাকিবে, তখন ফুট্‌কিটি উহাদের মধ্যে সর্বদক্ষিণে অবস্থিত বিন্দুটিরই প্রতীক হইবে।

জ্যামিতিক চিত্রগুলির এই অর্থ নির্দ্ধারণের কোন বাস্তব মূল্য নাই। পাঠকবর্গ যাহাতে কালো ফুট্‌কিগুলিকে জ্যামিতিক বিন্দু বা লম্বা দাগগুলিকে জ্যামিতিক রেখা বলিয়া ভুল না করেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা করা হইল।

পরিবর্তন ব্যতিরেকেই দৈর্ঘ্য স্থান পরিবর্তন করিতে পারে

প্রথমেই ত্রিমাত্রিক আয়তন সম্বন্ধে আমাদের প্রথম পর্য্যবেক্ষণটির অর্থ বিচার করিব। আকৃতি বা আয়তনের পরিবর্তন না করিয়া যে কোন বস্তুর স্থানান্তর সম্ভব — ইহাই প্রথম পর্য্যবেক্ষণটির বক্তব্য।

প্রথমেই আকৃতি বিচার করা যাইতে পারে। কোন বস্তুর পরিমাপের জন্য আমরা উহার উপরিস্থিত বিভিন্ন কয়েকটি বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একটি টেবিলের মাপ নির্ণয় করিবার জন্যে আমরা টেবিলটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের বা এক কোণ হইতে বিপরীত কোণের বা সর্বোচ্চ বিন্দু হইতে সর্বনিম্ন বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করি। দূরত্ব পরিমাপের জন্য একটি উপযুক্ত মাপকাঠি প্রয়োজন; একটি গজকাঠি বা এক টুকরা ফিতা মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মাপকাঠি সহজে বহনযোগ্য হইবে এবং স্থানান্তরে উহার দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকা আবশ্যক। এখন পরিমাপের জন্য মাপকাঠিটি নির্ণেয় দূরত্বের উপর স্থাপিত করিতে হইবে এবং মাপকাঠিটির কোন্ অংশের সহিত নির্ণেয় দূরত্বটি মিলিত হয় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

মাপকাঠিটির একই অংশের সহিত যদি কোন দুইটি দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব মিলিত হয়, তখন তাহাদের সমদৈর্ঘ্য বা সমদূরত্ব বলা হইবে। অনুরূপভাবে, একটি টেবিলের উপর মাপকাঠিটি স্থাপন করিয়া উহার প্রস্থ মাপকাঠিটির যে অংশের সহিত মিলিত হয়, তাহা চিহ্নিত করা হইল; এখন যদি অপর কোন টেবিলের প্রস্থ ঐ মাপকাঠির চিহ্নিত অংশের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে টেবিল দুইটির প্রস্থ সমান বলা হইবে। মাপকাঠি হিসাবে ফিতার ব্যবহার যদিও সুবিধাজনক, তথাপি ইহা পরিমাপণের জন্য একান্ত আবশ্যক নহে। একটি

টেবিলের উপর অপর টেবিলটি সমপাতিত করিয়া প্রস্থদ্বয়ের সাম্য প্রমাণ করা যাইতে পারে। অথবা সাধারণভাবে বলা যায় যে দুইটি দৈর্ঘ্য বা দূরত্বকে পরস্পর সন্নিহিত করিলে কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকেই যদি একটি অন্যটির সহিত সর্ব্বতোরূপে মিলিত হয়, তবে উহারা সমদৈর্ঘ্য বা সমদূরত্ব হইবে। কিন্তু টেবিল অপেক্ষা ফিতার ব্যবহার সুবিধাজনক, কারণ ফিতাটি সহজে বহন করা যায়। এই জন্য কার্যক্ষেত্রে একই ফিতার আপেক্ষিকে দুইটি প্রস্থের সাম্য নির্দ্ধারিত হয়। সমান দীর্ঘ দুইটি বস্তু, ফিতার একই দৈর্ঘ্যের সমান হয়। কারণ, দুইটি দৈর্ঘ্য অপর একটি দৈর্ঘ্যের সমান হইলে উহারা পরস্পর সমান হইবে — ইহা আমরা স্বীকার করি। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে যদি একটি ফিতা একটি আবৃত বক্ররেখাকে (closed curve) বেষ্টিত করে এবং পরে আবার পূর্বের আকার প্রাপ্ত হয়, তবে উহার দৈর্ঘ্য কোনরূপে পরিবর্তিত হইবে না।

ইহা কিরূপে সম্ভব? মনে করি, পরিমাপণের জন্য ব্যবহারের পূর্বে ফিতাটির একটি প্রান্ত চিহ্নিত করিয়া বোর্ডের উপর আকর্ষিত (stretched) অবস্থায় রক্ষিত হইল। এক্ষেত্রে, চিহ্নিত প্রান্তটি হইতে পরিমাপ করিয়া দুইটি বস্তুর সমদীর্ঘ হওয়ার অর্থ আমরা জানি। এখন, উদাহরণ স্বরূপ তিনটি টেবিল ক, খ, গ লওয়া হইল। মনে করি, পরিমাপের সাহায্যে আমরা জানি যে 'ক' এর প্রস্থ 'খ' এর প্রস্থের সমান এবং 'খ' এর প্রস্থ আবার 'গ'-এর প্রস্থের সমান। ইহার অর্থ হইল এই যে আমরা 'ক' এর প্রস্থের সমান অংশ ফিতাটিতে চিহ্নিত করিয়া দেখিলাম যে চিহ্নিত অংশ 'খ' এর প্রস্থের সমান; ইহার পর ঐ একই দৈর্ঘ্য 'গ'-এর উপর সমপাতিত করিয়া প্রত্যক্ষ করা হইল যে 'গ'-এর প্রস্থও উহার সমান। 'গ'-এর প্রস্থ 'ক'-এর প্রস্থের সমান বলিতে বুঝায় যে 'গ' পরিমাপ করিয়া ফিতাটি 'ক'-এর উপর স্থাপিত করিলে দেখা যাইবে যে, 'খ'-এর উপর ফিতাটি সমপাতিত করা হউক বা না হউক, 'ক' ও 'গ'-এর প্রস্থদ্বয় ফিতাটির সমান সমান অংশের সহিত সমান হইবে। অর্থাৎ যদি একবার 'ক' ও 'গ'-এর প্রস্থদ্বয় সমান হয়, তাহা হইলে 'ক' হইতে 'খ', 'খ' হইতে 'গ' ও আবার 'গ' হইতে 'ক' এ প্রত্যাবর্তন করিলেও 'ক'-এর প্রস্থ আবার 'গ'-এর প্রস্থের সমান অংশের ফিতার সহিত সমান হইবে।

এই বিচার বিবেচনাগুলি হইতে আমরা একটিমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। পাঠকবর্গ বোধহয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে দৈর্ঘ্য বা দূরত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ কালে আমরা যে মাপকাঠির উল্লেখ করিয়াছি স্থান পরিবর্তন করিলেও তাহার দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে। মাপকাঠির এই বিশেষত্ব কি ভাবে পরীক্ষিত হইবে? একটি গজ কাঠির আপেক্ষিকতায় আমরা ফিতার পরিমাপ করিতে পারি। কিন্তু তাহা দ্বারা আমরা দৈর্ঘ্যের ধ্রুবতা প্রমান [প্রমাণ] করিতে পারি না। একটির সমান অংশ অপরটির সমান অংশের সহিত মিলিত হইলে দৈর্ঘ্যদ্বয়ের সাম্য প্রমাণিত হয় মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে বস্তুর স্থানান্তর হইলে উহার দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয় ধরিলেও আমাদের বক্তব্য অবিকৃত থাকে, যদি —

(১) বিভিন্ন বস্তুর পরিবর্তন একই হয় এবং (২) যে কোন বস্তুর স্থানান্তর ঘটাইয়া তাহা আবার তাহার পূর্ব অবস্থানে আনিলে উহা পূর্বের আয়তনই গ্রহণ করে। আসলে প্রয়োজনীয় সর্ত হইল যে বিপরীত কোন কারণ না থাকিলে যে কোন দুইটি বস্তু যদি একবার পরস্পরের সমান হয়, তবে তাহাদের বিভিন্ন পথ দিয়া অপর কোন স্থানে আনিলেও তাহারা পরস্পরের সমান হইবে। যে কোন একটি লাঠি লণ্ডনে ফিতার যে অংশের সমান হইবে, লাঠিটি আটলান্টিক দিয়া এবং ফিতাটি ভারতবর্ষ হইয়া প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া নিউইয়র্ক যাইলেও সেখানে লাঠিটি ফিতাটির সেই একই অংশের সমান হইবে। অবশ্য লাঠিটির দৈর্ঘ্য আর্দ্রতার জন্য প্রসারিত হইতে পারে বা শুষ্কতার জন্য ফিতাটি সঙ্কুচিত হইতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তন জ্যামিতিক নয় এবং ইহা বিচার বহির্ভূত। কেবল জ্যামিতিক সর্তগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে কোন দুইটি বস্তু কোন একস্থানে যদি পরস্পরের সমান হয়, তবে স্থানান্তর সত্ত্বেও তাহারা আবার পরস্পরের সমান হইবে।

আমাদের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে ধারনা [ধারণা] এবং কোন নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের সহিত অপর দুইটি দৈর্ঘ্য সমান হইলে তাহারা পরস্পর সমান হইবে, এই সিদ্ধান্তটি, এই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু মাত্র স্থান পরিবর্তনের ফলেই আমাদের অজ্ঞাতে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কি সম্ভব?

গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বিষয়টি অর্থহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে সময় ব্যয় করা হইয়াছে, তাহাকে একেবারেই অপব্যয় বলা যায় না।

রচনা ঃ উইলিয়াম কিংডন ক্লিফোর্ড
অনুবাদ ঃ অসীম চট্টোপাধ্যায়

কার্দানো ১৫০১-১৫৭৬

মধ্যযুগের কুসংস্কার আর অর্থহীন আচারের বেড়াজাল ভেঙ্গে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, বানিজ্যে [বাণিজ্যে] নতুন প্রাণের স্পন্দন এসে 'রেনেশাঁ' নব জাগরণ উৎসারিত হ'ল ইটালী দেশে, তারপর ছড়িয়ে পড়লো ইউরোপের প্রত্যন্তে। 'আত্মার মুক্তি' প্রার্থী অশিক্ষিত মধ্যযুগের সেই ভূমি-দাসদের পরিবর্তে সমাজ জীবনে এল শক্তিময় তেজময় আশাবাদী মাটির মানুষ। তাই মাটির দিকে, আকাশে নয়, ফিরল মানুষের দৃষ্টি, এখানেই খুঁজল সে অমৃতত্ব। এল জীবন জিজ্ঞাসা — অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার আকুল আগ্রহে অভিযাত্রীরা যাত্রা করলো অনির্দেশে; জীবন বিপন্ন করলো সোনার আর তারুণ্যের উৎস সন্ধানে; রাসায়নিক 'জীবন-রস' এর পাক অন্যধাতুকে সোনা করার চেষ্টা করল আর ধনীরা অজানা ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করল — নিজেদের চিত্রিত খোদিত মূর্তি।

এ যুগেরই মানুষ জিরোলাসো [জিরোলামো] কার্দানো যুগোত্তম। পার্থিব অমৃতত্বের আকাক্ষাই [আকাঙ্ক্ষাই] ছিল তাঁর সমস্ত কাজের উৎস — তাঁর জীবন-বেদ, যশলোভে প্রাচীন গ্রীকরা যেমন দেবী ডায়নার মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছিল তেমনি কার্দানো চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের পাতায় নাম রাখতে; মূল্যায়নে তাঁর স্থান যেখানেই হোক না কেন। জীবদ্দশায় তাঁর একথা বিশ্বাস করার সংগত কারণ ছিল যে তাঁর উচ্চাকাক্ষা [উচ্চাকাঙ্ক্ষা] পূর্ণ হবে কারণ একাধারে তিনি ছিলেন ইউরোপের অন্যতম বিলাসী চিকিৎসক, সুপরিচিত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিষী (ষোড়শ শতকে জ্যোতিষচর্চা সমাজ স্বীকৃত পেশা ছিল) এবং সমকালীন সবচেয়ে বেশী পড়াশোনা করা বৈজ্ঞানিক লেখক। রাজা আর কার্ডিনালদের তিনি চিকিৎসা করেছেন, রাজকুমার আর পোপেদের জন্য অপরিমিত সৌভাগ্য ছুঁড়ে ফেলেছেন, গণিত বিষয়ে মৌলিক রচনা প্রকাশ করেছেন আর মোট চারশ'র বেশি বই লিখেছেন। এর মধ্যে দেড়শ বই ছাপা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান আর গণিতের ইতিহাসে আজ তাঁর নাম পাদটীকায় স্থান পায় আর তাঁর লেখার প্রায় কিছুই পড়া হয় না।

তবুও নবজাগরণের সূচনার গণিতজ্ঞদের, তত্ত্বে নতুনত্ব না এনে গণিত পুনরুদ্ধার করাই যাঁদের মুখ্য অবদান, তিনিই তাঁদের মূর্ত প্রতীক। একমাত্র একারণেই কার্দানো সকলের মনোযোগ আকর্ষণ যোগ্য।

আর্কিমিডিসের পর থেকে ইউরোপে গণিতের বিস্তৃতি উল্লেখযোগ্য নয়। এর শেষ বিকাশ দেখা গিয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার দিগন্তে, যখন পৃথিবীর ব্যাস আর চন্দ্র-পৃথিবীর দূরত্ব গণিতজ্ঞরা গণনা করেছিলেন। পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীর বাস্তববাদী রোমান সাম্রাজ্যে সেই পাণ্ডিত্য শ্বাসরুদ্ধ হল — গণিতের আর বিস্তার হ'ল না। পতন হল রোমের — বিরাট কীর্ত্তির বিপুল ধ্বংস! গিবন তাঁর 'ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অফ্ দি রোমান এম্পায়ার'এ বলেছেন পোপ 'ইউজিনিয়াস'-এর রাজত্বকালে দুজন পরিচালক রোমের ক্যাপিটোলাইন পাহাড়ে উঠে দেখেছিল......কাঁটাগাছ আর আগাছার ঝোপে সেই পূত মৃত্তিকা বিকৃত......আঙ্গুরলতায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে 'বিজয় সরণী', আর আবর্জনার স্তূপে লুকিয়েছে সেনেটরদের আসন...... রোমানদের 'ফোরাম' এখন হয় রান্না বাড়ীর বাগানের জন্য ঘেরা নয় তো শুয়োর মোষদের অভ্যর্থনার জন্য। অনন্তকালের জন্য নির্মিত মূর্তিগুলো অস্থির মত নগ্ন ভগ্ন অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে; এই ছিল রোমের অবস্থা, ইউরোপের বাকি অংশের অবস্থা আরও খারাপ। কেবলমাত্র পূর্বদিকে তুরস্কে আর ভারতে জ্ঞানরশ্মি জ্বলছিল। কনস্তানতিনোপল গ্রীক শিক্ষাকে ধরে রেখেছিল বাড়াতে পারেনি। ভারতবর্ষে অবশ্য গণিতের বিকাশ সাধনে তিনটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ চলছিল।

আমাদের বর্তমান সংখ্যা পদ্ধতি প্রস্তুত হল। শূন্যসহ এই দশটি সংখ্যার দ্বারা যে কোন সংখ্যা সহজেই পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করা যায়। এই আবিষ্কারের গুরুত্বের মূল্যায়ন অসম্ভব। এটি ছাড়া গণিত আর অগ্রসর হতে পারত না। ঋণাত্মক সংখ্যা গ্রহণের জন্য সংখ্যা ক্ষেত্রের বিস্তার দ্বিতীয় বিশেষ পদক্ষেপ।

তৃতীয়টি হল বীজগণিত আবিষ্কার। বিভিন্ন প্রক্রিয়া বোঝাবার জন্য সংকেত চিহ্ন আবিষ্কৃত হল। যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি এবং অজানা সংখ্যার পরিবর্তে শূন্য ব্যবহার করে সহজ সরল এবং বর্গ সমীকরণের অজানার রহস্য ভেদ হল।

নবম এবং দশম শতকে ভারতবর্ষের গণিত আরব দেশে বিস্তৃত হল আর এখানেই আরও বিকাশ লাভ করল। পাশ্চাত্য জগতে 'রুবাইয়াৎ' এর লেখক হিসাবে পরিচিত ওমর খৈয়াম্ আরবের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞদের অন্যতম। ভারতবর্ষের গণিত শিক্ষা তিনি কেবল গ্রহণই করলেন না যুক্ত করলেন তাঁর নিজস্ব চিন্তা। বীজগণিত ও জ্যামিতিকে যুক্ত করার জন্য তিনি 'গ্রাফ' এর ব্যবহার চালু করলেন এমনকি বাইনোমিয়েল উপপাদ্য নিয়ে কাজ করে কয়েক শতাব্দীর অন্তরালে ডেকার্তে ও নিউটনের আগমন প্রত্যাশিত করলেন।

ইউরোপ তখনও অন্ধকার যুগে রয়েছে। ক্রুসেডের আগে পর্যন্ত আরবদের জ্ঞান ইউরোপে প্রবেশ করেনি। পিসার বিশিষ্ট জ্ঞানী লিওনার্দো ফিবনোচচি ১২০২ সালে ইটালীতে বীজগণিত ও আরবীয় সংখ্যা চালু করলেন। এই নতুন সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহারের বিরুদ্ধে সর্বত্র বিপুল প্রতিরোধ দেখা দিল, কোথাও কোথাও আরবী সংখ্যা ব্যবহার আইনত নিষিদ্ধ হল। অবশ্য ক্রমে ক্রমে রোমান সংখ্যা আরবী সংখ্যাদের স্থান ছেড়ে দিল, কেবল মাত্র স্তম্ভ ও প্রাসাদ শীর্ষে আজও তারা বিরাজমান।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে রেনেশাঁর উজ্জ্বল রঙীন জীবন্ত প্রজাপতি তার অন্ধকার নিষ্প্রাণ গুটি থেকে হাজার বছরের ঘুম ভেঙ্গে আস্তে আস্তে বাইরে এল। আরবী শিক্ষা দৃঢ়মূল হল; নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো শুরু হল সেই শিক্ষা। ১৪৫৩ সালে তুর্কীরা কনস্‌তান্‌তিনোপল্‌ দখল করল। দারিদ্র্য ও তুর্কী-বিতাড়িত গ্রীক গণিতজ্ঞরা সেখান থেকে ইউরোপে আশ্রয় নিলেন। বাণিজ্যের প্রসারের সংগে সংগে এবং হিসাব ও খাতাপত্র ঠিক রাখার তাগিদে 'সংখ্যা'র প্রতি অনুরাগ বাড়ল।

১৫০১ এবং রেনেশাঁ এগিয়ে চলেছে। উত্তর ইটালীর প্রাণবন্ত নগর মিলান এর অনতিদূরে একটা ছোট শহরে ২৪শে সেপ্টেম্বর "অর্ধমৃত" জিরোলামো কার্দানো জন্ম নিলেন। তাঁর নিজের কথায় "উষ্ণ আসব স্নানে আমি বেঁচে উঠলাম।" এবং গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের জন্য "আমার একটা দানব হয়ে জন্মানর কথা।" তা না হয়ে সামান্য অক্ষম হয়ে তিনি বেঁচে গেলেন।

পিতা ফাজিও পেশায় উকিল হলেও "অপূর্ব কুশলী ও প্রতিভাবান" গণিতজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শোনা যায় লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি হয়ত জ্যামিতি সম্পৃক্ত সমস্যা পারম্পর্য নিয়ে তাঁর সংগে পরামর্শ করেছিলেন। প্রসিদ্ধি থাকার পরিপ্রেক্ষিত সত্ত্বেও বিত্ত অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারেননি। সাংসারিক জীবন তাই সুখের ছিল না। মাঝে মাঝে স্ত্রীর সংগে থেকেছেন। হয়ত তাঁকে প্রতিপালন করতে তিনি সমর্থ হননি একারণে প্রতিবেশীরা অবশ্য তাঁদের বিবাহে সন্দেহ প্রকাশ করত।

পিতার কাছেই কার্দানো আইন ও গনিতের [গণিতের] প্রথম পাঠ নিলেন। পিতার বালক অনুচর হলেন। জীবনে আইনজ্ঞ হবেন এ সিদ্ধান্ত দৃঢ় হল। কাজের চাপ অসহ্য হল জিরোলামোর পক্ষে। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তের বছর বয়সে কাজ থেকে মুক্তি পেলেন।

দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য ভরা শৈশব নিয়ে কার্দানো গর্ব করতে পারেন। প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন আর বদরাগী বাবা মা সামান্যতম অবাধ্যতায় তাঁকে চাবুক মারতেন। এটা বন্ধ হল যখন তাঁর বয়স সাত। চাবকানোর ফল ভাল হয়েছিল কিনা কার্দানো কিছু বলেননি।

কৈশোরেই যশ লাভের আকাঙ্খা [আকাঙ্ক্ষা] তাঁর মধ্যে প্রকট হয়। তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যু জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করে। খ্যাতি অথবা উত্তরাধিকারী এ ছাড়া মানুষ আর কি রেখে যেতে পারে? তাঁর বন্ধুর উত্তরাধিকারী ছিল না তাই কয়েক মাসের মধ্যেই তার নামও আর উল্লিখিত হল না।

তাঁর জীবনে এ ঘটনা না ঘটার ব্যবস্থা কার্দানো করলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পেলেন "দারিদ্র্য আর অবহেলা;" না ছিল বিত্ত না ছিল শিক্ষা, দেহ দুর্বল আর ছোট। যশ দূরের কথা অখ্যাতির জন্যও ঐসব পর্যাপ্ত নয়। ভালর দিকে ছিল প্রখর মন আর 'অবিকল্প উচ্চাকাঙ্খা' [উচ্চাকাঙ্ক্ষা]। আত্মজীবনীতে তিনি পরিষ্কার বলেছেন "লোকে আমাকে ভাবে সুযোগ সন্ধানী।" পিতা চেয়েছিলেন পুত্র হবে আইনজ্ঞ — কিন্তু আইন পিতাকে যা দিয়েছে তার কথা ভেবে কার্দানো সিদ্ধান্ত করলেন পৃথিবীতে নাম রাখতে হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানই তাঁর পথ। তিনি হবেন চিকিৎসক।

তাঁর সিদ্ধান্ত, স্বাভাবিক পারিবারিক কলহের সৃষ্টি করল, মা শিয়ারা মিশিনা, ছেলের পক্ষে। প্লেগে প্রথম তিনটি সন্তানকে হারিয়ে প্রিয় জিরোলামোর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা চাইলেন। স্বামী মত না দেওয়া পর্যন্ত স্বভাবত "স্থূলকায়া, ধর্মপ্রাণা, চকিত স্বভাব" মহিলাটি তর্কের ঝড় বইয়ে দিলেন।

'পাভিয়া'র স্থানীয় আকাদেমীতে উনিশ বছর বয়সে তিনি ভর্তি হলেন। কিছুকাল পরে অসাময়িক গোলযোগে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ায় পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন। এখানে তিনি প্রথম জয়মাল্য পেলেন। সম্পূর্ণ অবৈতনিক রেক্টর পদে নির্বাচিত হলেন এবং তার্কিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেন। বিশেষ বাগ্মিতা দিয়ে নয় "একটা উৎকৃষ্ট এবং আদর্শ যুক্তি" দিয়ে প্রতিপক্ষের সবাইকে তিনি পরাস্ত করেছেন এটাই ছিল তাঁর বিনীত দাবী। পাছে ইতিহাস তাঁকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে তাই তিনি আরও বলেছেন "আমি এমনি অনন্য চতুর ছিলাম যে আমার অসাধারণ পটুতায় প্রত্যেকে স্তম্ভিত হত" — তাই কেউ তাঁর সংগে তর্ক করতে চাইত না।

উপাধি প্রাপ্তির পর আত্মমন্য তরুণ চিকিৎসক মিলানে ফিরে এসে পেশাগত ছাড়পত্র চাইলেন। জন্মগত কারণে এই ছাড়পত্র তিনি পেলেন না। স্থিত হলেন পাদুয়ার কাছে ছোট্ট সহর সাকোয়। জীবনের মধুরতম দিনগুলো এখানেই কাটালেন। বিবাহ করলেন স্থানীয় লুসিয়া বান্দারিনিকে—মরজগতে নিজেকে অমর করার জন্য জন্ম দিলেন তিনটি সন্তানের — জিয়ামবাতিস্তা, শায়ারা আর আলদো।

গোপনে অধ্যাপনা ও চিকিৎসা করে আংশিকভাবে আর বেশির ভাগটাই —বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনও জুয়া খেলে তিনি অর্থ উপার্জন করতেন। এইভাবে তিনি সংসার চালাতেন। পাশার দান ফেলছেন না বা তাস ভাঁজছেন না এমন দিন দেখা যায়নি। খেলার বৈধ অবৈধ সমস্ত রকম চাতুরীই তাঁর জানা ছিল। যদিও তিনি বলেন যে কোন দিনই তিনি অবৈধ উপায় গ্রহণ করেননি। তাঁর ক্রমাগত জয়ের মূলে ছিল সৌভাগ্য আর আংকিক হিসাব জ্ঞান। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন যে আর্থিক প্রয়োজনেই তিনি জুয়া খেলতে বাধ্য হয়েছিলেন তবুও, আর্থিক দুর্গতি শেষ হবার পরও তিনি জুয়া খেলেছেন।

সাকোয় থাকাকালীন পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিভাগে অধ্যাপনা করার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু অর্থ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা না থাকায় সে প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

মিলান এর চিকিৎসক সংস্থা, সংস্থার পেশাগত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য কার্দানোর তৃতীয় আবেদন মঞ্জুর করলেন। এর মূলে ছিলেন মিলানএর এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যার ছেলেকে কার্দানো মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেন।

কার্দানোর পেশা শুরু হল। তাঁর বয়স তখন আটত্রিশ। দু'বছরের মধ্যেই মিলান এর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের অন্যতম বলে পরিচিত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিলেন, গণিত চর্চা আবার শুরু করলেন, পুস্তক আকারে প্রকাশ করার জন্য নিজের লেখা কাগজপত্র ঠিক করে নিলেন আর পরবর্তীকালের মিলানএর আর্চবিশপকে পেলেন পৃষ্ঠপোষক।

ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। অর্থ, যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি চাঁদের কলার মত বাড়তে লাগল। শুরু হল অমৃতত্বের চিন্তা-রোমন্থন। ছেলেবেলায় অলৌকিক ভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছিলেন কয়েকবারই। তাই ধারণা হল কোন ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব আছে তাঁর জীবনে। সক্রেটিস সহ আরও বহু বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনে এই অপ্রাকৃত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ''সত্য আর জ্ঞানের প্রতি অসীম অনুরক্তি'' ''ন্যায়বিচারানুরাগ'' আর ''সমস্ত গৌরব ঈশ্বরে সমর্পণ'' ইত্যাদি কারণেই কার্দানোর ধারণা হল তিনি ঈশ্বরাভিপ্রেত।

বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার প্রয়াসী ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী একজন শিক্ষিত লোক কিভাবে এরকম সংস্কারাচ্ছন্ন হয় তা বুদ্ধির অগম্য। হতে পারে সমকালীন দেশ কাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন; রাজপ্রাসাদে রাজপ্রাসাদে জ্যোতিষীদের দৃঢ় অধিষ্ঠান, কিন্তু কার্দানো যে সমস্ত ব্যাপারে বিশ্বাস করতেন তা সাধারণ জ্যোতিষীরও হাসির খোরাক হবে। তিনি বলেছেন যে তাঁর জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পেছনে ছিল কোন অদ্ভুত স্বপ্ন বা কুকুরের একটানা চীৎকার বা আগুনের ঝিলিক বা দাঁড়কাকের ডাক বা মুরগীর ডাক ইত্যাদি ইত্যাদি। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন অপূর্বদৃষ্ট [অদৃষ্টপূর্ব] একটি মেয়েকে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন। এবং এক সপ্তাহ পরে স্বপ্নদৃষ্ট মেয়েকে তিনি রাস্তায় দেখেন। কিছুকাল পরে সেই মেয়েটির সংগে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর প্রথম পুত্রের নামকরণের দিন মাতাপুত্রের শয়ন কক্ষে একটি বোলতা ঢুকে ছেলেকে প্রদক্ষিণ করে, শেষে পর্দায় আটকে যায়। পরবর্তীকালে পুত্রের জীবনের পরিনতি [পরিণতি] তাঁকে এই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। লোকে যখন তাঁর সম্পর্কে কথা বলত তখন তাঁর কান বন্ধ হয়ে যেত। প্রশংসা করলে তাঁর ডান কান আর নিন্দা করলে বাঁ কান বন্ধ হয়ে যেত। তিনি আরও বলেছেন যে হঠাৎ চমক লাগার মধ্যে দিয়েই তিনি সমস্ত বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় যখন তিনি ল্যাটিন ভাষা জানতেন না, তখন একদিন সুন্দর সোণালী রঙে বাঁধান একটা ল্যাটিন ভাষার বই কেনেন তার পর দিনই হঠাৎ তিনি ল্যাটিন ভাষায় রপ্ত হয়ে গেলেন।

কার্দানোর গল্প আর অদ্ভুত ঘটনা আরও অনেক আছে। কিন্তু মহাপুরুষ বা বিদগ্ধজনের মাথায় বা মনে এ জাতীয় ছদ্মবৈজ্ঞানিক অর্থহীন চিন্তা থাকে.কিন্তু সেটা তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে না। আর কার্দানোর অবদান যথেষ্ট মূল্যবান। কেবল গণিত বিষয়েই তিনি একুশটি বই লিখেছেন — এর মধ্যে আটটি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা আরস্ ম্যাগনা (Ars Magna) জ্যামিতির সম্পর্কে ষোড়শ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ বই।

কার্দানো যখন পাঠ শুরু করেন তখন জ্যামিতি বিস্তৃতি লাভ করেনি। আলেকজান্দ্রিয়ানরা জ্যামিতিকে যেখানে ছেড়ে দিয়েছিল জ্যামিতি সেখানেই ছিল। বীজগণিত অবশ্য আরবদের স্থগিত চিন্তা থেকেও বড় হতে শুরু করেছিল এবং যাঁরা এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছিলেন কার্দানো তাঁদের অন্যতম। তখনকার বীজগণিতের গ্রীক আমলের জ্যামিতির মত সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতা ছিল না। গণিতের আর ধাঁধার সমস্যা মেটাবার জন্য বীজগণিত কেবল কয়েকটা সাধারণ সূত্রের সমষ্টি মাত্র।

জ্যামিতি মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ে গেছে পৃথিবী ছাড়িয়ে অতলে, নিঃসীম শূন্যে। বীজগণিত কিন্তু দৈনন্দিন প্রয়োজনের রুটীমাখন। অনির্দিষ্টভাবে বেড়ে উঠেছে বীজগণিত কোন বিশিষ্ট সূত্রকে ভিত্তি না করে। এর যৌক্তিক ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করেই মানুষ এর ব্যবহার করেছে, পরিপুষ্ট করেছে একে। জ্যামিতি যেন পরিকল্পিত শৃঙ্খলাভুক্ত ছেলে। তার পরিমিত কথা উল্লসিত করে মনকে। বীজগণিত যেন অনাদরে গড়ে ওঠা ছেলে। বাবা মা ওর দিকে তাকাবার সময়ই পাননি। তাই না আছে শৃঙ্খলাবোধ না আছে ভব্যতা। ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত কেউ খেয়ালও করেনি যে জ্যামিতির মত বীজগণিতেরও সেই চাকচিক্য আর দ্যুতি নেই।

কার্দানো বীজগণিতের বিস্তারে সাহায্য করেন। গণিত বিষয়ক তাঁর একুশটি বই এর বেশির ভাগই ছিল জ্যামিতি, বীজগণিত ও সংখ্যাতত্ব [সংখ্যাতত্ত্ব] সম্পর্কে তৎকালীন জ্ঞানের সংক্ষেপসার। তাঁর 'আরস্ ম্যাগনা' সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিত পুস্তক। বীজগণিত নিয়ে চর্চা করা কালীন হঠাৎ ঘন সমীকরণের সমস্যার সমাধান সূত্রের আবিষ্কার তাঁর নজরে আসে। ষোড়শ শতকের আগে পর্যন্ত বীজগণিতের সাহায্যে কেবল সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করা যেত, যে সব সমীকরণে ঘন থাকত যেমন $x^3 + x^2 - 4 = 0$ সেগুলোর সমাধান করা যেত না। জ্যামিতির সরল, তল ও ঘনের মধ্যে যে তফাৎ বীজগণিতে এই তিন সমীকরণের মধ্যে সেই তফাৎ।

১৫০৫ সালে বোলোনা (Bologna) সহরের স্কিপিও ফেরেয়াস ঘন সমীকরণ সমাধানের একক সূত্র পান। এই সূত্রটি তিনি আর একজনকে জানালেন। তখনকার দিনে কোন আবিষ্কার সাধারণ্যে প্রকাশ করা হত না — ব্যক্তিগত লাভের আশায় গোপন রাখা হত। গণিতজ্ঞরা আর্থিক পুরস্কারের জন্য একে অন্যকে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আহ্বান করতেন। এই গাণিতিক তর্ক যুদ্ধ নিউটনের পরবর্তী যুগেও লোকপ্রিয় ছিল এবং এর দ্বারাই প্রচুর অর্থ ও সম্মানের অধিকারী হতেন সার্থক গাণিতিক।

১৫৩৫ সালে ফেরেয়াস এর এক শিষ্য এক ধরণের ঘন সমীকরণ সমাধানের জন্য গাণিতিক তর্কে আহ্বান করলেন তোতলা শিকোলো [নিকোলো] তারতাগলিয়াকে; স্ব-শিক্ষিত তারতাগলিয়া এ আহ্বান গ্রহণ করলেন এবং ঘন সমীকরণ এর যে কোন সমস্যার সমাধান সূত্র উদ্ভাবন করলেন। পৃবিবীতে [পৃথিবীতে] তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই বিষয়ে বিশেষভাবে জানেন তাই যে কোন বিরোধীকে তিনি পরাভূত করতে পারবেন।

১৫৩৫ সালে বোলোনার (Bologna) সাইপিও ফেরেয়াস একধরণের কিউবিক সমীকরণ সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করেন। সে সময়ে বিশেষ জ্ঞান ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যবহৃত হত। ফেরেয়াস আবিষ্কৃত সূত্রটি তাই তাঁর অনুগত একটি ব্যক্তির মন্ত্রগুপ্তির শপথ এর বিনিময়ে রূপান্তরিত হয়।

১৫৩৫ ফেরিয়াসের [ফেরেয়াসের] এক ছাত্র তোতলা বলে খ্যাত নিকোলো তারতাগলিয়াকে কিউবিক সমীকরণের সেই বিশেষ সূত্রের 'গণিত দ্বন্দ্ব' এ আহ্বান করেন। তারতাগলিয়া আহ্বান গ্রহণ করে স্ব-অধ্যবসায়ে যে কোন ধরণের কিউবিক সমীকরণ-সমাধান-সূত্র আবিষ্কার করেন। ফলে তিনি হলেন অপরাজেয় অনন্য।

চার বছর বাদে কার্দানো তাঁর Ars Magna পুস্তকে এই সূত্র লিপিবদ্ধ করার জন্য সূত্রটি জানতে চাইলেন। তারতাগলিয়া অস্বীকৃত হওয়ায় কার্দানো জঘন্য ভাবে তাঁর কটুক্তি [কটূক্তি] করেন। তারতাগলিয়া কার্দানোকে গণিত দ্বন্দ্বে আহ্বান করলেন। বেগতিক দেখে কার্দানো কটুক্তি [কটূক্তি] প্রত্যাহার করে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিলেন, মার্কুইস দ্যল ভার্স্যোর পৃষ্ঠপোষকতার ইঙ্গিত দিলেন এবং মন্ত্রগুপ্তির শপথ জানিয়ে সূত্রটি জানতে চাইলেন। মার্কুইসকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে তারতাগলিয়াকে মিলানে এনে ও ''একজন সৎ খৃষ্টান'' হিসেবে ''ভগবানের নামে শপথ নিচ্ছি'' বলে 'সূত্রগুপ্তি'র শপথ নিলেন। তারতাগলিয়া সূত্র-প্রকাশ করলেন কিন্তু মার্কুইস এর সংগে দেখা হলো না।

ছয় বছর পরে Ars Magna প্রকাশিত হল — সমস্ত জগৎ দেখল সেই সূত্র যা চিরদিন অপ্রকাশ্য রাখার জন্য কার্দানো সত্যবদ্ধ ছিলেন। বহুকাল পরে 'আত্মজীবনী'তে সীমাহীন ধৃষ্টতার সংগে তিনি বলেন ... ''আমার পূর্বতন বন্ধুদের কোন গুপ্ত কথাই কোন দিনও প্রকাশ করিনি।'' অবশ্য তার বইতে ওই সূত্র উদ্ভাবনে তারতাগলিয়ার দান তিনি কুণ্ঠাহীনভাবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস ইতিহাসের পাতায় সূত্রটি ''কার্দানোর সূত্র'' নামেই পরিচিত।

কিউবিক সমীকরণ এর ক্ষেত্রে না হলেও গণিতের অন্যক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ঋণাত্মক সংখ্যার (Negative Numbers) প্রথম পরিষ্কার চিত্র তিনিই তুলে ধরেন; ঋণাত্মকমূল এর (Negative Roots) অস্তিত্ব স্বীকার করেন আর কাল্পনিক সংখ্যার (Imaginary numbers) প্রথম হিসাব করেন।

যুগান্তকারী Ars Magna ছাড়াও জুয়াখেলা সম্পর্কে বই লেখেন কার্দানো আর তাতেই 'সম্ভাব্যতার সূত্র'এর (Laws of Probability) প্রথম ব্যাখ্যা দেখা যায়, একশ বছর পরে পাসকাল্ ও ফার্মাট [ফার্মা] এই নিয়ে অনুসন্ধান করার আগে পর্যন্ত কার্দানোর আবিষ্কার অনুক্তই ছিল। ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস, গণিতের এই আবিষ্কারের জয়মাল্য পেলেন পাসকাল্ এবং ফার্মাট [ফার্মা] আর সত্যিকারের আবিষ্কারক কার্দানো বিখ্যাত হলেন তারতাগলিয়ার সূত্র চুরি করে।

আর্থিক উন্নতির সংগে সংগে নানা বিষয়ে বই লিখতে সুরু করলেন কার্দানো — চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও মানসিক স্বাস্থ্য। ইউরোপের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে পরিচিত কার্দানোর নিজের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। বাস্তব ও কাল্পনিক বহুরকম রোগের সচল প্রতিমূর্তি ছিলেন কার্দানো। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিকিৎসক হিসাবে রাজা, সম্রাট, আর্চবিশপদের চিকিৎসা করে বিখ্যাত হলেন কার্দানো।

শেষ জীবনে খৃষ্টধর্ম বিরোধিতার অভিযোগে কারাবদ্ধ হলেন ঊনসত্তর বছরের বৃদ্ধ কার্দানো। তিন মাস কারাবাসের পর গোপনে পূর্বতন মতকে অস্বীকার করে ও খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস ঘোষণা করে তিনি মুক্তি পেলেন। চলে গেলেন রোমে। প্রভাবশালী এক বন্ধুর চেষ্টায় ভূতপূর্ব খৃষ্টধর্ম-বিরোধী কার্দানো পোপের কাছ থেকে পেনসন পেলেন। পোপের সভায় কোষ্ঠী বিচার করে এবং লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটে কার্দানোর। শোনা যায় নিজের কোষ্ঠি বিচার করে ৭৫ বৎসর পূর্তির চার দিন আগে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৫৭৬ তারিখে মৃত্যু হবে ঘোষণা করে ঐ দিনও সম্পূর্ণ সুস্থ থাকায় নিজের ভবিষ্যদ্বানী [ভবিষ্যদ্বাণী] পূর্ণ করার জন্য আত্মহত্যা করেন।

'জাঁ মুর' কৃত ***Of Men & Less Numbers*** হইতে গুরুপ্রসাদ চক্রবর্তী অনুদিত [অনূদিত]।

....

সম্পাদকীয় সংযোজন

একই বৈজ্ঞানিক-এর নামের বিভিন্ন বানান এই লেখাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রয়োজনবোধে ব্র্যাকেটে বৈজ্ঞানিকের নামের সঠিক উচ্চারণ (বাংলায়) আমরা সংযুক্ত করলাম।

ম্যাজিক স্কোয়ার

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

১নং চিত্র

ম্যাজিক স্কোয়ার তৈয়ারী করিতে হইলে একটি বড় চৌকা বা স্কোয়ারকে ছোট ছোট চৌকায় ভাগ করিয়া লইতে হয় এবং প্রত্যেকটি চৌকায় এক একটি করিয়া সংখ্যা বসাইতে হয়। (একই সংখ্যা একবারের অধিক ব্যবহৃত হইবে না।) এই সংখ্যাগুলি এমন হইবে যাহাতে সমান্তরাল ভাবে, খাড়া ভাবে, অথবা কোণাকুণি ভাবে; যেদিক হইতেই সংখ্যাগুলিকে যোগ করা যাক না কেন, যোগফল একই হইবে।

উপরে নয়টি সংখ্যা বিশিষ্ট একটি ম্যাজিক স্কোয়ার দেখান হইয়াছে। ইহার যেদিক হইতেই যোগ করা যাক, যোগফল সর্বদাই পনেরো হইবে।

এইবার (বিজোড় সংখ্যক স্কোয়ার বিশিষ্ট) ম্যাজিক স্কোয়ার তৈয়ারী করিবার একটি সহজ প্রণালী জানানো হইতেছে।

একটি চৌকা আঁকিয়া তাহাকে নয়টি চৌকায় ভাগ করা হইল। এইবার প্রত্যেকটি চৌকায় উপযুক্ত সংখ্যা বসাইতে হইবে।

উপরের লাইনের মাঝখানের চৌকাটিতে সব সময়েই ''এক''(১) বসাইতে হইবে।

অন্যান্য ঘরগুলিতে সংখ্যা বসাইবার জন্য তিনটি নিয়ম আছে।

সর্বোপরিস্থিত সমান্তরাল লাইনে যদি একটি সংখ্যা বসানো হইয়া থাকে, তবে পরের সংখ্যাটি বসাইবার জন্য ঐ সংখ্যার দক্ষিণ দিকের ঘরে সরিয়া যাইতে হইবে এবং খাড়াভাবে নামিয়া গেলে সর্বনিম্ন যে ঘর পাওয়া যাইবে, তাহাতেই পরের সংখ্যাটি লিখিতে হইবে।

কিন্তু যদি এই ঘরটিতে পূর্বেই কোন সংখ্যা বসানো হইয়া থাকে অথবা ডানদিকে সরিবার যদি কোন ঘর না থাকে, তাহা হইলে পরের সংখ্যাটি পূর্ব সংখ্যার ঠিক নিম্নের ঘরে বসাইতে হইবে।

উপরের ছবির উপরকার লাইনের মাঝখানের ঘরে '১' বসানো হইয়াছে। দ্বিতীয় সংখ্যাটি বসাইবার জন্য প্রথম সংখ্যাটির পাশের ঘরের সর্বনিম্নের চৌকায় '২' লেখা হইল।

ধরা যাক যে একটি সংখ্যা কোন সমান্তরাল লাইনের সর্বদক্ষিণে আছে। পরের সংখ্যাটি বসাইবার জন্য প্রথম সংখ্যার ঠিক উপরের লাইনে উঠিতে হইবে এবং ঐ লাইনের সবচেয়ে বাম দিকে যে ঘরটি আছে, সেইখানে পরের সংখ্যাটি লিখিতে হইবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় সংখ্যাটির জায়গায় অন্য কোন সংখ্যা পূর্বেই লেখা থাকে অথবা প্রথম সংখ্যাটি সব চাইতে উপরের লাইনে থাকে, তাহা হইলে প্রথমটির ঠিক নীচে পরের সংখ্যাটি লিখিতে হইবে।

এখানে '২' সংখ্যাটি সর্বদক্ষিণে আছে। পরের সংখ্যাটি লিখিবার জন্য ঠিক উপরের লাইনের সর্ববামের ঘরে যাইতে হইবে। এই ঘরে '৩' লেখা হইল।

কিন্তু প্রথম সংখ্যাটি যদি সর্বদক্ষিণের খাড়া লাইনে অথবা সর্বোচ্চ লাইনে না থাকে, তাহা হইলে পরের সংখ্যাটি কোণাকুণি ভাবে ডানদিকের ঠিক উপরের ঘরটিতে লিখিতে হইবে। যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পরের সংখ্যাটি পূর্বের সংখ্যার ঠিক নিম্নের ঘরে লিখিতে হইবে।

যেহেতু ৩ সংখ্যাটির কোণাকুণি ভাবে ডানদিকের উপরের ঘরটিতে ১ সংখ্যাটি পূর্বেই লিখিত হইয়াছে ৪ সংখ্যাটি ৩ এর ঠিক নিম্নে লিখিত হইল।

"৫" সংখ্যাটি লেখা হইল "৪" সংখ্যার উপরের সারিতে কোণাকুণি ভাবে ঠিক ডান দিকের ঘরটিতে।

এইভাবে "৬" সংখ্যাটিকেও উপযুক্ত স্থানে লেখা হইল। "৬" সংখ্যাটি সর্বোচ্চ লাইনের ডান দিকে আছে। সেই জন্য প্রথম নিয়ম কাজে লাগাইতে হইবে। যেহেতু ডান দিকে সরিবার জায়গা নাই, "৭" সংখ্যাটিকে "৬" এর নীচে লেখা হইল।

পরের সংখ্যাটি লিখিবার জন্য এক ঘর উপরে উঠা হইল। এই লাইনের সর্ববামের ঘরে "৮" সংখ্যাটি লিখিত হইল।

যেহেতু "৮" সংখ্যাটি সর্বোচ্চ লাইনে আছে, "৯" সংখ্যাটি পরের ঘরের খাড়াখাড়ি ভাবে সর্বনিম্ন ঘরে লিখিত হইল।

এইবার ম্যাজিক স্কোয়ারটি সম্পূর্ণ হইল কারণ প্রত্যেক ঘরেই সংখ্যা বসানো হইয়াছে।

১'	২	৩	৪"
৫	৬'''	৭''''	৮
৯	১০''''	১১'''	১২
১৩"	১৪	১৫	১৬'

২নং চিত্র

১৬	২	৩	১৩
৫	১১	১০	৮
৯	৭	৬	১২
৪	১৪	১৫	১

৩নং চিত্র

"১" সংখ্যাটি না লইয়া যে কোন সংখ্যাই লওয়া যাইত। কিন্তু প্রথম সংখ্যাটি সর্বদা উপরের লাইনের মাঝখানের ঘরে লিখিতে হইবে। শেষ সংখ্যাটি সর্বদা প্রথম সংখ্যার খাড়াভাবে সবচেয়ে নীচেকার ঘরে থাকে। তাহা না হইলে ম্যাজিক স্কোয়ার গঠনে ভুল হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

উপরোক্ত নিয়ম দ্বারা কেবল বিজোড় সংখ্যক ঘর বিশিষ্ট ম্যাজিক স্কোয়ারই গঠন করা যায়। জোড় সংখ্যার ঘর বিশিষ্ট ম্যাজিক স্কোয়ার গঠন অপেক্ষাকৃত শক্ত। ২নং চিত্রে ১৬টি ঘর বিশিষ্ট একটি ম্যাজিক স্কোয়ারের গঠন দেওয়া হইল।

উক্ত চিত্রে "১" হইতে "১৬" পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলিকে পর পর লেখা হইয়াছে। এইবার একভাবে চিহ্নিত সংখ্যাগুলির (যেমন ১ ও ১৬) পরস্পর স্থান বদল করিয়া লেখা হইল (৩নং চিত্র)। দেখা যাইবে যে ইহা একটি ম্যাজিক স্কোয়ারে পরিণত হইয়াছে।

সংখ্যাগুলিকে কোণাকুণি, সমান্তরাল ভাবে বা খাড়া ভাবে যে কোন রকমেই যোগ করা যাক না কেন যোগফল সব সময়ই চৌত্রিশ হইবে।

২০	২৭	৪	১১	১৮
২৬	৮	১০	১৭	১৯
৭	৯	১৬	২৩	২৫
১৩	১৫	২২	২৪	৬
১৪	২১	২৮	৫	১২

৪নং চিত্র

৪নং চিত্রে ২৫টি সংখ্যা বিশিষ্ট (৪-২৮) একটি ম্যাজিক স্কোয়ার দেখান হইয়াছে। এখানে যোগফল হইবে ৮০।

প্রমোদ কুমার

বিজ্ঞান ও প্রকল্প ঃ সংখ্যা ও মানগুণ্য

আঁরি প্যাওয়াঁকারে

১.

গাণিতিক যুক্তি বিস্তারের প্রকৃতি ঃ

অঙ্ক বিজ্ঞানের যথার্থ সূত্রপাত, সম্ভাবনা, মনে হয় মীমাংসারহিত এক দুর্জ্ঞেয় বিরুদ্ধবাদ যদি এই বিজ্ঞান শুধু মাত্র তাহার চেহারাতেই — আপাতদৃষ্টিতেই যদি ব্যবকলনধর্ম্মী[১] বা অবরোহী হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে, তাহার যুক্তির সেই সম্যক বলিষ্ঠতা (rigour) বা কোন ভাবে আসিল — যে বলিষ্ঠতা সম্পর্কে কেহ আজও কোন প্রশ্ন করেন নাই? আবার অন্যপক্ষে, যদি এই বিজ্ঞানই যে সকল প্রতিপাদ্য নির্বচন করে, সেগুলি ন্যায়তত্ত্বের (formal logic) নিয়ম দ্বারা উৎপত্তি বা হেতু নির্ণয় সাধ্য হয় অর্থাৎ হেতু নির্ণয় করা যায় — তাহা হইলে এই দিক দিয়া অঙ্কশাস্ত্র একটি মস্ত সমার্থবাচক শব্দ হইয়া দেখা দেয় না কেন?

ন্যায় অর্থে সিলজিসম[২] আমাদের নূতন কিছু তত্ত্বজ্ঞান শিখাইতে পারে না এবং যদি ধরা হয় সকল কিছু এক অভেদের জন্যত্ব[৩] (principle of identity) হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে নির্ঘাত সকল কিছুর সেই আদি জন্যত্বে পরিণতি লাভ করিবার হেতু থাকিয়া যায়। এবং এই সূত্রে আমরা কি স্বীকার করিব যে সকলকিছু উপপাদ্যের নির্বচন লইয়া যে অগণিত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার বিষয়বস্তু কেবলমাত্র অপরোক্ষ ভাবেই শুধুমাত্র বলার চেষ্টা যে 'ক' হয় 'ক'?

এখন, নিশ্চিন্ত মনে আমরা সেই সব স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বগুলির কথা উত্থাপন করিতে পারি যেগুলি ঐ সব বিচার বিবেচনার উৎস উপাদান হইয়া আছে। অবশ্য এ কথা আমরা উপলব্ধি করি যে ঐ সকল স্বতঃসিদ্ধগুলিকে বিরুদ্ধবাদের জন্যত্বে কোন ক্রমেই আনিয়া ফেলা যাইবে না; বা পরিণমন[৪] তথা হ্রস্বীকরণ সম্ভব নয়, এ ছাড়া, তাহাদের মধ্যে 'পরখ-সাধ্য (experimental) ব্যাপার' অবশ্য এই ব্যাপারের সহিত অঙ্কশাস্ত্রের কোন যোগ বা অংশ নাই — সেই 'পরখ-সাধ্য ব্যাপার' ছাড়া আর অন্য কিছু যদি ধরতব্যের [ধর্তব্যের] মধ্যে লইতে রাজী না হই — তখন দেখিব, যে একটি মাত্র বিষয় থাকিয়া যায় যাহাকে 'পূর্বাহ্ন মিশ্র দৃষ্টি' (Synthetic views) বলা যায়। তবু এইটুকুতেই, প্রতিবন্ধকতার কোন সুরাহা হয় না, শুধু একটি নাম দেওয়া হয়। এমন কি যদি সেই মিশ্রদৃষ্টির রীতি পদ্ধতির মধ্যে আমাদের জন্য কোন হেঁয়ালী-রহস্য না থাকে, যদি তাহা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তখনও দেখা যাইবে, বিরুদ্ধবাদ কোন সূত্রেই অদৃশ্য হইয়া যায় নাই — ফলে আমাদের আদত প্রশ্নকে শুধুমাত্র এড়ানই হইয়াছে। সিলজিসম অনুযায়ী যুক্তি বিবেচনা তাহার সম্পর্কে নূতন কোন চিন্তার দ্বারা তাহার তথ্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারে নাই। তথ্যগুলি অবশেষে পরিণমিত হইয়া স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া দেখা দেয় — এইটুকুই মাত্র সিদ্ধান্ত করা যায়।

কোন উপপাদ্যই সম্পূর্ণ নূতন হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কোন একেবারে নূতন স্বয়ংসিদ্ধ সত্য সেই উপপাদ্যকে ব্যক্ত ভাবে প্রমাণ করিতে সহায় না হয়; যুক্তিবিচার সরাসরি স্বজ্ঞা[৫] (intuition) হইতে কতক স্পষ্টত-সত্য আহরণ করিয়া আমাদের দিতে পারে। এবং এই দিক দিয়া ইহা এ-ব্যাপারে পরাশ্রয়ী বা পরমুখাপেক্ষী মাত্র। অতএব, আমরা অন্যসূত্রে যাহা আহরণ বা কার্য্য করিয়াছি, সে ব্যাপারকে — ন্যায় কৌশল দেখা যাইবে শুধু ঢাকা দিতেই ছদ্মবেশ পরাইতে ব্যস্ত এবং এমন কথা বলিলে সম্ভবত অন্যায় — অসঙ্গত হইবে না।

যে কোন অঙ্কের বই খুলিলেই বিরুদ্ধবাদ বড় বেশী করিয়া দেখা দিবে, প্রতিটি পাতায় দেখিব লেখক বলিতেছেন 'যে সকল প্রতিজ্ঞা পূর্ব হইতেই বিদিত সেইগুলিকে সাধারণীকরণ (generalise) করাই তাহার উদ্দেশ্য'। এই যদি কথা হয় অর্থাৎ অঙ্কশাস্ত্রগত পদ্ধতি যদি বিশেষত্ব হইতে সাধারণত্বের দিকে যায় আর ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে উহাকে কেমন করিয়া ব্যবকলন মীমাংসা বলিব?

আবার; অবশেষে যদি সংখ্যাবিজ্ঞান শুধুমাত্র বিশ্লেষণ-সাধ্যই হয়, কিম্বা কয়েকটি মিশ্র স্বজ্ঞা হইতে বিশ্লেষণসাধ্য ক্রিয়ার ফলে প্রসূত হয়, তাহা হইলে এক্ষেত্রে মনে হয় যে কোন প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এক নজরেই উহার সত্যসত্তা[৬] অনুধাবন করিতে পারিবেন। অধিকন্তু, এমনও আশা হয়, যে কোন সাদামাটা বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের জন্য ঐ সকল সত্যের সম্যক্ প্রকাশের জন্য একটি বিশেষ ভাষারও সৃষ্টি হইবে।

অবশ্য এই সকল কার্য্যকারণগুলি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তোলা যায় সত্য; তবু অঙ্কবিষয়ক যুক্তি বিবেচনার নিজেরই একটি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা বা গুণ আছে এবং এই দিক দিয়া সিলজিসমের হইতে পৃথক বলিয়া ধরা কর্ত্তব্য। এ পার্থক্য নিশ্চয়ই অতীব গভীর। প্রথমতঃ ধরা যাক, দুইটি ঐক্য-সংখ্যার ব্যাপারে যে নিয়মটি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করিয়া—সমান প্রক্রিয়া আরোপ করিয়া, একই অভিন্ন ফলাফল লাভ করি তাহার রহস্যের চাবিকাঠিটি আমরা কোন ক্রমেই পাইব না। এইভাবে নানা রকমের যুক্তি বিবেচনা ন্যায় (সিলজিসমে) তত্ত্বে নিরসন করা যাক বা নাই করা যাক — সঠিক অর্থে তাহাদের বিশ্লেষণ-সাধ্য চরিত্র ত্যাগ করে না, এইজন্য, তাহাদের ক্ষমতা হারায়।

২.

তর্কটি খুবই পুরাতন। দেখা যাক লিইবনেৎস (Leibnitz) কি ভাবে দুই এবং দুই যোগে — কি প্রকারে চার হয় তাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথমেই, '১' এই সংখ্যাটিকে সংজ্ঞাবিহিত করিব মনস্থ করা যাক, এই সঙ্গে x + ১ এই প্রক্রিয়াটিও সংজ্ঞাবিহিত করিব। x + ১ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা x এর সহিত একক যোগ করিব। এই সংজ্ঞাগুলি যাহাই বুঝাক না কেন উহারা পরবর্ত্তী যুক্তি বিবেচনার বিষয়ীভূত হইবে না। পরে, আমি ২, ৩, ৪ সংখ্যাগুলির ঐক্যতার দিক দিয়া সংজ্ঞা নির্ণয় করিব।

(১) ১ + ১ = ২ (২) ২ + ১ = ৩ (৩) ৩ + ১ = ৪ এবং এখানে এই প্রকারে x + ২ সমৃদ্ধ যোগ হেতু প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা বিহিত করিব।
(৪) $x + 2 = (x + 1) + 1$

ফলে আমরা দেখিব —

২ + ২ = (২ + ১) + ১ (সংজ্ঞা ৪) ২ + ১ + ১ = ৩ + ১ (সংজ্ঞা ২) ৩ + ১ = ৪ (সংজ্ঞা ৩) ফলে ২ + ২ = ৪ (প্রমাণিত)

এবং অবশ্য এ কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই যে এইরূপের যুক্তি বিস্তার সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণধর্মী। এ বিষয়ে আমরা যদি অঙ্কশাস্ত্রবিদকে প্রশ্ন করি, তাহা হইলে তিনি উত্তর করিবেন, উহা কোনক্রমে ব্যক্তপ্রমাণদর্শন[৭] নয়, অন্যপক্ষে উহা সত্যপ্রতিপাদন[৮] মাত্র। আর আমরা শুধুমাত্র নিছক সাবেকী (conventional) সংজ্ঞা দুইটির মধ্যে হয় একটি নয় অন্যটির দিকে মন রাখিয়াছি, নিজেদের সীমিত করিয়াছি। কিন্তু আর কিছুই বিশেষ শিক্ষা করি নাই। প্রমাণ হইতে সত্যপ্রতিপাদন যথাযথভাবে আলাদা — কারণ ইহা বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ, ইহার দ্বারা কোন কিছুর সুরাহা হয় না — কোথাও পৌঁছাইতে ইহা সহায়তা করে না। কোথায়ও পৌঁছাইতে সহায়তা করে না অর্থাৎ সিদ্ধান্তটি প্রতিপাদ্যকে আর এক ভাষায় বলা ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্যপক্ষে, নির্ঘাত সত্য প্রমাণ, খুবই ফলপ্রসূ; আসল কারণ বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিপাদ্য অপেক্ষা সিদ্ধান্ত ব্যাপকতর ২+২=৪ এই সমতার সত্যপ্রতিপাদন করা যায় কারণ ইহা সবিশেষ। অঙ্কশাস্ত্রের প্রত্যেক নির্বচনের[৯] এইভাবে সত্যপ্রতিপাদন করা যায়। কিন্তু, যদি অঙ্কশাস্ত্রের সকল কিছুকেই সবসময় সত্যপ্রতিপাদন মধ্যে হ্রস্বীকরণ করা যায় তাহা হইলে সে শাস্ত্র আর বিজ্ঞান কি করিয়া হয়? এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে দাবা খেলোয়াড় একটি ঘুঁটি মারিয়া বিজ্ঞান সৃষ্টি করে না। এখানে সাধারণতার বিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞান বলিয়া অন্য কিছু নাই। তাই আমরা বলিতে পারি যথার্থ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হইবে এহেন সরাসরি সত্যপ্রতিপাদন বাদ দেওয়া।

৩.

এখন যদি জ্যামিতিবিদের কাজকর্ম দেখা যায়, এবং তাহার কয়েকটি পদ্ধতির পর্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিব — যে কাজটি খুবই সহজ নয়। শুধু যে একটি বইএর যত্রতত্র খুলিয়াই সবকিছু হইবে বা যে কোন প্রমাণকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই চুকিয়া যাইবে এমন নহে। প্রথমত, জ্যামিতিকে এ বিষয়ে বাদ দেওয়াই শ্রেয়, না হইলে শর্ত এবং অবকাশের (space) আদিমূল ও প্রকৃতি মিলিত হইয়া দুরূহ সমস্যাগুলি আমাদের প্রশ্ন সকলকে ঘোরাল করিবে। অনেকটা এই কারণে, অনুকলন[১০] (infinitesimal calculus) ব্যাপারটিকেও ধরা যায় না। তাই আমাদের অঙ্কচিন্তা যেখানে এখনও বিশুদ্ধ আছে অর্থাৎ পাটিগণিতে — তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রেও মনোনয়নের প্রশ্ন আসে, কেন না সংখ্যাতত্ত্বের উচ্চ মার্গে প্রাচীনতম আদিমতম অঙ্কবিষয়ক ভাবরূপগুলি ক্রমেই অতি নিগূঢ় মাত্রায় প্রগাঢ়ভাবে এমন বিশদ আকার ধারণ করিয়াছে যে উহা বিশ্লেষণ এক প্রকার দুরূহ।

পাটিগণিত বিষয়ক আলোচনায় আমরা যে কথাটি যে ব্যাখ্যাটি অনুসন্ধান করিতেছি আশা হয় সর্ব্বপ্রথমেই তাহা পাইব। কিন্তু সেগুলি ভাগ্যশঃ[১১] যথার্থভাবে প্রাথমিক উপপাদ্যের সকলের মধ্যে নিহিত — যাহাদের — উপপাদ্যগুলি বিষয়ে অত্যুত্তম তত্ত্ব রচয়িতারা কিছুমাত্র যথার্থতা এবং বলিষ্ঠতা দেখান নাই; অবশ্য এই কারণে তাহাদের অপরাধী করা যায় না। তাহারা শুধুমাত্র তৎকালীন প্রয়োজন মিটাইতে বাধ্য হন। এবং একথাও ঠিক যে, নূতন শিক্ষার্থীরা অঙ্কশাস্ত্রের (rigour) বলিষ্ঠতার জন্য মোটেই তৈরী নহে। নূতন শিক্ষার্থীদের কাছে উহা সম্পূর্ণ ভূয়ো জটিল সূক্ষ্মতা হইয়া দেখা দিবে, উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর শিক্ষার্থীদের সর্ব্ববিষয়ে খুব সঠিক করিতে যাওয়াও শুধুমাত্র সময়ক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। নূতন শিক্ষার্থীদের দরকার খুব তাড়াতাড়ি পাঠ শেষ করা, যে পথে তত্ত্ব রচয়িতারা, বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তকরা, প্রতিষ্ঠাতারা, খুব সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়াছেন সে পথের কোথাও ইতস্তত না করিয়া নূতন শিক্ষার্থীরা অগ্রসর হইতে পারে।

এই নিছক বলিষ্ঠতাকে রপ্ত করিতে এত সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন কেন অথচ যাহা সচারচর [সচরাচর] মনে হয়, সকলের মনেই সহজেই স্বাভাবিকভাবে ভর করিতে পারে — বসিয়া যাইতে পারে?

এ ব্যাপার মনস্তাত্ত্বিক ও ন্যায়সঙ্গত সমস্যা, এবং ইহা পর্য্যালোচনার উপযুক্ত বিষয়। আমরা উহা আলোচনা করিব না। যেহেতু আমাদের বিষয় বহির্ভূত। এখন এই কথাই আমার স্মরণ করাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আমার ইচ্ছা বিশেষরূপে এ কথার উপর জোর

দেওয়া যে আমাদের উদ্দেশ্য কোনক্রমেই সাধিত হইবে না যদি না প্রাথমিক উপপাদ্যগুলির প্রমাণগুলিকে পুনর্গঠনে আমরা না নিযুক্ত হই। নূতন শিক্ষার্থীদের যাহাতে ব্যতিব্যস্ত না করে বলিয়া ভাসাভাসা আকারে সেইগুলি রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে; সেই অবস্থা হইতে আর এক বিশেষ ভাবে গঠন করা যাহাতে পাকা দক্ষ জ্যামিতিবিদকে সন্তুষ্ট করে।

যোগের সংজ্ঞা ঃ

মনে করি যে x+১ প্রক্রিয়া ইত্যবসরে সংজ্ঞাবিহিত করা হইয়াছে। ক্রিয়াটি, কাজটি সম্পাদিত হয় যখন '১' সংখ্যা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা 'x' এর সহিত যোগ করা হয়, এ প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা সম্পর্কে যাহা বিহিতই হউক পরবর্ত্তী যুক্তি আলোচনায় আসে না।

এখন আমরা x+a এই প্রক্রিয়া সংজ্ঞাবিহিত করিব। যে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা 'x' এর সহিত 'a' সংখ্যা যোগ করাতেই যাহার কাজ সম্পাদিত হয়। এখন ধরা যাক, x+(a-১) এই প্রক্রিয়া আমরা সংজ্ঞাবিহিত করিয়াছি; তাহা হইলে, x+a প্রক্রিয়া নীচের সাম্য দ্বারা সংজ্ঞাবিহিত হইবে ঃ (১) $x+a=\left[x+(a-১)\right]+১$.

তখনই x+a এর অর্থ সঠিক বুঝিব যখন x+(a-১) সম্পর্কে আমাদের ধারণা সঠিক হইবে। এবং যেমন পূর্ব্বে আমি মনস্থ করিয়াছিলাম x+১ প্রকৃতি আমরা জানি, আমরা পরম্পরা এবং পৌনঃপৌনিকতার[২১] দ্বারা প্রক্রিয়া x+২, x+৩ সংজ্ঞা বিহিত করিতে পারি। এবং এই সংজ্ঞাকে এক মুহূর্ত্তেই বিচার করিয়া দেখিতে পারি। ইহা একটি বিশেষ রকমের বা প্রকৃতির যাহা উহার স্বকীয়তাকে আদত ন্যায়সঙ্গত সংজ্ঞা হইতে ঐ অবস্থা বা স্তরেও স্বতন্ত্র করিয়া দেখায়। সাম্য (১) সত্যই, ইহার মধ্যে অসংখ্য (infinite number) সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নিহিত আছে। প্রত্যেক সংজ্ঞার এক এবং অভিন্ন অর্থ আছে। সেই অর্থ তখনই বুঝা যায় যখন সংজ্ঞার পূর্ব্ববর্তী সংজ্ঞার অর্থটি আমরা বুঝি।

যোগের সারবত্তাঃ

Associative — (সংযোগ) আমি বলি a+(b+c)=(a+b)+c , যথার্থই উপপাদ্যটি c=১ ব্যাপারেই সত্য। এখন যদি এইভাবে ফেলা যায়, a+(b+১)=(a+b)+১ যাহা শুধু সংখ্যাপাতনের দিক হইতে আলাদা হওয়া ছাড়া, সাম্যর দিক দিয়া সমান (১) যে সাম্য দ্বারা আমি যোগের সংজ্ঞা বিহিত করিয়াছি। এখন ধরা যাক, c=y ব্যাপারেও উপপাদ্যটি সত্য। তখনই দেখা যাইবে যে c = y + ১ ব্যাপারেও উহা সত্য। যদি (a+b)+y = a+(b+y) অতএব [(a+b)+y]+১=[a+(b+y)]+১; অথবা সংজ্ঞা '১' অনুযায়ী — (a+b)+(y+১)=a+(b+y+১)=a+[(b+y+১)] এইভাবে দেখানও যায় অবশ্য আদত বিশ্লেষণাত্মক ব্যবকলন দ্বারা দেখান যায়, যে y+১ ব্যাপারে উপপাদ্যটি সত্য। c=১ সত্য হওয়ার দরুণ c=২, c=৩ এইভাবে পরম্পরা সত্য।

Commutative — (বিনিময়) আমি মনস্থ করি যে a+১=১+a। এই উপপাদ্যটি সাক্ষাৎ (evidently) সত্য a=১ ব্যাপারে; আমরা আদত বিশ্লেষণধারায় যুক্তিবিবেচনার দ্বারা হিসাব-নিকাশ (verify) করিতে পারি যদি a=y ব্যাপারে ঠিক হয়, সত্য হয়, তাহা হইলে a=y+১ ব্যাপারেও সত্য। যেহেতু (y+১)+১=(১+y)+১=১+(y+১)

এখন যেহেতু a=১ ব্যাপারে সত্য, অতএব a=২, a=৩ ব্যাপারগুলিতেও সত্য। এবং এইভাবে পরম্পরা সত্য হইতে থাকিবে। ফলে এইরূপ ফলিত করিয়া দেখাকেই বলা হয় প্রমাণ, পৌনঃপৌনিকতার দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয়।

২) মনস্থ করি যে a+b=b+a এবং উপপাদ্যটি যে b=১ ব্যাপারে ঠিক হয়, এ কথা আমরা বিচার করিলাম, এবং বিশ্লেষণ ধারায় ইহাকে কষিয়া (verified) দেখা যাইতে পারে যে ইহা যদি b=B , ব্যাপারে সত্য হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই b=B+১ ব্যাপারেও সত্য।

এই প্রতিজ্ঞা (proposition) হইতে আমরা বুঝিব যে, পৌনঃপৌনিকতার দ্বারা পত্তন হয়।

গুণের সংজ্ঞাঃ

আমরা এখন গুণের সংজ্ঞা সাম্যের দ্বারা (by equalities) নির্দ্ধারিত করিব, যথা (১)a×১=a (২) a×b=[a×(b-১)]+a.

উপরোক্ত দুইটির বিচারের মধ্যেই অসংখ্য সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হয়, বা দেখা দেয় a×১ যখনই আমরা সংজ্ঞাবিহিত করি তখন ইহার বলে আমরা a×২, a×৩ এইভাবে অনেক সংজ্ঞাবিহিত করিতে সক্ষম হই।

Distributive (বিতরন [বিতরণ]) আমি মনস্থ করি (a+b)×c=(a×c)+(b×c) এখানেও বিশ্লেষণ ধারায় কষিয়া দেখা যায় যে উপপাদ্যটি c=১ ব্যাপারে ঠিক; এবং ইহার পর যদি c=y ব্যাপারে সঠিক হয় তাহা হইলে c=y+১ ব্যাপারেও নির্ঘাত সঠিক হইবে। তাহা হইলে দেখা যায় আমাদের প্রতিজ্ঞা ক্রমাগত পৌনঃপৌনিকতার দ্বারা প্রমাণিত হয়।

Commutative (১) এখন যদি মনস্থ করি a×১=১×a, উপপাদ্যটি a=১ হিসাবে স্পষ্টত প্রতীয়মান। আবার আমরা বিশ্লেষণ ধারা অনুযায়ী কষিতে পারি যে — যদি ইহা a=a ব্যাপারে সঠিক হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই a=a+১ ব্যাপারেও সত্য হইবে।

(২) এখন আমি মনস্থ করি $a \times b = b \times a$ এই উপপাদ্য পূর্ব্বেই b=১ হইলে, প্রমাণ করা হইয়াছে। এবং বিশ্লেষণ ধারা অনুযায়ী করা যায় যে যদি b=B ক্ষেত্রে সত্য হয়, তাহা হইলে b=B+১ ব্যপারে [ব্যাপারে] সঠিক।

৪.

এই ধরণের একঘেয়ে যুক্তি বিবেচনার কথা এখন স্থগিত রাখা যাইতে পারে; তবু একথা বলা যায় যুক্তি বিবেচনার এই বিশেষ একঘেয়েমিই আমাদের কাছে প্রক্রিয়াকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলে। প্রক্রিয়া সমান বা একই এবং প্রতি পদক্ষেপেই একই ভাবে দেখা দেয়; প্রক্রিয়াকে বলা যায় পৌনঃপৌনিকতার দ্বারা প্রমাণ। আমরা প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি যে একটি উপপাদ্য x =১ ব্যাপারে সঠিক। এবং তাহার পর আমরা দেখিয়াছি যে যদি তাহা x-১ ব্যাপারে সঠিক হয় তাহা হইলে x ব্যাপারেও উহা সত্য, এবং ফলে, এইভাবে আমরা সকল পূর্ণ সংখ্যার ব্যাপারে ইহা সত্য ও সঠিক তাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। এখনই আমরা দেখিলাম, যে যোগ এবং গুণের বিধির প্রমাণ করার জন্য কি ভাবে উহাকে কাজে লাগান যায় — অর্থাৎ বলা যায় বীজগণিতের কালকুলাস — বিধি ব্যাপারে কাজে লাগাইতে পারি।

এই কালকুলাসই রূপান্তরণের যন্ত্র বা পন্থা (instrument of transformation)। সাধারণ ন্যায় হইতে ইহা অনেক কিছু বিভিন্ন সংযুক্তিতে (combination) কাজে লাগে। তবু বলিতে হইবে ইহা বিশ্লেষণকারী যন্ত্র বা পন্থা মাত্র এবং ইহার দ্বারা আমরা নূতন কিছুই শিখিতে পারি না।

যদি অঙ্ক শাস্ত্রের আর অন্য কোন যন্ত্র বা পন্থা না থাকিত তাহা হইলে আমরা দেখিতাম যে শাস্ত্রের সম্প্রসারণে অচিরাৎ বাধা পড়িত; কিন্তু একই প্রক্রিয়ার সাহায্য শাস্ত্র নূতন করিয়া গ্রহণ করে। পৌনঃপৌনিকতা দ্বারা যুক্তি বিবেচনা। এইভাবে শাস্ত্র অগ্রসর হইতে থাকে।

আমরা যদি ভালভাবে দেখি, দেখিব প্রতি পদক্ষেপেই এই ধরণের যুক্তি বিবেচনা আছে, হয় তাহা অতি সাধারণরূপে যে রূপের কথা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম অথবা কম বেশী কোন পরিবর্ত্তিত রূপে। ফলে ইহাকে দারুণ যুক্তিবিবেচনা বলিয়া অভিহিত হয়। আমরা নিখুঁত ভাবে পরীক্ষা করিব।

৫.

পৌনঃপৌনিকতার দ্বারা যুক্তিবিবেচনার বিশেষ চরিত্র আলোচনা করিলে দেখিব — উহাতে একীভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একটি মাত্র বিধি (formula), অগণিত সিলজিসম। আমরা এই কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিব অবশ্য যদি আমরা একের পর এক সিলজিসম নির্বচন করিয়া দেখি, একটির পর একটিকে অনুসরণ করে, যেন, যদি এই ভাবে বলা যায় যে জলপ্রপাতের ধারায় নিম্নলিখিত ধারণাগুলি প্রাকল্পিক (hypothetical)। ন্যায়-উপপাদ্য '১' সংখ্যাটির বিষয় সত্য, এখন যদি '১' সংখ্যাটির সূত্রে সত্য হয়, ইহা '২' সংখ্যার ব্যাপারেও সত্য, যদি '২' সংখ্যার ব্যাপারে সঠিক হয় তাহা হইলে '৩' সংখ্যার ব্যাপারে সঠিক — ফলত '৩' সংখ্যার ব্যাপারে সঠিক এবং এইভাবে চলে; এবং আমরা দেখিতে পাই প্রতিটি সিলজিসম এর সিদ্ধান্ত তাহার পরবর্ত্তী অনুসরণকারীর নিম্নতা (minor) হিসাবে কাজ করে। এবং আর একটু ভাবা যায় — আমাদের সিলজিসম এর যেগুলি উচ্চতর (major) তাহাদের সকলকেই সহজেই একটি মাত্র রূপে হ্রস্বীকরণ করা যায়, যদি n-১ ব্যাপারে উপপাদ্য খাঁটি হয় তাহা হইলে উহা নির্ঘাত n ব্যাপারেও ধ্রুব।

এখন, আমরা উপলব্ধি করি পৌনঃপৌনিকতার দ্বারা যুক্তিবিবেচনায় আমরা প্রথমোক্ত সিলজিসমের নিম্নতার (minor) এবং সাধারণ সূত্র যাহাতে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে সমস্ত উচ্চতরগুলি থাকে সেই সবের নির্বচন করাতেই আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি। এই অশেষ সিলজিসমের সারবন্দি শুধুমাত্র কয়েকটি কথায় ছকিয়া ফেলা যায়।

এখন আমরা সহজেই বুঝিতে সমর্থ হইব যে, কেন একটি উপপাদ্যের প্রতিটি নির্দ্দিষ্ট ফলাফলই, আগে যেমন বলিয়াছি ব্যাখ্যা করিয়াছি, বিশ্লেষণ ধারা অনুযায়ী কষিয়া (verified) দেখা যায়। অতএব যদি আমাদের উপপাদ্যটি সকল সংখ্যার ব্যাপারেই যে সঠিক একথা প্রমাণ না করার পরিবর্ত্তে — ধরা যাক আমরা ঠিক করি শুধুমাত্র '৬' সংখ্যার ব্যাপারে উহা সঠিক; তাহা হইলে আমাদের ধারাবাহিকতার প্রথম পাঁচটি সিলজিসম কবুল বা প্রতিপাদন করিলেই যথেষ্ট হইবে। এবং এইভাবে '৯' সংখ্যাটির প্রয়োজন হইবে যদি আমরা '১০' সংখ্যাটির ব্যাপারে [ব্যাপারে] উহাকে প্রমাণ করিতে চাহি। উচ্চতর সংখ্যার ব্যাপারে আমাদের আরও সংখ্যার দরকার হইবে। এবং সংখ্যা যত বড়ই হউক না কেন, আমরা সকল সময়ই উহার নাগাল পাইব এবং বিশ্লেষণ ধারায় কষিয়া বা খতাইয়া দেখা সকল সময়ই সম্ভব হইবে। কিন্তু যত দূরেই আমরা যাই, গভীরে যাই, আমরা দেখিব, এমন একটি সাধারণ উপপাদ্যকে স্থির করিতে পারিব না যে উপপাদ্যকে সকল সংখ্যার ব্যাপারে অবাধে খাটাইতে পারি; ইহাই একমাত্র বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই স্থিরকরণে আমাদের অসংখ্য সিলজিসমের প্রয়োজন এবং আমাদের এক্ষেত্রে একটি বিরাট ব্যবধান (abyss) পার হইতে হইবে, যাহা বিশ্লেষণকারীর কেবলমাত্র স্বাভাবিক ন্যায়ের ধ্যানধারণাই যাহার সম্বল তথা জ্ঞান সীমিত অর্থাৎ তাহার পক্ষে সেই বিশ্লেষণকারীর ধৈর্য্য দ্বারা উহা কোন কালেই পার হওয়া অসম্ভব।

প্রবন্ধের গোড়াতেই আমি প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম যে কেনই বা আমরা এমন একজনের কল্পনা করিতে পারি না, যে ক্ষমতাসম্পন্ন মন এক নিমেষেই অঙ্কশাস্ত্রগত সকল সত্যই দেখিতে পাইবে। এখন এ প্রশ্নের উত্তর অতীব সরল। একজন দাবা খেলোয়াড় আগেভাগেই চার-পাঁচটা চাল ভাবিতে পারে; কিন্তু যতই কেন না সে খুব চৌখস খেলোয়াড় হউক তাহার পক্ষে সীমা জানা রাশি ছাড়া সসীম সংখ্যার অধিক ভাবা অসম্ভব। যদি সে তাহার বুদ্ধিমত্তাকে পাটিগণিতের ব্যাপারে লাগায়, সে কোনক্রমেই ঐ-শাস্ত্রের খুব সহজ সাধারণ সত্যগুলিকে স্বজ্ঞার সাহায্যে বুঝিতে পারিবে না। অতি ছোটখাট উপপাদ্যকেও বুঝিতে হইলে, তাহাকে পৌনঃপৌনিক ধারায় যুক্তিবিবেচনাকে কাজে লাগাইতে হইবে — এই জন্য যে ঐ উপায়টি, যন্ত্রটি, আমাদের সত্যই জানা-রাশি হইতে অজানা-রাশির দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। এই উপায় যন্ত্রটি আমাদের একান্ত প্রয়োজন — বড়ই কাজের, ইহার সাহায্যে আমরা যতটা ধাপ (step) ইচ্ছা, একবারেই লাফ দিতে পারি। এ উপায় আমাদের সুদীর্ঘ বিরক্তিকর একটানা খতাইয়া-দেখা যাহা দ্রুত অকেজো হইয়া দেখা দেয় তাহা হইতে অনায়াসে মুক্তি দিতে পারে। তাই যখনই সহজ-সাধারণ উপপাদ্য লইয়া বসি বা দেখিব বলিয়া গ্রহণ করি তখনই উহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য, যদি তাহা না হয়, শুধু বিশ্লেষণধারা দ্বারা খতাইয়া দেখিয়া উহার ভিতরে পৌঁছাইতে পারিব না। পাটিগণিতের এই অনুকলন (infinitesimal analysis) চৌহদ্দিতে (domain) আমাদের স্বভাবতই মনে হইতে পারে যে আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিশ্লেষণ হইতে বহুদূরে পড়িয়াছি কিন্তু — এ কথা জানা ভাল — অঙ্কশাস্ত্রগত-অসীমতার ভাবরূপ এখানে, ইতিমধ্যেই একটি অবিশ্বাস্য রকমের গুরুত্বপূর্ণ খেলা খেলিয়াছে, দিক খুলিয়াছে — যাহা ছাড়া কোন বিজ্ঞানই সম্ভব হইত না — এই জন্য বলা যে উহা ছাড়া কোন কিছুই সাধারণ রূপে দেখা দিত না।

আঁরি প্যাওয়াঁকারে কৃত 'সায়েন্স ও হাইপথেসিস' হইতে
কমলকুমার মজুমদার অনূদিত

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. ব্যবকলনধর্ম্মী - এখানে 'Deductive' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'সামান্য নিয়ম থেকে যুক্তির সাহায্যে লব্ধ বিশেষ দৃষ্টান্ত; অনুমান, অনুমিতি'। এখানে 'ব্যবকলন' বা 'অবরোহী' শব্দটির অর্থ অভিন্ন।
২. সিলজিসম - দুটি বিবৃতি থেকে সিদ্ধান্ত, অনুমান। Syllogism - An argument or form of reasoning in which two statements or premises are made and a logical conclusion is drawn from them.
৩. জন্যত্ব - 'জন্য' একটি সংস্কৃত শব্দ, অর্থ ফল (Effect)। জন্যত্ব - The property of being an effect, 'জন্য'র ধর্ম।
৪. পরিণমন - ?
৫. স্বজ্ঞা - বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে কেবল অনুভূতিবলেই জানা, স্বজ্ঞাত হওয়া অর্থাৎ স্বতঃলব্ধ জ্ঞান।
৬. সত্যসত্তা - Existence, বিদ্যমানতা।
৭. ব্যক্তপ্রমাণ দর্শন - ?
৮. সত্যপ্রতিপাদন - যুক্তি বা প্রমাণের সাহায্যে কোনো জ্যামিতিক তত্ত্বের সত্য নির্ধারণ করা।
৯. নির্বচন - জ্যামিতিক উপপাদ্যের সূত্রাকারে বিষয়নির্দেশ।
১০. অনুকলন - Infinitesimal Calculas (কমলকুমার ব্যবহৃত বঙ্গীকরণ)।
১১. ভাগ্যশঃ — শব্দটি তৈরি করা কারণ অভিধানের সমর্থন নেই।
১২. 'পৌনঃপৌনিকতার সমর্থন কোনো অভিধানেই নেই। পৌনঃপুনিকতা সঠিক প্রয়োগ।

যে শব্দগুলির পাশে '?' চিহ্ন দেওয়া আছে সেই শব্দগুলির গ্রহণযোগ্য অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

লুইস্ ক্যারল হইতে একটি প্রশ্ন

ট বাক্সে দুইটি বল আছে। বল দুইটির সম্বন্ধে কেবল জানা আছে যে তাহাদের প্রত্যেকটির রং হয় কালো না হয় সাদা। বাক্স ল দুইটি বাহির না করিয়া তাহাদের রং বল?

র ঃ একটি কালো একটি সাদা।

আমরা জানি যে কোন বাক্সে দুইটি কালো বল এবং একটি সাদা বল থাকিলে একটি কালো বল তুলিবার সম্ভাবনা হইতেছে $\frac{২}{২+১} = \frac{২}{৩}$ এবং অন্য কোনরকম সম্মেলনে এই সম্ভাব্যতা পাওয়া যাইবে না।

বাক্সে নিম্নোক্ত সম্মেলন হইতে পারে —

(ক) কালো + কালো

(খ) কালো + সাদা

(গ) সাদা + সাদা

এবং এইগুলির সম্ভাব্যতা যথাক্রমে —

(ক) $\frac{১}{৪}$ (খ) $\frac{১}{২}$ (গ) $\frac{১}{৪}$

এখন আর একটি কালো বল দেওয়া হইল। কাজেই নিম্নোক্তরূপ সম্মেলন হইল —

(ক) কালো + কালো + কালো

(খ) কালো + সাদা + কালো

(গ) সাদা + সাদা + কালো

এবং তাহাদের সম্ভাব্যতা আগের মতই যথাক্রমে —

(ক) $\frac{১}{৪}$ (খ) $\frac{১}{২}$ (গ) $\frac{১}{৪}$

এখন উপরোক্ত সম্মেলন হইতে একটি কালো বল তুলিবার সম্ভাব্যতা —

$$\frac{১}{৪}\cdot১+\frac{১}{২}\cdot\frac{২}{৩}+\frac{১}{৪}\cdot\frac{১}{৩}=\frac{২}{৩}$$

অর্থাৎ এখন বাক্সটিতে নিশ্চয়ই দুইটি কালো এবং একটি সাদা বল আছে; কেন না আগেই বলা হইয়াছে অন্য কোনরকম সম্মেলনে আমরা $\frac{২}{৩}$ সম্ভাব্যতা পাইতে পারি না।

অতএব প্রথমে (অর্থাৎ, কালো বলটি যোগ করিবার আগে) বাক্সে নিশ্চয়ই একটি কালো এবং একটি সাদা বল ছিল।

লুইস্ ক্যারল এর *Pillow Problems* হইতে
দেবিদাস মুখোপাধ্যায় অনূদিত।

অংক ভাবনা

অংকবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক ঃ

কমলকুমার মজুমদার ॥ আনন্দমোহন ঘোষ

— প্রচ্ছদ চিত্র —

নানাঘাট শিলালিপি ঃ অশোক রাজত্বের একশতক পরে খোদিত এই প্রাচীন ভারতীয় শিলালিপিতে শূন্য ও বিভিন্ন সংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়। নানাঘাট পর্বত পুণা হইতে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

অঙ্ক ভাবনা
অঙ্ক বিষয়ক বাংলা ত্রৈমাসিক
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ এপ্রিল-জুন, ১৯৬৫

কমলকুমার মজুমদার কর্ত্তৃক ৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা - ১৩ হইতে অজয় দাশগুপ্ত দ্বারা মুদ্রিত।

লুইস্ ক্যারল হইতে একটি প্রশ্ন

একটি বাক্সে দুইটি বল আছে। বল দুইটির সম্বন্ধে কেবল জানা আছে যে তাহাদের প্রত্যেকটির রং হয় কালো না হয় সাদা। বাক্স হইতে বল দুইটি বাহির না করিয়া তাহাদের রং বল?

উত্তর ঃ একটি কালো একটি সাদা।

আমরা জানি যে কোন বাক্সে দুইটি কালো বল এবং একটি সাদা বল থাকিলে একটি কালো বল তুলিবার সম্ভাবনা হইতেছে $\frac{২}{২+১} = \frac{২}{৩}$ এবং অন্য কোনরকম সম্মেলনে এই সম্ভাব্যতা পাওয়া যাইবে না।

বাক্সে নিম্নোক্ত সম্মেলন হইতে পারে —

(ক) কালো + কালো

(খ) কালো + সাদা

(গ) সাদা + সাদা

এবং এইগুলির সম্ভাব্যতা যথাক্রমে —

(ক) $\frac{১}{৪}$ (খ) $\frac{১}{২}$ (গ) $\frac{১}{৪}$

এখন আর একটি কালো বল দেওয়া হইল। কাজেই নিম্নোক্তরূপ সম্মেলন হইল —

(ক) কালো + কালো + কালো

(খ) কালো + সাদা + কালো

(গ) সাদা + সাদা + কালো

এবং তাহাদের সম্ভাব্যতা আগের মতই যথাক্রমে —

(ক) $\frac{১}{৪}$ (খ) $\frac{১}{২}$ (গ) $\frac{১}{৪}$

এখন উপরোক্ত সম্মেলন হইতে একটি কালো বল তুলিবার সম্ভাব্যতা —

$$\frac{১}{৪}\cdot১+\frac{১}{২}\cdot\frac{২}{৩}+\frac{১}{৪}\cdot\frac{১}{৩}=\frac{২}{৩}$$

অর্থাৎ এখন বাক্সটিতে নিশ্চয়ই দুইটি কালো এবং একটি সাদা বল আছে; কেন না আগেই বলা হইয়াছে অন্য কোনরকম সম্মেলনে আমরা $\frac{২}{৩}$ সম্ভাব্যতা পাইতে পারি না।

অতএব প্রথমে (অর্থাৎ, কালো বলটি যোগ করিবার আগে) বাক্সে নিশ্চয়ই একটি কালো এবং একটি সাদা বল ছিল।

লুইস্ ক্যারল এর *Pillow Problems* হইতে
দেবিদাস মুখোপাধ্যায় অনূদিত।

অংক ভাবনা

অংকবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

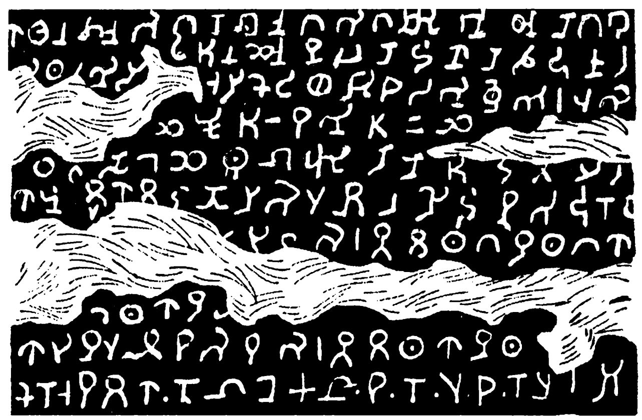

সম্পাদক ঃ

কমলকুমার মজুমদার ॥ আনন্দমোহন ঘোষ

— প্রচ্ছদ চিত্র —

নানাঘাট শিলালিপি ঃ অশোক রাজত্বের একশতক পরে খোদিত এই প্রাচীন ভারতীয় শিলালিপিতে শূন্য ও বিভিন্ন সংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়। নানাঘাট পর্বত পুণা হইতে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

অঙ্ক ভাবনা

অঙ্ক বিষয়ক বাংলা ত্রৈমাসিক

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ এপ্রিল-জুন, ১৯৬৫

কমলকুমার মজুমদার কর্ত্তৃক ৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত

মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা - ১৩ হইতে অজয় দাশগুপ্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

অঙ্কভাবনা পত্রিকা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; ভাগ্যশঃ[১] ইহা পাঠক সাধারণ হইতে সমাদর লাভে বঞ্চিত হয় নাই; অবশ্য ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেকেই ক্ষুণ্ণ এ কারণ হইয়াছেন যে, প্রকাশিত প্রবন্ধ মাত্রই অনুবাদ; এই কথার একমাত্র সন্তোষজনক যুক্তি হইল যে, ইহা স্বীকার্য্য, দু একটা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ব্যতীত অঙ্কশাস্ত্র আলোচনার সকল ক্ষেত্রেই, সাধারণত, পদ্ধতি অনুসরণ আমরা করি, শাস্ত্রের যথোচিত স্বাধ্যায় নাই ফলে সঠিক জিজ্ঞাসা, বলিলে অন্যায় হইবে না আসে নাই, পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত গ্রন্থ কোথায়, অতএব অনুবাদই একমাত্র গতি। এখন ইহাও, অবিসম্বাদী নিশ্চিত যে অনুবাদের অযুত প্রয়োজন নির্ণিয় [নির্ণেয়] হয়, অনুবাদ পাঠে আমাদের ভাবনা সমৃদ্ধ হইবে, অনুবাদ বিচারকে সার্থকতা দান করিবে, অনেক প্রশ্নের উদয় হইবে।

বিদেশী গ্রন্থাদি অনুবাদে আমরা যে বিষয়ে পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হই — তাহা পরিভাষা, যাহারা এই শাস্ত্র বা অন্যান্য শাস্ত্রের পরিভাষা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাদের অনুসরণ কার্য্যত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, যথা প্রজেক্ট ও হাইপথেসিস দুয়েরই পরিভাষা — প্রকল্প, যথা স্টান্ডার্ড ও মাগনিচিউড দুইটি বিভিন্ন শব্দের পরিভাষা — মান; এবং আমাদের পাঠক সাধারণ, হয়ত পাঠ্যপুস্তকে পড়িলেও, দৈনিক < >[২] দ্বারা উক্ত শব্দগুলির তাৎপর্য্য একরূপ বুঝেন, একেবারে অন্যশাস্ত্র আলোচনায়ও তাহার অভিধা যায় না, তাই বাক্য যদি চিন্তার স্বরূপ, মননের বাস্তবতা হয়, তাহা হইলে দেখিব ঐ সকল পরিভাষায় কিয়দংশে পাঠকের বিভ্রম উপস্থিত হইবে। অনেক শব্দ লইয়া আমরা বিব্রত আছি, পরিভাষাকারীদের সমালোচনার অধিকার আমাদের নাই, তথাপি সবিনয়ে ইঙ্গিত আমরা করিব যে তাহারা যদি বিশেষ বিশেষ ক্লাসিক অঙ্কশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করত, শাস্ত্রগত বাক্য সকলের যথার্থ স্বভাব নির্ণয়ে পরিভাষা সূচিত করার সময়, অন্যান্য শাস্ত্রে উহাদের ব্যবহার বিবেচনা করিতেন তাহা হইলে সর্বার্থ সাধক হইত।

আমাদের বিশ্বাস উক্ত বিষয়ে দর্শনশাস্ত্র স্বাধ্যায় একান্ত অপরিহার্য্য, উহা হইতে আমরা যথারীতি সাহায্য পাইতে পারি। আমরা যখনই ভাষান্তর করিয়াছি তখনই বিশেষত দর্শনধর্ম্মী বাক্যগুলি সাংখ্য বৈশেষিক ইত্যাদি হইতে গ্রহণ করিয়াছি — ইহা ব্যতীত আটপৌরে বাক্য, শুদ্ধ সংস্কৃত নহে বলিয়া পরিত্যাগ করি নাই — এবং যথাসাধ্য একটি বাক্যের সমার্থ শব্দসকল ও তাহাদের অপভ্রংশগুলি নির্দ্ধারণে আমরা সঠিক বাক্য নির্দ্ধারণ প্রয়াসী হই — আর ঐ সকল বাক্যের সহিত বিদেশী বাক্যও উল্লেখ করি। এই প্রসঙ্গে আর এক মনোভাব প্রকাশ যুক্তিসঙ্গত নিশ্চিত যে, অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী বাক্য পরিত্যাগ করাও অন্যায়।

পত্রদ্বারা দুয়েকজন পাঠক ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন। প্রথমত, সম্বন্ধবোধে, রসবোধে (নবরস) মানুষের কণ্ঠস্বর যেরূপ বিভিন্ন ব্যঞ্জনা আশ্রয়ী তদ্রূপ শাস্ত্র হিসাবে ভাষার তারতম্য ঘটা উচিত, এমত ধারণা হয়; এতদ্ব্যতীত ইহা প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, যে ইদানীং বঙ্গভাষা কতিপয় চপলমতির ক্রীড়া হইয়া ওতপ্রোত, ফলে ঐ ভাষা অভ্যস্ত পাঠক অঙ্ক ভাবনার পাঠ অনুধাবনে অপটু হয়েন, কথ্যভাষা অধুনা সাহিত্যধর্ম্মরূপে প্রচলিত, কথ্যভাষা বলিতে কতিপয় সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আর যাহা কিছু প্রায় সকলই শুদ্ধ সংস্কৃত রহিল; এবং আরও ধীরে 'লাইনো কল্যাণে' ভাষা এক্ষণে বিকলাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; তর্কের প্রয়োজন নাই তবু আদত যেখানে ভাষার রূপান্তর হয় সে তাহার চিন্তা-সূত্রেই পদবন্ধনের রূপান্তর হয় যথা কথোপথনে, সেখানে কোন নতুনত্ব আবিষ্কার আসিল না। যাহা হউক পাঠকবর্গ যেন কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করেন এই মাত্র অনুরোধ।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা লীলাবতীর অনুবাদে বিরত রহিলাম। পরবর্ত্তী কোন সংখ্যা হইতে সটীক ও ব্যাখ্যা সহকারে লীলাবতী, পূর্বে যেরূপ, প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রাখি।

'আর্কিমিডিসের পাটিগণিত' প্রবন্ধের টাইপ বিন্যাস নিমিত্ত কালিকা টাইপ ফাউন্ড্রির বাবু শ্রীমলয় চক্রবর্ত্তীর নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

....

সম্পাদকীয় সংযোজন ঃ ১. শব্দটি তৈরি করা কারণ অভিধানের সমর্থন নেই। ২.'< >' চিহ্নিত স্থানে কোনো একটি শব্দ বাদ পড়ে গেছে।

ঠিকানা পরিবর্তন

অঙ্ক ভাবনা পত্রিকার গ্রাহক শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে অঙ্ক ভাবনার নতুন অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

অঙ্ক ভাবনা

৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

(বেলা ১১টা হইতে ৫টা অবধি অফিস খোলা থাকিবে)

* *'অঙ্ক ভাবনা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় কার্যালয় এই ঠিকানায় উঠে আসে।*

অঙ্ক ভাবনা

অঙ্ক বিষয়ক বাঙলা ত্রৈমাসিক
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।। এপ্রিল-জুন, ১৯৬৫

।। সূচীপত্র।।

সম্পাদকীয়	
বিজ্ঞান ও প্রকল্প	৫৯
গাণিতিক সম্ভাব্যতার উপক্রমণিকা	৬৩
বীজগণিতের ইতিকথা	৬৬
ত্রিমাত্রিক আয়তন	৬৯
আর্কিমিডিসের পাটীগণিত	৭৩
দশমিকের রহস্য	৭৬
কার্ল ফ্রিডরিক গ্যয়স	৮৩
সংখ্যাতত্ত্বের সূচনা	৯৩
অনইউক্লিডীয় জ্যামিতি	৯৬

৬.

যে সকল মতের উপর পৌনঃপৌনিকতার[১] দ্বারা যুক্তিবিবেচনা ভিত্তি করিয়া আছে, তাহা অন্যান্য রূপভেদে (forms) প্রদর্শন করান যাইতে পারে। এখন, আমরা বলিতে পারি, উদাহরণ স্বরূপ — বিভিন্ন পূর্ণসংখ্যার যে কোন একটি সসীম সমষ্টির মধ্যে দেখা যাইবে যে এমন এক সংখ্যা আছে যাহা অন্য সংখ্যার তুলনায় ক্ষুদ্র। এবং তৎক্ষণাৎই আমরা একটি নির্বচন হইতে অন্য নির্বচনে (enunciation) সোজা চলিয়া যাইতে পারি; এইভাবে, পৌনঃপৌনিকতার দ্বারা যুক্তি বিবেচনা ঠিক ঠিক ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে ভাবিয়া নিজেদের মনকে আঁখিঠারিতে পারি, কিন্তু ইত্যাকারে আমরা সচরাচর সর্বদাই একটি রহিত অবস্থায় আনীত হই — তথা একটি ক'রে-কর্মে দেখান অসাধ্য স্বতঃসিদ্ধর নিকট পৌঁছাইয়া যাই এবং যাহার প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণ করার কথায় বা ব্যাপারে, সেটিকে আর এক ভাষায় অনুবাদ করিয়া বসি, অথচ উহা যে-কে-সেই প্রচ্ছন্নভাবে প্রমাণের পিছনে থাকিয়া যায়। অতএব পৌনঃপৌনিকতার দ্বারা যুক্তি বিবেচনার নিয়মকে যে বিরুদ্ধবাদের জন্যত্বে হ্রস্বীকরণ করা অসাধ্য এই সিদ্ধান্তটি আমরা কোন মতেই এড়াইতে পারি না। কিম্বা নিয়মটি আমাদের নিকট ক্রমান্বয় পরখ হইতে কখনও দেখা দেয় না। পরখ কার্য আমাদের শুধু শিখাইতে পারে, যে, নিয়মটি, বলা যায়, প্রথম দশ বা প্রথম একশোর জন্য ঠিক; কিন্তু কখনই অনির্দিষ্ট সংখ্যাক্রমের ব্যাপারে উহা কাজের হইবে না; কেবলমাত্র, বিশেষ কোন ক্রমের অংশের — সর্বদাই যাহা সীমিত — কম বা বেশী সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে।

এখন, উহাই যদি জিজ্ঞাসা-পর্যালোচনার সব কিছু হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধবাদের জন্যত্ব[২] এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বলিব, ইহা আমাদের যত ইচ্ছা, খুসীমত, সিলজিসিম[৩] [সিলজিসম] বানাইয়া (develop) তুলিতে সমর্থ করিবে। শুধুমাত্র তখনই এই জন্যত্ব ভাঙ্গিয়া পড়িবে যখন সিলজিসিমের, অসীম সংখ্যাকে সেই একটি মাত্র সূত্র দ্বারা যুত করার কথা উঠিবে এবং সেখানে পরখ কার্য কোন সাহায্যেই আসিতে অক্ষম। এই নিয়মটি বিশ্লেষণাত্বক প্রমাণ এবং পরখ কার্যর ভিতরে আসেই না উহা সঠিক পূর্বাহ্নের মিশ্র স্বজ্ঞা ধাঁচের। অন্য পক্ষে, ইহার মধ্যে জ্যামিতিগত শর্ত ব্যাপারের মত সাবেকী ভাব দেখা যায় না।

তবে কেন এই মতকে এত দুর্দ্ধর্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণে ভারাক্রান্ত করিয়া আমাদের উপর চাপান হইয়াছে? এই হেতু যে, যে মন উহাকে জানে, ইহা সেই মনের শক্তির বল, যাহা একই কার্যের বারংবার পুনরাবৃত্তির কল্পনা বা ধারণা করিতে পারে যখন মাত্র একবারই সে কার্য সংগঠন হওয়া সম্ভব। মনের এই ক্ষমতা বিষয়ে প্রত্যক্ষ, সরাসরি স্বজ্ঞা আছে, পরখ ঐ বিষয়টির ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর সুযোগ মাত্র, এবং মন তাই এ বিষয়ে সচেতন।

কিন্তু একথাও বলা যায়, যদি শুধুমাত্র পরখ দ্বারা পৌনঃপৌনিকতার দ্বারা — যুক্তি বিবেচনার ন্যায্যবৈধতা প্রতিষ্ঠা না করা যায় তবে ইহা কি আরোহী বিচারের পরখের সাহায্যে আসার জন্য? আমরা পর্যবেক্ষণ করি, যে একটি উপপাদ্য '১' সংখ্যার '২' সংখ্যার '৩' সংখ্যার এই ভাবে সংখ্যার ব্যাপারে সত্য— ন্যায় তখনই ওতোপ্রোত (manifest), এবং আমরা ধরি, সকল ভৌত ন্যায়বিধি সঠিক, একই হেতুতে সত্য, যাহা খুবই বিশদ হইলেও পর্যবেক্ষণের সীমিত সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়াছে।

এখন এ সত্য আমাদের দৃষ্টি এড়াইবে না যে, আরোহীর খুব সাদামাটা পদ্ধতির সহিত ইহার একটি দারুণ সাদৃশ্য আছে। তথাপি মূলগত পার্থক্য সেখানে থাকিয়া যায়। ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরোহী বিচার অনুসরণ সকল সময়ই দেখা যায় অনিশ্চিত; এই জন্যই যে বিশ্ব জগত আমাদের বাহিরে-সম্মুখে প্রতীয়মান সেই বিশ্ব জগতের সাধারণ (order) 'ক্রমে' বিশ্বাসের উপরই তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অঙ্ক শাস্ত্রগত আরোহী বিচার — অর্থাৎ পৌনঃপৌনিকতার দ্বারা প্রমাণ — অন্যপক্ষে আমাদের উপর প্রয়োজন-সঙ্গতভাবে চাপান হইয়াছে — কারণ, ইহা নিজেই মনের সত্তার গুণের বল মাত্র।

৭.

আমি যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে অঙ্কশাস্ত্রবিদ্গণ যে-সকল প্রতিজ্ঞাগুলি তাঁহারা বিচার করিয়া লাভ করিয়াছেন, সেইগুলিকে সকল সময়ই সাধারণায়ত করিতে যারপরনাই উদ্যোগী হন। এবং এই সূত্রে অন্য আর কোন উদাহরণ খোঁজখবর না করিয়া, আমরা কেবলমাত্র $a+১ = ১+a$ এর সাম্যই দেখাইলাম এবং পরে, এইটিকে $a+b=b+a$ এর সাম্য প্রতিপাদন করার জন্য ব্যবহার করিয়াছি — এখন এই ব্যবহার সুস্পষ্টরূপে আরও ব্যাপক বা সাধারণ। অতএব, তাই, অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ের মতই, আমাদের তত্ত্ব—বিশেষ হইতে ক্রমে সাধারণ ভূমিকা পরিগ্রহ করিতে পারে। এই সত্যটি, আলোচনার পূর্ব্বাহ্নে বড়ই দুর্বোধ্য, ধারণাতীত হইয়া আমাদের নিকট দেখা দেয়; কিন্তু এখন, নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই সত্যে আর কোন ভাবেই হেঁয়ালী-রহস্য ঘোর করিয়া নাই, এই কারণে যে আমরা ক্রমে ক্রমে পৌনঃপৌনিকতা-দ্বারা-প্রমাণ এবং সাদামাটা অবরোহী বা ব্যবকলনের মধ্যে — অর্থাৎ উহাদের পার্থক্য ব্যাপারে — উপমা নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছি।

একথায় সন্দেহের অবকাশ নাই যে, অঙ্ক শাস্ত্রগত পৌনঃপৌনিক যুক্তি বিবেচনা এবং ভৌত আরোহী যুক্তি বিবেচনা পৃথক পৃথক বুনিয়াদের উপর স্থাপিত, তথাপি দেখা যাইবে উহারা যদিও একটি নির্দ্দিষ্ট সমান্তরাল দূরত্ব রাখিয়া চলিতেছে কিন্তু উহাদের গন্তব্য একই দিকে পরিচালিত অর্থাৎ যথা, — বিশেষ হইতে সাধারণ অভিমুখে।

এই বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ যথাযথভাবে পরীক্ষা করা যাক। a+২ = ২+a ... (১) এর সাম্য প্রমাণ সিদ্ধ করিতে হইলে আমাদের a+১ = ১+a নিয়মটি শুধুমাত্র দুইবার আরোপ করা প্রয়োজন হয় এবং তাই এই ভাবে লিখি, a+২ = a+১+১= ১+a+১= ১+১+a = ২+a ... (২)

এখন বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা ঐরূপে যে ঐক্য ব্যবকলন বা পরিণমন করা গেল, ইহা খুব কিছু বিশেষ দারুণ ব্যাপার নহে। ইহা আদতে ভিন্ন প্রকারের। অতএব, আমরা অঙ্ক শাস্ত্রগত সঠিক বিশ্লেষণাত্মক ও ব্যবকলন যুক্তিবিচার বিহিত ভাবে এ কথা কবুল করিতে পারি না যে, আমরা খুব সাদাসিধা অর্থেই — বিশেষ হইতে সাধারণ অভিমুখে পরিচালিত হই। তাই দেখা যাইবে (১) সাম্যর দুইটি অংশের তুলনায় (২) সাম্যর দুইটি অংশই কেবল বড়ই জটিল মিশ্রণ মাত্র এবং এইখানেই বিশ্লেষণ, শুধুমাত্র যে সকল অনুক দ্বারা ঐ মিশ্রণ সম্ভবপর হইয়াছে সেই সকল অনুকগুলিকে পৃথক করিবার কাজে লাগে, ইহা ব্যতীত উহাদের মধ্যে সম্পর্কতত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়।

তাই গণিতশাস্ত্রবিদ্‌রা সব কিছুই 'নির্ম্মাণ' দিয়া সুরু করেন, বা নির্ম্মাণ করিতে করিতে অগ্রসর হন। ক্রমে তাঁহারা আরও জটিল মিশ্রণ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। এবং যখন তাঁহারা এই সকল মিশ্রণ আবার বিশ্লেষণ করেন, তখন ঐ সকল মিশ্রণ, একরূপ বলা যায়, অবশেষে উহাদেরই আদি অনুকগুলির সত্ত্ব মোটামুটিভাবে সমষ্টিরূপে দেখা দেয়, আর তাঁহারা সেই অনুকগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক বর্ত্তমান তাহা পর্য্যালোচনা করেন এবং সমষ্টিগুলির সম্পর্ক সমূহ পরিণমন করিয়াও দেখেন। এই সমগ্র পদ্ধতিই নিছকরূপে বিশ্লেষণাত্মক কিন্তু ইহা যে শুধু সাধারণ হইতে বিশেষের ঘরে যাওয়া তাহা কোন মতেই নহে; এই জন্য যে, সমষ্টিগুলি পরিচ্ছন্নরূপে, তাহাদের অনুকগুলি হইতে যে বিশেষ — এইরূপে কখনই গণ্য করা যায় না।

প্রায়শঃ এহেন 'নির্ম্মাণ' পদ্ধতির উপর, যথাযথভাবেই, খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং অনেকেই দৃঢ়বিশ্বাস করেন, দাবি করেন, যে উহার মধ্যেই যথার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতির একান্ত প্রয়োজনীয় এবং পর্য্যাপ্ত সক্ষমতার (condition) শর্ত আছে। প্রয়োজনীয় অবশ্যই তবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খুব কিছু এমন নহে — এই কারণ যে নির্ম্মাণ ক্রিয়া ব্যাপারটি সর্ব্বদাই কার্যকরী হইবে, এ কথা স্বীকার্য যে শুধুমাত্র উহা বাক বৈখরী নিষ্ফল মস্তিষ্ক পরিচালনার বিষয় হইবে তাহা নহে। এই জন্য যে উহা প্রতিনিয়তই উচ্চমার্গের প্রথম উপায় হিসাবে কাজ করিবে। সর্ব্বপ্রথম উহার সত্ত্বে এমন (unity) ঐক্য থাকা বাঞ্ছনীয় যাহার দ্বারা আমরা সহজেই অনুকগুলির পাশাপাশি স্থিতি (juxtaposition) ছাড়াও আরও অনেক কিছুই দেখিতে সমর্থ হই। কিম্বা আরও নিখুঁত ভাবে বলা যায়, অনুক ছাড়াও নির্ম্মাণ ব্যাপারটি সঠিক বিবেচনা করার জন্য অন্য কোন সুযোগ একান্ত দরকার। এখন এ সুযোগ কিরূপে হইতে পারে? আমরা কেন প্রাথমিক ত্রিভুজ লইয়া বিচার বিবেচনা না করিয়া বহুভুজ যাহা ত্রিভুজে পৃথকীকরণ করা যায় তাহা লইয়া যুক্তি বিবেচনা করি? এই জন্যই যে, যত অগনন [অগণন] পার্শ্ব বহুভুজটির থাকুক না কেন, তাহার সত্তা উহার মধ্যে আছে, এবং সেগুলিকে, বহুভুজগুলিকে, কোন নির্দ্দিষ্ট বহুভুজের সহিত নিঃসন্দেহে মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে। প্রায় ক্ষেত্রেই, প্রাথমিক ত্রিভুজগুলির স্বভাব সম্পর্ক অনুশীলন সরাসরি করিয়া, অনেক চেষ্টা সাধনার পর সেই সকল সত্তা, গুণ, অবিষ্কার [আবিষ্কার] করা সম্ভবপর হয়।

যে কোন একটি 'নির্ম্মাণ' ক্রিয়াকে একই বর্গের (genus) প্রকারভেদ হিসাবে সূচিত করার জন্য — অন্য আর আর সদৃশ বা অনুরূপ নির্ম্মাণ ব্যাপারের পাশাপাশি রাখিয়া মিলান যায় — তখনই তাহা খুব আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। এখন, ইহা সাব্যস্ত করিতে, কাজেকাজেই আমাদের বিশেষ হইতে সাধারণ ঘরে এক বা ততোধিক ধাপ অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। এখানে প্রকাশ থাক, বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি — 'নির্ম্মাণ ক্রিয়ার দ্বারা' যদিও আমাদের নিম্ন দিকে যাইতে বাধ্য করে না, তবু দেখা যাইবে যে, উহা আমাদের একই স্তরে স্থগিত রাখে। একমাত্র গণিতশাস্ত্রগত আরোহী বিচার সাহায্যে আমরা উচ্চ হইতে উচ্চ স্তরে নীয়মান হই, যেহেতু কেবল আরোহী বিচার হইতেই আমরা নূতন কিছু শিক্ষা লাভ করি। এই আরোহী বিচারে, ভৌতআরোহী হইতে যদিও একেবারে পৃথক্ কিন্তু একইরূপ ফলপ্রসূ এবং ইহা ব্যতীত নির্ম্মাণ ধর্ম্ম বিজ্ঞান সৃষ্টি করিতে অক্ষম।

এখন সিদ্ধান্তে এই কথা বলিব, যখন একই কর্ম্মধারা পুনঃপুনঃ অনির্দ্দিষ্টকাল ধরিয়া করা যায়, এই আরোহী বিচার তখনই সম্ভব। এবং এই দিক দিয়া দেখা যাইবে, দাবা খেলার তত্ত্ব কখনই বিজ্ঞান হইয়া দেখা দিবে না, কারণ, যেহেতু একটি ঘুঁটির রকমারি চাল সীমাবদ্ধ আর তাহা ছাড়া একটি চালের সহিত অন্য চালের মিল নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অঙ্কশাস্ত্রগত মানগুণ্য ও পরখ

অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌রা সঠিক কনটিনিউয়ম (continuum) বলিতে কি অর্থ করিয়া থাকেন তাহা যদি আমরা জানিতে চাহিয়া এই ব্যাপারে জ্যামিতির শরণাপন্ন হই, তাহা হইলে তাহা নিরর্থক হইবে। একজন জ্যামিতিবিদ্ যে নকশাগুলি অনুশীলন করেন, সেইগুলিকে কিভাবে নিজের কাছে [কাজে] রূপায়িত করা যায় তাহারই অনুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহার কল্পরূপগুলি তাঁহারই নিকট যন্ত্র মাত্র; ঠিক যেমন তিনি খড়িটি ব্যবহার করেন, অবিকল তেমনি ধারায় — তিনি তাঁহার জ্যামিতিতে (space) অবকাশ ব্যবহার করেন; এবং এই সূত্রে, কোন ক্রমেই অঘটনের উপর খুব কিছু গুরুত্ব আরোপ করা বিধেয় নহে; যাহা, অর্থাৎ যে অঘটন, প্রায়শঃ লক্ষণীয়, খড়ির সাদাটে ভাব হইতে বেশী করিয়া গণ্য করিবার মত নহে।

খাঁটি বিশ্লেষণকারীর পক্ষে এহেন ফাঁদকে ভয় করিবার কারণ নাই। তিনি গণিতশাস্ত্র হইতে অধিকন্তু অকেজো অনুকগুলিকে উৎখাত করিয়াছেন; এবং এখন, একমাত্র তিনিই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ক্ষমতা ধরেন। যথার্থই কনটিনিউম [কনটিনিউয়ম] (continuum) কি যাহা লইয়া অঙ্ক শাস্ত্রবিদ্‌রা যুক্তিবিবেচনা করেন — অনেক বিশ্লেষণকারী তাঁহাদের শিল্পতত্ত্ব লইয়া গভীর আলোচনায় নিবিষ্ট — এ প্রশ্নের এ যাবৎ উত্তর দিয়াছেন, নজিরস্বরূপ তানারীর "এ্যাঁত্রোদাকশিয় আলা থেওরই দে ফোংকশিওঁ দিউন ভারিআব্‌ল" এর কথা উল্লেখ করা যায়।

এখন আমরা পূর্ণসংখ্যা লইয়া কাজ সুরু করিব — দুইটি যে কোন ধারাবাহিক গোচের (sets) এক বা তাহার বেশী মধ্যপর্যায়ে গোচে বসান পর-পদ-প্রবিষ্ট (intercalcate) করান যাক এবং তাহার পর এইগুলির মধ্যে-অন্তরে, পুনরায় অন্য গোচ স্থাপন করা যাক, আর এইভাবে করিয়া চলিতে হইবে। ইত্যাকারে আমরা বিবিধ ডাকের (terms) অযুত সংখ্যা পাইব, এইগুলি যে সংখ্যা হিসাবে দেখা দেয় — তাহাকে ভগ্নাংশিক, মূলদ ও প্রমেয় (commensurable) বলা হয়। কিন্তু এখানেই ইহার শেষ নয়, মনে রাখা কর্ত্তব্য যে এই ডাকের মধ্যে সংখ্যায় ইহারা অসীম — অন্য ডাক স্থাপন করাও হয়, যাহাদের অমূলদ ও অপ্রমেয় (uncommensurable) বলা হয়।

আর বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্বে, এখানেই আমি একটি প্রাথমিক, বা প্রারম্ভিক মন্তব্য করিতে চাই, যে এইরূপে ধারণাকৃত কনটিনিউয়ম (continuum) আর কিছুতেই নির্দিষ্ট ক্রমে সাজান — অবশ্য, সংখ্যায় অসীম সঠিক গতানুগতিক-সাদাসিধে ধ্যানধারণা নহে, কিন্তু বাহ্যত একের পরে বা সহিত অন্যের স্থিতি; যাহাতে, সাধারণত ধরা হয় যে কনটিনিউয়মের অনুকগুলির মধ্যে এমন এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, যে পরম্পরা ঘনিষ্ঠতা উহাকে এক অটুট রূপে গঠন করে; যাহাতে, রেখার আগে বিন্দুর কোন অস্তিত্বই নাই অথচ, কিন্তু রেখা বিন্দুর পূর্বে আছে। এই হিসাবে, অত্যন্ত গণ্যমাণ্য, প্রখ্যাত ফরমূলা অনুযায়ী কনটিনিউয়ম 'বহুতায় একত্ব' — একত্ব নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং এখন বহুতাই বিদ্যমান। তাই বলিব, ইহার বলিষ্ঠতা বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া, গর্ব্ব অনুভব করিয়া, বিশ্লেষণকারীরা ইহার, এই তত্ত্ব লইয়া, যুক্তিবিবেচনা করেন — ফলে দেখা যাইবে তাঁহারা যেভাবে কনটিনিউয়মকে সংজ্ঞা-সূচিত করিয়া থাকেন, তাহাতে, তাঁহাদের খুব কমই যৌক্তিকতা বর্তমান। এখন পাঠকদের এইটুকু সতর্ক করাই যথেষ্ট হইবে যে, পদার্থ বিজ্ঞানবিদের এবং অধিবিদ্যাবিৎ এর কনটিনিউয়ম হইতে যথার্থ অঙ্কশাস্ত্রগত কনটিনিউয়ম একেবারে অন্য স্বভাবের বস্তু।

সম্ভবত, একথাও বলা যাইতে পারে যে, যে অঙ্ক শাস্ত্রবিদ্‌রা এহেন সংজ্ঞা লইয়া সন্তুষ্ট — তাঁহারা নিছক বাক্যবিন্যাসের দ্বারা প্রতারিত। ঐ সকল গোচের প্রত্যেকটির রকমফের যথাযথ ভাবে প্রদর্শন করান উচিত, কেমন ভাবে তাহাদের বসান হইল তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান উচিত, এবং দেখান উচিত যে কেমনভাবে উহা সম্ভবপর হইল। এ কথা উত্থাপন করা ভুল হইবে — এই যুক্তিবিবেচনার বিষয়ীভূত হইয়া শুধু সেই গোচগুলিরই সত্তা আসে যাহা তাহার পূর্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী অন্যসকল গোচের মধ্যে নিহিত আছে। একমাত্র উহারই সংজ্ঞার মধ্যে স্থান লাভ (intervene) করা উচিত। এবং তাই আমরা গোচগুলি কিভাবে বসান হইল বা স্থান দখল করিল তাহা লইয়া কালক্ষয় করিব না; ইহাও সত্য যে, যদি কেহ এই কথাটি মনে রাখেন যে জ্যামিতিবিদের ভাষায় 'সম্ভব' কথাটির সরল অর্থ প্রতিবাদ হইতে রেহাই পাওয়া, তাহা হইলে প্রয়োগ প্রয়োজনার সম্ভাবনা সম্পর্কে কেহই দ্বিরুক্তি করিবেন না। এখনও কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হয় নাই, এই দীর্ঘ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার পর পুনরায় আমরা বিচার করিব।

অপ্রমেয়র (uncommensurable) সংজ্ঞা ঃ — বার্লিন গোষ্ঠির অঙ্কবিদ্‌রা, বিশেষত 'ক্রণেকার', পূর্ণসংখ্যা ব্যতীত অন্য কোন অনুক ব্যবহার না করিয়া অমূলদ এবং ভগ্নাংশ সংখ্যাগুলির অবিচ্ছিন্ন গ্রাম নির্ম্মাণ করিতে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত। এই মতের ব্যাপারে বলা যায়, অঙ্ক শাস্ত্রগত কনটিনিউয়ম সম্পূর্ণরূপে মনগড়া বিষয়, এবং ইহাতে পরখের কোন স্থান নাই।

মূলদ সংখ্যার ভাবাদর্শ তাঁহাদের কাছে কোন সূত্রেই প্রতিবন্ধক হইয়া দেখা দেয় না; তাঁহারা অপ্রমেয় সংখ্যাকেই শুধু সংজ্ঞায় সূচিত করার জন্য একনিষ্ঠভাবে সাধনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সংজ্ঞাকে জ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বে আমার মনে হয় কিঞ্চিৎ মন্তব্য করা

সমীচীন, কেন না যে সকল পাঠকরা জ্যামিতিবিদ্‌দের আচার অভ্যাস সম্পর্কে খুব অল্পই অবহিত, তাহাদের উহা যারপরনাই বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে, যথা, অঙ্কবিদ্‌রা কোন সূত্রেই বস্তুসকল অনুশীলন করেন না, পরন্তু বস্তুসকলের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে তাহাই অনুশীলন করাই তাঁহাদের লক্ষ্য। বস্তু সকলের সম্বন্ধ হেরফের না করিয়া যদি তাহাদের পরিবর্ত্তে অন্য কিছুর দ্বারা প্রতিস্থাপনা করা হয়, সেক্ষেত্রে তাঁহাদের কোনই ব্যাঘাত হয় না, তাঁহাদের লক্ষ্য পদার্থ প্রকৃতি অনুধাবন করা নহে, তাহারা কেবলমাত্র আঙ্গিক বিষয়েই জিজ্ঞাসু।

'ক্রণেকার' যে অতি সরল প্রতীক দ্বারা এই অপ্রমেয় সংখ্যার নামকরণ করিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে একরূপ বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য হইবে, যদি আমরা এই সহজ কথাটি স্মরণে না রাখি যে, যথা বলা যায়, আমাদের ধ্যান-ধারণার ভাবাদর্শ হইতে উহা ভিন্ন ধরণের, আমাদের ক্ষেত্রে এমন এক মাত্রিক নিশ্চিতি পাওয়া দরকার যাহা পরিমেয় সাপেক্ষ এবং প্রায় অংশেই যাহা অধিগম্য।

এখন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাক 'ক্রণেকারে'র সংজ্ঞাটি কিরূপ। প্রমেয় সংখ্যাগুলিকে বহুপ্রকারে শ্রেণী ভাগ করা যাইতে পারে এবং সেই ভাগ এই শর্ত্ত অনুযায়ী হইবে যে, প্রথম শ্রেণীর যে কোন সংখ্যাই দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কোন সংখ্যা হইতে বড় বা উচ্চ মানের; ইহাতে আবার এধরণের ব্যাপারও ঘটা সম্ভবপর যে, প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা সকলের মধ্যে এমন একটি সংখ্যা আছে — যাহা অন্যান্য সংখ্যা হইতে ছোট; এখন, যদি প্রথম শ্রেণীতে, ধরা যাক, '২' সংখ্যাটি লইয়া এবং '২' হইতে বড় বড় সংখ্যা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে '২' হইতে সমস্ত সংখ্যা ছোট ধরা হয়, তখন খুব স্পষ্টত দেখা যাইবে, '২' সংখ্যাটি প্রথম শ্রেণীর সমস্ত সংখ্যার তুলনায় সর্ব্বনিম্ন হিসাবে দেখা দিবে। তাই '২' সংখ্যাটিকে এই ভাগের প্রতীকরূপে বাছাই করা যাইতে পারে।

এখন ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, অন্যপক্ষে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে এমন এক সংখ্যা বর্ত্তমান যাহা অন্য আর সকল সংখ্যার তুলনায় সর্ব্ব উচ্চমানের; তখন ফলে এই ব্যাপার ঘটে, উদাহরণ স্বরূপ, — যদি প্রথম শ্রেণীতে '২' হইতে বড় বড় সংখ্যাগুলি ধরা হয় — এবং যদি দ্বিতীয় শ্রেণীতে, '২' কে লইয়া, '২' হইতে ছোট ছোট সংখ্যা সকল আলাদা করা হয় — তখনই '২' সংখ্যাটিকে, এখানেও, আবার এই ভাগের প্রতীকরূপে ধার্য্য করা যায়।

কিন্তু এ ব্যাপারও সমানই ঘটিতে পারে, যে আমরা প্রথম শ্রেণীতে এমন কোন সংখ্যা খুঁজিয়া পাইব না যাহা অন্য সকল সংখ্যার তুলনায় ক্ষুদ্র, অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতেও এমন সংখ্যা পাইব না যাহা অন্যসকলের তুলনায় বড়। এই সূত্রে, ভাবা যাক — প্রথম শ্রেণীতে আমরা সমস্ত সংখ্যাই যাহাদের বর্গ '২' হইতে বড়, সেইগুলিকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে '২' হইতে যাহাদের বর্গ ক্ষুদ্র সেইগুলিকে রাখিলাম। এখন আমরা জানি যে ঐ দুইভাগের মধ্যে এমন কোন সংখ্যার বর্গই নাই যাহা '২' এর সমান। ফলত, সাক্ষাৎ বলা যায়, প্রথম শ্রেণীতে এমন কোন সংখ্যাই নাই যাহা অন্য সকল সংখ্যার তুলনায় ক্ষুদ্র — কারণ সংখ্যার বর্গে '২' এর যতই কাছাকাছি যাক না কেন সমান হইবে না; তবে সর্ব্বসময় আমরা এমন প্রমেয় সংখ্যা পাইতে পারি যাহার বর্গ প্রায় '২' এর কাছাকাছি হয়। 'ক্রণেকারে'র সাব্যস্ত মতের দিক হইতে এই অপ্রমেয় সংখ্যা √২ টি সেই প্রমেয় সংখ্যাসকল ভাগের বিশেষ পদ্ধতির প্রতীক ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়; এবং প্রত্যেকটি পুনঃ দ্বিধাকরণের ধারার প্রতি উত্তরে — তাহা প্রমেয়ই হোক আর নাইই হোক এই ভাবে এক সংখ্যায় দেখা দেয়, যে-সংখ্যা প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। তবে ইহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হইবে এই যে, এই প্রতীক সকলের আদি উৎপত্তি বিষয়ে আমরা বিস্মৃত হইব; এবং কোন বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তাহাদের যে একটা মূর্ত্ত অস্তিত্ব আছে তাহা আমরা আরোপ করিলাম, — একথা ইহা ব্যাখ্যা করাও বাকি থাকিয়া যায় এবং অন্য পক্ষে ভগ্নাংশের ব্যাপারে বাধাবিপত্তির কি সূত্রপাত ঘটে না, বা আরম্ভ হয় না?

পূর্বাহ্নে যদি আমরা সেই বিষয় (matter) না জানি যে, যাহা, অনবরত ভাগ-সাপেক্ষ অর্থাৎ কনটিনিউয়ম — তাহা হইলে কি আমরা ঐ সকল সংখ্যাগুলির আন্দাজ পাইব?

ভৌত কনটিনিউয়ম — অঙ্ক শাস্ত্রগত কনটিনিউয়মের ভাবাদর্শ সত্যই কি পরখ হইতে সোজাসুজি বাহির হইয়াছে কিম্বা নয় তাহা এখন আমাদের প্রশ্নের বিষয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পরখের উপাত্তগুলি — যাহা আমাদের নিছক সংবেদন, উহাকে মিত করা যাইতে পারে। এবং একথা বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত হইব, যে ইহা সত্যই সম্ভব, কেন না কিছুদিন হইল উহা পরিমেয় করা প্রয়াস চলিতেছে এবং একটি নিয়মও বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এই নিয়মটিকে বলা হয় 'ফেকনারের নিয়ম' (Fechner's Law) ইহা বলে, 'সংবেদন — সংবর্গমানের উদ্দীপকের সমানুপাতিক'। কিন্তু যে সকল পরখ দ্বারা এই নিয়ম প্রবর্তন করার আগ্রহ, প্রচেষ্টা চলিতেছে সেগুলিকে যদি আমরা বিচার করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিব, যে, বিচার আমাদের পুরাপুরি ঠিক উল্টা সিদ্ধান্তে লইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ যথা — এই ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়াছে যে '১০' গ্রাম ভার — A এবং ১১ গ্রাম ভার — Bতে একই-সমানই সংবেদনের উদয় হয়, আবার আর একটি ভার 'C' যাহার '১২' গ্রাম — B-এর সহিত তাহার কোন পার্থক্যই দেখা যায় না, অথচ ভার —A এর সহিত 'ভার — C'এর পার্থক্য দেখা যায়। অতএব পরখ সকলের মোটামুটি ফলগুলিকে এইভাবে এই সম্বন্ধে প্রকাশ করা যায় —$A=B$, $B=C$, $A<C$ এবং ইহাকে ভৌত কনটিনিউয়মের সূত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে বিরুদ্ধবাদের নিয়মের সহিত ঘোর অমিল রহিয়াছে দেখা যায়, এই অমিলকে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যেই আমাদের অঙ্কশাস্ত্রগত কনটিনিউয়ম আবিষ্কার করিতে বাধ্য করে। তাই

আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পরিচালিত হই যে ঐ ধারণা একেবারেই মন হইতে সৃষ্ট, এবং পরখ ব্যাপারেই সে সুযোগের কারণ হইয়াছে। আমরা কোনক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারি না দুইটি মাত্রিক যাহা তৃতীয়টির সমান — সমান অথচ একের সঙ্গে অন্য সমান নহে, তাই A নিশ্চয়ই B হইতে ভিন্ন এবং B, C হইতে ভিন্ন প্রকারের এই কথা সাব্যস্ত করিতে পরিচালিত হই, এবং যদি আমরা এই সত্য সম্পর্কে অবহিত না হই — তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের চেতনের ত্রুটিই তাহার কারণ?

আঁরি প্যাওয়াঁকারে কৃত 'সায়েন্স ও হাইপথেসিস'
হইতে কমলকুমার মজুমদার অনূদিত।

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. আগাগোড়া 'পৌনঃপৌনিকতা' ব্যবহার করা হলেও কোনো অভিধানে এর সমর্থন নেই। শব্দটি হবে পৌনঃপুনিকতা।

২. জন্যত্ব - 'জন্য' একটি সংস্কৃত শব্দ, অর্থ ফল (Effect)। জন্যত্ব - The property of being an effect, 'জন্য'র ধর্ম।

৩. সিলজিসম - প্রথম পর্ব অঙ্কভাবনায় (প্রকাশিত এই লেখাটির প্রথম কিস্তিতে) 'সিলজিসম' [syllogism] বানান ব্যবহার করা হয়েছে যা অধিকতর সঙ্গত। দুটি বিবৃতি থেকে সিদ্ধান্ত, অনুমান। Syllogism - An argument or form of reasoning in which two statements or premises are made and a logical conclusion is drawn from them.

এই লেখাটির প্রথম পর্ব, 'অঙ্ক ভাবনা', প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গাণিতিক সম্ভাব্যতার উপক্রমণিকা

লোকমুখে মহাবিজ্ঞানী নিউটনের নামে একটি খোসগল্প প্রচলিত আছে। মাধ্যাকর্ষণসূত্র আবিষ্কারের মূলে নাকি একটি পতনশীল আপেলফল বর্তমান। এবম্বিধ কাহিনীর সত্যতাবিষয়ে সন্দেহ অত্যন্ত স্বাভাবিক; কিন্তু নিউটনের কালে যে আপেলফল মাটির দিকে পড়িত, নিউটনের আগে এবং এখন পর্যন্তও পৃথিবীর সর্বত্র, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরো বহুবিধ ঘটনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিলক্ষিত হয়, যেমন অগ্নি হইতে আলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যেমন কোন বস্তুকে অন্য কোন কঠিন বস্তুর দ্বারা আঘাত করিলে তাহা হইতে শব্দ সৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। উপরের উদাহরণগুলিকে আমরা বিশেষ অর্থে আবশ্যকীয়তা (necessity) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। আপেলফল মাটির দিকে নামিয়া আসে না এমন কোন ঘটনা আমাদের জানা নাই, নির্দিষ্ট উষ্ণতার ঊর্দ্ধে জল বাষ্পে পরিণত হয় না এবম্বিধ দৃষ্টান্ত কাহারও বিদিত নহে, কোন বস্তুকে কোন কঠিন বস্তুর দ্বারা আঘাত করিলে তাহা হইতে সদাসর্বদাই শব্দ নির্গত হইয়া থাকে। এবম্প্রকার আবশ্যকীয়তাকে বস্তুগত (ভৌত) আবশ্যকীয়তা (physical necessity) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অন্য আরেকপ্রকার আবশ্যকীয়তার কথাও এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাহাদিগকে ন্যায়সঙ্গত আবশ্যকীয়তা (logical necessity) বলা হইয়া থাকে। আমরা যদি ইউক্লিডের জ্যামিতি বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় থাকি তাহা হইলে এই কথা মানিয়া লইতে আমরা অনন্যোপায়, ত্রিভুজের যে কোন দুই বাহুর সমষ্টি একত্রে তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড়। এই সত্য অস্বীকার করিলে ইউক্লিডের অঙ্কশাস্ত্রের সমস্তটাই অর্থহীন হইয়া যায়। সুতরাং, ত্রিভুজের যে কোন বাহু অপর দুই বাহুর সমষ্টি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে আমরা বাধ্য। এবম্প্রকার আবশ্যকীয়তাকে যুক্তিগ্রাহ্য আবশ্যকীয়তা বলা হইয়া থাকে।

বস্তুগ্রাহ্য আবশ্যকীয়তাকে অনেক সময় জাগতিক কানুন (natural law) নামে অভিহিত করা হয়। মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগিয়া থাকে যে জাগতিক কানুনগুলি কি সর্বক্ষেত্রে ও সর্বসময় নিশ্চিত? ইহার উত্তরে না ভিন্ন অন্য কিছু বলা অযৌক্তিক। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ঐগুলি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। যখন জাগতিক কানুনের এক্তিয়ারবহির্ভূত (!) কোন ঘটনা ঘটিয়া যায়, আমরা যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হই, বলি, ইহা একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। আশ্চর্যজনক ঘটনার সম্ভাবনা, আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি, নিরতিশয় কম, সুতরাং নগন্য [নগণ্য]।

প্রসঙ্গক্রমে দৈবসম্ভাবনার (chance) কথাও না আসিয়া পারে না। মুদ্রাক্ষেপণের কথা সকলেরই জানা থাকা স্বাভাবিক। মুদ্রার দুইটি দিক আছে, ইংরাজীতে উহাদিগকে হেড ও টেল বলা হইয়া থাকে। ক্ষেপণান্তে কোন দিক উপরিভাগে থাকিবে, তাহা অনির্দিষ্ট। দুই

দিকেরই উপরিভাগে থাকিবার দৈবসম্ভাবনা সমান, যদি না অন্য কোন বিষয়ের হস্তক্ষেপ ঘটে। প্রাথমিক অবস্থিতি, ক্ষেপণশক্তি প্রভৃতির উপর ফলাফল সদাসর্বদাই নির্ভরশীল। বহুবার মুদ্রাক্ষেপণ করিলে দেখা যাইবে যে হেড ও টেলের সংখ্যা পরস্পরের অতি নিকট। এই কারণে বলা হইয়া থাকে যে উহাদের সম্ভাবনা সমান, উভয়েরই সম্ভাবনা $\frac{১}{২}$।

লুডো খেলার ঘুটিতে ছয়টি দিক আছে — ১,২,৩,৪,৫,৬ সংখ্যাত। এই ক্ষেত্রেও যে কোন সংখ্যাতদিকের উপরিভাগে থাকিবার সম্ভাবনা সমান। সর্বসাকুল্যে দৈবসম্ভাবনা ছয়টি, প্রতিটির নিজস্ব সম্ভাবনা তাই $\frac{১}{৬}$।

পরিসংখ্যান হইতে এই কথা জানা যায় কোন নগরের, যেমন কলিকাতার, যেমন বোম্বাইয়ের, জন্ম মৃত্যু বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ আত্মহত্যা পুনর্বিবাহ, চুরি ডাকাতি খুন, প্রতি লক্ষ নাগরিকে, নাতিদীর্ঘকালের মধ্যে এবং সাধারণভাবে অন্যান্য সামাজিক বিষয় সকল সমতা রক্ষা করিলে, অবিকল সমান না হইলেও মোটামুটিভাবে কোন এক নির্দিষ্ট সংখ্যার নিকটবর্তী থাকিবে। অন্য অনেক বিষয় রহিয়া যায়, যেমন যুদ্ধ, যেমন দুর্ভিক্ষ বা মহামারী যাহা সম্পূর্ণত আমাদের জ্ঞান ও ধারণার বহির্ভূত ঘটনা, যাহারা ঐ সংখ্যার পরিবর্তনের জন্য দায়ী। এই ক্ষেত্রেও কোন্ বিশেষ বৎসরে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহাদির দৈবসম্ভাবনা কিরূপ তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব।

কোন বাক্সে যদি সাদা ও কালো উভয় রঙেরই কিছু বল থাকে তবে চোখ বুজিয়া কোন বল তুলিয়া লইলে তাহা সাদা বা কালো যে কোন রঙেরই বল হইতে পারে। দুই রঙেরই বলের সংখ্যা সমান হইলে এবং রঙ ছাড়া উহাদের অন্য কোন পার্থক্য না থাকিলে সাদা বা কালো বল তুলিবার দৈবসম্ভাবনা (chance) সমান।

এইরূপে আরো বহুবিধ উদাহরণের সাহায্যে গাণিতিক দৈবসম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করা যায়। উদাহরণের সংখ্যা আর না বাড়াইয়া আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি, কোন নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে যদি ক, খ, গ, ঘ — এই চারিটি ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে 'ক' ঘটিবার সম্ভাবনা বা 'খ' কিংবা 'গ', এমন কতকগুলি নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যে উহাদের ঘটিবার জন্য দৈবসম্ভাবনার উপর নির্ভর করিতে হয়।

দৈবসম্ভাবনা (chance) আমাদিগকে সম্ভাবনা বিষয়ে (probability) কৌতূহলী করিয়া তোলে। সম্ভাবনাকে আমরা দৈবসম্ভাবনার মাত্রা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সংবাদপত্রে যখন বলা হইয়া থাকে যে অদ্য লোকসভায় তুমুল উত্তেজনার সম্ভাবনা আছে, ইহার অর্থ এই, অন্যান্য বিষয়, যেমন পূর্বদিনের ঘটনাবলী, যেমন আলোচ্যবিষয় ইত্যাদি, হইতে উত্তেজনার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া বোধ হয়। কোন শিশুকে দেখাইয়া যখন বলা হইয়া থাকে, ঐ শিশুটির বড় হইলে শিল্পী হইবার সম্ভাবনা আছে, অন্যবিষয়, যেমন পারিবারিক প্রেরণা, শিল্পবিষয়ে শিশুটির অনুরাগ, শিশুবয়সেই কৃত কোন কোন নজির ইত্যাদি ঐ সম্ভাবনার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল।

অত্যন্ত জোরে গাড়ি চালাইলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে, নিরীহ পদচারণায়ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম নহে। ইহা সুবিদিত যে অত্যন্ত জোরে গাড়ি চালাইলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অধিকতর, এইরূপ সিদ্ধান্তের মূলে নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিরাজমান।

ঘোড়দৌড় বিষয়ে বলা হইয়া থাকে অমুক দুইটি ঘোড়ার মধ্যে অমুক ঘোড়াটির বাজি জিতিবার সম্ভাবনা ৭:৯, কিংবা উইম্‌ব্লডন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সর্বশেষ খেলায় অমুক খেলোয়াড়ের জিতিবার সম্ভাবনা ১০:৭। অভিজ্ঞরা ঘোড়া দুইটির দৌড়াইবার ক্ষমতা, পূর্ব রেকর্ড, জকির এলেম প্রভৃতি বিষয়ে বিচার বিবেচনা করিয়া সম্ভাবনাকে সংখ্যাত করিয়া তোলেন, উইম্‌ব্লডন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও ইহাই। এইরূপ আরো বহুবিধ উদাহরণ দেখানো যাইতে পারে, যাহার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় সম্ভাবনাকে সংখ্যাত করিয়া তুলিবার, সংখ্যার সাহায্যে বুঝিবার এই প্রবণতা আমাদের মধ্যে রহিয়াছে।

একটি বাক্সে যদি একটি সাদা ও একটি কালো বল থাকে তবে চোখ বুজিয়া একটি বল তুলিলে উহা সাদা কিংবা কালো, যে কোন রঙেরই বল হইতে পারে। সাধারণভাবেই এই কথা বলা সম্ভব, বলটি সাদা কিংবা কালো রঙের হইবার সম্ভাবনা সমান। সংখ্যার সাহায্যে বর্ণিত করিতে হইলে আমরা বলিব উহাদের উভয়েরই সম্ভাবনা $\frac{১}{২}$, যেহেতু মোট বলের সংখ্যা ২, যাহার মধ্যে সাদা ও কালো প্রতিটি বলের সংখ্যা ১। বাক্সে যদি ১০টি সাদারঙের বল ও মাত্র ১টি কালো রঙের বল থাকে, তবে অবশ্যই সাদা রঙের বল তুলিবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এই ক্ষেত্রে মোট বল ১১টি, যাহার মধ্যে সাদা ও কালো রঙের বলের সংখ্যা যথাক্রমে ১০ ও ১। অতএব, সাদা রঙের বল তুলিবার সম্ভাবনা $\frac{১০}{১১}$ এবং কালো রঙের বল তুলিবার সম্ভাবনা $\frac{১}{১১}$। সাদা বল ৬টি ও কালো বল ৩টি হইলে সাদা বল ও কালো বল তুলিবার সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{৬}{৯}$ ও $\frac{৩}{৯}$ অর্থাৎ $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৩}$। এই প্রকারেই সম্ভাবনাকে সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। উপরেই শেষ উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা বলিতে পারি সাদা বল তুলিবার সম্ভাবনা ২:১।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পরিণত বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন লোকের পক্ষে কোন্ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা অধিকতর, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে সাঙ্কেতিক উপায়ে, সংক্ষেপে ও অতি নিপুণভাবে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে সংখ্যার সাহায্য লইতে হয়।

ইতিপূর্বে কয়েকবার বাক্সের মধ্যে সাদা ও কালো বলের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। বিষয়টি জটিলতর হইয়া উঠিবে

যখন সাদা ও কালো বলের সংখ্যা জানা থাকিবে না। এইক্ষেত্রে সাদা ও কালো বল তুলিবার সম্ভাবনা নিরূপিত করা সম্ভব নহে। যেহেতু বলগুলির সংখ্যা সম্পর্কে কিছুই জানা নাই, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ অনাবশ্যক হইয়া যায়। কিন্তু যদি জানা থাকে, সাদা ও কালো বলের সংখ্যা সমান, সংখ্যাটি জানা না থাকিলেও, তৎক্ষণাৎ অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে উহাদের তুলিবার সম্ভাবনাও এক অর্থাৎ উভয়েরই $\frac{১}{২}$ সম্ভাবনা।

বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে জটিলতর গাণিতিক কৌশলের প্রয়োজন। উপক্রমণিকার ক্ষেত্রে উহা স্থগিত রাখিলেও ক্ষতি নাই। অঙ্কশাস্ত্রে সম্ভাব্যতার প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীন অঙ্কশাস্ত্রে এই সম্ভাব্যতার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না। মহাবিজ্ঞানী গ্যালেলিওর ধারণায় প্রথম দৈবসম্ভাবনার (chance) আবির্ভাব ঘটে। বাস্তবিকক্ষেত্রে অঙ্কশাস্ত্রে এইরূপ সম্ভাবনার বিষয় লইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর দুই বিজ্ঞানী প্যাস্কেল্ [পাসকাল] (১৬২৩-১৬৬২) ও ফারমঁট [ফার্মা] (১৬০১-১৬৬৫) প্রথম আলোচনা করেন। সেভিয়ার দ্য মারে নামে জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক প্যাস্কেল্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রের গরমিল বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই সময় প্যাস্কেলের মন প্রথম সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা করে এবং তিনি ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। এই আলোচনা ফরেমাঁকে [ফার্মা] কৌতূহলী ও উৎসাহিত করে। এই দুই বিজ্ঞানী সম্মিলিতভাবে সম্ভাবনার শাস্ত্রকে গড়িয়া তুলিলেন।

হেগেন্স্ (১৬২৯-১৬৭৫), জেকব বেয়ার্‌নলি (১৬৫৪-১৭০৫), আব্রাহাম দ্য মভিয়ার (১৬৬৭-১৭৫৪), ল্যাপ্লাস [লাপ্লাস] (১৭৪৯-১৮২৭) — এই সব বিজ্ঞান জগতের মহাজনেরাও নিজেদের বিচারবুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির সাহায্যে গণিতের এই বিভাগকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পরিশেষে উল্লেখনীয়, অঙ্কশাস্ত্রে এই সম্ভাব্যতার বিভাগটি বিশ্বাসভিত্তিক; অর্থাৎ কিছু বিশ্বাসকে অবলম্বন না করিলে এই শাস্ত্রে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। সম্ভাবনাগুলির অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্বভাবতই মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য। কিছু বিশ্বাস ছাড়া এই শাস্ত্র, এবং আরো অনেক শাস্ত্রই, গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। বস্তুত, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিদেশে, অনুসন্ধিৎসার মূলে, প্রেরণার আদিতে, সদাসর্বদাই বিশ্বাস বিদ্যমান। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ইলেকট্রনের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিলে আর উপায় নাই। পল বলিয়াছেন 'Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.' বিশ্বাস বা মতি অভিপ্রেত বস্তুনিচয়ের মূল বা আধার, সেই বস্তুনিচয়ের সাক্ষ্য প্রমাণ, যাহা নিয়ত অদৃশ্য।

ঋণস্বীকার ঃ '*Introduction to Mathematical Probability.*
by J. V. Uspensky.

সুব্রত চক্রবর্তী

বীজগণিতের ইতিকথা

রেণেশাঁস

রেণেশাঁস যুগে বীজগণিতের (Algebra) উপর প্রথম চিন্তাশীল লেখা প্যাচিঅলির (Pacioli) *সুমা* (*Suma*) — ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সুষ্ঠুভাবে না হইলেও এই পুস্তকটিতে বীজগণিত সম্বন্ধীয় তৎকালীন চিন্তাধারা মোটামুটিভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল; প্রচলিত স্থুল [স্থূল] প্রতীকরীতির সহায়তায় এই পুস্তকটীতে সমীকরণ একটি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিল।

ইহার পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পুরোপুরি বীজগণিত লইয়া লিখিত প্রথম পুস্তক হইল — রুডলফ্ এর '*ক্যস্*' (১৫২৫ খৃঃ)। মতবাদের দিক হইতে সবিশেষ উন্নত না হইলেও বর্গমূল প্রতীকরীতির উন্নতিবিধানে এবং জার্মাণীতে বীজগণিতের প্রসারে এই পুস্তকটির বিশেষ অবদান রহিয়াছে। ১৫৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেল (Stifel) এই পুস্তকটির নবতর সংস্করণ ছাপাইয়া ইহার গুরুত্ব আরও বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

ছাপার হরফে প্রথম যুগান্তকারী বীজগণিতের বই কিন্তু কার্দান্ [জিরোলামো কার্দানো] বিরচিত 'আর্স ম্যাগনা' (Ars Magna) — ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে, প্রধানতঃ সমীকরণ সমাধানের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। দ্বিঘাত, ত্রিঘাত সমীকরণ ছাড়াও ইহাতে জটিল রাশির (Complex Number) ব্যবহার ছিল। এককথায় এই পুস্তকটিকে আধুনিক বীজগণিতের দিকে প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে।

ইহার পরবর্তী বীজগণিত সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য মুদ্রিত রচনা তারতাগলিয়া কৃত 'জেনারেল ত্রাটো' (১৫৫৬-১৫৬০)। যদিও কার্দান্-এর সহিত তাহার ঘন সমীকরণ সংক্রান্ত বিরোধ এই পুস্তক রচনার পূর্বেই তাহার অন্য পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৫৪৬)।

ইংল্যাণ্ডে বীজগণিতের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন রবার্ট রেকর্ড (Robert Recorde) ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার 'হোয়েটষ্টোন অফ উইটে' (Whetstone of Witte) তৎকালীন সময়ের তুলনায় একটি সর্বাংগ সুন্দর প্রামাণ্য গ্রন্থ। পরবর্তীকালে তাঁহারই প্রয়াসে মাস্টারসন (Masterson) এর অসম্পূর্ণ লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল ১৫৯২-১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বীজগণিতের প্রথম ইতালীয় ভাষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন বম্বেল্লি (Bombelli)।

প্রাথমিক বীজগণিত এই সময় মোটামুটি পরিণত স্তরে পৌঁছিয়াছিল। তখন পর্যন্ত কেবল মাত্র প্রতীকরীতির আরও কিছু উন্নতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা ছিল, যাহা পরবর্তীকালে ভিয়েতা (Vieta) ১৫৯০ খৃঃ, হ্যারিয়ট (Harriot) ১৬১০ খৃঃ, ওউটরেড (Oughtred) ১৬২৮ খৃঃ, দে কার্তে (Des cartes) ১৬৩৭ খৃঃ এবং নিউটন যুগের বৃটিশ পণ্ডিতদের ঐকান্তিক প্রয়াসে সাধিত হইয়াছিল।

প্রাথমিক বীজগণিতের প্রধান অংশ এই ভাবে দেখা গেল সপ্তদশ শতাব্দীতেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

এ্যালজেব্রা (Algebra) নামকরণ

এইবার এ্যালজেব্রা ও তাহার কতকগুলি অপরিচিত নামের ইতিহাস লইয়া কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

"যাহা কিছু রহস্য যাহা কিছু অজ্ঞাত — সকলি জানিবার নিয়ম; প্রাকৃতিক নিয়মানুসন্ধানের নিয়ম" — এবম্বিধ সকল নাম দিয়া এই বিশেষ বিজ্ঞানের নামকরণের ইতিহাস শুরু হইয়াছিল (Ahmes খৃঃ পূঃ ১৫৫০ এবং পরবর্তীকালে Gosselin ১৫৭৭; Seki ১৬৮০)।

গ্রীসে ইহার কোন আলাদা নামকরণ করা হয় নাই। সমগ্র সংখ্যাতত্ত্বকেই গ্রীসিয়রা এ্যারিথ্মেটিক তথা পাটিগণিত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এবং স্বাভাবিক নিয়মেই এ্যালজেব্রাকেও ইহারই মধ্যে অন্তর্ভূক্ত [অন্তর্ভুক্ত] করা হইয়াছিল।

হিন্দু পণ্ডিতদের মধ্যে অবশ্য বিবিধ নামের ব্যবহার লক্ষিত হয়। আর্যভট্ট (৫১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি) মহাবীর (৮১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি) তাঁহাদের নিজস্ব গ্রন্থ যথাক্রমে "আর্যভট্যম্" এবং "গণিতসার সংগ্রহে" বিশেষ কোন নামকরণ ছাড়াই এ্যালজেব্রাকে অন্তর্ভূক্ত [অন্তর্ভুক্ত] করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত এ্যালজেব্রার নামকরণ করিয়াছিলেন "কুটক"। এবং ভাস্কর (১১৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি) সাধারণভাবে সমগ্র অঙ্কশাস্ত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন "বীজগণিত", এ্যালজেব্রাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়াছিলেন "অব্যক্তগণিত" বা "অব্যক্তক্রিয়া" নামে।

চীনদেশে এ্যালজেব্রা সমন্বিত গ্রন্থের নানা প্রকার বিচিত্র নামকরণ দেখা যায়। সহগ (Co-efficient) কে এইখানে গণনা-দণ্ড বলা হইয়াছে। জাপানের বহু বিচিত্র নামের মধ্যে Yendan jutsu অর্থাৎ বিশ্লেষণ প্রথা, Kigen seiho অর্থাৎ গুপ্ত সত্য সন্ধানের নিয়মাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এইখানে লক্ষণীয় এই যে এতাবৎ আমরা যতটুকু কালক্রম অনুসরণ করিয়াছি তাহার মধ্যে যদিও এ্যালজেব্রা নামের পূর্ণ আবির্ভাব ঘটে নাই তবুও আমরা এই নামকে ব্যবহার করিয়াছি সংক্ষেপে গণিত শাস্ত্রের এই বিশেষ শাখাটিকে বুঝাইবার জন্যই।

এ্যালজেব্রা নামের প্রথমতম প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় আরবদেশের প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ আল-খোয়ারিজিমি বিরচিত গ্রন্থের শিরোনামায় — আল্-জাবর'ওয়াল মুকাবালাহ্ (Al-jabarw'al mukabalah) ৮২৫ খৃষ্টাব্দে। ইহারই বিভিন্ন অনুবাদের শিরোনামায় নানা প্রকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবশেষে আমাদের পরিচিত সংক্ষিপ্ত নাম এ্যালজেব্রার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীতে।

আল্-জাবর'ওয়াল মুকাবালাহ্‌র আক্ষরিক অর্থ হইল পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিভেদ। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে বেহা এদীন (Beha Edin) প্রাঞ্জল উদাহরণ দ্বারা ইহার মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দেনঃ

যে কোন একটি সমীকরণ লইয়া দেখা যাক ঃ $bx+2q=x^2+bx-q$ তাহা হইলে আল-জাবর অনুযায়ী $bx+2q+q=x^2+bx$ এবং আল মুকাবালাহ্ অনুযায়ী $3q=x^2$।

সাধারণভাবে বলা য়ায় আল-জাবর এর মূলগত ভাব হইল ঋণাত্মক সংখ্যার জায়গা বদল এবং মুকাবালাহ্‌র হইল মূলতঃ ধনাত্মক সংখ্যার জায়গা বদল এবং সরলীকরণ।

আরবের খ্যাতনামা গণিতবিদ আল খার্খি (Al-Kharkhi) আনুমানিক ১০২০ খৃষ্টাব্দে আল ফখরী (Al-Fakhri) নামে গণিতের পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আল-খোয়ারিজিমির মত তাঁহার গ্রন্থও যদি লাতিনে তরজমা হইত তাহা হইলে এ্যালজেব্রা আজকে এ্যালজেব্রা না হইয়া ফখরি হইতে পারিত — অন্ততঃ ইহা হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমানে [পরিমাণে] যে ছিল তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

বীজগণিতের কয়েকটি প্রতীকচিহ্ন

এখন কয়েকটি প্রতীকচিহ্নের জন্ম-ইতিহাস আলোচনা করা হইবে, কিন্তু এখন হইতে আমরা এ্যালজেব্রাকে বীজগণিত এবং এ্যারিথ্‌মেটিক্‌কে পাটীগণিত নামে অভিহিত করিব।

প্রাথমিক পাটীগণিতের প্রায় সকল প্রতীকচিহ্নই বীজগণিত হইতে আসিয়াছে — মূলতঃ মুদ্রণকারের সুবিধার্থে। মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতেই পাটীগণিতে প্রতীকচিহ্নের প্রথম বিস্তৃত ব্যবহার দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে পাটীগণিতে প্রতীকের ব্যবহার আদৌ গুরুত্ব লাভ করে নাই। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় 'হডারের' ১৬৭২ সালে পুনর্মুদ্রিত পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠার পরেই মাত্র পরবর্তী মন্তব্যটুকু রহিয়াছেঃ "স্মরণ থাকে '+' এই চিহ্ন যোগ বুঝায়, এবং দুইটি রেখা সমন্বিত '=' এই চিহ্ন সমতা বা সমীকরণ বুঝায়, কিন্তু '×' এই চিহ্ন গুণন বোঝায়", পুস্তকের অপর কোথাও অন্য কোনো প্রতীকের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমনকি সমতার আধুনিক প্রতীকচিহ্নের উদ্ভাবক 'রেকর্ড'ও, [Robert Recorde] কেবলমাত্র তাঁহার বীজগণিতের বই 'হোয়েটস্টোন অফ উইটে' (১৫৫৭)-তে এই প্রতীকের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আনুমানিক ১৫৪২ সালে লিখিত পাটীগণিতের বই 'গ্রাউণ্ড অফ আর্টেস' এ ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

প্রাচীনতম প্রতীকচিহ্ন

প্রাচীনতম প্রতীকচিহ্নগুলি মিশরে উদ্ভাবিত। Ahmes Papyrus (আঃ খৃঃ পূঃ ১৫৫০)-এ যোগ বুঝাইতে এবং বিয়োগ বুঝাইতে এই চিহ্নদ্বয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

সুনিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও ডায়োফ্যান্টাস্ (আঃ ২৭৫ খৃঃ) তাঁহার এ্যারিথ্‌মেটিকা-য় সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করেনঃ

"বিয়োগচিহ্নকে বিয়োগচিহ্ন দ্বারা গুণ করিলে যোগচিহ্ন হয়, এবং বিয়োগচিহ্নকে যোগচিহ্ন দ্বারা ভাগ করিলে বিয়োগচিহ্ন হয়। বিয়োগ বুঝাইতে Ψ (শাই) এই চিহ্নকে উল্টাইয়া লিখিতে হইবে।

খুবই সম্ভব যে ইহা Λ ল্যাম্বডা বা গ্রীক L (যাহা বিয়োগসূচক গ্রীক শব্দের প্রথমাক্ষরও বটে) এর অপভ্রংশ।

হিন্দুদিগের মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতীকচিহ্নের বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না, তবে দশম শতাব্দীতে বক্ষালী পাণ্ডুলিপিতে ঋণাত্মক সংখ্যা বুঝাইতে পার্শ্বে '×'এই চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। ভাস্করের পাণ্ডুলিপিতে (আঃ ১১৫০ খৃঃ) ঋণাত্মক সংখ্যা বুঝাইতে সংখ্যার মাথায় বিন্দু বা ছোট বৃত্তের ব্যবহার দেখা যায় (যেমন -৬ বুঝাইতে ˙৬ বা °৬) আবার কোথাও বা সংখ্যাটি একটি বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ শূন্য হইতে ৬ কম।

যোগ ও বিয়োগের ইউরোপীয় প্রতীক চিহ্ন

যোগ বুঝাইতে শুরুর দিকে ইওরোপে p P. বা $\bar{p}$ অথবা প্লাস এই সকল প্রতীকের প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু বিস্ময়কর ইহাই যে যদিও বিয়োগ বুঝাইতে মাইনাস শব্দের ব্যবহার ১২০২ খৃষ্টাব্দে ফিবনোচ্চি এর পুস্তকে পাওয়া যায় প্লাস শব্দের ব্যবহার পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের পূর্বে দেখা যায় না। পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে (যোগচিহ্ন $\bar{p}$ এর অনুকরণ) বিয়োগচিহ্ন হিসাবে $\bar{m}$ এর বহুল প্রচলন দেখা যায়।

সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব

গাণিতিক প্রতীক নির্দ্ধারণে সম্প্রদায়গত রুচির কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লাতিন সম্প্রদায় সাধারণত ইতালীয় রীতি অনুসরণে যোগ বিয়োগের চিহ্ন হিসাবে $\bar{p}$ এবং $\bar{m}$ ব্যবহার করিত, কিন্তু জার্মানে '+' এবং '-' এই প্রতীকদ্বয়ের উপর কিছু বেশী পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ইহাদের ব্যবহার পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে দেখা যায় না।

আমাদের পরিচিত প্রতীকের উদ্ভব

জার্মানীতে প্রাপ্ত ১৪৫৬ সালের এক পাণ্ডুলিপিতে যোগ বুঝাইতে et এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়; শব্দটি এমন ভঙ্গিমায় লিখিত যে ইহা দেখিতে প্রায় + এই চিহ্নের ন্যায়। (ইংরাজীতে এবং বুঝাইতে যেমন & এই প্রতীকের ব্যবহার আছে)। সুতরাং 'et' এট-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইতেই যোগচিহ্নের উদ্ভব ইহা প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

বিয়োগচিহ্নের উদ্ভব লইয়া অনেক মতভেদের অবকাশ আছে। কাহারও মতে $\bar{m}$ এই প্রতীকের শীর্ষস্থ '-' ওই চিহ্নটুকু টিকিয়া গিয়াছে। কেহ বলেন m এর পরিবর্তে '-' এই প্রতীক ব্যবহারের তৎকালীন অভ্যাস হইতেই বিয়োগচিহ্নের উদ্ভব। [যেমন Summaর পরিবর্তে Su$\bar{m}$a. দশ বা হাজার বুঝাইতে X mille এর পরিবর্তে $\bar{X}$ প্রভৃতি]।

Uncial এবং Visigothic-এর লেখায় m এর পরিবর্তে যথাক্রমে ÷ এবং ∸ এই প্রতীকদ্বয়ের ব্যবহার দেখা যায়। ইহা হইতে '-' এই প্রতীক চিহ্ন যে m (minus) এরই ['+' এই চিহ্ন যেমন et শব্দের প্রতীক] এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

অপর সম্ভাবনা ইহাই যে, ২ গজ — ৩ ইঃ প্রভৃতি লিখিতে মধ্যস্থলের অনুপস্থিত সংখ্যার পরিবর্তে '-' এই চিহ্ন ব্যবহারের অভ্যাস হইতেই বিয়োগচিহ্নের আবির্ভাব।

ছাপার হরপে '+' এবং '-' এই প্রতীকদ্বয়ের প্রথম প্রকাশ ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে উইডম্যান এর পাটীগণিতে। কিন্তু লেখক গণনার কার্যে ইহাদের ব্যবহার করেন নাই। বস্তুতপক্ষে যোগ-বিয়োগের প্রতীকদ্বয় গাণিতিক হিসাবনিকাশে পাটীগণিতের বহুপূর্বে বীজগণিতে ব্যবহৃত হয়।

উইডম্যান লেখেন, "$\frac{২}{৫}$ $\frac{৪}{৫}$ $\frac{৩}{৫}$ যোগ করিলে হয় $\frac{৯}{৫}$ বা ১$\frac{৪}{৫}$"।

ডাচ্ গাণিতিক ভোদার হোয়েকেই প্রথম (১৫১৪ খৃঃ) '+' এবং '-' প্রতীকের সহায়তায় বীজগণিতে গণনার সূচনা করেন [যেমন $\sqrt{\frac{৩}{৪}} - \sqrt{\frac{৩}{৫}}$ বুঝাইতে $R_{\frac{৩}{৪}} - R_{\frac{৩}{৫}}$ প্রভৃতি]।

পাটীগণিতে গণনার কার্য্যে প্রতীকদ্বয়ের প্রথম প্রয়োগ করেন জর্জ্জ ওয়াক্‌ল ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে।

প্রতীকদ্বয়ের বহুস্থানে প্রভূত প্রচলনের কৃতিত্ব অবশ্য বীজগাণিতিক ষ্টিফেল (পূর্বে ইহাকেই প্রতীকদ্বয়ের উদ্ভাবক বলা হইত) এর প্রাপ্য।

ইংল্যাণ্ডে প্রতীকদ্বয়ের স্বীকৃতি ঃ

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে 'রেকর্ড' তাঁর পুস্তকে প্রতীকদ্বয়কে পূর্ণ স্বীকৃতি দেন। বেকার (১৫৬৮ খৃঃ) যদিও '+' চিহ্নের পরিবর্তে '×' এই প্রতীকের প্রচলনের চেষ্টা করেন তবু সাধারণভাবে প্রতীকদ্বয় ইংল্যাণ্ডে গৃহীত হয়।

History of Mathematics — Bell হইতে প্রণতি সরকার অনূদিত।

ত্রিমাত্রিক আয়তন

আকার পরিবর্তন ব্যতিরেকে একটি বস্তুর স্থানান্তরণের যৌক্তিকতা বলিতে কি বুঝায় তাহা আমরা দেখিয়াছি; যেমন যে কোন দৈর্ঘ্য একটি জায়গার নির্দিষ্ট কোন পরিমাপে খাপ খায় — বা পরিমাপকে স্থান দেয়; ঠিক সেই দৈর্ঘ্যই, যখন সেই দুটি যে কোন পন্থায় দিক দিয়া অন্য কোন জায়গায় আনীত হোক, ঠিক সেই দৈর্ঘ্যই স্থান দিবে। বর্তমানে আমরা আয়তনের গঠনরূপ পরিবর্তন ব্যতিরেকে বস্তুর স্থানান্তরণের যোগ্যতা বলিতে কি বুঝায় তাহা আলোচনা করিব।

সর্বপ্রথমে বলা যাক, যে বস্তুর আয়তন শুধুমাত্র উহার সীমানির্দ্ধারণকারী তলের উপরই নির্ভর করে, বস্তুর অন্ত্য স্থানের বিন্যাসের উপর কিঞ্চিৎমাত্রও নির্ভর করে না। সেইজন্য আমরা তলের আয়তন বলিতে সর্বদা বস্তুর আয়তনকেই বুঝাইব।

বস্তুর তলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখন আমরা কয়েকটি কথা বলিতে চাই। ১নং চিত্রে একটি ঘনক, একটি নলক (cylinder) এবং একটি গোলককে দেখান হইল। ঘনকের তল, কিনার (edge) ও কোণক (corner) সহ ছয়টি সামতলিক পার্শ্বদেশের সমবায়। কিন্তু নলকের তল, দুইটি সামতলিক প্রান্তীয় তলের এবং তন্মধ্যবর্তী একটি গোলাকৃতি তলের সমষ্টি। নলকের প্রান্তীয় তলদ্বয় উহার গোলাকার তল হইতে দুইটি চক্রাকার কিনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। গোলকের মসৃণ তল সুষমভাবে মণ্ডলাকার। বস্তুর তলের মসৃণ অংশ, কূল এবং কোণকের মধ্যে আকারগত বিরাট পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কূল বা কিনার তলোপরি অবস্থিত রেখা মাত্র। দ্বিমাত্রিক আয়তন

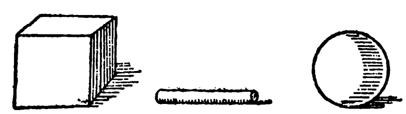

চিত্র ১

অধিকারের কথা বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে ইহা তলের অংশবিশেষ নহে। সেখানে কোণক অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র বিন্দু ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুষমতা, (গোলক তলের, নলকের সামতলিক ও গোলাকার তলের এবং ঘনকের সামতলিক তলের সমস্ত বিন্দুর মতো) কিনার সন্নিধান (edge) ও কোনক সামীপ্য (corner) ভেদে তলবিন্দুকে নানা ভাগে বিন্যস্ত করা সম্ভব। প্রয়োগ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপরোক্ত বিন্দুগুলিকে আমরা যথাক্রমে, সুষমবিন্দু (smooth point) কিনারবিন্দু (edge point) এবং কোণক বিন্দু (corner point) বলিব। কিনার বিন্দু ও কোণক বিন্দুর সমবায়কে একত্রে বিষম বিন্দু(rough point) বলা যাইতে পারে।

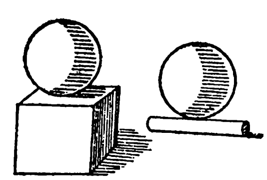

চিত্র ২ . চিত্র ৩

২নং চিত্রে একটি ঘনকের উপরিতলে একটি গোলককে দেখান হইল। বস্তু দুইটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে, অন্যভাবে, গোলকতলের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু ঘনক তলের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে এক অভিন্ন বিন্দুর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উপরোক্ত দুই বিন্দুই সুষমবিন্দু। বিন্দুদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন না করিয়া ঘনকতলে গোলকের সঞ্চরণ একান্তভাবেই অসম্ভব। এখন যদি আমরা ঘনকের উপরিতলে গোলকটীকে কিয়ৎ-পরিমাণে পরিভ্রমণ করাই তাহা হইলে দেখিব যে গোলকের অন্য এক বিন্দু ঘনকের অপর এক বিন্দুর সংস্পর্শে আসিয়াছে। নলকের একটী সুষম বিন্দুর উপর গোলকটীকে স্থাপন করিলেও ঐ একই সত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। (চিত্র ৩)

এখন যদি আমরা নলকের গোলাকার তলদেশ ঘনকের উপরিতলের উপর সন্নিবিষ্ট করি (চিত্র৪), তাহা হইলে বস্তুদ্বয় পরস্পরকে সরলরেখায় স্পর্শ করিবে। ঐ রেখার প্রত্যেকটি বিন্দুতে, নলকতলের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু, ঘনকতলের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সহিত

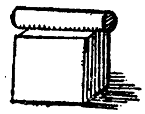

চিত্র ৪

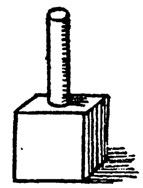

চিত্র ৫

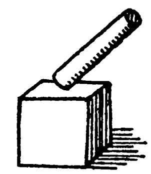

চিত্র ৬

সম্মিলিত হইয়া উভয়ে একই অভিন্ন বিন্দুকে চিহ্নিত করিবে। এখানেও কথিত বিন্দু দুইটি সুষম বিন্দু। পূর্বের মত ইহাও সত্য যে, সংযুক্ত বিন্দুদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন না করিয়া এক বস্তুর উপর অপর বস্তুর আপেক্ষিক সঞ্চরণ এখানেও অসম্ভব। নলকটিকে ঘনকের উপরিতলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সঞ্চরণ করান হইলে আমরা দেখিব, নূতন এক সরলরেখায় বস্তু দুইটি পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে। সমস্ত স্পর্শবিন্দু এক্ষেত্রে পূর্ব হইতে ভিন্ন।

এখন যদি ঘনকের উপরিতলে নলকের সামতলিক প্রান্তীয় তল প্রতিস্থাপিত করান হয় (চিত্র ৫) তাহা হইলে উভয় বস্তুর তলদ্বয় সম্মিলিত হইয়া একক তলে পরিণত হইবে। এখানে তল দুইটি পূর্বের ন্যায় কোন বিন্দু বা সরলরেখায় স্পর্শ না করিয়া একটি সম্পূর্ণ তলে পরস্পরকে স্পর্শ করিবে।

নলকের সামতলিক তলে একটি বিন্দু এবং ঘনকের উপরিতলে এমন একটি বিন্দুর কথা ধরা যাক যাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে। উভয় বিন্দু স্পষ্টতঃই সুষম বিন্দু। এখানেও ইহা সহজ সত্য যে, সংযুক্ত বিন্দুদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন না করিয়া বস্তুদ্বয়ের যে কোনটির অপরটির উপর সঞ্চরণ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

কিন্তু আরও শিক্ষণীয় বেশ কিছু এখনও বলিবার মত আছে।

পূর্বাপর আমরা অনুমান করিয়াছি যে নলকের সামতলিক তল ঘনকের সামতলিক তল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। এখন নলকটিকে ঘনকতলের মধ্যদেশে দণ্ডায়মান করাইয়া (চিত্র৫) পরস্পরকে স্পৃষ্ট করান হইলে নলকের বৃত্তীয় তল ঘনকের বর্গীয় তল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবরিত হইবে। তাহার পর যদি নলকটিকে ঘনকতলে অবনমিত (tilt) করা হয় তাহা হইলে নলক ৬নং চিত্রের রূপ পরিগ্রহণ করিবে। পূর্ব বর্ণিত সুষম বিন্দুদ্বয় এখানে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া নাই। কিন্তু এই স্থানেও অন্য দুই বিন্দু পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া আছে। কেননা অবনমিত নলকের বৃত্তীয় কিনারে একটি বিন্দু ঘনক তলোপরি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর উপর ন্যস্ত। নিজ কিনাররেখার উপর নলকটিকে আবর্তিত না করাইয়া একই দিকে নলকটিকে যত কম বা বেশী অবনমিত করি না কেন উপরোক্ত বিন্দুদ্বয় পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াই অবস্থান করিবে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, কিনারবিন্দু যখন সুষমবিন্দুকে স্পর্শ করে তখন সংযুক্ত বিন্দুদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন না করিয়া বস্তুদ্বয়ের যে কোনটির অপরটির উপর আপেক্ষিক সঞ্চরণ সম্ভব। ঘনক কিনাররেখার বিপরীতে নলকের সামতলিক বা গোলাকার তলের (চিত্র ৭, ক, খ) কিম্বা, ঘনক কিনাররেখার বা নলক কিনাররেখার বিপরীতে গোলকতলের কথা বিবেচনা করিলে ঐ একই সত্যের প্রতীতি জন্মিবে।

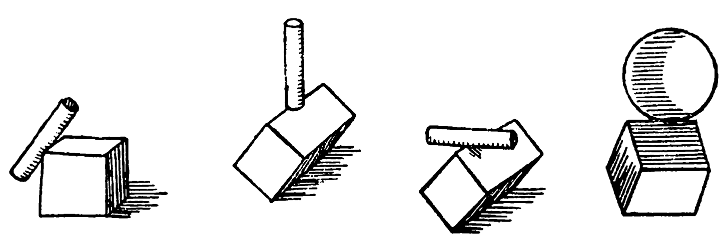

(ক) (খ) (গ) (ঘ)

চিত্র ৭

বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটিকে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ করিয়া একই বিন্দুদ্বয়ের স্পর্শ অব্যাহত রাখিয়া, অপরটিকে আমরা সঞ্চরণ করাইতে পারি। কিন্তু এইরূপ করিবার সময় একই দিকে বস্তুটির অবনমন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

যদি ঘনকের একটি কোণককে নলকের একটি সুষম বিন্দুর সহিত স্পৃষ্ট করান হয় (যেমন ৮নং চিত্র) তাহা হইলে যে বিন্দুদ্বয়

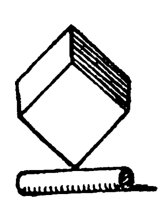

চিত্র ৮

পরস্পরকে স্পর্শ করিবে তাহাদের উপর বস্তুটির অবনমনের দিক সম্বন্ধে কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত হয় না। ঘনকটীকে যে কোনোদিকে অবনমিত করি না কেন সর্বক্ষেত্রেই ইহার কোণক নলকের সুষম বিন্দুকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

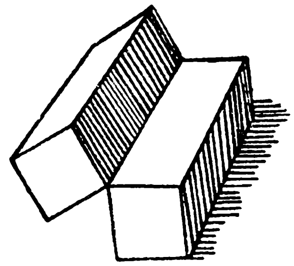

চিত্র ৯
[কিনাররেখার সহিত কিনাররেখার
একমুখীন স্পর্শন = একমাত্রিক স্বাধীনতা]

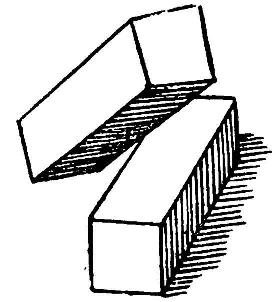

চিত্র ১০
[কিনাররেখার সহিত কিনাররেখার
ভিন্নমুখীন স্পর্শন = দ্বিমাত্রিক স্বাধীনতা]

এখন যদি আমরা দুইটী কিনারবিন্দুকে পরস্পর সংযুক্ত করি তাহা হইলে স্পর্শবিন্দুতে বস্তুদ্বয়ের একমুখীনতা (চিত্র ৯) এবং ভিন্নমুখীনতা (চিত্র ১০) ভেদে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। পূর্ববর্তী অবস্থায় একটী নির্দিষ্ট দিকে অবনমন ঘটাইয়া একই বিন্দুদ্বয়ের পারস্পরিক স্পর্শন সম্ভব। সেই জন্য কোণক সহ কিনারবিন্দুর স্পর্শনে অবনমনের দিক সম্বন্ধে কোনো বিধিনিষেধ থাকে না। কোণক সহ কোণকের স্পর্শনে ঐ একই কথা আরও বেশীভাবে বলা যায়।

সারমর্ম এই যে, — নির্দিষ্ট ধারণায় সকল তলই সুষম বিন্দুগুলিতে সম গঠন-বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন, কেননা যখন দুই সুষমবিন্দু পরস্পরকে স্পর্শ করে, তখন তলদ্বয় একে অপরের সহিত এত যোগ্যভাবে যুক্ত হয় যে সংযুক্ত বিন্দুদ্বয়কে; বিচ্ছিন্ন না করিয়া বস্তু দুইটীর একটীর অপরটীর উপর আপেক্ষিক সঞ্চরণ অসম্ভব।

দুই কিনাররেখারও ঐরূপ যোগ্য সংযুক্তি সম্ভব। বস্তুদ্বয়ের যোগ্য সংযুক্তি বলিতে আমরা এই বুঝি যে স্পৃষ্ট বিন্দুদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন না করিয়া উভয় বস্তুর মধ্যে যে কোন একটীর সঞ্চরণ অসম্ভব। এইজন্য অবশ্য বস্তুদ্বয়ের একটীর পৃষ্ঠদেশ উৎকীর্ণ (re-entrant) করা প্রয়োজন (চিত্র ১১)। সুতরাং ইহা এখানে সঙ্গতভাবে বলা যাইতে পারে যে এইভাবে যে বিন্দুতে তলদ্বয়ের যোগ্য সংযুক্তি ঘটে সে বিন্দুতে তলদ্বয় সমগঠন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ১১নং চিত্রে ঘনকটী যে বস্তুটীর সংস্পর্শে আছে সেই বস্তুটী, — উভয়ের অংশ বিশেষ কর্তিত এমন দুইটী গোলকের সমবায়।

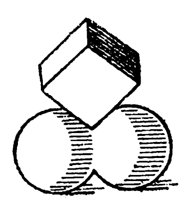

চিত্র ১১

যদি গোলক দুইটীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ কর্তিত হয় তাহা হইলে গঠিত বস্তুটীর উৎকীর্ণ কিনার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইবে এবং তখন ঘনকের কিনারের সহিত ইহার স্পর্শন অসম্ভব হইয়া পড়িবে। (চিত্র ১২) আবার যদি প্রত্যেক বৃত্তের প্রায় অর্ধ অংশ কর্তন করা হয় তাহা হইলে উৎকীর্ণ কিনার প্রশস্ত হইয়া পড়িবে এবং ঘনকটীকে ঐ স্থানে স্থাপন করিলে উহা দুলিতে আরম্ভ করিবে (চিত্র ১৩) স্পষ্টতঃই মধ্যবর্তী এমন এক অবস্থা বর্তমান যখন বস্তুর কিনারের সহিত ঘনক কিনারের, দোলন ব্যতীত·যোগ্য সংযুক্তি সম্ভব। (চিত্র ১৪) এখানে যদিও একটি বস্তুর কিনার উদ্গত এবং অপরটির অবনত তবুও কিনাররেখায় উভয় তলই সমগঠন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যদি আমরা অনুমান

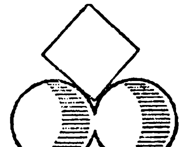

চিত্র ১২

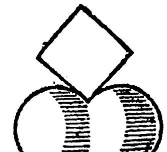

চিত্র ১৩

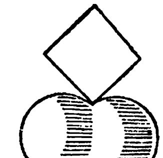

চিত্র ১৪

করি উল্লিখিত যুগ্ম গোলকটি (twin sphere) কাষ্ঠ নির্মিত তাহা হইলে বস্তুতল শুধুমাত্র কাষ্ঠতলই নয়, পরিবেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের তলও বটে। অধিকন্তু কাষ্ঠতলে যাহা অবনমন, বায়ুতলে তাহাই উদ্গমন। ঠিক একইভাবে ঘনকের প্রত্যেকটি উদ্গত কিনার এবং < >[১] কিনার একই সময়ে বায়ুতলে অবনমনের সৃষ্টি করে। তল যতখানি এক বস্তু-সাপেক্ষ ঠিক ততখানি অপর বস্তু-সাপেক্ষ এবং বস্তুর অন্তরাবস্থা এবং বহিরাবস্থা নিরপেক্ষ। তলের উদ্গমন অবনমন এবং বিধিবহির্ভূত পরিভাষা। একটি পাতলা বুটিদার ধাতুখণ্ডে এক পক্ষের উদ্গমন অপর পক্ষের অবনমন এবং অপর পক্ষের উদ্গমন পরপক্ষের অবনমন ছাড়া অন্য কিছু নয়। যে কোনোটিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। (এখানে পাতলা ধাতুখণ্ড বলিতে ধাতু তল বোঝান হয় নাই। ইহা এক পাতলা ঘন বস্তু মাত্র যাহার দুই তল পরস্পর অনুরূপ।)

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে উপরোক্ত ঘনক কিনারে গঠন ভঙ্গিমা যুগ্ম গোলকের গর্তের বায়ুকিনারে প্রতিসম। অর্থাৎ কিনাররেখায় তলদ্বয় সমগঠন সম্পন্ন।

এই সকল ক্ষেত্রে যুগ্মগোলকের উপমা খুবই সুবিধাজনক, কেননা কর্তন-ক্রমের বিভিন্নতা ঘটাইয়া যে কোনো আকারের কিনাররেখা সৃষ্টি করা সম্ভব। এখানে আমরা অনুমান করিয়াছি যে কর্তিত অংশগুলি অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। কর্তিত ক্ষুদ্রতর অংশকে সংযুক্ত করিলে আমরা ১৫নং চিত্র তিনটির দক্ষিণ দিকের চিত্রের মতো উদ্গত কিনাররেখা মণ্ডিত একটি বস্তু পাই।

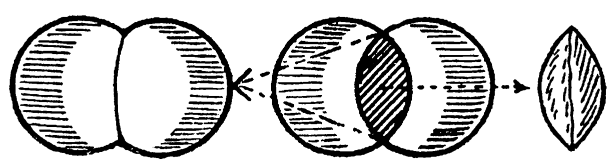

চিত্র ১৫

বস্তুদ্বয়ের একটি বৃহত্তর অংশ সম্মিলনে গঠিত ও অবনত কিনাররেখা মণ্ডিত। পূর্বের মতো এখানেও উভয় বস্তুর কিনাররেখা সমগঠন সম্পন্ন।

ধরা হউক দুইটি গোলককে প্রায় অর্দ্ধভাগে কর্তন করা হইল (অবশ্য উভয় গোলককে একই ভাবে ভাগ করিতে হইবে, নতুবা সামতলিক তলগুলির যোগ্য সংযুক্তি ঘটিবে না।) এবং তাহার পরে বৃহত্তর অংশদ্বয় এবং ক্ষুদ্রতর অংশদ্বয় সংযুক্ত করা হইল। এখন এমন দুইটি ঘন বস্তুর সৃষ্টি হইল যাহাদের কিনাররেখা অত্যন্ত প্রশস্ত এবং উন্মুক্ত; উদ্গত কিনাররেখা কিঞ্চিৎ শিরাল[২] এবং উৎকীর্ণ কিনাররেখা কিঞ্চিৎ অবনত। গোলকদ্বয়কে ঠিক সমভাবে কর্তন করা হইলে নব-বস্তু পুনরায় একটি গোলকেই পরিণত হইবে এবং গোলোকোপরি কোন শিরা বা অবনতি থাকিবে না। তলগুলিও সর্বতোভাবে সুষম হইবে।

উদ্গত কূলরেখার ক্রম প্রসারণতার ফলে শিরা অদৃশ্য হয় এবং উৎকীর্ণ (re-entrant) কিনাররেখার ক্রমসম্প্রসারণতার ফলে অবনতি অদৃশ্য হয় — এই ধারণাই উপরোক্ত বোধের সৃষ্টি করে। অথবা আমরা অনুমান করিতে পারি যে উদ্গত (projecting)

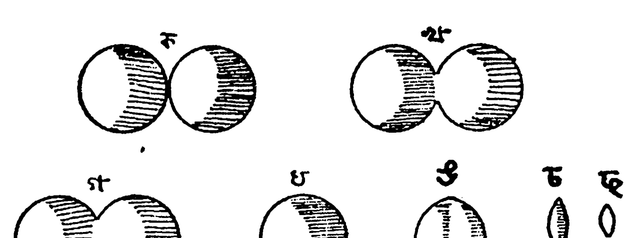

চিত্র ১৬

কিনাররেখা ক্রমপ্রসারণতার মধ্য দিয়া সুষম রূপ পরিগ্রহ করে এবং তারপর উৎকীর্ণ কিনাররেখার সৃষ্টি করে। ১৬ নং নকশার চিত্রগুলিকে যদি একটি চক্রে অনুক্রমে সংস্থাপিত করিয়া আমরা চক্রটিকে দ্রুত গতিতে আবর্তিত করাই তাহা হইলে প্রণালীটি অমাদের [আমাদের] গোচরীভূত হইবে। প্রথমে গোলকদ্বয় বিচ্ছিন্ন, পরে অভিন্ন (খ,গ) তদনন্তর একক গোলকের (ঘ) পরিশেষে ক্ষুদ্র হইতে

ক্ষুদ্রতর উত্তল কাচের আকারে সঙ্কুচিত হইবে (ঙ,চ,ছ)। ইহা সত্যই এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে ঘ নং চিত্রের একমাত্র গোলকটি উপরোক্ত প্রণালীটির এক অবস্থা। অথবা ইহা বলা যাইতে পারে যে উদ্গত কিনার এবং উৎকীর্ণ কিনারের মধ্যে উপবিষ্ট কিনারবিন্দুই বিশেষ ক্ষেত্রে সুষমবিন্দু। কিনারবিন্দুর এই অবস্থা স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই সমস্ত সুষম বিন্দুতে তলগুলি সমগঠন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

The common sense of the exact sciences by
William Kingdon Clifford হইতে শংকরপ্রসাদ হাজরা অনূদিত।

....

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. কোনো একটি শব্দ (সম্ভবত, 'অবনত') বাদ পড়ে গেছে।

২. এখানে অর্থ উঁচু। অর্থাৎ উচ্চতা অর্থে ব্যবহৃত।

এই লেখাটিতে বিভিন্ন জায়গায় একই শব্দের বিভিন্ন বানান ব্যবহৃত হয়েছে। সাম্য রক্ষিত হয়নি। আমরা হুবহু অনুসরণ করলাম।

আর্কিমিডিসের পাটীগণিত

'বৃত্ত পরিমাপ' (Measurement of a circle) এবং 'বালুকা গণনা' (Sand reckoner) গ্রন্থ দুইটির অধিকাংশেই পাটীগণিত সম্বন্ধে আলোচনা বর্তমান। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা অনাবশ্যক, কারণ যে কোন মানগুণ্য যুক্ত সংখ্যা প্রকাশের নিমিত্ত পুস্তকটিতে যে পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন পন্থা নির্দেশ করা সম্ভব নহে। কিন্তু 'বৃত্ত পরিমাপ' গ্রন্থটিতে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা ব্যবহার করিয়া নানা প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হইয়াছে। গ্রীক পদ্ধতিতে সংখ্যাপাতন প্রকাশ করা সম্ভব, এরূপ সংখ্যাগুলির সাহায্যেই আর্কিমিডিস গুণন, বর্গমূল ইত্যাদি বিভিন্ন পাটীগাণিতিক বিষয়ের উত্তর নির্ণয় করিয়াছেন সত্য, কিন্তু নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ করেন নাই। বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রশ্ন পুস্তকটিতে আছে। পাঠকদের সুবিধার্থে প্রথমে গ্রীক পদ্ধতির সংখ্যাতত্ত্ব এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রীক গণিতজ্ঞরা যে সব গাণিতিক প্রশ্নের সমাধান করিতেন (যাহাকে বলা হয় the art of calculating) তাহা আলোচিত হইবে; কারণ ইহার ফলে নিম্নলিখিত দুইটি জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ হইবে ঃ —

(১) বৃহৎ সংখ্যার আনুমানিক বর্গমূল নির্ণয়ে আর্কিমিডিসের নিজস্ব পদ্ধতি।

(২) √৩ এর দুইটি আনুমানিক মান নির্ণয়ে আর্কিমিডিসের গণনা প্রণালী (যাহা আর্কিমিডিস নানাস্থানে ব্যবহার করিলেও কিরূপে তাহা নির্ণিত হইল, তাহার কোন আভাস নাই।)

গ্রীক সংখ্যা পদ্ধতি ঃ

ইহা সুনিশ্চিত যে গ্রীকরা ১ হইতে ৯৯৯ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যা বর্ণাক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করিতেন। পরে আরও তিনটি সংকেতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ইহা ব্যতীত, প্রতি অক্ষরের উপর একটি ক্ষুদ্র আনুভূমিক রেখা স্বরাঘাত (accent) রূপে ব্যবহৃত হইত যেমন $\bar{a}$ ।

পদ্ধতিটি নিম্নরূপ ঃ—

α′, β′, γ′, δ′, ∈′, ς′, ζ′, η′, θ′	যথাক্রমে	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯।
ι′, κ′, λ′, μ′, ν′, ξ′, ο′, π′, ϙ′,	যথাক্রমে	১০, ২০, ৩০, ...৯০।
ρ′, σ′, τ′, υ′, ϕ′, χ′, ψ′; ω′, ϡ′	যথাক্রমে	১০০, ২০০, ৩০০, ...৯০০।

অন্তবর্তী [অন্তর্বর্তী] সংখ্যাগুলি পাশাপাশি রাখিয়া প্রকাশিত হইত। বৃহত্তম সংখ্যাটি বামপ্রান্তে রাখিয়া পরবর্তী সংখ্যাগুলি মান অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে সজ্জিত করা হইত। যেমন, ১৫৩ সংখ্যাটি লেখা হইত $\rho\nu\gamma'$ অথবা $\overline{\rho\nu\gamma}$ (ρ =১০০, ν =৫০, γ' = ৩; স্বরাঘাত দ্বারা যোগ প্রক্রিয়া বোঝানো হইত)। শূণ্য [শূন্য] সংখ্যাটি প্রকাশের কোন সংকেত ছিল না। সুতরাং, ৭৮০ লিখিতে $\psi\pi'$ এবং ৩০৬ লিখিতে $\tau\varsigma'$ লিখিতে হইত।

বৃহৎ সংখ্যাক্রমের ক্ষেত্রে সহস্রকে একক ধরা হইত এবং ১০০০, ২০০০ হইতে ৯০০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি প্রথম নয়টি আদি সংখ্যা (Natural number) প্রকাশে ব্যবহৃত অক্ষরগুলি দ্বারা পৃথকভাবে প্রকাশ করা হইত; মাত্র সারির (line) সম্মুখে এবং নিম্নে একটি ক্ষুদ্র ড্যাস (Dash) ব্যবহৃত হইত। যেমন, $,\delta' = 4000$ এবং পূর্বের ন্যায় পাশাপাশি অক্ষর সজ্জিত করিয়া অন্তর্বর্তী সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা হইত। যেমন, ১৮২৩ সংখ্যাটি, $,\alpha\omega\kappa\gamma'$, বা $,\alpha\omega\kappa\gamma$, — এইভাবে লেখা হইত। অনুরূপে, ১০০৭ = $,\alpha\zeta'$। অন্তর্বর্তী অন্যান্য সংখ্যার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসৃত হইত। ৯৯৯৯র পরে অযুত (Myriad) সংখ্যা, এবং ১০,০০০ ও উহারও উর্দ্ধসংখ্যাগুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণ সংখ্যাগুলিকেই উপযুক্ত নাম প্রদান করিয়া ব্যবহার করা হইত। অযুত (Myriad) সংখ্যাটির পরিবর্তে বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সংকেত ব্যবহৃত হইত। তবে সাধারণতঃ M বা Mv ব্যবহৃত হইত এবং ইহা ব্যবহৃত হইলে অযুত বা তদূর্দ্ধ সংখ্যাগুলি অর্থাৎ ১০,০০০-এর গুণিতকগুলি সাধারণতঃ এই সংক্ষিপ্ত সংকেতের উপরে লেখা হইত (কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার M এর আগে বা পরেও ব্যবহৃত হইত)। যেমন, ৩৪৯,৪৫০ = $\overset{\lambda\delta}{M}, \theta\upsilon\nu'$।

ডায়োফ্যান্টাস (Diophantus) সহস্রের আগে অযুত বা তদূর্দ্ধ সংখ্যাগুলি প্রকাশের জন্য একক সংখ্যা প্রকাশের সাধারণ চিহ্নগুলিই ব্যবহার করিতেন; সহস্র সূচক অক্ষরগুলি হইতে অযুত সূচক অক্ষরগুলি তিনি একটি বিন্দু দ্বারা পৃথক করিতেন। সেইজন্য, তাঁহার প্রণালী অনুসারে, ৩,০৬৯,০০০ হইল $\overline{\tau\varsigma}.,\overline{\theta}$ বা ৩৩১,৭৭৬ হইল $\overline{\lambda\gamma}.,\overline{\alpha\psi o\varsigma}$

কোন কোন ক্ষেত্রে অযুত তদূর্দ্ধ সংখ্যাগুলি সাধারণ অক্ষরগুলির উপরে দুইটি বিন্দু সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করা হইত। যেমন,

$\ddot{\rho}$ = ১০০ অযুত [বা] (১,০০০,০০০)

অযুত সংখ্যক অযুত (myriads of myriads) অর্থাৎ একশত কোটী[১] বুঝাইবার জন্য দুইজোড়া বিন্দু ব্যবহার করা হইত। যেমন,

$\ddot{\ddot{\iota}}$ ১০ অযুত-অযুত (myriad-myriads)১,০০০,০০০,০০০

ভগ্নাংশ ($\lambda\in\pi\tau\alpha'$) বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করা হইত। সাধারণ সংখ্যাসূচক অক্ষরের উপর দুইটি স্বরাঘাতচিহ্ন ব্যবহার করিয়া ভগ্নাংশের হরটি (denominator)প্রকাশ করাই প্রচলিত রীতি ছিল। লবটি ১ হইলে ০ একটিমাত্র অক্ষরের সংকেতেই ভগ্নাংশ প্রকাশ করা হইত; সেক্ষেত্রে লব প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না। যেমন, $\frac{১}{৩} = \gamma''$ অনুরূপে, $\frac{১}{৬} = \varsigma''$ বা $\frac{১}{১৫} = \iota\in''$ ।

এই প্রণালীতে সাধারণ ভগ্নাংশগুলি প্রকাশ করা হইত। কিন্তু যেক্ষেত্রে লবটি ১ না হইয়া অন্য সংখ্যা হইত, সেক্ষেত্রে সাধারণ সংখ্যা প্রকাশের প্রচলিত রীতিই অনুসৃত হইত। এইরূপে, $\frac{৯}{১১} = \theta'\iota\alpha''$ বা $\frac{১০}{৭১} = \iota' o\alpha''$

হেরণ (Heron) তাহার 'জ্যামিতি' গ্রন্থে অন্য উপায়ে শেষোক্ত ভগ্নাংশগুলি প্রকাশ করেন। তিনি এক্ষেত্রে হরটি দুইবার লিখিতেন। এইরূপে তাহার প্রণালী অনুসারে $\frac{২}{৫} = \beta'\in''\in''$ বা $\frac{২৩}{৩৩} = \kappa\gamma'\lambda\gamma''\lambda\gamma''$ ।

আর্কিমিডিস, ডায়োফ্যান্টাস বা ইটোসিয়াস (Eutocius) $\frac{১}{২}$ প্রকাশের জন্য ∟″ চিহ্নটি ব্যবহার করিতেন; হেরণ '(' বা S-এর অনুরূপ চিহ্নদ্বয়ের যে কোনটি ব্যবহার করিতেন।

ভগ্নাংশ প্রকাশের অপর একটি জনপ্রিয় রীতি প্রচলিত ছিল। লবটি ১ এর অধিক হইলে উহাকে কয়েকটি খণ্ড ভগ্নাংশে (Component fraction) বিভক্ত করা হইত; এই খণ্ডগুলির লব ১ করা হইত এবং উহাদের যোগফল আসল ভগ্নাংশটির সমান হইত। এক্ষেত্রেও পাশাপাশি সন্নিবেশ যোগ প্রক্রিয়া নির্দেশ করিত। যেমন, $\frac{৩}{৪} = \frac{১}{২} + \frac{১}{৪} \rightarrow$ ∟″ δ'' $\frac{১৫}{১৬} = \frac{১}{২} + \frac{১}{৪} + \frac{১}{৮} + \frac{১}{১৬} \rightarrow$ ($\delta''\eta''\iota\varsigma''$ [এক্ষেত্রে $\frac{১}{২}$ হেরণের প্রণালীতে প্রকাশিত]।

ইটোসিয়াসের রচনায় পাই, ∟″ $\xi\delta''$ অর্থাৎ $\frac{১}{২} + \frac{১}{৬৪}$ বা $\frac{৩৩}{৬৪}$। এই ভাবে এই প্রণালীতে ভগ্নাংশ প্রকাশ করা হইত। অনেক ক্ষেত্রে আবার একই ভগ্নাংশ প্রকাশ করিতে বিভিন্ন খণ্ড ভগ্নাংশে উহাকে বিভক্ত করা যাইত এবং তাহার ফলে একই ভগ্নাংশের প্রকাশ বিভিন্ন হইত।

যেমন, হেরণ $\frac{১৬৩}{২২৪}$ প্রকাশ করিতে বিভিন্ন খণ্ড ভগ্নাংশের সাহায্য গ্রহণ করেন

$$\text{ক)} \quad \frac{১}{২}+\frac{১}{৭}+\frac{১}{১৪}+\frac{১}{১১২}+\frac{১}{২২৪}$$

$$\text{খ)} \quad \frac{১}{২}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{১৬}+\frac{১}{৩২}+\frac{১}{১১২}$$

$$\text{এবং গ)} \quad \frac{১}{২}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{২১}+\frac{১}{১১২}+\frac{১}{২২৪}$$

বর্তমান রীতির ঠিক বিপরীত একটি সাধারণ রীতি গ্রহণ করিয়া ডায়োফ্যান্টাস ভগ্নাংশ প্রকাশ করিতেন। তিনি লবের উপরে হরটি লিখিতেন; যেমন,

$$\frac{\gamma}{\epsilon} = \text{৫/৩ বা } \frac{\kappa\,\epsilon}{\kappa\alpha} = \text{২১/২৫ অথবা } \frac{\alpha.\omega\iota\varsigma,}{\rho\kappa\zeta.\phi\xi\eta} = \text{১,২৭০,৫৬৮/১০,৮১৬।}$$

ষাটের ভগ্নাংশ (Sexadesimal Fraction)

যে সকল পাটীগাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্য আমরা এখনও গ্রহণ করি, এই পদ্ধতি তাহারই উদাহরণ বলিয়াই ইহার উল্লেখ প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত, ইহা বর্তমান দশমিক প্রথার অনুরূপ; কেবল এই পদ্ধতিতে ১০ এর স্থলে ৬০ কে উপগুণিতক (Sub-multiple) রূপে ব্যবহার করা হয়। গ্রীকরা জ্যোতির্বিদ্যা গণনায় ষাটের পদ্ধতি ব্যবহার করিতেন এবং টলেমীর (Ptolemy) রচনায় ইহা পূর্ণ বিকশিত রূপে প্রতিভাত হয়। একটি বৃত্তের পরিধিকে এবং ইহাদ্বারা কেন্দ্রে যে চারিটি সমকোণ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতি ভাগকে এক ডিগ্রী বলা হয়। ডিগ্রীর ৬০ ভাগের এক ভাগকে ১ মিনিট এবং প্রতি মিনিটের $\frac{১}{৬০}$ অংশকে ১ সেকেণ্ড বলা হয়। বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধকেও অনুরূপে ৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং বিভক্ত প্রতিটি অংশকেও আবার ৬০ ভাগে ভাগ করা হয় এবং অনুরূপভাবে এই প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে চলে। এইরূপে সাধারণ পাটীগাণিতিক গণনার অনুকূল একটি ভগ্নাংশ পদ্ধতি পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা উপযুক্ত একক নির্বাচনের সাহায্যে যে কোন ক্ষুদ্র সংখ্যা, যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, প্রকাশ করা সম্ভব। তাই টলেমীর নিম্নোক্ত উক্তি বিস্ময়কর নয় ঃ "সাধারণ ভগ্নাংশ ব্যবহারে অসুবিধার জন্য আমরা সাধারণতঃ সংখ্যাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ষাটের পদ্ধতি ব্যবহার করিব।" কারণ ৬০ দ্বারা ক্রমাগত বিভাজনের সাহায্যে সমস্ত সংখ্যাগুলির একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ সম্ভব এবং যে কোন ভগ্নাংশের এই শ্রেণীর মধ্যে স্থান নির্দেশ সম্ভব। উল্লেখযোগ্য যে আধুনিক দশমিক প্রথার মত ষাটের পদ্ধতিতেও যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া সহজেই সম্পাদন করা যায়। দশমিক প্রথার সহিত ইহার প্রভেদ এইমাত্র যে ষাটের পদ্ধতিতে কোন শ্রেণীর ৬০টি অংশ উহার পরবর্তী বৃহৎ ক্রমের একটি এককের সমান। পরিধির মান প্রকাশ করিবার জন্য সংখ্যাটির সহিত ডিগ্রী বা $\mathring{\mu}$ সংকেতটি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইত; সংখ্যাটির মান প্রকাশকারী অক্ষরটির উপর একটি ছোট আনুভূমিক রেখা থাকিত। সংখ্যাটির শীর্ষে একটি বা দুইটি স্বরাঘাত (accent) দ্বারা যথাক্রমে মিনিট ও সেকেণ্ডের মান প্রকাশ করা হইত। যেমন, $\mu\beta = 2^\circ$. অথবা, $\bar{\mu}o\iota o\omega\nu\mu\xi\mu\beta'\mu'' = \text{৪৭}^\circ\text{৪২}'\text{৪০}''$. আবার, কোন শ্রেণীতে যদি কোন মান না থাকিত, তাহা হইলে উপযুক্ত শ্রেণী সংকেত দ্বারা চিহ্নিত O সংকেতটি ব্যবহৃত হইত। যেমন, $\bar{o}\,\alpha'\beta''\mu''' = \text{০}^\circ\text{১}'\,\text{৪২}''\text{০}'''$ ।

ব্যাসার্দ্ধের ক্ষেত্রেও একই প্রণালী অনুসৃত হইত।

The works of Archimedes with the method of Archimedes,
Edited by T.L. Heath
হইতে অসীম চট্টোপাধ্যায় অনূদিত।

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. 'অযুত সংখ্যক অযুত'-এর অর্থ দশ কোটি, কখনোই একশো কোটি নয়। মনে হয় লাইনের শুরুতে — '১০' বা '১০টি অযুত সংখ্যক অযুত'-এর কোনো একটা হবে, যা বাদ পড়ে গেছে।

দশমিকের রহস্য

সাধারণত ভগ্নাংশকে যখন দশমিকে পরিবর্তন করিতে হয় তখন সত্যই বড় পীড়াদায়ক একঘেয়ে কাজ বলিয়া শিক্ষার্থীদের বোধ হয়, খুব কমই শিক্ষার্থী আছে যাহাদের কাছে এই ভাগ করার কাজটি তেমন আনন্দদায়ক হইয়া দেখা দেয়, যদি না, এই সূত্রে, তাহাদের মনকে অন্য কয়েকটি উদ্দীপনাদায়ী জিনিষ দেওয়া যায়। এখন তেমন ধরণের উদ্দীপনাদায়ী বিষয় লইয়া আমরা আলোচনা করিব। এই আলোচনায়, নির্দ্ধিধায় স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, যে ভগ্নাংশ আমরা ব্যবহার করি, সেগুলি তাহাদের সর্বনিম্ন ডাকের।

যখন ভগ্নাংশকে দশমিকে পরিণত করা হয়, তখন দেখা যায় কখনও ভাগ করা শেষ হয় আবার কখনও দেখা যায় ভাগ করা শেষই হইতে চাহে না — এবং ক্রমাগত ভাগ করা চলিতে পারে — উদাহরণ স্বরূপ —

$$\frac{১}{৪}=.২৫,\ \frac{১}{২০}=.০৫,\ \frac{১}{৩}=.৩৩৩...$$

প্রথম দুইটির ক্ষেত্রে ভাগ-করা শেষ কিন্তু তৃতীয়টির ব্যাপারে তাহা ঘটিতে পারে না, যতই কেন না ভাগ করা যাক কখনই মিল হইবার নহে। একথা আমরা সকলেই জানি যে হর যখন ১০, কিম্বা ১০০ কিম্বা ১০০ এর গুণনীয়ক তখন কোনই ভাগশেষ থাকিবে না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি অন্য ক্ষেত্রে সকল সময়ই ভাগশেষ থাকে। ইহার সোজা অর্থ এই যে, হর যখন ২ কিম্বা ৫ ব্যতীত গুণনীয়ক হিসাবে অন্য কোন মৌলিক সংখ্যার দ্বারা গঠিত না হয়, ভাগ করা তখনই একমাত্র শেষ হয়।

$$\frac{১}{২^৩\times৫^২}=\frac{৫}{২^৩\times৫^৩}=\frac{৫}{১০^৩}=\frac{৫}{১০০০}=.০০৫$$

ইহা দেখা গেল, হর যদি ২ এবং ৫ এর গুণফল হয়, তখন ৫ কিম্বা ২ এর কোন ঘাত দ্বারা লব ও হর কে গুণ করিয়া, তাহাকে ১০ এর ঘাত সকলে পরিণত করা যায়। ইহাই একমাত্র ব্যাপার যেখানে ভগ্নাংশকে সঠিক সংখ্যক রাশি (digits) যুক্ত দশমিকে প্রকাশ করা যায়। আর অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যখন হর-তে এমন গুণনীয়ক থাকে যাহা ২ অথবা ৫ দ্বারা বিভাজ্য নহে, তখন ভাগ করা চলিতেই থাকিবে, মিলে পৌঁছান যাইবে না। প্রথমে এই ভাগ করা ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিজনক হইয়া দেখা দেয়, কিন্তু ক্রমে খানিক পরে একই সংখ্যার পুনঃ পুনঃ আর্বিভাব ঘটিতে থাকে; সেই ধরণের প্রত্যেকটি ভগ্নাংশকে আবৃত বা পৌনঃপুনিক দশমিক বলা হয়। লুইস কারঅল [ক্যারল] একদা বলিয়াছেন — অঙ্ক বিভাগের একটি ম্যাজিক লণ্ঠন থাকা নিশ্চিত যাহার দ্বারা বৃত্ত পরিক্রমণ অবস্থায় আবৃত্ত দশমিক প্রদর্শন করা যায়। আমরা এখন কেমন ভাবে এই সকল দশমিক বৃত্ত পরিক্রমণ করে তাহা দেখাইব।

আবৃত্ত দশমিকে যে সকল < রাশি বা রাশিমালা>[২] অনবরত দেখা দেয় তাহাকে দশমিকের পর্যাবৃত্ত (Period) বলা হয়। $\frac{১}{৩}$এর পর্যাবৃত্ত ৩; $\frac{১}{২৭}$ পর্যাবৃত্ত .০৩৭। এই সকল পর্যাবৃত্তর মাথায় সাধারণত একটি রেখা টানিয়া উহা বিশেষ রূপে বুঝান হয়। যথা,

$\frac{১}{৩}=.৩৩৩...=\overline{৩}$, $\frac{১}{২৭}=.০৩৭০৩৭...=.\overline{০৩৭}$। এখন আমরা প্রশ্ন তুলিতে পারি এই ধরণের ভগ্নাংশ ব্যাপারে কিছু সময় পরেই কেন একই সংখ্যা দেখা দেয়, ইহার একমাত্র ঠিক উত্তর এই যে তাহা ছাড়া তাহাদের উপায় নাই। ধরা যাক যদি $\frac{১}{৭}$কে দশমিকে পরিণত করিতে চাই, তাহা হইলে ভাগ করিতে করিতে দেখিব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ব্যতীত ভাগশেষ দেখা যায় না, এবং ছয় দফা ভাগ করার পর প্রথম ভাগশেষ পুনরায় দেখা দিবে, এবং তখনই ভাগফলেও পৌনঃপুনিকতা দেখা দিবে। এখানে ভাগ করিয়া দেখিলে ব্যাপারটি বুঝিতে সুবিধা হইবে, আর ভাগ করার সময় আমাদের ভাগশেষগুলি দাগাইতে হইবে।

```
৭)১.০০০০০০(.১৪২৮৫৭          ...৬০
   ৭                           ৫৬
  ----                        ----
   ৩০                           ৪০
   ২৮                           ৩৫
  ----                         ----
     ২০                           ৫০
     ১৪                           ৪৯
    ----                         ----
       ৬০...                        ১...
```

১ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমিক ভাগশেষগুলি হইল ৩,২,৬,৪,৫ এবং আবার ভাগশেষরূপে ১ আসে। সুতরাং ভাজ্যের ঐ ছয়টি অঙ্কই আবার পুনঃপুনঃ আসে যখন ভাগপ্রক্রিয়া শেষ হয় না অথচ ভাজ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাগশেষ থাকে না, তখন আমরা এই প্রকার ঘটনার সম্মুখীন হই; অর্থাৎ অঙ্কগুলি পুনঃপুনঃ উদিত হয়। যদি আমরা $\frac{১}{১১}$ ভগ্নাংশটিকে দশমিকে পরিবর্তিত করি, তাহা হইলে

দেখিব যে ১০টি অঙ্কের পূর্বেই ভাগশেষগুলি আবৃত্ত হয় এবং $\frac{১}{১৩}$ ভগ্নাংশটির ক্ষেত্রে এই পর্যাবৃত্ত ১২টি অঙ্কের বেশী হয় না। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে এই অঙ্কগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা বৃহৎ হইতে পারে না, কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, ১ কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে দুইটি ভাগশেষ পাইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু $\frac{১}{৩}$ ভগ্নাংশটির দশমিক রূপ $.\dot{৩}$ — ইহাতে একটি ভাগশেষই পুনঃপুনঃ আসে। .১ কে ৯ দ্বারা ভাগ করিলে ৮টি সম্ভাব্য ভাগশেষ হইতে পারে; কিন্তু $\frac{১}{৯}=.\overline{১}$; এক্ষেত্রেও একটি ভাগশেষই বারংবার পাওয়া যায়। $\frac{১}{১১}$ ভগ্নাংশটির ক্ষেত্রে ২টি অঙ্ক এবং $\frac{১}{১৩}$ ভগ্নাংশটিতে ৬টি অঙ্ক পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ ৭ সংখ্যাটিই প্রথম হর যাহা দীর্ঘতম বিস্তারে পর্যাবৃত্ত হয় এবং পরের অনুরূপ সংখ্যাটি হইতে ১৭ অর্থাৎ $\frac{১}{১৭}$ ভগ্নাংশটিকে দশমিকে প্রকাশ করিলে ১৬টি অঙ্কের পর অঙ্কগুলি আবৃত্ত হয়।

এখন $\frac{১}{৭}$ ভগ্নাংশটির ক্ষেত্রে কয়েকটি আকর্ষণীয় তথ্য সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতিতে যে কারণে বহুভুজ লইয়া আলোচনার পরিবর্তে ত্রিভুজ লইয়া আলোচনা করা হয়, সেই একই কারণে আমরা প্রথমে সরল দশমিক অর্থাৎ ১ সংখ্যাটিকে সর্বদা লব লইয়া আলোচনা করিব — অর্থাৎ আমরা সরল দশমিক লইয়া প্রাপ্ত ফলগুলি জটিল দশমিকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিব যেরূপ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলগুলি জটিল বহুভুজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

$\frac{১}{৭}=.\overline{১৪২৮৫৭}$ পর্যাবৃত্তটিকে ২ দ্বারা গুণ করা যাক। $২\times১৪২,৮৫৭=২৮৫,৭১৪$

প্রাপ্ত সংখ্যাটির অঙ্কগুলি একই, কেবল অন্য প্রকারে সজ্জিত এবং লক্ষণীয় যে অঙ্কগুলির সজ্জা এলোমেলো নয়। ধরা যাক, অঙ্কগুলিকে একটি বৃত্তের চারিদিকে ঘড়ির কাঁটার গতির অনুরূপে অর্থাৎ বামাবর্তে সাজান হইল। এখানে সংখ্যাটিকে যথাক্রমে ২,৩,৪,৫,৬ দ্বারা গুণ করা হইল।

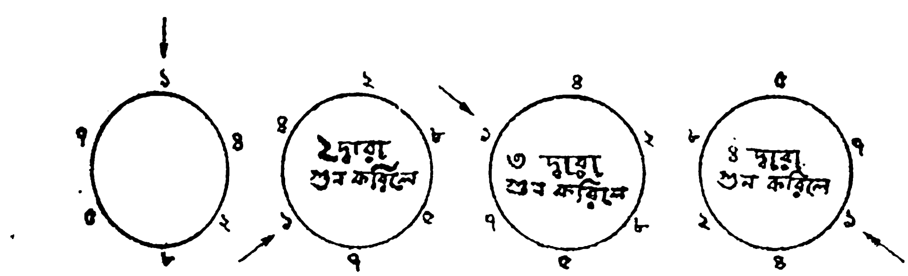

এখন ইহা স্বতঃই প্রতিভাত যে গুণ প্রক্রিয়ার ফলে অঙ্কগুলির 'বৃত্তীয়ক্রম' (cyclic order)-এর কোনরূপ পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি বরাবর অঙ্কগুলির আপেক্ষিক অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে এবং এই বৃত্তগুলিকে চক্ররূপে যাহাদের ঘূর্ণন সম্ভব, কল্পনা করিলে আমরা বলিতে পারি যে গুণ প্রক্রিয়ার ফলে এই সকল ক্ষেত্রে চক্রটি কিঞ্চিৎ আবর্তিত হয় মাত্র।

৭ দ্বারা গুণ করিলে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

৮,৯ ইত্যাদি সংখ্যা লইয়াও আমরা উপরোক্ত পরীক্ষা করিতে পারি; কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যাবৃত্ত হইতে আবৃত্তসূচক কিছু আসে; ছোট সংখ্যাগুলির ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য নয়।

.৯৯৯৯৯...কে উপরোক্ত পর্যাবৃত্তর সহিত অর্থাৎ $.\overline{১৪২৮৫৭}$ এর সহিত যোগ করিলে আরেকটি আকর্ষণীয় ফল লাভ করা যায়।

.১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭...........
.৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯...........

যোগ প্রক্রিয়া শুরু করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে একক যোগ করিলে দশকের সংগে যুক্ত হইবার জন্য থাকে ১ আবার দশক যোগ করিলে সহস্রের ঘরে ১ যুক্ত হয় এবং এই ভাবে ক্রম (order)-এর সংখ্যাগুলি যোগ করিলে পরবর্তী ক্রমের জন্য ১ সংখ্যাটি থাকিয়া যায় অর্থাৎ চলতি বাংলায় বলিতে হয় সর্বদা ১ সংখ্যাটি 'হাতে থাকে'।

এখন "১৪২,৮৫৭," এই পর্যাবৃত্তসূচক সংখ্যাটি লইয়া অপর একটি পরীক্ষা করিব। সংখ্যাটিকে '১৪২' ও '৮৫৭' এই দুই অংশে বিভক্ত করা হইল। এক্ষণে প্রথম অংশের প্রথম অঙ্কের সহিত দ্বিতীয় অংশের প্রথম অঙ্ক যোগ করা হইল। ঐ দুই অংশের দ্বিতীয় অঙ্কদ্বয় ও তৃতীয় অঙ্কদ্বয়ের যোগফলও বাহির করা হইল।

$১+৮=৪+৫=২+৭=৯$

পরে সকল অঙ্কগুলির যোগফল নির্ণয় করা হইল।

১+৪+২+৮+৫+৭=২৭

এখন পর্যাবৃত্তসূচক সংখ্যাটিকে দুই অঙ্কের তিনটি সংখ্যায় ভাগ করা হইল ও ঐ তিনটি সংখ্যার যোগফল লওয়া হইল।

১৪+২৮+৫৭=৯৯ বা, অন্য বৃত্তীয় ক্রম লইয়া ৪২+৮৫+৭১=১৯৮।

এখন সর্বশেষে পর্যাবৃত্তসূচক সংখ্যাটিকে দুই অংশে খণ্ডিত করিয়া আমরা যে দুইটি তিন অঙ্কের সংখ্যা পাই তাহাদের যোগফল নির্ণয় করা হইল —

১৪২+৮৫৭=৯৯৯

৪২৮+৫৭১=৯৯৯

২৮৫+৭১৪=৯৯৯.

লক্ষণীয় এই যোগগুলির প্রত্যেকটি ৯ দ্বারা বিভাজ্য। $\frac{১}{১৩}$ভগ্নাংশটিকে দশমিক রূপে প্রকাশ করিলে দেখা যায় ইহার পর্যাবৃত্ত বিস্তার হইল .০৭৬৯২৩ এবং অঙ্কগুলিকে একইভাবে সজ্জিত করিলে অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। ইহা কি উল্লেখযোগ্য নহে?

পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে ২,৩,৪,৫,৬ দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে গুণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা যে ফল লাভ করিয়াছিলাম, তাহা $\frac{১}{১৩}$ ভগ্নাংশটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে কারণ এক্ষেত্রে পর্যাবৃত্তির বিস্তার যতদূর সম্ভব বিস্তারের অর্ধেক মাত্র। দেখা যায় যে ১,৩,৪,৯,১০,১২ দ্বারা গুণ করিলে একই অঙ্কমালা বৃত্তীয় ক্রমে আসে, কিন্তু, যদি ২,৫,৬,৭,৮, ১১ দ্বারা গুণ করা যায় তাহা হইলে নতুন একটি '১৫৩,৮৪৬' পাওয়া যায়। সংখ্যাটির অঙ্কগুলির যোগফল দ্বারা পূর্বে প্রাপ্ত ফলাফল যে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাহা দেখান যায়।

সংখ্যাটির একটি করিয়া অঙ্ক লইয়া যোগফল ১+৫+৩+৮+৪+৬=

সংখ্যাটির দুইটি করিয়া অঙ্ক লইয়া যোগফল ১৫+৩৮+৪৬= বা ৫৩+৮৪+৬১=

সংখ্যাটির তিনটি করিয়া অঙ্ক লইয়া যোগফল ১৫৩+৮৪৬= বা ৫৩৮+৪৬১= বা ৩৮৪+৬১৫=

লক্ষণীয় যে এই একই ফলাফল আমরা নিম্নলিখিত ডাকের (set) গুণকগুলির (multiplier) প্রত্যেকটি হইতে পাইতে পারি ঃ

১	৩	৪	৯	১০	১২
২	৫	৬	৭	৮	১১

এক্ষেত্রে প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রান্ত সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল ১৩ এবং দ্বিতীয় সারির প্রান্ত সংখ্যাদ্বয়ের যোগফলও '১৩' আবার যে কোন পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী দুই সংখ্যার যোগফলও ১৩।

ভগ্নাংশের হরটি একটি মৌলিক (prime) সংখ্যা হইলে যে কোন আবৃত্ত দশমিকের জন্য আমরা এই একই ফলাফল সর্বদা লাভ করিব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে $\frac{১}{১৭}$ ভগ্নাংশটির পর্যাবৃত্ত সূচক সংখ্যাটি ১৬ অঙ্কের এবং আমরা উহাদের লইয়া পূর্বোক্তরূপ যে কোন সংযুক্তি (combination) করিতে পারি। যদি হরটি দশ অপেক্ষা বৃহৎ হয়, তবে সংখ্যাটির শুরুতে এক বা একাধিক শূন্য হইবে। যদি পর্যাবৃত্ত সূচক সংখ্যাটির প্রথম অর্ধেক অঙ্কগুলি জানা থাকে তবে বাকী অঙ্কগুলি আর ভাগ না করিয়াই জানা সম্ভব, কারণ ৭ সংখ্যাটি হর হইলে যে সত্য প্রযোজ্য এবং ১৩ সংখ্যাটির ক্ষুদ্র বিস্তারে যাহার সত্যতা আমরা যাচাই করিয়াছি তাহা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; অর্থাৎ যদি পর্যাবৃত্তকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়, তবে প্রত্যেক অংশের অঙ্কগুলির যোগফল ৯ হইবে। সুতরাং ১৭ হরটির পর্যাবৃত্তের প্রথম ৮টি অঙ্ক জানা থাকিলে বাকী ৮টি অঙ্কও সহজেই নির্ণয় করা যায়। প্রথম ১০টি অঙ্ক দেওয়া হইল ঃ ০৫৮৮২৩৫২৯৪।

আমরা বাকী ছয়টি অঙ্কও লিখিতে পারি এবং ৭ সংখ্যাটির ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষেত্রেও করিতে পারি। অঙ্কগুলিকে একটি বৃত্তের চারিপাশে সজ্জিত করা যাউক এবং সর্বদা শূন্যকে প্রথম অঙ্ক ধরিয়া ইহাদের যথাক্রমে ২, ৩, ৪...১৬ দ্বারা গুণ করা হউক। আমরা দেখিব যে গুণফল বৃত্তের চতুষ্পার্শস্থ অঙ্কগুলি দ্বারা গঠিত কিন্তু বৃত্তের আপেক্ষিকে ইহাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

আবার, যদি অঙ্কগুলি হইতে একটি, দুইটি, চারটি বা আটটি করিয়া সংখ্যা গঠন করা যায় অর্থাৎ অঙ্কগুলিকে এমন জোট (group)-এ লওয়া হয় যাহাতে প্রত্যেক জোটে সমান সংখ্যক অঙ্ক থাকে এবং ইহাদের সমস্ত সম্ভাব্য সংযুক্তি লওয়া হয়, তবে দেখা যাইবে যে যোগফল সর্বদা ৯ সংখ্যাটির গুণিতক (multiple) হইবে।

৫+৮+৮+২+৩+...

৫৮+৮২+২৩+৫২+...

৫+৮৮+২৩+৫২+...

৫৮৮+২৩৫২+...

৫৮৮২+৩৫২৯+...

ইত্যাদি।

মাত্র ভাগফলেরই নহে, ভাগশেষেরও বিশেষ ধর্ম (property) বর্তমান। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ৭ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ যথাক্রমে ১,৩,২,৬,৪,৫ হইবে। ইহাদের দুই জোটে বিভক্ত করা হইল এবং প্রত্যেক জোটের একই অবস্থানের অঙ্কদ্বয়ের যোগফল লওয়া হইল অর্থাৎ প্রথম জোটের প্রথম অঙ্কের সহিত দ্বিতীয় জোটের প্রথম অঙ্ক, প্রথম জোটের দ্বিতীয় অঙ্কের সহিত দ্বিতীয় জোটের দ্বিতীয় অঙ্ক এইভাবে যোগ করা হইল।

১৩২৬৪৫; ১+৬=৩+৪=২+৫=৭

অথবা প্রত্যেক জোটের অঙ্কগুলির যোগফল পৃথক ভাবে লইলে, ১+২+৪=৭, ৩+৬+৫=১৪

আবার ছয়টি সংখ্যার যোগফল হইল, ১+৩+২+৬+৪+৫=২১

এখানে দুইটি করিয়া অঙ্ক লইয়া যে সকল সংখ্যা গঠিত হয় তাহাদের যোগফল লওয়া হউক ঃ ১৩+২৬+৪৫=৮৪, ৩২+৬৪+৫১=১৪৭,

তিনটি করিয়া অঙ্ক লইলে ১৩২+৬৪৫=৩২৬+৪৫১=২৬৪+৫১৩=৭৭৭

স্পষ্টতঃ, এই ভাগশেষগুলির সহিত ৭ সংখ্যাটির সম্পর্ক বর্তমান।

* * *

‘$\frac{১}{১৩}$’ ভগ্নাংশটিকে দশমিকে প্রকাশ করিলে ছয়টি ভাগশেষ পাওয়া যায় ঃ ১০, ৯, ১২, ৩, ৪, ১। ‘৭’ সংখ্যাটিকে হর ধরিয়া আমরা যে সকল প্রক্রিয়া করিয়াছি, তাহা এক্ষেত্রেও করা সম্ভব; তবে এক্ষেত্রে ‘১৩’ সংখ্যাটির সহিত আমাদের পুনঃপুনঃ সাক্ষাৎ ঘটিবে।

সকল ভাগশেষগুলিই এক অঙ্কের না হইলে ইহাদের ব্যবহার কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য; সুতরাং এক্ষেত্রে সংযুক্তি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে যখন ‘৩’ ও ‘৪’ অঙ্কদ্বয় একত্রে আসে তখন দুটি করিয়া অঙ্ক লইয়া যোগ করার সময় আমরা ৩৪ যোগ করি অর্থাৎ বস্তুতঃ আমরা ‘৩০+৪’ ব্যবহার করি। অনুরূপে, যখন ‘১০’ ও ‘৯’ একত্রে আসে, তখন আমরা ‘১০০+৯’ বা ১০৯ লিখিব। আবার ৯ এবং ১২ একত্রে আসিলে ‘৯০+১২’ বা ১০২ লিখিব। অতএব, আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আসলে প্রক্রিয়াগুলি একই প্রকারের। ১০৯+১২৩+৪১= অথবা, ১০২+৩৪+২০=

১৩ সংখ্যাটি গুণনীয়ক (factor) হিসাবে কতবার এই যোগগুলিতে আসে তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে এবং প্রাপ্ত ফলাফলের সহিত ৭ এর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অনুরূপ প্রক্রিয়ার ফলাফলের তুলনা করা যাইতে পারে।

১১০২+... =

+৪২০ =

+২০৯ =

উপরোক্ত শূন্যস্থানগুলি পূরণ করিতে এবং যোগফলগুলি কিভাবে ১৩ সংখ্যাটির সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা আলোচনা করিতে পাঠকবৃন্দ সত্যিকারের আনন্দলাভ করিবেন।

যেহেতু $\frac{১}{১৭}$ সংখ্যাটির পর্যাবৃত্তিতে একটি ১৬ অঙ্কের বিস্তার পাওয়া যায়, অতএব ইহার ভাগশেষগুলির সংযুক্তি সাধনের বিস্ময়কর সম্ভাবনা বর্তমান। পূর্ববর্তী দুইটি ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে অঙ্কগুলির যোগফল নির্ণয় করিয়াছি, এক্ষেত্রে অনুরূপে যোগফল নির্ণয় করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রতিটি যোগফল ১৭ সংখ্যাটির গুণিতক (multiple) হইবে।

* * *

এখনে [এখানে] প্রদত্ত একটি আবৃত্ত দশমিক হইতে কি ভাবে উহার আদি ভগ্নাংশটি পাওয়া সম্ভব, তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখিব। উদাহরণ স্বরূপ, মনে করা যাউক যে প্রদত্ত দশমিকটি হইল —

ধরা যাউক, ক = .৭৭৭৭...

অতএব ১০ ক = ৭.৭৭৭৭...

∴ ৯ ক = ৭, যেহেতু দশমিকের সংখ্যাগুলি উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন।

∴ ক = $\frac{৭}{৯}$

এখন, .৩৫৩৫... দশমিকটিকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করিব ঃ

মনে করি, $ক = .৩৫৩৫...$

$\therefore ১০০ক = ৩৫.৩৫৩৫...$

$\therefore ৯৯ক = ৩৫$

$\therefore ক = \frac{৩৫}{৯৯}$

অনুরূপে, .৩৭০৩৭০... দশমিকটিকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ধরা যাউক,

$ক = .৩৭০৩৭০...$

$\therefore ১০০০ক = ৩৭০.৩৭০৩৭০$

$\therefore ৯৯৯ক = ৩৭০$

$$\therefore ক = \frac{৩৭০}{৯৯৯} = \frac{৩৭০}{৯ \times ১১১} = \frac{৩৭০}{৯ \times ৩ \times ৩৭} = \frac{১০}{২৭}$$

এই সকল উদাহরণ হইতে আমরা আবৃত্ত দশমিককে ভগ্নাংশে প্রকাশ করিবার একটি নিয়ম বাহির করিতে পারি। পর্যাবৃত্ত সূচক সংখ্যাটিকে লব লইয়া এবং পর্যাবৃত্ত সূচক সংখ্যাটিতে যতগুলি অঙ্ক আছে, ততগুলি ৯ দ্বারা হরটি গঠন করিতে হইবে।

জ্যামিতিক প্রগতি (geometric progression) এর সাহায্যেও এই ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, .৭৭৭... আবৃত্ত দশমিকটি নিম্নলিখিত প্রগতির সমান।

$$\frac{৭}{১০} + \frac{৭}{১০০} + \frac{৭}{১০০০} + \ldots$$

এখানে $অ = \frac{৭}{১০}$, $র = \frac{১}{১০}$ এবং 'ন' অনন্ত সংখ্যা পর্যন্ত বর্দ্ধিত।

এখানে, অ = প্রগতির প্রথম পদ, র = সাধারণ অনুপাত অর্থাৎ যে কোন সংখ্যা ও তাহার পূর্ব সংখ্যার অনুপাত এবং ন = প্রগতির মোট পদসংখ্যা।

এক্ষেত্রে যোগফল নির্ণয়ের সূত্র হইল

যোগফলঃ $স = \frac{অ}{১-র} = \frac{৭}{৯}$

দ্বিতীয় উদাহরণের ক্ষেত্রে

$$.\overline{৩৫} = \frac{৩৫}{১০০} + \frac{৩৫}{১০০^২} + \frac{৩৫}{১০০^৩} + \ldots$$

ইহাতে, 'অ' ও 'র' এর মান বসাইয়া সহজেই যোগফল 'স' বাহির করা যাইবে।

যদি আবৃত্ত দশমিকটির পূর্বে একটি পূর্ণ সংখ্যা (whole number) থাকে, তবে প্রথমে মাত্র দশমিক অংশটিকে ভগ্নাংশে পরিণত করিয়া পূর্ণ সংখ্যাটির সহিত যোগ করা সুবিধাজনক। যেমন, ২.৭৭৭... এর ক্ষেত্রে ২.৭৭৭... $= ২\frac{৭}{৯}$

কিন্তু আমাদের পূর্বের প্রক্রিয়াও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য

$ক = ২.৭৭৭...$

$১০ক = ২৭.৭৭৭...$

$\therefore ৯ক = ২৫$

$\therefore ক = \frac{২৫}{৯} = ২\frac{৭}{৯}$

যদি দশমিক বিন্দু এবং আবৃত অংশের মাঝে সরল দশমিক (simple decimal) রূপে এক বা একাধিক অঙ্ক থাকে তবে সেক্ষেত্রেও এই একই প্রক্রিয়া প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, .৮৫৩২৩২৩২... দশমিকটিকে লওয়া হইল।

$$\begin{aligned}
ক &= .৮৫৩২৩২\ldots \\
১০০ক &= ৮৫.৩২৩২৩২\ldots \\
১০০০০ক &= ৮৫৩২.৩২৩২\ldots \\
\therefore ৯৯০০ক &= ৮৪৪৭ \\
\therefore ক &= \frac{৮৪৪৭}{৯৯০০}
\end{aligned}$$

কতকগুলি আবৃত্ত দশমিকের ক্ষেত্রে পর্যাবৃত্ত সূচক সংখ্যায় বৃহত্তম সম্ভাব্য অঙ্কসংখ্যা থাকে এবং কতকগুলির পর্যাবৃত্ত বিস্তার সম্ভাব্য বিস্তার অপেক্ষা কম হয়। আবৃত্ত দশমিকের এই ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিবার মত জ্ঞান আমরা সঞ্চয় করিয়াছি।

কোন প্রদত্ত পর্যাবৃত্ত বিস্তারের অঙ্কসংখ্যা জানা থাকলে, আমরা দেখিয়াছি যে ভগ্নাংশের হরটি সেই অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক '৯' দ্বারা গঠিত হয়। এবং সেই জন্যই যদি কোন প্রকারে হরটির কতগুলি '৯' আছে জানা যায়, তাহা হইলে আবৃত্ত দশমিকটির পর্যাবৃত্ত সম্বন্ধেও আমাদের সম্যক্ জ্ঞান জন্মে।

'$\frac{১}{১১}$' ভগ্নাংশটির পর্যাবৃত্ত বিস্তার করিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে করি, ক = প্রদত্ত ভগ্নাংশটি হইতে জাত আবৃত্ত দশমিকের পর্যাবৃত্ত বিস্তার।

$$\frac{১}{১১} = \frac{ক}{৯৯৯৯\ldots}$$

এখানে হরটিতে ৯ এর সংখ্যা 'ক' এর অঙ্কসংখ্যার সমান। প্রদত্ত সমীকরণটির উভয়পক্ষের হরকে ১১ দ্বারা ভাগ করিলে বামপক্ষ ১-এর সমান হয়; অতএব দক্ষিণ পক্ষও ১-এর সমান হইবে। দক্ষিণ পক্ষের হরটি ১১ দ্বারা বিভাজ্য হইতে কমপক্ষে কয়টি ৯ প্রয়োজন? স্পষ্টতঃ মাত্র দুইটি। $\therefore ক = \frac{৯৯}{১১} = ০৯$

$\frac{১}{৭}$ ভগ্নাংশটির জন্যও উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি চেষ্টা করা যাইতে পারে।

$$\frac{১}{৭} = \frac{ক}{৯৯৯৯৯\ldots}$$

এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে দ্বিতীয় হরটিকে ৭ দ্বারা বিভাজ্য করিতে হইলে অন্যূন কয়টি ৯ প্রয়োজন। দেখা যাইবে যে ন্যূনপক্ষে ছয়টি ৯ প্রয়োজন। সুতরাং $\frac{১}{৭}$ ভগ্নাংশটির বিস্তার ছয় অঙ্কের হইবে।

$$\frac{১}{৭} = \frac{ক}{৯৯৯৯৯৯}$$

উভয় পক্ষের হরকে ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া

$$১ = \frac{ক}{১৪২৮৫৭}$$

ক = ১৪২,৮৫৭ অর্থাৎ আমরা আমাদের বহু পরিচিত সংখ্যাটির সাক্ষাৎ লাভ করিলাম।

ইহার সাহায্যে সহজেই বোঝা যায় কেন $\frac{১}{৩}$ বা $\frac{১}{৯}$ ভগ্নাংশগুলির প্রতিটির ক্ষেত্রে পর্যাবৃত্ত এক অঙ্কের হয়। দেখা গিয়াছে যে ৭ ও ১৩ উভয়ের দ্বারাই '৯৯৯,৯৯৯' সংখ্যাটি বিভাজ্য। অতএব উভয়ের ক্ষেত্রেই পর্যাবৃত্ত ছয় অঙ্কের হইবে।

$$\begin{aligned}
৯৯৯,৯৯৯ &= ৯ \times ১১১,১১১ = ৯ \times ৩ \times ৩৭,০৩৭ \\
&= ৯ \times ৩ \times ৩৭ \times ১০০১ \\
&= ৩^{৩} \times ৭ \times ১১ \times ১৩ \times ৩৭
\end{aligned}$$

ইহা হইতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে '$\frac{১}{৩৭}$' ভগ্নাংশটির ক্ষেত্রেও পর্যাবৃত্ত ছয় অঙ্কের হইবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে এক্ষেত্রে এতগুলি '৯' প্রয়োজন হয় না। '৯৯৯' সংখ্যাটি '৩৭' দ্বারা বিভাজ্য। অতএব '$\frac{১}{৩৭}$' ভগ্নাংশটির ক্ষেত্রে পর্যাবৃত্ত মাত্র তিন অঙ্কের হয়;

$$\frac{১}{৩৭} = .\overline{০২৭}$$

'৯', '৯৯', '৯৯৯' ইত্যাদিকে এই প্রকারে না প্রকাশ করিয়া সাধারণতঃ ১০-১, $১০^{২} - ১$, $১০^{৩} - ১$ ইত্যাদি বিশেষ প্রকারে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। অতএব, নিয়মটিকে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে —

$১০^{ক}-১$ যে কোন মৌলিক সংখ্যা 'ন' দ্বারা বিভাজ্য হইলে '$\frac{১}{ন}$' ভগ্নাংশটির পর্যাবৃত্ত বিস্তার 'ক' এর সর্বনিম্ন মান দ্বারা নির্ণীত হয়।

$১০^{ক}-১$ এর মৌলিক উৎপাদক প্রদর্শনকারী নিম্নলিখিত ছকটি আকর্ষণীয় বোধ হইতে পারে; এখানে ক = ১, ২, ৩,...

$$
\begin{aligned}
&১০^{১}-১=৩^{২}\\
&১০^{২}-১=৩^{২}\times\underline{১১}\\
&১০^{৩}-১=৩^{৩}\times\underline{৩৭}\\
&১০^{৪}-১=৩^{২}\times১১\times\underline{১০১}\\
&১০^{৫}-১=৩^{২}\times\underline{৪১}\times\underline{২৭১}\\
&১০^{৬}-১=৩^{৩}\times\underline{৭}\times১১\times\underline{১৩}\times৩৭\\
&১০^{৭}-১=৩^{২}\times\underline{২৩৯}\times\underline{৪৬৪৯}\\
&১০^{৮}-১=৩^{২}\times১১\times\underline{৭৩}\times১০১\times\underline{১৩৭}\\
&১০^{৯}-১=৩^{৪}\times৩৭\times\underline{৩৩৩,৬৬৭}\\
&১০^{১০}-১=৩^{২}\times১১\times৪১\times২৭১\times\underline{৯০৯১}.
\end{aligned}
$$

নিম্নরেখ সংখ্যাগুলি নির্দেশ করে যে ইহারা উৎপাদক হিসাবে এই প্রথম উপরোক্ত ছকে আসিল এবং ইহাদের বিস্তার ঐ সারির ১০ এর ঘাত (power) দ্বারা নিরূপিত হয়।

লক্ষণীয় যে অতি বৃহৎ সংখ্যার ক্ষেত্রে বিস্তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইতে পারে। ২৭১ ও ৩৩৩,৬৬৭ সংখ্যাদ্বয়কে উদাহরণরূপে দেখান যাইতে পারে। $\frac{১}{১০১}$ ভগ্নাংশটিকে দশমিকরূপে প্রকাশ করিলে পর্যাবৃত্ত বিস্তার ১০০ অঙ্ক হইবে আশা করা যায়; কিন্তু দেখা গিয়াছে যে ইহার পর্যাবৃত্ত মাত্র চার অঙ্কের হয়।

'১০০' অপেক্ষা ক্ষুদ্র মাত্র নয়টি সংখ্যার ক্ষেত্রে পর্যাবৃত্ত বিস্তার পূর্ণ দৈর্ঘ্যের হয়। ইহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ হরটি হইল '৯৭' অর্থাৎ '$\frac{১}{৯৭}$' ভগ্নাংশটির পর্যাবৃত্ত বিস্তারে '৯৬' টি রাশি আছে। অবশ্য '$\frac{২}{৯৭}$', '$\frac{৩}{৯৭}$', ... '$\frac{৯৬}{৯৭}$' ভগ্নাংশগুলির ক্ষেত্রে পর্যাবৃত্ত ঐ একই দৈর্ঘ্যের হয় এবং প্রতিটির ক্ষেত্রে পর্যাবৃত্তটি একই বৃত্তীয়ক্রমে গঠিত হয়।

আমাদের উপরোক্ত পর্যাবৃত্ত তখনই সত্য হইবে যখন হরটি একটি মৌলিক সংখ্যার হইবে। উদাহরণস্বরূপ, $\frac{১}{২১}=.০৪৭৬১৯$ এই পর্যাবৃত্তটিতে '১৪২,৮৫৭' পর্যাবৃত্তটির মত কোন বিশেষ ধর্ম বর্তমান নহে। আরও অনেক ক্ষেত্রে আবার অঙ্ক সংখ্যার যোগফল '৯' সংখ্যাটির গুণিতক (multiple) হইবে।

$$\frac{১}{৩৯}=.\overline{০২৫৬৪১},\quad ২+৫+৬+৪+১=১৮$$

$$\frac{১}{৭৭}=.\overline{০১২৯৮৭},\ \text{এবং}\quad ০+৯=১+৮=২+৭,\quad ১+২+৯+৮+৭=২৭$$

$$\frac{১}{২৩১}=.\overline{০০৪৩২৯},\quad ৪+৩+২+৯=১৮$$

এবং এখন প্রশ্ন এই যে, যে দশমিকগুলি পর্যাবৃত্ত নহে, অথচ অসীম (infinite) দশমিক, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা কি বলিতে পারি? সত্যই এইরূপ দশমিকের অস্তিত্ব বর্তমান এবং এইরূপ অনেক দশমিকই উদাহরণস্বরূপ আমরা উপস্থাপিত করিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ —

.২১২১১২১১১২১১১১২... এই অসীম ও অনাবৃত্ত (non-repeating) দশমিকটির বিচার করা যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে একটি ভগ্নাংশকে সর্বদা হয় একটি সসীম অথবা একটি আবৃত্ত দশমিকরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিপরীতপক্ষে উপরোক্ত উভয়প্রকার দশমিককেই ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ করা সম্ভব। অতএব, ইহা নিশ্চিত যে, যে অসীম দশমিকটি অনাবৃত্ত হইবে, তাহাকে ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ করা যাইবে না; এই প্রকারের দশমিকগুলিকে লইয়াই অমূলদ (irrational) রাশিসমূহ গঠিত হয়।

$\sqrt{২}$ কে উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইহার মূল নির্ণয় করা যাইতে পারে। দেখা যাইবে যে যতদূর

দশমিক স্থান (decimal place) পর্যন্ত আমরা অগ্রসর হই না কেন, দশমিকটি কখনই সসীম বা আবৃত্ত হইবে না। একটি নতুন অঙ্ক যুক্ত হইলে যে দশমিকটি সৃষ্ট হয়, তাহার বর্গ (square) পুরাতন দশমিকটির বর্গ অপেক্ষা ২ সংখ্যাটির অধিকতর নিকটবর্তী। এই অঙ্কগুলি কখনও নিয়মিত ক্রমে আসে না এবং দশমিকটির কোন পর্যাবৃত্ত বিস্তারও নাই। পর্যাবৃত্ত বর্তমান থাকিলে আমরা $\sqrt{২}$-এর সঠিক মূল বাহির করিতে পারিতাম। সাত দশমিক স্থান পর্যন্ত $\sqrt{২}$-এর মান = ১.৪১৪২১৩৬ আপাত দৃষ্টিতে ইহার সহিত আবৃত্ত দশমিকগুলির কোন পার্থক্য দেখা যায় না; কিন্তু ইহা সন্দেহাতীত যে যাহাই মনে হউক বা যতবেশী স্থান পর্যন্ত, সহস্র বা লক্ষ স্থান পর্যন্ত, মান নির্ণয় করা যাউক না কেন, ইহা দ্বারা কোন পর্যাবৃত্ত পৌনঃপুনিকতা সূচিত হয় না।

Mathematical Excursions by H.A. Merrill হইতে
অসীম চট্টোপাধ্যায় অনূদিত।

সম্পাদকীয় সংযোজন

মূল 'অঙ্ক ভাবনায়', ১ চিহ্নিত অংশে বন্ধনী নির্দেশিত শব্দগুচ্ছ বাদ পড়ে গেছে।

কার্ল ফ্রিডরিক গ্যয়স

১৭৭৭-১৮৫৫

অঙ্কশাস্ত্রের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্রয় হইলেন আর্কিমিডিস, নিউটন এবং গ্যয়স। আর্কিমিডিসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের যে দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহাই আবার আধুনিক যুগের কাছে উন্মুক্ত করিয়া ধরিলেন নিউটন এবং শত বর্ষ পরে গ্যয়স অঙ্কশাস্ত্রে সাফল্যের নবযুগ প্রবর্তন করিলেন।

গ্যয়সের পিতা গেহার্ড জার্মাণীর ছোট শহর ব্রান্সউইকের শ্রমিক ছিলেন। জীবন ধারণের জন্য সারা বৎসর ধরিয়া তাহাকে একটানা কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। তাহার প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল ডরোথিয়া ওয়ারনে। ইনি একটি মাত্র পুত্রসন্তান যোহান গর্গ হাইনরিখকে রাখিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহার মৃত্যুর পর গেবহার্ড ডরোথিয়া বেনজ নামে এক অশিক্ষিতা পরিচারিকাকে বিবাহ করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাহাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। নবজাতকের নামকরণ করা হইল যোহান ফ্রিডরিক কার্ল। এই কার্লই উত্তরকালে অশেষ দরিদ্রতা ও অখ্যাত পটভূমিকা হইতে অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাসে সাফল্যের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শিশু বয়সেই কার্লের মধ্যে বহুবিধ প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল। পিতা মাতা এই সব দেখিয়া ভাবিলেন কার্ল ক্ষীণ পরমায়ু লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কেননা ঈশ্বরের কৃপাধন্য ও বিশেষ অনুগৃহীতরা অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। পরিষ্কার ভাবে মুখে কথা ফুটিবার আগেই কার্ল যোগ বিয়োগ করিতে পারিতেন। বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন কার্ল যে রকম স্বাভাবিক ভাবে যোগ বিয়োগ করিবার বুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন ঠিক সেই রকম আশ্চর্যজনক সহজ উপায়ে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। পিতার নিকট বর্ণমালা চিনিয়া লইয়া তিনি নিজে নিজেই লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন।

কার্লের অপরিণত বয়সের এই সকল কৃতিত্বসমূহ তাহার পিতামাতা অত্যন্ত গর্বসহকারে প্রচার করিতে ভালবাসিতেন। তাহারা এইগুলিকে বৈঠকি মজার চাতুর্যপূর্ণ কৌশল মনে করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কার্ল গ্যয়স উত্তরাধিকারী সূত্রে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ছিলেন।

চাতুর্যপূর্ণ কৌশল অর্থাৎ বৈঠকি মজা এবং প্রতিভার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে তাহা গেবহার্ড হয়ত বুঝিতে পারিতেন না

বলিয়াই হউক কিংবা অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়াই হউক পুত্রের প্রতিভাকে স্বীকার করিতে চাহিতেন না। তিনি কার্লকে তাঁতের কাজে নিয়োজিত করিলেন। তাহার অভিপ্রায় ছিল কার্ল অন্ততঃ পক্ষে পিতৃব্য যোহান বেনজের মত একজন সুদক্ষ তাঁতি হোক। কার্ল পিতৃব্যকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যোহান বেনজই প্রথম কার্লের প্রতিভাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। কৈশোরে নিজস্ব যে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সাধ দরিদ্রতার নির্মম কশাঘাতে বিলীন হইয়া গিয়াছিল তাহারই পূর্ণতার নবতর সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি ভাইপোকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

সাত বৎসর বয়সে কার্লকে স্থানীয় গ্রামার স্কুলে পাঠানো হইল। সেইখানে একদিন জনৈক শিক্ষক ক্লাসের ছেলেদের জব্দ করিবার জন্য ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যাকে যোগ করিতে দিলেন। প্রশ্নটি বলিতে না বলিতেই কার্ল শিক্ষকের সামনে শ্লেট বাড়াইয়া ধরিল। সংখ্যানুক্রম সূত্র দ্বারা যে এইরূপে যোগ করা যাইতে পারে ইতিপূর্বে কার্লকে কেহই তাহা শিখাইয়া দেয় নাই অথচ নিজে নিজেই কি ভাবে ঐ সূত্র আবিষ্কারে সমর্থ হইল ইহা ভাবিয়া শিক্ষক যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তখন পর্যন্ত কেবলমাত্র পিথাগোরাসের শিষ্যরাই এই সূত্র নিজেদের মধ্যে সাঙ্কেতিক ভাবে ব্যবহার করিতেন। $\frac{1n(n+1)}{2}=s$, এইখানে s হইল সমষ্টি এবং 1, 2, 3,....n অনুক্রমের শেষ সংখ্যা হইল n।

গ্যয়স সম্ভবতঃ ১০০র সঙ্গে ১, ৯৯র সঙ্গে ২, ৯৮র সঙ্গে ৩ যোগ করিয়া সমাধান বাহির করিয়াছিলেন। কেননা, প্রতিবারেই যোগফল দাঁড়াইতেছে ১০১ এবং যেহেতু একশটি সংখ্যা যোগ করিতে হইতেছে অতএব এখানে ৫০ গোছ (set) ১০১ রহিয়াছে। ১০১ এর ৫০ গুণ হইল ৫,০৫০; সুতরাং সমস্যাটির উত্তরও ইহাই হইবে। (অথবা সূত্র অনুযায়ী $1/2 \times 100 \times 101 = 5{,}050$)।

দরিদ্রতা ও নানা প্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কার্ল পড়াশুনো করিতে লাগিলেন। কিংবদন্তীর মত গ্যয়সের বিস্ময়কর প্রতিভার কথা যথা সময়ে ব্রান্সউইকের ডিউকের কানে পৌঁছিল। ডিউক কার্লকে দুর্গে ডাকাইয়া আনিলেন এবং এইভাবে দু'জনের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইল তাহা আজীবন অক্ষুন্ন [অক্ষুণ্ণ] ছিল।

পনেরো বৎসর বয়সে কার্লকে কলেজে পাঠানো হইল। কলেজের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিলেন ডিউক এবং প্রতিমাসে কিছু নির্দ্ধারিত ভাতাও বরাদ্দ করিয়া দিলেন। গ্যয়স প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা এবং অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে পড়িতে শুরু করিলেন। তিন বৎসর পরে কার্ল যখন গ্যোটিঙগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন তখন পর্যন্ত ভাষা না অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে মার্চ তারিখে অঙ্কশাস্ত্রের সপক্ষেই চূড়ান্ত ভাবে মন স্থির করিলেন। কেননা এই বিশেষ দিনটিতেই তিনি শুধুমাত্র একটি কম্পাস ও একটি মাপকাঠির সাহায্যে সতেরো দিক বিশিষ্ট বহুভুজ অঙ্কন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এমন কি বৃদ্ধ বয়সে যখন আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার আবিষ্কার সমূহ অনন্য সাধারণ কৃতিত্বে ভাস্বর ও উজ্জ্বল, তখনও তিনি উক্ত আবিষ্কারকে তাঁহার জীবনের অন্যতম কীর্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

মার্চের ঐ বিশেষ দিন হইতেই তিনি অঙ্কবিষয়ক ডায়ারি রাখিতে শুরু করিলেন। অনইউক্লিডীয় জ্যামিতির নবতর সম্ভাবনা তিনি ইতিমধ্যেই অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। সংখ্যাতত্ত্ব ও পাটীগণিতে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি জটিল সংখ্যার রৈখিক প্রতিরূপ আবিষ্কারে এবং বীজগণিতের মৌলিক প্রতিজ্ঞা নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। গ্যয়সের যৌবনকাল নিউটনের মতই অপর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদনক্ষম ও সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তিনি বলিতেন প্রতিনিয়ত তাঁহার মনে এত অধিক সংখ্যক কল্পনা ভীড় জমাইত যে উহাদের অতি ক্ষুদ্র একাংশকেই তিনি কাজে লাগাইতে পারিতেন, আবার ঐগুলির মধ্যেও কেবলমাত্র কিছু ভগ্নাংশকেই চর্চা করিবার সময় পাইতেন।

একুশ বৎসর বয়সে কার্ল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় লইয়া ব্রান্সউইকে ফিরিয়া গেলেন। পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটাতে তিনি পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আলাদা বসবাস করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি গুরুতর অর্থসঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ব্রান্সউইকের ডিউকের বদান্যতায় এই সঙ্কট হইতে তিনি পরিত্রাণ পাইলেন। অতঃপর তিনি গ্যোটিঙগেনে থাকা কালে সংখ্যাতত্ত্বের উপর যে নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি শুরু করিয়াছিলেন তাহা শেষ করিতে নিবিষ্ট হইলেন এবং নিয়মিতভাবে কয়েকমাস হেলমস্টেডে আসা যাওয়া করিয়া লাইব্রেরীতে পড়াশুনো করিতে লাগিলেন। অবশেষে দীর্ঘ তিন বৎসর পরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে Disquisitiones Arithmeticae নামে নিবন্ধটি প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে গ্যয়সের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। উল্লিখিত গ্রন্থের সারমর্ম আলোচনা করা স্বল্প পরিসর এই নিবন্ধে সম্ভবপর নহে। গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু সর্বসমতার তত্ত্বের উপর সরল ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা। Denbow ও Goedicke রচিত (Harper & Brothers প্রকাশিত) Foundation of Mathematics গ্রন্থের ৫৩৪-৪৪ পৃষ্ঠা সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। উৎসাহী পাঠক বইটি পড়িয়া দেখিতে পারেন। কিছুদিন পরে তিনি আরো সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমপরিমাণেই গুরুত্বপূর্ণ আর একটি প্রবন্ধ রচনা করিলেন। প্রবন্ধটির দীর্ঘ নামকরণ করিলেন ঃ Demonstratio Nova theorematis omnem functionem

algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus revolvi posse. ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

সংক্ষেপে এই আখ্যার অর্থ হইল গ্যয়স বীজগণিতের মৌলিক প্রতিজ্ঞার (fundamental theorem) প্রমাণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি অখণ্ড মূলদ সমীকরণের একটি মাত্র চলে অন্ততঃ একটি করিয়া মূল থাকে; আরো সরল করিয়া বলিতে গেলে, এই প্রতিজ্ঞার অর্থ হইতেছে, যে কোন বীজগাণিতিক সমীকরণের অন্ততঃপক্ষে একটি মূল থাকিবেই। অনুসিদ্ধান্তটি সমপরিমাণেই আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সমীকরণেরই অজ্ঞাত রাশির সর্বোচ্চ ঘাত যত হইবে ঠিক ততগুলি মূল থাকিবে। যেমন $x^4 + 2x^3 + 9 = 0$ ইহার মূল থাকিবে চারটি এবং এইভাবে $x^3 + x^2 + 2x + 4 = 0$ র থাকিবে তিনটি। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অথবা প্রত্যেকটি মূলই অভেদ হইবে কিন্তু তথাপি প্রত্যেকটিকেই আলাদা অস্তিত্ব (entity) হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। ইহার কারণ হইল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেখান হইয়াছিল যদি $x - a$, সমীকরণের একটি উৎপাদক হয়, তাহা হইলে a হইতেছে সমীকরণের একটি মূল। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে $x^2 - 6x + 9 = 0$ কে $(x-3)\ (x-3) = 0$ এই উৎপাদকে পরিণত করা যায়। যে কোন সমীকরণেই এই সম্পর্ক সত্যবদ্ধ। ইহার মূল অভিন্নরূপে ৩ এবং ৩ হইতেছে। ইহারা যদিও অভেদ, তথাপি প্রত্যেকটিকে আলাদা ভাবেই গণিতে হইবে।

মৌলিক প্রতিজ্ঞার প্রমাণ নির্ণয় করতঃ কার্ল বীজগণিতকে সুসম্বদ্ধ ও বীজগাণিতিক নিয়মাবলীকে সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত [অন্তর্ভুক্ত] করিয়া সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রতিটি বীজগাণিতিক সমীকরণেরই অন্ততঃ একটি করিয়া মূল রহিয়াছে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে সংখ্যারীতির সম্পূর্ণতা সাধন সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতে হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, যদি অমূলদ সংখ্যাকে সমীকরণ হইতে বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে কেবল মাত্র অমূলদ মূল লইয়া সমাধান অসম্ভব হইয়া উঠিবে এবং প্রত্যেক সমীকরণেরই যে অন্ততঃ একটি করিয়া মূল থাকে তাহাও অসত্য হইবে।

ধনাত্মক, ঋণাত্মক, মূলদ ও অমূলদ প্রভৃতি যে সকল সংখ্যা লইয়া বাস্তব রাশিমালা গঠিত হয় তাহা দ্বারা কি সংখ্যারীতির সম্পূর্ণতা সাধিত হয়? না তাহা হইতে পারে না। একটি সরল সমীকরণ যথা $x^2 + 4 = 0$ কেবল মাত্র বাস্তব সংখ্যা দ্বারা সমাধানের অসাধ্য হইয়া উঠিবে। কেননা ইহার উত্তর হইবে $x = \pm\sqrt{-4}$, অথবা $x = \pm 2\sqrt{-1}$। য়্যুলার বলিয়াছেন "...$\sqrt{-1}$ এবং $\sqrt{-2}$ এইরূপ রাশিমালা কাল্পনিক সংখ্যা, কেননা উহারা ঋণাত্মক রাশিমালার মূলের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। সুতরাং ঐরূপ রাশিমালা সম্পর্কে আমরা স্থির নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি বাস্তব রাশিমালার মধ্যে এইরূপ সংখ্যার কোন বিদ্যমানতা নাই।" যাহাই হউক গ্যয়স এ'কথা বিশ্বাস করিতেন যে, একটি বিদ্যমানতাকে, ঋণাত্মক রাশিমালার মত কাল্পনিক সংখ্যার উপরেও আরোপ করা যাইতে পারে এবং সংখ্যারীতিতে তিনি এই প্রস্তাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

কেবল মাত্র স্বীকারই করেন নাই অধিকন্তু কাল্পনিক সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার মতই লেখচিত্রে অঙ্কিত হইতে পারে ইহা প্রমাণ করিয়া উপরোল্লিখিত মূল সূত্রগুলিকে দৃঢ় ভিত্তিনীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

পরের পৃষ্ঠার [মূল 'অঙ্কভাবনা' পত্রিকায় চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছিল] চিত্রটিতে x অক্ষটি বাস্তব সংখ্যাকে নির্দেশ করিতেছে এবং y অক্ষ কাল্পনিক সংখ্যাকে নির্দেশ করিতেছে। এখন $2\sqrt{-1}$ কে অঙ্কন করিতে হইলে কেবলমাত্র y অক্ষ এর বরাবর দুটি একক (unit) দিতে হইবে। গ্যয়স $\sqrt{-1}$ এই কাল্পনিক সংখ্যাকে নির্দেশ করিতে "i" অর্থাৎ কাল্পনিক সংখ্যা এই চিহ্নটির প্রবর্তনা করিয়াছেন।

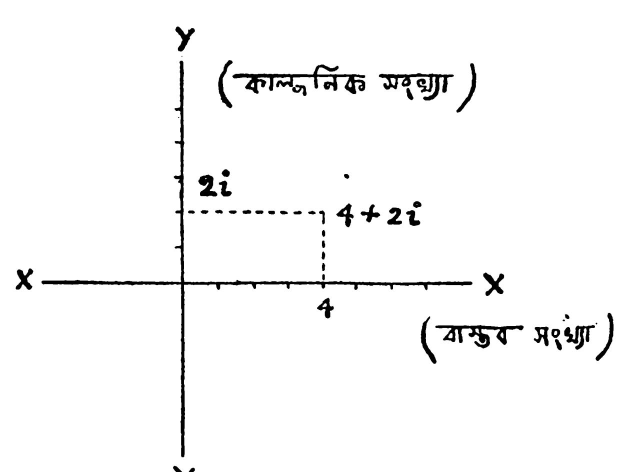

এখন $2\sqrt{-1}$ কে $2i$ লিখিলেও চলে। $\sqrt{-2}$ কে $i\sqrt{2}$ লেখা যাইতে পারে। কাল্পনিক ও বাস্তব সংখ্যার সংযুক্তিতে $4+2i$ এইভাবে অঙ্কিত হইতে পারে। উপরের চিত্রটিতে বাস্তব ও কাল্পনিক সংখ্যা এক একটি বিন্দুকে নির্দেশ করিতেছে যাহাকে গ্যয়স একটি ভিন্ন ধরনের, সংখ্যা হিসাবে বিবেচনা করিয়া জটিল সংখ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই জটিল সংখ্যাগুলি হইতেই অন্যান্য সকল সংখ্যার উৎপত্তি। অর্থাৎ যে কোন বাস্তব সংখ্যাই আদতে $a+bi$ নিয়মে জটিল সংখ্যা রূপে পরিগণিত হইতে পারে। এখানে আমরা দেখিতেছি a বাস্তব b শূন্য; আবার যে কোন কাল্পনিক সংখ্যাই উক্তরূপ জটিল সংখ্যা, যেখানে a হইতেছে শূন্য এবং b হইতেছে বাস্তব। রাশিমালা, চৌহদ্দি (domain) অথবা ক্ষেত্র (field) যে পদেই অগ্রাধিকার দেওয়া হউক না কেন আমরা নিম্নবর্ণিত চিত্রাঙ্কন করিয়া দেখাইতে পারিঃ

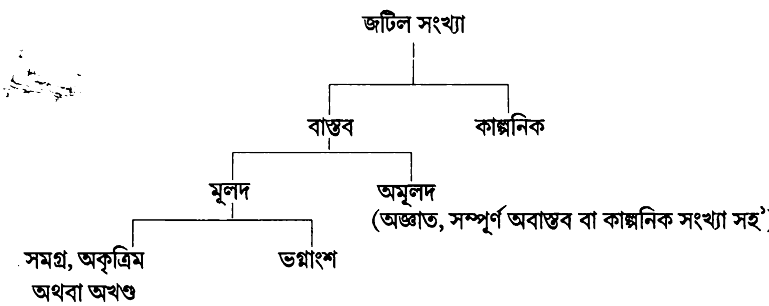

অবশ্য এই সংখ্যাগুলির যে কোনটিই ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক হইতে পারে। জটিল সংখ্যা স্বীকৃতি লাভের ফলে শুধু বীজগণিতই লাভবান হয় নাই উপরন্তু জ্যামিতি এবং বিশ্লেষণ প্রণালীও সমধিক উপকৃত হইয়াছে। জটিল চলের অপেক্ষক সূত্রেরও উন্নতিবিধান ঘটিয়াছে। ধ্রুব পারস্য ব্যবকলনধর্মী জ্যামিতি এবং ভেক্টর বিশ্লেষণ যাহা আধুনিক বিজ্ঞানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা ঐ সকল অর্ধ বাস্তব ও অর্ধ কাল্পনিক সংখ্যা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

জটিল সংখ্যাকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং ঘাতে উন্নীত বা মূল নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রতি ক্ষেত্রেই $a+bi$ নিয়মে একটি জটিল সংখ্যার ফলস্বরূপ a, b কিংবা উভয়েই শূণ্য [শূন্য] হইতে পারে। জটিল সংখ্যার উপর কাজ করার জন্য কোন নতুন সংখ্যা উদ্ভাবন করিতে হইবে না। জটিল সংখ্যার স্বীকৃতি লাভের ফলে সমগ্র বীজগণিত যেন এক লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছিল এবং যে কোন বীজগাণিতিক সমীকরণ সমাধান ও বীজগণিতে সকল রকমের কাজ করা সম্ভব হইয়া উঠিল। পিথাগোরাসের সময় হইতেই মানুষ এতাবৎ কাল এই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। অনুরূপ প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও চলিতেছিল। রাসায়নিকরা রসায়নে সংখ্যার অনুরূপ যাবতীয় উপাদান বা অনুক বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন পর্যন্ত ১১১টী মৌল উপাদান বা অনুক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানীগণ অপরপক্ষে পদার্থের মৌল একক কি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছিলেন। প্রথমে তাহাদের বিশ্বাস ছিল, অণু অবিভাজ্য একক — কিন্তু পরে দেখা গেল অণু ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন সহযোগে প্রস্তুত হইয়াছে। অবশ্য ইহাই সম্পূর্ণ তালিকা নহে। কেননা আরও নতুন নতুন পদার্থ কণিকা যেমন এ্যান্টিপ্রোটনস, পজিট্রন, নিউট্রিনস প্রভৃতি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। হয়তো আবার নতুন করিয়া এইগুলির সঙ্গে আরও পদার্থ কণিকা যোগ হইবে কিংবা এইগুলিকে বিভাজ্য করিয়া আরও নতুন পদার্থ আবিষ্কৃত হইবে। অঙ্কশাস্ত্রের অবসানের জন্য গাণিতিক অনুসন্ধান এই সকল লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল এবং এই বিষয়ে গ্যয়স চূড়ান্তভাবে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

গ্যয়সের নিকট ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটী ক্ষুদ্র আবিষ্কারের কথা এইখানে উল্লেখযোগ্য। গ্যয়সের মা গ্যয়সের জন্ম তারিখ জানিতেন না। "এ্যাসেনশনের"[২] আট দিন আগে গ্যয়স জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শুধু এইটুকু তাঁহার মনে ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে গ্যয়স বিশেষ নিয়ম স্থির করিয়া ইস্টারের তারিখ নির্দ্ধারণ করিলেন। পরে উক্ত তারিখের সাহায্যে তিনি নিজের জন্ম তারিখ, তথা ৩০শে এপ্রিল বাহির করিয়াছিলেন।

এই সময় হেলমস্টেড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য গ্যয়স ডক্টরেট পাইলেন। তখন তিনি অধিকাংশ সময়ই Disquisitiones Arithmeticae এর পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। একবার তিনি শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করিবেন এই ভাবিয়া The Metaphysics of Mathematics এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি রচনা করিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের প্রধান ভিত্তির উপর এত সরল এবং প্রাঞ্জল আলোচনামূলক প্রবন্ধ ইতিপূর্বে আর কেহই রচনা করেন নাই। অঙ্কের অধিবিদ্যা না বুঝিতে পারায় অনেকেরই ধারণা অঙ্কশাস্ত্র অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য বিষয়। গ্যয়সের হাতে এই বিষয় অত্যন্ত সরল ও ব্যঞ্জনাময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অঙ্কশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের দিকে চক্ষু রাখিয়াই এই প্রবন্ধটী রচনা করিয়াছিলেন।

অঙ্কশাস্ত্রের সমগ্র জটিল ও দুর্বোধ্য ক্রিয়াপ্রণালী, প্রতিজ্ঞাকে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র অঙ্কশাস্ত্রের মৌলিক তাৎপর্যগুলিকে বিশ্লেষণ করিবার মানসেই তিনি এই প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন।

জ্যামিতি ও গণিতের সাধারণ্যে গৃহীত মূলসূত্রগুলির প্রতি তাঁহার অদম্য সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সম্ভবতঃ গাণিতিক প্রতিভার প্রভব ছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন গ্যয়সের বয়স মাত্র ১৫ বৎসর, তখনই তিনি ইউক্লিডের তলের সংজ্ঞা সমান্তরাল ও স্বতঃসিদ্ধ সরল রেখার উপর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার গবেষণা খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য যথেষ্ট হইলেও কিন্তু গ্যয়স কখনও এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের কথা তাঁহার জীবৎকালে প্রকাশ করেন নাই। অনিশ্চিত স্বতঃসিদ্ধ এবং গতানুগতিক সমতলকে বাদ দিয়া তিনি অনইউক্লিডীয় জ্যামিতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। The Metaphysics of Mathematics প্রবন্ধে তিনি কোন নতুন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন নাই, কেবল কতকগুলি বিশৃঙ্খলতাকে নিয়মের বশে আনিয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র মানগুন্যতার মধ্যে সম্পর্ক নিয়া কাজ করে এই বলিয়া তিনি অঙ্কশাস্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং কিরূপে এই সম্পর্ক নির্দ্ধারিত অথবা নির্মিত হয় তাহা চিত্রিত করিয়াছিলেন। মানগুন্যতাকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রথমটি ব্যাপক অথবা ব্যাপন স্থূল মানগুন্যতা অর্থাৎ যাহা রেখা ঘন ও কোণসমূহ লইয়া গঠিত হইয়াছে, দ্বিতীয়টি তীব্র মানগুন্য যথা বেগ ও ঘনত্ব যাহা ব্যাপক মানগুন্যর উপর নির্ভরশীল। বেগ মানগুন্য হিসাবে স্থানের উপর নির্ভরশীল। স্থানের এই বিন্দু হইতে ঐ বিন্দু পর্যন্ত যাইবার সময়কাল ধরিয়া ইহার পরিমাপ করা হয়।

গ্যয়স বলিয়াছেন কেবলমাত্র মানগুন্য অধ্যয়ন সম্ভব নহে। সাধারণভাবে, একটি রেখার ভিতর অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণ করিবার মত কিছুই থাকে না, কিন্তু উহার পাশে আর একটি লাইন টানিলেই নিশ্চিত কিছু পর্যবেক্ষণ সম্ভব হইয়া উঠে। দৈর্ঘ্যে ও লক্ষ্যপথ তুলনা করা যায়, কোণগুলি মাপা যায় এবং অন্যান্য সম্পর্কগুলিকেও পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই ভাবে অঙ্কশাস্ত্র মানগুণ্য কিরূপে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কিত হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখে।

পাটীগণিত কেবলমাত্র মানগুণ্যের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে, জ্যামিতিও তাহাই করে উপরন্তু পরষ্পরের [পরস্পরের] প্রতি মানগুণ্য সম্পর্কের অবস্থানকেও নির্দেশ করে। প্রাচীন কালে গ্রীসিয়রা খাঁটি জ্যামিতিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিতেন। মধ্যযুগে আরবীয়দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া এই পদ্ধতি পরিবর্তিত রূপে পাটীগাণিতিক পদ্ধতির প্রচলন করিল। যদিও জ্যামিতিক সম্পর্ক বিশুদ্ধ রূপে অবস্থিতি সংক্রান্ত তথাপি অনুশীলন করিতে হইলে পাটীগাণিতিক পদ্ধতি দ্বারাই আরম্ভ করিতে হইবে। অবস্থিতি সম্পর্ককে ত্রিকোণমিতি, পাটীগাণিতিক পদেই বর্ণনা করে। জ্যামিতিক পদ্ধতি হইতে পাটীগাণিতিক পদ্ধতিকে আধুনিক কালে যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, গ্যয়স সঠিকভাবেই ইহার নির্দেশ করিয়াছিলেন। গ্রীসিয়রা ইহা জানিতেন না কিম্বা ঐ সময় উক্ত পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। কষ্টসাধ্য জ্যামিতিক পদ্ধতি হইতে অধিকতর ফলপ্রদ সংখ্যারীতি দ্বারা পাটীগাণিতিক পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

মানগুন্যর বিভিন্ন সম্পর্কের পর্যবেক্ষণে অঙ্কশাস্ত্র অসীমের ব্যবহার অন্তর্ভূক্ত [অন্তর্ভুক্ত] সম্পর্ক এবং যে গুলিতে ঐ সম্পর্ক অনুপস্থিত সেই সম্পর্কের মধ্যে মূলগত পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছে। পূর্বোল্লিখিত সম্পর্ককে উচ্চতর গণিতের সংশ্লিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং পরবর্তী সম্পর্ককে নিম্নতর গণিতের অঙ্গীভূত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এইগুলির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আরও পার্থক্য দেখানো হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক মানগুন্যর ভিতর বিদ্যমান থাকিতে পারে। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে খণ্ডের সহিত অখণ্ডের সম্পর্ক। যোগ হইতেছে কতকগুলি অংশকে একত্রে মিলাইয়া একটি সমগ্র গঠন; এবং সমগ্রকে ভাঙ্গিয়া যে দুইটি অংশ পাওয়া যায় তাহাই বিয়োগ। অন্যান্য সকল ক্রিয়া প্রণালীই যোগ কিংবা বিয়োগের অভিযোজন।

গ্যয়সের The Metaphysics of Mathematics প্রবন্ধে মূল বক্তব্য বিষয়ের প্রকৃতি ছিলঃ অঙ্কশাস্ত্রকে যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা এবং উহার ভিত্তিভূমির অনুসন্ধানে একটি সামগ্রিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিকে ভবিষ্যদ্বাণী করা। কিন্তু এই আন্দোলনই পরিশেষে অত্যন্ত জটিল ও বাহুল্যপূর্ণ; এবং আদৌ সুস্পষ্ট নয় বলিয়া গ্যয়সের সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের অধিকাংশকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

বার্টরাণ্ড রাসেল এবং আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড কৃত, অধিকাংশ লোকের অপঠিত গ্রন্থ Principia Mathematica তে সকল প্রকার আগাছা জঞ্জাল দূরীভূত করিয়া অঙ্কশাস্ত্রকে একমুঠো বীজে রূপান্তরিত করিয়া এবং পরে ঐ সকল বীজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সম্যক বিশ্লেষণ করা, বোধ হয় এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা সুবিদিত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রচেষ্টা ছিল।

তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ অঙ্কশাস্ত্র হইতে অনাবশ্যক বাহুল্যকে নির্মূল করিয়া, অঙ্কশাস্ত্রকে কিছু মৌলিক স্বতঃসিদ্ধে রূপান্তরিত করিয়া, মূলতত্ব [মূলতত্ত্ব] গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মূলতত্বগুলির [মূলতত্ত্বগুলির] বৈশিষ্ট্য নিরূপিত করা। ইংরেজি বর্ণমালার ২৬টি অক্ষর যেমন বিভিন্ন প্রকার সমন্বয়ে সমগ্র সাহিত্যের উৎস হিসাবে কাজ করে তেমনি উপরোক্ত স্বতঃসিদ্ধগুলির উপর নির্ভর করিয়া, বিভিন্ন প্রকার সংযুক্তির মাধ্যমে অঙ্কশাস্ত্রের সমগ্র কাঠামো গড়িয়া উঠিতে সক্ষম হইবে। ইহাকে ফলপ্রসূ করিবার জন্য কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং মানিয়া লওয়া জিনিষগুলি — তাহা যতই স্বতঃপ্রতীয়মানই হউক না কেন, অঙ্কশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে

বিদূরিত করিতে হইবে। যেমন, বস্তুকে সংখ্যায়িত করিবার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা হইতেই সংখ্যার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সেই জন্যই বিশুদ্ধ ভাবে স্বতঃসিদ্ধ মূলের দৃঢ় ভিত্তিতে এই সংখ্যাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহাদিগকে অঙ্কশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর নহে। ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলি লুক্কায়িত ও অনুল্লিখিত জটিল গঠনকৌশল মাত্র। এতদ্‌সত্ত্বেও, রাসেল ও হোয়াইটহেডের স্বতঃসিদ্ধগুলির আপাত সরলতা সত্ত্বেও, সন্দেহ হয় যে, ঐগুলি প্রকৃতপক্ষে অঙ্কশাস্ত্রের মৌলিক উপাদান হইতে পারে কিনা কিম্বা ঐ ধরণের কোন মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ প্রণয়ন করা আদৌ সম্ভবপর কিনা?

ইউক্লিডের ''স্বতঃপ্রতীয়মান'' স্বতঃসিদ্ধগুলিতে ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়াতেই সেইগুলিকে নতুন করিয়া নিরীক্ষাকল্পে অঙ্কশাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অনুপ্রেরণা ঘটিয়াছিল। গ্যয়স বহু পূর্বেই এই ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই গাণিতিক কাঠামোকে সন্দেহ ও সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিতেন। এমনকি তিনি অবিসম্বাদী সত্যরূপে পরিগণিত ত্রি-মাত্রিক আয়তনের অস্তিত্ব লইয়াও প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, কেবলমাত্র দ্বি-মাত্রিক আয়তনই বুঝিতে সক্ষম এক রকম প্রাণী যেমন আমরা কল্পনা করিতে পারি, আমাদের অপেক্ষা উচ্চস্তরের কোন প্রাণীও ঠিক তেমনি আমাদের প্রতি এবং ত্রি-মাত্রিক আয়তন সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারে। যেহেতু, মানুষ কেবলমাত্র ত্রি-মাত্রিক আয়তনই কল্পনা করিতে পারে, ইহার অর্থ এই নয় যে, উচ্চতর মাত্রা বিশিষ্ট আয়তনে অস্তিত্বের বিদ্যমানতা সম্ভব নহে। এইরূপে সমগ্র বিদ্যমানতার পরিমিত অংশ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে থাকে। মনন এবং বোধের সমন্বয়ে এই পরিমিতি গড়িয়া ওঠে। বাস্তবতা কেবল মাত্র দৃশ্যমান যাহা, তাহার অধিক কিছুই নহে অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর সীমিত বাস্তবতা মাত্র, কিন্তু মানব মন ঐ সীমিত বাস্তবকে অতিক্রম করিয়াও কল্পনা করিতে পারে, যাহাতে আমরা দেখিতে পাইব আমাদের কল্পনার বাহিরেও বাস্তবতার অবস্থান সম্ভব। পরবর্তী কালে কেয়িলি দেখাইয়াছেন, ''ঐ একই মানব মন গাণিতিক প্রতীকের সাহায্যে কল্পনা বহির্ভূত বাস্তবের সন্ধান করিতে সক্ষম হয় এবং ত্রিমাত্রিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অঙ্কের সাহায্যে চার কিংবা পাঁচ বা n মাত্রিক কাঠামোতে বিচরণ করিতে পারে।''

অঙ্কশাস্ত্র জ্যামিতির অচিন্তনীয় অগ্রগতির সঙ্গে রুদ্ধ হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে, সমগ্র প্রপঞ্চ ও ঘটনা নিচয়কে চাক্ষুষ রূপদানে অসমর্থতার পশ্চাতে, এই প্রবণতাই কাজ করিতেছে। পারমাণবিক ও নিখিল জ্যোতির্বিজ্ঞানে অধিকাংশ ঘটনাকেই কেবল মাত্র কতকগুলি সমীকরণ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। চিত্তগত রূপায়নকে [রূপায়ণকে] পরিহার করার আধুনিক প্রবণতার মূলে দুইটি কারণ নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরণের চিত্রায়ণ প্রকরণ সম্ভব নহে; দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ চিত্র সমন্বিত উপস্থাপনা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাদ বিহীন নহে। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে ইউক্লিডের অনুচিত্রগুলি জ্যামিতিকে শুধুমাত্র সহজ ও সরল করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই অনেক অবর্ণিত, অস্বচ্ছ, ধরিয়া লওয়া ধারণা বা বস্তু দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

গ্যয়স যে অনইউক্লিডীয় জ্যামিতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা, মনুষ্যচিন্তার ইতিহাসে চমকপ্রদ ও বৈপ্লবিক ধারণা সমূহের অন্যতম ছিল। কিন্তু, নিউটনের মত গ্যয়স বিতর্কমূলক কিছুকে এড়াইয়া চলিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই আবিষ্কারের কথা তাঁহার নোট বই হইতে জানা গিয়াছিল। তাঁহার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতান্ত দুঃখজনক ঘটনা হইলেও ক্ষমার্হ। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি বিশুদ্ধ গণিতে গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়া পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশ্য প্রতিভার এই অপব্যবহারে তাহার নিজের কোন ত্রুটি ছিল না। কেননা উপযুক্ত চাকুরি লাভে অসমর্থ হইয়া এবং আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত হইবার দরুণই তিনি অধিকতর অর্থ উপার্জ্জনের সম্ভাবনায় ও বিদ্বৎসমাজের স্বীকৃতি লাভের আশায় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। তৎকালে বহু ক্ষুদ্র গ্রহ এবং গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছিল — গ্যয়স অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে সেইগুলির কক্ষপথ নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার এই ধরণের আবিষ্কারের কথা প্রথম ঘোষণা করিলেন। এই কাজের জন্য তিনি বিদ্বৎসমাজের সপ্রশংস অভিনন্দন পাইলেন। সেন্ট পিটার একাডেমী অফ সায়েন্স তাঁহাকে আজীবন সদস্য পদে নির্বাচিত করিলেন এবং উক্ত সংস্থা পরিচালিত মানমন্দিরের পরিচালক পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু গ্যয়স ব্রান্সউইকের ডিউকের অনুরোধে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ডিউক গ্যয়সের ভাতা বাড়াইয়া দিলেন উপরন্তু ব্রান্সউইকেই তাঁহার গবেষণার জন্য একটি মানমন্দির নির্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। এই সময়ে গ্যয়সের ওপর ইউরোপের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্‌দের দৃষ্টি ন্যস্ত হইল। তাহাদের অনেকেই গ্যয়স যাহাতে গ্যোটিঙগেন বিশ্ববিদ্যালয়েই নিযুক্ত হইতে পারেন সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্যয়স তখন ব্রান্সউইকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা চালাইতেছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সমৃদ্ধশালী জনৈক চর্মব্যবসায়ীর কন্যা যোহান্না অসথফকে বিবাহ করিলেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে। গ্যয়স পূর্ণোদ্যমে নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার খ্যাতি জার্মানীর সীমিত গণ্ডী ছাড়াইয়া সুদূর রাশিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে ব্রান্সউইকের ডিউক পরলোক গমন করিলেন এবং গ্যয়স, প্রিয় বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীর মৃত্যুতে গভীর শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক বৎসর পরে, মানমন্দিরের পরিচালক নিযুক্ত হইয়া গ্যয়স স্ত্রীপুত্র সঙ্গে করিয়া

গ্যোটিঙগেনে চলিয়া গেলেন। ডিউকের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্যয়সের জীবনে অবিশ্বাস্য রকমের দুর্ভাগ্য ও দুঃখজনক ঘটনার সূত্রপাত হইল। তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার পিতা, প্রিয় কাকা যোহান বেনজ, স্ত্রী এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ সন্তান সকলেই একে একে মৃত্যু বরণ করিলেন। উপরন্তু তিনি পুনরায় আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইলেন কেননা গ্যোটিঙগেনে তিনি সামান্য বেতন পাইতেন, এছাড়া ডিউকের কাছ হইতে এতকাল যাবৎ, যে ভাতা পাইয়া আসিতেছিলেন ইতিমধ্যে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা অন্য জায়গায় আরো বেশী অর্থ উপার্জনের চেষ্টা না করিয়া, গবেষণা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার মত নির্বুদ্ধিতা ও মূঢ়তার কঠোর সমালোচনা করিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে গ্যয়স এত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি ডায়ারিতে লিখিয়াছিলেন "এইরূপে জীবন ধারণের চেয়ে আমার কাছে মৃত্যুই অধিকতর প্রিয় এবং কাম্য।" নিদারুণ একাকীত্ব এবং নৈরাশ্যের দুঃসহ ভার বহনে অপারগ হইয়া ছয় মাস পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট পুনর্বার গ্যোটিঙগেনের এক অধ্যাপক কন্যা ফ্রেডরিকা উইলহেলমিনা ওয়াল্ডেকে বিবাহ করিলেন। পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের তিনটি সন্তানের জন্ম হইল। ইহার পর মিনা গ্যয়স যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। গ্যয়স রুগ্না স্ত্রীর সেবাশুশ্রূষা করিতেন, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করিতেন। বিধবা মাকেও তিনি নিজের কাছে আনাইয়া লইয়াছিলেন। মায়ের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অনুরাগ অত্যন্ত গভীর ছিল।

ইতিমধ্যে তিনি জিওড্যসীয় নিরীক্ষায় অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বৎসর কাল তিনি জিওড্যসীর ওপর কাজ করিয়াছেন। এই কাজের সামগ্রিক গাণিতিক পরিণাম বর্ণনা করা অসম্ভব। ডিফারেনশিয়াল জ্যামিতি (Differential Geometry) তলমাত্রা তত্ত্ব (theories of surfaces) পরিসংখ্যান (statistics) সম্ভাব্যতার সূত্র (theory of probability) তিনি এইগুলি প্রত্যেকটিরই উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্যগুলিও এই জিওড্যসীয় কার্যক্রমের উপাঙ্গস্বরূপ ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে সম্ভাব্যতার সূত্রতে তাঁহার অবদান সহস্র নিরীক্ষা এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধানের মাধ্যমেই আসিয়াছিল। মানুষের দৃষ্টি অভ্রান্ত নয় বলিয়া প্রতিটি নিরীক্ষা বা পাঠক্রমকে (reading) বারংবার পর্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছে। প্রায়শঃই ভিন্ন ফল পাওয়া গিয়াছে। "ন্যূনতম বর্গ" (least square) যে নিয়ম তিনি বাল্য বয়সেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা প্রয়োগ করিয়া কোন পাঠক্রমটি (reading) সম্ভাব্য শুদ্ধ তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন। ইহা ছাড়াও পাঠক্রমের ফল দ্বারা রেখাচিত্র অঙ্কণ করিয়া দেখাইতেন যে ইহা সর্বদা ঘণ্টাকৃতি বক্ররেখায় (চিত্র দ্রষ্টব্য) পরিণত হয়। ইহাকে গ্যয়সীয় বক্ররেখা বলা হয়। কেন্দ্রের বাম প্রান্তে অর্দ্ধেক প্রমাদ অবস্থান করে। এক কথায় প্রমাদ বিস্তারিত সংস্থান (Distribution of errors) সর্বদা একটী ছক (pattern) অনুসরণ করিয়া করিয়া চলে যাহা গ্যয়সীয় অভিলম্ব বিস্তারণ সংস্থান বিধি (Law of normal distribution of errors) রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে এমনকি আপতিক প্রমাদকেও আকস্মিক বলা শক্ত কেননা গ্যয়সীয় বিধানতত্ত্ব অনুযায়ী এই ধরণের আকস্মিকতার সংঘটনের পৌনঃপুনিকতা, আংশিকভাবে হিসাব নিকাশ করিয়া বলিয়া দেওয়া যায়। যত বেশী সংখ্যক ঘটনার উপর পরীক্ষাকার্য চালান যাইবে, প্রমাদগুলির সংঘটনও ঠিক সেই পরিমাণে নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী এবং উপাত্তের অংশ হইতে সত্যিকার তত্ত্বটিকে নির্ণয় করিতে হইলে অভিলম্ব বিস্তারণ সংস্থানে (Normal distribution) গ্যয়সীয় বিধানতত্ত্ব একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইবে। কিন্তু উক্ত বিধানতত্ত্বের উপযোজন সেইখানেই শেষ

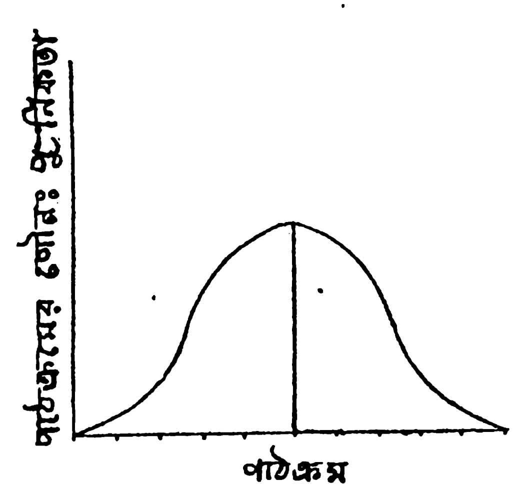

নহে। শীঘ্রই অঙ্কশাস্ত্রকাররা উপলব্ধি করিলেন যে কেবলমাত্র প্রমাদই নহে অন্যান্য যে কোন ঘটনা বা প্রপঞ্চই উক্ত বিধানতত্ত্বের অধীন। ঘণ্টাকৃতি ঐ একই চিত্রলেখ হইতে মনুষ্যজাতির উচ্চতা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং অন্যান্য গুণাবলী সম্বন্ধে জানা যাইতে পারে। এমন কি

নির্বোধ কিম্বা প্রতিভাসম্পন্ন, দৈত্যাকৃতি মানুষের সংখ্যা, নভমণ্ডলে [নভোমণ্ডলে] সূর্যের গতিবিধির ন্যায়, নিশ্চিত ও স্পষ্টরূপেই বলা যাইতে পারে।

পৃথিবী পৃষ্ঠের মাপজোক এবং নির্বোধদের সংখ্যা নিরীক্ষা করিবার মধ্যে যে যোগাযোগ অর্থাৎ তথ্যমূলকভাবে উহাদের মধ্যে সম্পর্কের বিদ্যমানতা, যাহা ব্যবহারিক অঙ্কের প্রকৃত উন্নতির প্রমাণ স্বরূপ। জিওড্যাসীয় পরিকল্পনা সমাপ্ত করিয়া গ্যয়স দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর স্ত্রী মিনার মৃত্যু হইল। গ্যয়স তাঁহার পূর্বসূরী আর্কিমিডিস ও নিউটনের মত অঙ্কশাস্ত্রে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট ও আচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি যেন অঙ্কের মধ্যেই বসবাস করিতেন — অন্য দিকে মন দিবার মত সময় তাঁহার ছিল না। সাধারণ লোকের কাছে অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার এই আত্মসমাহিত ভাব বাতুলতা বলিয়া প্রতীয়মান হইত। অঙ্কশাস্ত্রই একমাত্র তাঁহার ধ্যানজ্ঞান ছিল। অন্যান্য সমস্ত কিছুকে বর্জন করিয়া, অবিচল ও একাগ্র নিষ্ঠা সহকারে তিনি অঙ্ক চর্চা করিতেন। অঙ্ক বিষয়ক এত বেশী ভাবনাচিন্তা ও ধ্যান ধারণা তাঁহার মনে ভীড় করিত যে কোনটিতে কবে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। প্রতিটি সাধারণ জিনিসই তাঁহার গাণিতিক জিজ্ঞাসার লক্ষ্যবস্তু ছিল। যেমন ঘর হইতে লাইব্রেরী ও মানমন্দিরে যাইতে পদক্ষেপের সংখ্যা, বন্ধুবান্ধব এবং খ্যাতনামা ব্যাক্তিরা [ব্যক্তিরা] কতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ছেলেমেয়েরা কোন বয়সে প্রথম হাঁটিতে শিখিল, কবে দাঁত উঠিয়াছে, কবে টীকা লইয়াছে ইত্যাকার বাহ্যতঃ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর গাণিতিক তথ্য সমূহ তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে নোটবুকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন ভবিষ্যতে কোন সময়ে কাজে লাগাইবেন এই মানসে। পরে পদক্ষেপের এই তালিকা টোপোলজি Topology* পাঠে সহায়ক হইয়াছিল। লোকজনের বয়সের বিবরণ অবসর গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত বীমা সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল। কোন প্রকার চেষ্টা ব্যতিরেকেই তিনি সংবর্গমান বা লগারিদ্‌ম শিখিয়াছিলেন। সংখ্যা মনে রাখিবার অত্যাশ্চর্য স্মৃতির সহায়তায় তিনি মনে মনে বৃহৎ সংখ্যা বা রাশিদ্বারা হিসাবনিকাশ করিতে পারিতেন। একবার যে অঙ্ক তিনি করিতেন তাহা তিনি মোটেই ভুলিতেন না। অঙ্কশাস্ত্রকে তিনি কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন সংবর্গমান বা লগারিদ্‌মের তথ্য ও ছকের হিসাবের মধ্যে কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বীয় ক্ষেত্রে তিনি যেন নিখুঁত নৈপুণ্য সাধনের ব্রত নিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রকে সকল শিল্পের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন।

Mysticism & Logic গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বার্টরাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন "অঙ্কশাস্ত্র কেবলমাত্র সত্যকেই নহে চরম সৌন্দর্যকেও আমাদের জ্ঞাত করে। যে সৌন্দর্য শীতল ও নিরঞ্জন, রুক্ষ ও অনাড়ম্বর ভাস্কর্যের মত। আমাদের কোমল হৃদয়বৃত্তিকে স্পর্শ না করিয়াও সঙ্গীত কিম্বা চিত্রকলার জাঁকজমকপূর্ণ কারুকার্য ছাড়াও যাহা কেবলমাত্র মহৎ শিল্পে প্রতিভাত হইতে পারে তদ্রূপ বিশুদ্ধতার উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ, উৎকর্ষতার প্রতীকস্বরূপ।" অঙ্কশাস্ত্রে আরও বেশী দৃঢ়তার প্রয়োজন রহিয়াছে, গ্যয়সের এই আবেদন সামগ্রিকভাবে আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রের দিক্ নির্ণয় করিয়াছে। গ্রীসিয়দের সময় হইতেই যে সকল পুরাতন সমস্যা লইয়া অঙ্কশাস্ত্রকাররা ভাবিত ছিলেন তাহার মধ্যে অমূলদ সংখ্যা, অসীম ও পরিমেয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুকলন প্রভৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া সমাধানের নতুনতর প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল এই সময়। ক্যানটর, ক্যয়চি, ওয়েয়াস ট্রাস ও ডেডিকিণ্ড প্রমুখ গ্যয়সের গাণিতিক উত্তরাধিকারীগণ, উপরোল্লিখিত অবহেলিত ক্ষেত্রগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সংখ্যা, অসীম, তিলতমানু অনুকলন ও কাষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে এতাবৎকাল গৃহীত মূল ধারণার উপর নতুন আলোকপাত করিয়াছিলেন। উৎকর্ষতার প্রতি গ্যয়সের আসক্তি, তাঁহার আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং কার্যপ্রণালীর উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার রচনাকে উৎকর্ষতার আদর্শরূপে পরিগণিত করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও, তাঁহার গ্রন্থসমূহকে অত্যন্ত জটিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে য়্যুলারের শিথিল কল্পনাপ্রধান ও সরল রচনাশৈলীকে প্রাঞ্জলতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা হয়। এই আপাতবিরোধী দৃষ্টান্ত যেরূপ অদ্ভুত ঠেকিতেছে আসলে ঠিক তাহা নহে। মানুষের মন — এমন কি গণিতজ্ঞদের মনও ধারাবাহিক ভাবে ধাপে ধাপে কাজ করিতে সক্ষম হয় না। হয়ত কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া গেল, কখনো পশ্চাৎমুখী ধাবিত হইল কখনো বা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিল। যখন কঠিন ন্যায়ের কৃত্রিম মানসিক প্রতিক্রিয়া সমূহ সম্মুখীন হয় তখন মনে হয় যে এইগুলি অবশ্যই যুক্তির শৃঙ্খলে জড়িত হইবে।

যতক্ষণ না কোন বিষয় সমাপ্ত করিতে পারিতেন ততক্ষণে গ্যয়স ঐ বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। গ্যয়স বলিতেন "অসমাপ্ত কাজে আমি কোন তৃপ্তিলাভ করি না এবং যে কাজে আমার কোন আনন্দ উৎপন্ন হয় না তাহা আমার কাছে নির্যাতন স্বরূপ"। সকল কাজই তিনি যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি একটি শীলমোহর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে একটি গাছ কয়েকটি বড় আপেল এবং Pauca sed matura এই বাক্যটি খোদিত ছিল। নিউটন যেমন, তাঁহার জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তরকালে অন্যান্যরা যাহাতে আরও কাজ করিতে পারেন এই দৃঢ় বিশ্বাসে অনির্ণেয় সমস্যা সমূহ এবং অনুন্নত ধারণা সকল স্বীয় গ্রন্থে সংযুক্ত করিতেন, গ্যয়স ঠিক তাহার বিপরীত ছিলেন। অনেক গণিতজ্ঞই গ্যয়সের এই স্বার্থপর মানসিকতার নিন্দা করিয়াছেন।

গ্যয়স তাঁহার জীবৎকালে ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় গণিতের ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ এবং ফলাফল প্রকাশ করিয়াছিলেন। বীজগণিত,

জ্যামিতি, বিশ্লেষণ প্রণালী, পাটীগণিত, সংখ্যাতত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্রের প্রত্যেকটি শাখারই তিনি প্রভূত উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় বলিতেন অঙ্কশাস্ত্র হইল বিজ্ঞানের রাণী আর অঙ্কশাস্ত্রের রাণী হইল পাটীগণিত। এই রাজকীয় চক্রে গ্যয়স নিজে ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রের রাজপুত্র। তিনি শুধুমাত্র আংশিকভাবেই নহে সমগ্র ভাবে অপরিমেয় অঙ্কশাস্ত্রের বিশাল ক্ষেত্রকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যাহা কিছুই তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। গ্যয়সকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন ফরাসী গণিতজ্ঞ লা প্লাশ [লাপ্লাস]।

তত্ত্বীয় কার্য ব্যতিরেকে গ্যয়স বহু বৎসর ব্যবহারিক গণিতেও নিয়োজিত ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, চুম্বকত্ব, ভূসংস্থানিক, কেলাসিত, দৃগ্‌বিজ্ঞান এবং বিদ্যুৎ তিনি এইসকল বিষয়েও প্রচুর কাজ করিয়াছিলেন। স্যামুয়েল মর্সের অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্বে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যবহারিক ভাবে সঙ্কেতের মাধ্যমে তারবার্তা প্রেরণের সম্ভাব্যতা অনুমান করিয়াছিলেন।

অঙ্কশাস্ত্র গ্যয়সকে খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, সফলতার সকল পুরস্কারই দিয়াছিল। একবার তিনি বলিয়াছিলেন "এক এক সময় সমগ্র ভাবনা চিন্তা বিচার বিবেচনা, পর্যবেক্ষণ সকলই ব্যর্থ হইত। রাগে দুঃখে হাতের কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। শেষ পর্যন্ত কিছুদিন পর আশ্চর্যজনক উপায়ে কৃতকার্য হইতাম। মনে হইত ইহা যেন ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহেই সম্ভব হইল। সমস্যাটি বিদ্যুৎচমকের মত ক্ষণিকের মধ্যেই সমাধা হইয়া গেল, এমন কি আমি নিজে পর্যন্ত চিন্তাভাবনার খেই অনুসরণ করিতে পারি নাই। তখন মনে হইত সমস্যাটি অতীব সহজ এবং সরল ছিল এবং এক অনির্বচনীয় আনন্দে সমগ্র মন ভরিয়া উঠিত।" এই ধরণের আকস্মিক অন্তর্দৃষ্টি প্রায় সকল মহৎ গণিতজ্ঞের মধ্যেই বর্তমান ছিল। আর্কিমিডিস, নিউটন, দেকার্তে, প্যাসকাল এবং আরও অনেকেই এই গুণের অধিকারী ছিলেন। প্রায়শঃই, দীর্ঘদিনের তীব্র অথচ অর্থহীন ও নিষ্ফল চিন্তা-ভাবনা হইতেই আকস্মিকভাবে অনুপ্রেরণার বিদ্যুৎচমকে সফলতা লাভ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, উল্লেখ করা যাইতে পারে, গ্যয়স নিজে একটি নিয়মিত সতেরো দিক বিশিষ্ট বহুভুজের বৃত্তে অন্তর্লেখনে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রয়াস পাইতেছিলেন। একদিন সকালে আকস্মিকভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি উহার সমাধান নির্ণয় করিয়াছিলেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে অঙ্কের প্রতি গ্যয়সের অনুরাগ দুইটি চরম অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল; একটি হইল পেশাগত সাফল্য অপরটি হইল ব্যক্তিগত দুঃখ, অশান্তি ও হতাশা। তিনি নীরবে অঙ্ক চিন্তায় গভীর ভাবে নিমগ্ন থাকিয়া অপ্রীতিকর বস্তুজগৎকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পত্নীদ্বয়ের অকাল মৃত্যু ছাড়াও প্রিয় ছাত্র আইজেনস্টাইনের মৃত্যুতে তিনি দুঃখ পাইয়াছিলেন। আইজেনস্টাইনকে তিনি সর্বকালের মহৎ প্রতিভাদের অন্যতম একজন বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আইজেনস্টাইন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে আর্কিমিডিস, নিউটনের সারিতে নিজের স্থান করিয়া লইতেন। মৃত্যুভয় তাঁহাকে বিকারগ্রস্ত স্নায়বিক রোগীতে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। বিষণ্ণতার শিকার হইয়া তিনি সমগ্র বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল মাত্র কাজের মধ্যে আত্মমগ্ন থাকিয়াই কিছুটা স্বস্তি পাইতেন। কারো প্রতি কোন অনুরাগ পর্যন্ত ছিল না। বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতদের তিনি মূর্খ ও বাচাল বলিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল পৃথিবী নির্বোধ এবং অসৎ লোকে পূর্ণ। নিজের ছেলে মেয়েরাও এই সকল কারণে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।

ব্যক্তিগত ভাবে গ্যয়স মিতব্যয়ী ছিলেন, বিলাসিতাকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার পড়ার ঘরে একটি ছোট টেবিল, একটি দাঁড়াইয়া লিখিবার ডেস্ক ও একটি চেয়ার মোট এই তিনটি আসবাবপত্র ছিল। শয়ন কক্ষে কোন চুল্লী পর্যন্ত ছিল না। যথাসাধ্য সাধারণ খাওয়া দাওয়া করিতেন।

বাষট্টি বৎসর বয়সে তিনি যেন মানসিক শান্তি লাভের সঞ্জীবনী হিসাবে নবোদ্যমে রুশ ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই অনর্গল বলিতে ও লিখিতে শিখিলেন। তিনি ফরাসী, গ্রীক, লাতিন, ইংরেজি, ড্যানিস, কিছু কিছু সুইডিস, ইতালিয়ান ও স্প্যানিশ প্রভৃতি বহুবিধ ভাষা জানিতেন। ভাষা ছাড়া বুককিপিং ও শর্টহ্যাণ্ডও শিখিয়াছিলেন।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শন এবং ধর্মতত্বে [ধর্মতত্ত্বে] তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অবধারিত মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে সম্ভাব্য কি ঘটিতে পারে এই ভাবনা চিন্তা প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন অমরতা ব্যতিরেকে, নিখিল বিশ্ব অর্থহীন ও অযৌক্তিকতায় পর্যবসিত হইত। তথাপি আমাদের সামনে অর্থহীনতা ও অযৌক্তিকতা বর্তমান রহিয়াছে, এইগুলিকে একমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই অতিক্রম করা যাইতে পারে। বিশ্বাস করা না করা, কেবল সাধারণ ভাবে ইচ্ছারই অধীন নহে। যে ব্যক্তির মন বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধ, বিশ্বাস অবশ্যই তাহার মিত্র স্বরূপ। গ্যয়সকে এইখানে অজ্ঞাবাদী মনে হইতে পারে, কিন্তু তিনি আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গেই বিশ্বাসী হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই সময় তিনি অনিদ্রা, বদহজম ও হৃদরোগ প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ভুগিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া নিষ্ঠুর অমোঘ নিয়তিস্বরূপ মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া অমা রজনীর ঘন অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেলেন। গ্যোটিঙগেনে সেন্ট এ্যালবানস সিমেট্রিতে মায়ের অচিহ্নিত সমাধির পার্শ্বে তাঁহাকে

সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। নিউটনের মত গ্যয়স বিত্তশালী ও ধনবান হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে প্রচুর অর্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু তাঁহার আসল ঐশ্বর্য ''গণিতশাস্ত্রের'' কাছে সকল কিছুই ম্লান ছিল।

Of Men & Numbers by Jane Muir হইতে
শ্রীবেলাল চৌধুরী অনূদিত

....

axiom -কে বাংলায় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াছি কিন্তু এই পরিভাষা সঠিক নহে এইরূপ মনে হইতে পারে কেননা self evident ই যথার্থ স্বতঃসিদ্ধ হইবে। axiom সহজ সত্য হিসাবে থাকিলে উহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে কিন্তু যখন অঙ্কশাস্ত্র বাস্তবের বাহিরে যাইবে তখন axiom কে আর স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় না। — অনুবাদক

অনুবাদক বেলাল চৌধুরীর সংযোজন (শীর্ষরেখাঙ্কিত)

১. অজ্ঞেয় সংখ্যা সমূহ বীজগণিতের অধীন নহে বলিয়া এখানে আলোচনা করা হইল না।
২. খৃষ্টের মৃত্যুর তিন দিন পরে সমাধি হইতে উত্থান ও স্বর্গারোহণ দিবস।
৩. টোপোলজি (Topology) বীজগণিত, জ্যামিতি ও পাটীগণিতের মত গাণিতিক বিষয়ের একটি শাখা। নামের আক্ষরিক অর্থ বিষয়ক নির্দেশ হইল, বিন্দুর বা বস্তুর অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা। আদিপর্বে জ্যামিতিক ধাঁধা এবং দড়ি সংক্রান্ত খেলার উপর নির্ভর করিয়া টোপোলজি গড়িয়া উঠিয়াছে।

সম্পাদকীয় সংযোজন

১. যে শব্দগুলিকে আমরা অবিচ্ছিন্ন দেখতে অভ্যস্ত সেগুলি সর্বত্র ('অঙ্কভাবনা'র দুটি খণ্ডেই) ভেঙে দুটি শব্দ হিসেবে লেখবার প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণ — কেবল মাত্র, গভীর ভাবে, অকাল মৃত্যু — ইত্যাদি।
২. লেখচিত্রে সাধারণত অনুভূমিক (horizontal) রেখার দুদিককে X এবং X' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। উল্লম্ব (vertical) রেখাকেও অনুরূপে Y এবং Y' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এখানে তা হয়নি।
৩. 'মানগুণ্য' বানান সঠিক। কিন্তু এই লেখায় 'মানগুন্য' এবং 'মানগুণ্য', দু-রকম বানানেরই ব্যবহার আছে।
৪. সঠিক এবং অধিক প্রচলিত উচ্চারণ কার্ল ফ্রিডরিশ গাউস।
৫. কয়েকটি অর্থ —
১. প্রভব - উৎস, উৎপত্তি, ২. অজ্ঞাবাদ - দার্শনিক তত্ত্ববিশেষ, যে তত্ত্ব বলে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে কিছুর অস্তিত্ব থাকলেও তা জানা মানুষের অসাধ্য, Agnoticism. ৩. তিলতমানু - তিলতম অনু অর্থাৎ নিতান্ত স্বল্প পরিমাণ, ৪. কাষ্ঠা - অষ্টাদশবার উপর্যুপরি চক্ষুর পলকপাতপরিমাণ সময়।

সংখ্যাতত্ত্বের সূচনা

পূর্ব সংখ্যায় যোগ ও গুণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপক নিয়মের সূচনা করা হইয়াছিল। সেখানে আমাদের $৪(২\times৩)=৪\times২+৪\times৩$ প্রভৃতি লিখিবার অভ্যাসের কথা আছে। সাধারণভাবে ইহাকেই গুণের বিতরণ নিয়ম বলা হয়।

গুণের বিতরণ (Distributive) নিয়ম

$$a\times(b+c)=(a\times b)+(a\times c)$$

এই নিয়ম আমাদের পরিচিত বহু গুণ-প্রক্রিয়ার ভিত্তি। উদাহরণ হিসাবে ১৫x২৩-এর গুণপ্রক্রিয়া দেখা যাক্।

$$\begin{array}{r} ১৫ \\ ২৩ \\ \hline ৪৫ \\ ৩০ \\ \hline ৩৪৫ \end{array}$$

ইহা প্রকৃতপক্ষে নিম্নলিখিত রীতিরই রূপান্তর ঃ

$$\begin{aligned} ১৫\times২৩ &= ১৫\times(২০+৩) \\ &= (১৫\times২০)+(১৫\times৩) \\ &= ৩০০+৪৫ \\ &= ৩৪৫ \end{aligned}$$

অথবা, পরবর্তী জটিলতর উদাহরণটি ঃ $(a+b)(c+d)=ac+bc+ad+bd$

$$\begin{aligned} (a+b)(c+d) &= (a+b)c+(a+b)d && \text{[বিতরণ নিয়ম]} \\ &= c(a+b)+d(a+b) && \text{[বিনিময় নিয়ম]} \\ &= (ca+cb)+(da+db) && \text{[বিতরণ নিয়ম]} \\ &= ca+cb+da+db && \text{[যোগের ধর্ম্ম]} \\ &= ac+bc+ad+bd && \text{[বিনিময় নিয়ম]} \end{aligned}$$

সমস্যা

১। $a\times b\times c$ এর সংজ্ঞা নিরূপণ কর।

২। উপরিউক্ত সংজ্ঞার সহায়তার দেখাও ঃ $a\times b\times c=b\times a\times c$।

৩। দেখাও যে $৩\times৫\times৭=৭\times৫\times৩$।

৪। নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলির গুণ প্রক্রিয়া সম্ভব বিপরীত (Multiplicative Inverse) লেখ ঃ

$২, \frac{১}{৩}, -\frac{১}{\pi}, ১, -৩, \frac{১}{২}\sqrt{২}, ০$

৫। দেখাও যে $(a+b)\times c=a\times c+b\times c$

৬। বাস্তব সংখ্যা কি ভাগ প্রক্রিয়ার জন্য ক্লোজার নিয়ম অনুসরণ করে?

৭। বাস্তব সংখ্যার ভাগ প্রক্রিয়ায় বিনিময় নিয়ম প্রযোজ্য কি?

৮। বাস্তব সংখ্যার ভাগ প্রক্রিয়ায় সংযোগ নিয়ম প্রযোজ্য কি?

৯। সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ কর ঃ

$$a+(b\times c)=(a+b)\times(a+c)$$

১০। উক্তিটির অসারতা দেখাও ঃ

$$a\div(b+c)=(a\div b)+(a\div c)$$

১১। সবিস্তারে প্রমাণ কর ঃ

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad [a \times a \text{ বুঝাইতে } a^2 \text{ লেখা হয়}]$$

বাস্তব সংখ্যার ধর্মাবলী

শুরু হইতে যাহা বলা হইল তাহার সারার্থ হিসাবে আমরা এখানে গণিতে বাস্তব সংখ্যার ধর্মগুলি একত্রিত করিতেছি। a, b, c, প্রভৃতি অক্ষরসমূহ যে কোন বাস্তব সংখ্যা বুঝাইতেছে।

ধর্ম ১।	$a+b$ একটি নির্দিষ্ট বাস্তব সংখ্যা	[যোগের ক্লোজার নিয়ম]
ধর্ম ২।	$(a+b)+c = a+(b+c)$	[যোগের সংযোগ নিয়ম]
ধর্ম ৩।	$a+0 = 0+a = a$	[যোগের অভেদসূচক নিয়ম]
ধর্ম ৪।	$a+(-a) = (-a)+a = 0$	[যোগের বিপরীত নিয়ম]
ধর্ম ৫।	$a+b = b+a$	[যোগের বিনিময় নিয়ম]
ধর্ম ৬।	$a \times b$ একটি নির্দিষ্ট বাস্তব সংখ্যা	[গুণের ক্লোজার নিয়ম]
ধর্ম ৭।	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$	[গুণের সংযোগ নিয়ম]
ধর্ম ৮।	$a \times 1 = 1 \times a = a$	[গুণের অভেদসূচক নিয়ম]
ধর্ম ৯।	$a \times \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \times a = 1, a \neq 0$	[গুণের বিপরীত নিয়ম]
ধর্ম ১০।	$a \times b = b \times a$	[গুণের বিনিময় নিয়ম]
ধর্ম ১১।	$a \times (b+c) = (a \times b) + (a \times c)$	[গুণের বিতরণ নিয়ম]

এই এগারোটি ধর্মই সমস্ত গণিত শাস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর।

সমস্যা

১। উপরিউক্ত ধর্মগুলির যথার্থতা পরীক্ষা কর, যখন ঃ

(ক) $a = \frac{১}{২}$, $b = ২$, $c = \pi$ (খ) $a = ১৩$, $b = ০$, $c = \frac{২}{৩}$

২। $a+b+c$ এর সংজ্ঞা এবং উপরের এগারটি ধর্মের সহায়তায় প্রমাণ কর —

$a \times (b+c+d) = (a \times b) + (a \times c) + (a \times d)$

৩। সংজ্ঞা অনুসারে $a - b = a + (-b)$ ধর্ম ১ হইতে ধর্ম ১১ এর সহায়তায় দেখাও ঃ

$(a-b)+b = a$

৪। উপরিউক্ত ১১টি ধর্মের সহায়তায় প্রতি ধাপে যুক্তি সহকারে দেখাও ঃ

(ক) $(x+2y)(2x+y) = 2x^2 + 5xy + 2y^2$

(খ) $(2+3x)(1+x) = 2 + 5x + 3x^2$

৫। (ক) দেখাও যে $x = \frac{a}{b}$ ইহা $bx = a$ এই সমীকরণকে সিদ্ধ করে, যখন $b \neq 0$ [অর্থাৎ যখন b-এর মান শূণ্য [শূন্য] নয়।]

(খ) "যদি a ও b দুইটি বাস্তব সংখ্যা হয় এবং b এর মান শূণ্য না হয় তাহা হইলে এমন একটী তৃতীয় বাস্তব সংখ্যা x পাওয়া যাইবে যাহাতে bx=a হয়" — উক্তির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৬) সত্য অথবা মিথ্যা দেখাও ঃ "a যে কোন একটি বাস্তব সংখ্যা হইলে অপর এমন একটী বাস্তব সংখ্যা x পাওয়া যাইবে যাহাতে 0x=a হয়।"

শূণ্যের [শূন্যের] বিশেষ ধর্মাবলী

বাস্তব সংখ্যার পরীক্ষা নিরীক্ষায় শূণ্যের [শূন্যের] আচরণ বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধাজনক অংশ। ভগ্নাংশের লব ও হর হিসাবে তিনটি বিভিন্ন স্থানে শূণ্যের [শূন্যের] অবস্থিতি দেখা যায় ঃ

$\frac{0}{b}, \frac{a}{0}, \frac{0}{0}, [b \neq 0,\ a \neq 0]$

প্রথমতঃ দেখা যাক্ $\frac{a}{b} = c\ [b \neq 0]$ এই সমীকরণটিকে অন্যরূপে লিখিলে দাঁড়ায় $a = b \times c$, এইরূপ ভাবে $\frac{0}{b} = c$ এই সমীকরণকে রূপান্তরিত করিয়া লিখিলে $0 = b \times c$; কিন্তু যেহেতু b-এর মান শূণ্য [শূন্য] নয় ইহা পূর্বাহ্নেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, অতএব $c = 0$। সুতরাং $\frac{0}{b} = 0$। $\frac{a}{0}$, $[a \neq 0]$ কিন্তু সম্পূর্ণ [সম্পূর্ণ] ভিন্ন জাতের প্রতীক।

$\frac{a}{0} = c$ এই সমীকরণ হইতে পাই $a = c \times 0$; কিন্তু c এর সমস্ত মানের জন্যই $c \times 0 = 0$, এবং সুতরাং $c \times 0$ কখনই a এর সমান হইতে পারে না, যেহেতু $a \neq 0$ (প্রকল্প অনুসারে)। অতএব $\frac{a}{0}$ ইহা অর্থহীন।

শেষতঃ আমরা $\frac{0}{0}$ ইহার আলোচনা করিব। $\frac{0}{0} = c$ এই সমীকরণ হইতে পাই $0 = 0 \times c$, যাহা c এর যে কোন বাস্তব মানের জন্য সত্য। এই কারণে $\frac{0}{0}$ কে অনির্ধারিত বলা হয়।

ইহা হইতে $\frac{a}{a}$, $[a \neq 0]$ সম্বন্ধে যেন কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়; $\frac{a}{a} = 1$.

সংক্ষেপে দেখা গেল, ভগ্নাংশের হর হিসাবে শূণ্যের [শূন্যের] উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু $\frac{0}{a}$ $[a \neq 0]$ শূণ্যের [শূন্যের] সমান।

সমস্যা

১। নিম্নলিখিত ভগ্নাংশগুলির অর্থ নিরূপণ কর ঃ

$\frac{২}{০}, \frac{০}{২}, \frac{২}{২}, \frac{০}{০}, \frac{০}{১/২}, \frac{\pi}{\pi}, \frac{\pi}{০}$

২। x -এর কোন মানের জন্য নিম্নলিখিত ভগ্নাংশগুলি অর্থহীন?

$\frac{x+1}{x-1}, \frac{2}{x}, \frac{3x+2}{x^2+2}, \frac{x-1}{x-1}, \frac{0}{4+x^2}$

৩। x -এর কোন বাস্তব মানের জন্য নিম্নলিখিত ভগ্নাংশগুলি অনির্ধারিত?

$\frac{x^2}{2x}, \frac{x+2}{2x+4}, \frac{0}{x^2}, \frac{1+x^2}{2+x^2}, \frac{2x-1}{4x^2-2x}$

Principles of Mathematics by Allendoerfer & Oakley
হইতে সুযশ সরকার অনূদিত।

অনইউক্লিডীয় জ্যামিতি

ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য

অনইউক্লিডীয় জ্যামিতি বর্তমানে অঙ্কশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং এই অনইউক্লিডীয় জ্যামিতির ইতিহাস এতই সুবিদিত ও এতবার লেখা হইয়াছে যে আমরা এখানে উহার, শুধুমাত্র একটি মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীই লিপিবদ্ধ করিব।

ইউক্লিডের একটি স্বতঃপ্রতীয়মানতা (axiom)ই উহার প্রকাশে কিছুটা জটিল চরিত্রের যাহাকে অবশিষ্টগুলির মত সরল প্রাথমিক তথ্য নির্ভর বলিয়া মনে হয় না। উহা হইল[১],

যদি দুইটি রেখা একটি তৃতীয় রেখা দ্বারা খণ্ডিত হয় এবং খণ্ডনকারী রেখার একই পার্শ্বস্থ অন্তস্থ কোণের যোগফল বা সমষ্টি যদি দুই সমকোণের কম হয়, তাহা হইলে রেখাগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রলম্বিত হইলে খণ্ডনকারী রেখার পূর্বোক্ত পার্শ্বে মিলিত হইবে।

এই প্রতিজ্ঞার প্রমাণ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অনেক গণিতজ্ঞই প্রয়াস পাইয়াছিলেন; উহাদের মধ্যে ল্যুজ্যঁদর এর নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, যে সকল স্বতঃপ্রতীয়মানতার প্রয়োজনীয় অনুক্রমই ইহাকে পূর্ববর্তী মানক্রম করিয়াছে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাটি পূর্ববর্তী সরলতর প্রতিজ্ঞাগুলি হইতেই অবধারিত ভাবে আসিতেছে। ল্যুজ্যঁদর প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, একটি ত্রিভুজের কোণের যোগফল বা সমষ্টি কখনই দুইটি সমকোণকে অতিক্রম করিতে পারে না এবং যদি এমন একটি ত্রিভুজ থাকে যাহাতে এই যোগফল দুই সমকোণের সমান তাহা হইলে সকল ত্রিভুজ সম্পর্কেই ইহা অনুরূপ ভাবে সত্য। রেখার দৈর্ঘ্যের কোন সীমা নাই অনুমানের উপরই অবশ্য, এই প্রমাণ নির্ভরশীল ছিল। যাহাই হউক, তিনি এইরূপ কোন ত্রিভুজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন নাই যাহার কোণগুলির যোগফল দুইটিই সমকোণ[২]।

অবশেষে কিছু গণিতজ্ঞ বিশ্বাস করিতে শুরু করিলেন যে ঐ তথ্যবিবৃতি প্রমাণের অসাধ্য, যদিও উক্ত তথ্য সর্বদা সত্য নহে ধরিয়াও সমপরিমাণে যুক্তি সিদ্ধ জ্যামিতি গঠন করা সম্ভব। এবং সর্বশেষে ইউক্লিডের সমুদয় স্বীকার্যগুলি কেবল মাত্র অনুমান, যে অনুমানগুলি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে সত্য বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু ভিন্নতর অনুমান দ্বারাও উহাদের যুক্তি পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইতে পারে।

এই তত্ত্বের সূচনাকারী হিসাবে অনেক সময় গ্যয়সের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে জানা গিয়াছে যে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ল্যাম্বার্ট[৪] লিখিতভাবে একটি প্রবন্ধে সমান্তরাল রেখাবিষয়ক স্বতঃপ্রতীয়মানতা যে প্রমাণ সাপেক্ষ তাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং এমন কতকগুলি জ্যামিতির কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন যেখানে ঐ স্বতঃপ্রতীয়মানতাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে। এমন কি ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইতালিতে সাক্কেরি যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেও তিনি অনইউক্লিডীয় জ্যামিতির পূর্ণ পদ্ধতি নিরূপিত করিয়াছিলেন এবং এই সঙ্গে অন্যান্য প্রকল্পগুলি যে অনৃত — এই প্রমাণ নির্ণয় করিবার প্রচেষ্টা করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এইখানে প্রথম পরিচ্ছেদের ভিত্তিবতত্ত্ব (basis) হিসাবে সাক্কেরির পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়াছে।

সমান্তরালসম্পর্কীয় স্বতঃপ্রতীয়মানতাকে প্রমাণ করিবার জন্য গ্যয়স বহুকাল যাবৎ ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি হয়ত যে উপপাদ্যগুলির প্রমাণে সমান্তরাল বিষয়ক স্বীকৃতিগুলি পরিত্যাগ করা আবশ্যক ছিল, সেই স্বতঃপ্রতীয়মানতার অস্বীকার্য অনুক্রমের ফলেই কিছু উপপাদ্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কখন [কখনো] এই বিষয়ে কিছু প্রকাশ করেন নাই।

হাঙ্গেরীর যোহান বোলিয়্যাই এবং রাশিয়ার লোবাচ্যেহুস্কিই প্রথম দৃঢ় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সমান্তরালের স্বতঃপ্রতীয়মানতা আবশ্যিকভাবে সত্য নহে। তাঁহারা উভয়েই সম্পুর্ণ [সম্পূর্ণ] স্বাধীন ও পৃথকভাবে নিজেদের কাজ করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁহাদের উভয়েরই প্রাপ্য। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এই ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছিল।

বহুকাল পরেই এই আবিষ্কার বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইতিমধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বিষয়ে ব্যাপক ভাবে অনুসন্ধানের কাজ চলিতেছিল এবং পরবর্তীকালে এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করা হইয়াছে, বস্তুতপক্ষে, কেবলমাত্র ব্যাখ্যা দ্বারাই নহে, উহাদের সমতুল্যতার দ্বারা যথেষ্ট আলোকপাত করা হইয়াছিল।

এইভাবে এক বৎসর কি দুই বৎসরের মধ্যেই উভয়ের "ক্রেল" নামক একই পত্রিকায় নানাপ্রকার পর্যবেক্ষণের ফলাফল ব্যক্ত করিয়া, প্রথমে লোবাচ্যেহুস্কীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উরস্থলের উপর — মাইণ্ডিং লিখিত স্মৃতিকথা প্রকাশিত হইয়াছিল যাহাতে তিনি গোলক সংক্রান্ত ত্রিকোণমিতি ফর্মুলা বা সূত্র, যদি আমরা a র বদলে ia ইত্যাদি লিখি তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করে, এইরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই দুইটি বিষয় প্রকাশিত হইবার ত্রিশ বৎসর পরে ইহাদের সংযোগ সাযুজ্যতা বেল্টরামি কর্তৃক সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়।

পুনরায়, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে Philosophical Transactions গ্রন্থে Quantics এর উপর কেয়িলিয়র ষষ্ঠ স্মৃতিকথা প্রকাশিত হইয়াছিল যাহাতে তিনি পরিমাপনের অভিক্ষিপ্ত তত্ত্বকে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছেন, যে কোন চিত্রের অসমন্বয় পূর্ণ সম্পর্ককে বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত বিশেষ ধরণের কোন চিত্র দ্বারা কিভাবে পরিমাপমূলক গুণকে (metrical properties) অভিক্ষিপ্তরূপে ব্যবহার করা যায়, এবং যাহাকে তিনি ধ্রুব পারম্য বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ক্লেইন দেখাইলেন যে এই তত্ত্বই অনইউক্লিডীয় জ্যামিতির যথাযথ প্রতিরূপ।

উপরন্তু ইহাও দেখান হইয়াছিল যে, যদি আমরা পরিমাপনের এমন একটি একক ভাবিতে পারি যে একক যখন তলে কিম্বা শূন্যে চলিতে থাকে তখন কোন নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়। তাহা হইলেই আমরা অনইউক্লিডীয় জ্যামিতি অনুধাবন করিতে পারি।

এই ক্ষেত্রে পূর্বতন গনিতজ্ঞরা [গণিতজ্ঞরা] কেবলমাত্র এই জ্যামিতিকেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহার মধ্যে সূক্ষ্ম কোণের প্রকল্পকে প্রতীতি ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। একটি রেখা সসীম দৈর্ঘ্যে বিশিষ্ট হইতে পারে এই সম্ভাবনার কথা তাঁহাদের মনে কখন [কখনো] উদয় হয় নাই। পরবর্তী সময়ে, উপবৃত্ত সংক্রান্ত জ্যামিতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন র‍্যাইমান। ইতি [ইনি] ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জ্যামিতির ভিত্তিনীতির উপর সম্পূর্ণ [সম্পূর্ণ] আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অনুশীলন শুরু করিয়াছিলেন যাহাকে নিরংশ [নিরঙ্কুশ] বীজগাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গী বলা যাইতে পারে। কেবলমাত্র ব্যাখ্যাকারী চিত্র পদ্ধতি ব্যতিরেকে চলের রীতি দ্বারা স্থান কিম্বা জ্যামিতিক চিত্রকে তিনি পুরোপুরি পরিহার করিয়াছিলেন। এই সকল চলের অপেক্ষকের প্রকৃতি কি যাহাদের দৈর্ঘ্যে বা দূরত্বের অনুক বলা যাইতে পারে, এই প্রশ্নেরই তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন সহজতম অবস্থায় ইহা সেই চলেরই অনুকলনের দ্বিযাত [দ্বিঘাত] অপেক্ষকের বর্গমূল যে চলগুলির সহগরাজি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই চলগুলির অপেক্ষক। দ্বিঘাত রাশিমালার বিভিন্ন আকার লইয়া আমরা এই সকল ভিন্ন প্রকারের জ্যামিতির অসীম সংখ্যা পাই। কিন্তু বেশীর ভাগের মধ্যেই আমরা স্বতঃপ্রতীয়মানতাকে হারাই, যে অঙ্গকে উহার আকার কিম্বা আয়তনের পরিবর্তন না করিয়াও স্থানান্তরিত করা যায়।

এই প্রসঙ্গে হেল্মহোলট্জ এবং ক্লিফোর্ডের নাম সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা উভয়েই এই বিষয়কে বিজ্ঞান বিষয়ক জর্নালে প্রবন্ধ লিখিয়া জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ক্লিফোর্ডের নিকট আমরা উপবৃত্তাকার স্থানে সমান্তরাল তত্ত্বের জন্য ঋণী। পরে এই বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করিব। তিনি দেখাইয়াছিলেন এই প্রকার জ্যামিতিতে আমরা একটি সসীম তলকে পাইতে পারি যাহার উপর নির্ভর করিয়া ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সত্যকে ধারণ করিতেছে।[৫]

অনইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রধান শিক্ষা হইল যে স্বতঃপ্রতীয়মানতা ভৌতবিজ্ঞান তত্ত্বের মত কেবলমাত্র আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে অবরোহ অনুমান ভিত্তিক। দার্শনিক ছাড়া গনিতজ্ঞদের [গণিতজ্ঞদের] কাছে উহারা কেবল প্রকল্প, যাহার সত্যতা কিম্বা অনৃতি তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে। গণিতজ্ঞ যিনি, তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন যে কোন আকারকেই গ্রহণ করিতে পারেন এবং ঐ আকারের উপর জ্যামিতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। অনুরূপভাবে প্রাপ্ত জ্যামিতিকে অঙ্কশাস্ত্রের অন্যান্য শাখায় উপযোজনের প্রাসঙ্গিকতা রহিয়াছে।

এই সকল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞাসমূহে স্বতঃপ্রতীয়মান এই শব্দটিকে প্রয়োগ করা হইয়াছে — স্বতঃসিদ্ধ রূপে কিম্বা অপরিহার্য্য সত্য বলিয়াও নহে। যদি নিশ্চিত কোন বিবৃতি প্রমাণ করা যায় অর্থাৎ ইতিমধ্যেই যদি কোন স্বতঃপ্রতীয়মানতার (axiom) অপরিহার্য অনুক্রম বলিয়া গৃহীত হয়, তথাপি উহাকে স্বতঃপ্রতীয়মানতা বলা উচিৎ নহে। প্রথম সূত্রপাত হইতে গৃহীত হইয়াছে এমন সকল স্বতঃপ্রতীয়মানতাকে লইয়া যখন দুই কিম্বা ততোধিক পারস্পরিক ভাবে পরস্পরবিরোধী বিবৃতকরণ সমান ভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটিকে মানিয়া লইতে পারি এবং যে বিবৃতিকে আমরা গ্রহণ করিব উহাই আমাদের জ্যামিতির স্বতঃপ্রতীয়মানতা হইবে। আমাদের আলোচ্য জ্যামিতি এই স্বতঃপ্রতীয়মানতার অনুক্রমেরই অনুশীলন।

যে তিন প্রকারের জ্যামিতির বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম তাহা বিভিন্ন তিন প্রকারের অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি সমান্তরাল যুগল অথবা দুইটি সমান্তরাল যুগল অঙ্কন করা যাইতে পারে অথবা কোন সমান্তরাল যুগলই অঙ্কন করা যাইতে পারে না; একটি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অথবা দুই সমকোণ হইতে কম অথবা দুই সমকোণ অপেক্ষা বেশী; কোন সরল রেখাকে অসীম অবধি বর্দ্ধিত করা সম্ভব নহে অথবা একদিকে অসীম অবধি বর্দ্ধিত করা সম্ভব অথবা দুই দিকেই অসীম অবধি বর্দ্ধিত করা সম্ভব; এক সমতলে সদৃশ আকৃতি অঙ্কন করা সম্ভব অথবা সম্ভব নহে ; একটি সরলখেরা [সরলরেখা] সসীম দৈর্ঘ্যেবিশিষ্ট অথবা অসীম দৈর্ঘ্যে বিশিষ্ট — ইত্যাকার বিভিন্ন অনুমান গ্রহনের [গ্রহণের] ফলে বিভিন্ন জ্যামিতির উদ্ভব হয়। এই মূল অনুমানগুলি কোন কোন জ্যামিতির চরিত্র অবধারিত করিয়া থাকে, এবং এই জ্যামিতির অন্যান্য অঙ্গও এই সকল অনুমান দ্বারাই অধিগম্য।

প্রস্তাবনা

পূর্বে জ্যামিতির স্বতঃপ্রতীয়মানতাকে চিন্তাধর্মের বিধানতত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করা হইত কেননা উহাকে মেধাসম্পন্ন মন দ্বারা অস্বীকার করা যাইত না, এমন কি অনুসন্ধান করাও অসম্ভব ছিল। যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়া যাইতে দেখা যাইত; কেবলমাত্র সেই স্বতঃপ্রতিয়মানতা [স্বতঃপ্রতীয়মানতা] নহে অধিকন্তু ইহা বিশ্বাস করা হইত যে ঐগুলির অর্থাৎ স্বতঃপ্রতীয়মানগুলির কোনটাই সত্য নহে, এই অনুমানের ভিত্তিতে আমরা কোন কারণ বা যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারি না। যাহাই হউক, ইহা দেখান হইয়াছে যে আংশিক বা পূর্ণভাবেই ইউক্লিডের বিপরীতধর্মী এক গোছ (set) স্বতঃপ্রতীয়মানতাকে লইয়া তাহার জ্যামিতির মতই সঙ্গতিমূলক অন্য আর এক প্রকার জ্যামিতির রূপায়ণ সম্ভবপর।

আমরা, এইখানে দুই প্রকার জ্যামিতির (অবশ্যই অনইউক্লিডীয়) প্রসঙ্গ আলোচনা করিব। কেবলমাত্র যেগুলি সমান্তরাল রেখা সম্পর্কিত, সেগুলি ব্যতিরেকে বর্তমান নিবন্ধে, স্বতঃপ্রতীয়মান এবং সংজ্ঞা সমূহ ইউক্লিডে যে রূপ আছে সেইরূপই লওয়া হইল। সমান্তরাল রেখার উপর নির্ভরশীল স্বতঃপ্রতীয়মানতাগুলিকে বাদ দিলে আমরা তিনটি প্রকল্পে পৌঁছিতেছি। ইহাদের মধ্যে একটি ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকেই প্রতিষ্ঠিত করে এবং অপর দুইটির — প্রত্যেকটিই কৌতুহলোদ্দীপক [কৌতূহলোদ্দীপক] ও কার্যকর কতকগুলি সারিবদ্ধ প্রতিজ্ঞা আমাদের সামনে উপস্থিত করে। বস্তুতঃপক্ষে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সীমিত অংশকেই অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, আমরা যে দুইটি অনইউক্লিডীয় জ্যামিতি বর্ণনা করিতে যাইতেছি তাহা অপেক্ষা ইউক্লিডীয় পদ্ধতিই অধিকতর সত্য। আমরা এমন একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিব যাহা আমাদের প্রথমেই প্রমাণ করিতে সমর্থ করিবে যে, প্রতিজ্ঞা সমূহ তিন প্রকার জ্যামিতির কাছেই এজমালি বা একই, দ্বিতীয়তঃ ইউক্লিড হইতে ভিন্নতর অন্য দুই প্রকার জ্যামিতির প্রত্যেকটির জন্য সারিবদ্ধ প্রতিজ্ঞা ও ত্রিকোণমিতি সূত্র প্রকাশ করা এবং পরে বৈশ্লেষিক পদ্ধতি দ্বারা উহাদের বিশেষ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিরূপিত করা। এই অনুশীলনে আমরা জ্যামিতির ভিত্তিনীতির প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি না, এমন কি জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে মানিয়া লওয়া সকল বিষয় সমূহকে নির্দেশও করিতেছি না। এই সকল জ্যামিতিতে এজমালি যাহা রহিয়াছে সেইগুলিকে পরিহার করিয়া আমরা কেবলমাত্র ঐগুলির বৈসাদৃশ্যের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করিব। নিরাংশ তত্ত্ব ছাড়াও সমবদ্ধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা জ্যামিতির প্রকৃতি বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানা যাইবে। এইরূপে আমরা এখানে আমাদের পাঠ্যে উল্লিখিত সংজ্ঞার পুনরাবৃত্তি না করিয়া অধিকতর জ্যামিতিক পদেরই উল্লেখ করিব এবং ধরিয়া লইব যে এই সকল পদ দ্বারা যে সকল চিত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করা হইয়াছে সেগুলি বিদ্যমানই রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া আমরা ধরিয়া লইব যে,

ক ঃ যে কোন দুই বিন্দু দ্বারা সরলরেখার বিদ্যমানতা নির্দ্ধারিত হয় এবং বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত পথ হইল সরলরেখা।

খ ঃ সমতলের বিদ্যমানতা তখনই নির্দ্ধারিত হয় তিনটি বিন্দু দ্বারা গঠিত সরল রেখায় নহে এমন রেখার দ্বারাই এবং একটি সরল রেখা সমতলের যে কোন দুই বিন্দুকে যুক্ত করে যাহা সমগ্রভাবে সমতলের মধ্যেই নিহিত।

গ ঃ জ্যামিতিক চিত্রের আকার বা আয়তনকে কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়াও নড়ান যাইতে পারে।

ঘ ঃ রেখার প্রতিটি বিন্দুকেই অতিক্রম করিয়া একটি বিন্দু একটি রেখার সহিত এক অবস্থান হইতে অন্য অবস্থান পর্যন্ত চলে। এবং জ্যামিতিক মানগুণ্য উদাহরণস্বরূপ — একটি কোণ কিম্বা একটি অন্যটির মান হইতে ভিন্নতর একটি রেখার আংশিক দৈর্ঘ্য সকল মধ্যবর্তী মানের ভিতর দিয়া অতিক্রম করে।

যেখানে আমাদের সাধারণ পাঠ্য হইতে বিশদ বিবরণ সরবরাহ করা যাইবে সেখানে কিছু প্রতিজ্ঞাতে প্রমাণ বাদ দেওয়া হইবে অথবা কেবলমাত্র প্রমাণ পদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়া হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্যানজিওমেট্রি (Pangeometry)

১। কেবলমাত্র উপরিপত্তির জন্যত্বের উপর নির্ভরশীল প্রতিজ্ঞাসমূহ

উপপাদ্য ১ ঃ যদি একটি সরলরেখা অন্য একটি সরলরেখাতে মিলিত হয়, উদ্ভূত সন্নিহিত কোণদ্বয়ের যোগফল দুই সমকোণের সমান।

উপপাদ্য ২ ঃ যদি দুইটি সরলরেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তাহা হইলে শিরঃকোণদ্বয় সমান হইবে।

উপপাদ্য ৩ ঃ যদি একটি বাহু এবং দুইটি সন্নিহিত কোণ অথবা দুইটি বাহু এবং অন্তর্ভূক্ত [অন্তর্ভুক্ত] কোণ যথাক্রমে অন্যটির অনুরূপ অংশে একটির সমান হয় তাহা হইলে ত্রিভুজ দুইটি সমান হইবে।

উপপাদ্য ৪ ঃ একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজে সমান বাহুর বিপরীত কোণসমূহ সমান। শীর্ষকোণকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া (৩) ব্যবহার কর।

উপপাদ্য ৫ ঃ একটি ত্রিভুজের যে কোন দুইটি বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডিত [সমদ্বিখণ্ডক] যদি অন্তস্থঃ কোন বিন্দুতে ছেদ করে তাহা হইলে তৃতীয় বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক ঐ বিন্দুতে মিলিত হইবে। এই বিন্দুটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুত্রয়ের মধ্য দিয়া অঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্র হইবে।

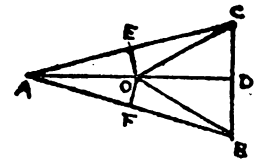

প্রমাণ ঃ মনে কর EO এবং FO রেখা O বিন্দুতে মিলিত হইতেছে। AFO এবং BFO (3) দ্বারা সমান। এইরূপে AEO এবং CEO সমান।

অতএব, CO এবং BO রেখা সমান যেহেতু ইহারা প্রত্যেকটিই AO রেখার সমান।

সুতরাং BCO সবদ্বিবাহু ত্রিভুজ এবং BOC কোণকে যদি OD রেখা ছেদ করিতেছে এইরূপ অঙ্কন করা যায় তাহা হইলে BC রেখার মধ্য বিন্দুতে উহা লম্ব হইবে।

উপপাদ্য ৬ ঃ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুস্থঃ কোণের সমদ্বিখণ্ডক যে জ্যা দ্বারা কোণটি উৎপন্ন হইতেছে সেই জ্যার লম্ব সমদ্বিখণ্ডক হইবে।

উপপাদ্য ৭ ঃ একটি বৃত্তের কেন্দ্রে কোণ বিচ্ছিন্নকারী চাপের আনুপাতিক এবং উহাদের দ্বারা পরিমেয় সাধ্য হইতে পারে।

উপপাদ্য ৮ ঃ একটি সরলরেখার বহিঃস্থ কোন বিন্দু হইতে ঐ সরলরেখার উপর একটি লম্ব অঙ্কন করা সম্ভব।

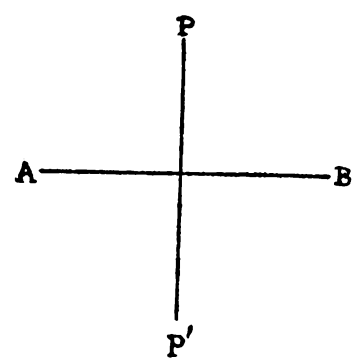

প্রমাণ ঃ ধরা যাউক P′ হইল অবস্থান। যদি সমতলকে উহার সমাপতনের ভিতর ABর বিপরীত দিকে আবর্তিত করা হয় তাহা হইলে ঐ অবস্থান P দখল করিবে; অতএব PP′ সরলরেখা AB রেখার লম্ব হইতেছে।

উপপাদ্য ৯ ঃ যদি লম্বের একটি বিন্দু হইতে বক্ররেখা অঙ্কন করা যায়, যাহা লম্বের পাদদেশ হইতে সমদূরত্বে একটি রেখাকে ছেদ করিতেছে উহারা রেখা ও লম্বের সমান হইতেছে এবং সমান কোণ সৃষ্টি করিতেছে।

উপপাদ্য ১০ঃ একই কোণে যদি দুইটি রেখা একটি তৃতীয় রেখাকে ছেদ করে যাহার অনুরূপ কোণ সমূহ সমান তাহা হইলে এমন একটি রেখা অঙ্কন করা যাইতে পারে যাহা উভয়েরই লম্ব হইবে।

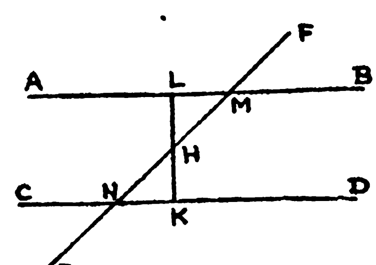

প্রমাণ ঃ ধরা যাউক FMB এবং MND কোণদ্বয় সমান, এবং H বিন্দুর মধ্য দিয়া MN রেখার মধ্যবিন্দু CD রেখার উপর LK লম্ব অঙ্কন করিয়াছে। অনন্তর, অনুরূপভাবে AB রেখার লম্ব হইল LK। কেননা LMH ও KNH দুইটি ত্রিভুজই (3) দ্বারা সমান।

উপপাদ্য ১১ঃ যদি দুইটি সমান দৈর্ঘ্যে বিশিষ্ট রেখা একটি সমতলে একটি প্রদত্ত রেখার উপর লম্বভাবে উপস্থাপিত করা হয়, উহাদের প্রান্তসীমা সংযোগকারী রেখা উহাদের সঙ্গে সমান কোণের সৃষ্টি করে এবং উহাদের মধ্যপথে উপস্থাপিত তৃতীয় লম্ব দ্বারা সমকোণে দ্বিখণ্ডিত হয়।

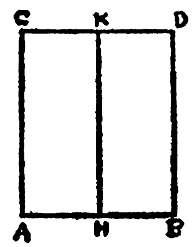

ধরা যাউক, AC ও BD রেখা ABর উপর লম্ব, এবং মনে করা যাউক AC ও BD সমান। C ও D তে কোণ সমূহ এই দুই বিন্দুকে সংযুক্তকারী রেখা দ্বারা গঠিত হইতেছে, উহারা সমান এবং ABর মধ্য বিন্দুতে HK লম্ব উহার মধ্য বিন্দুতে CDর লম্ব।

উপরিপত্তি দ্বারা প্রমাণিত।

উপপাদ্য ১২ ঃ পূর্ব প্রতিজ্ঞাতে যেমন দুইটি লম্ব এবং একটি তৃতীয় লম্ব উহাদের মধ্যে অবস্থিত এই রেখাপথে উপস্থাপিত হইয়াছে; যদি কোন রেখা এই তৃতীয় লম্বকে সমকোণে খণ্ডিত করে, এবং যদি এই রেখা পূর্বোক্ত লম্ব দুইটিকে আদৌ খণ্ডিত করে তাহা হইলে এমন ভাবে ছেদ করিবে যাহাতে উভয়ের সঙ্গেই সমান কোণ উৎপন্ন করিবে এবং সমান দৈর্ঘ্যে খণ্ডিত করিবে।

উপরিপত্তির দ্বারা প্রমাণিত।

অনুসিদ্ধান্ত ঃ শেষোক্ত দুইটি প্রতিজ্ঞা সত্য হইতেছে যদি ABর মধ্য বিন্দুতে HK লম্ব হইয়া, A ও B কোণগুলি সমান সূক্ষ্ম অথবা সমান স্থূল কোণ হয়। যদি AC=BD, C ও D তে কোণগুলি সমান হয় এবং CD র মধ্য বিন্দুতে HK লম্ব হয়; কিম্বা, যদি কোন বিন্দুতে CD, HKর লম্ব হয় K ও প্রতিচ্ছেদ্য AC ও BD এই দুই রেখার উপর সম পরিমাণ দূরত্বকে খণ্ডিত করিবে এবং উহাদের সঙ্গে সমান কোণ সৃষ্টি করিবে।

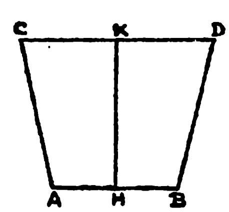

২. নিয়ন্ত্রিত চিত্রের জন্য যে সকল প্রতিজ্ঞা সত্য

নিম্নবর্ণিত প্রতিজ্ঞাসমূহ অন্ততপক্ষে চিত্রের জন্যই সত্য যাহাদের রেখাগুলি নিশ্চিত কিছু দৈর্ঘ্যে উহাদের সীমা ও মাত্রা ছাড়াইয়া যায় নাই। অর্থাৎ যদি কোন ব্যতিক্রম ঘটে ইহা এমন একটি ব্যাপার, যেখানে কিছু কিছু রেখার দৈর্ঘ্যের নিমিত্ত আমরা উপপাদ্য প্রয়োগ করিতে পারি না অথবা প্রমাণ করিবার জন্যও অগ্রসর হইতে পারি না। এই অর্থে, সুবিধার জন্য আমরা নিয়ন্ত্রিত শব্দটি ব্যবহার করিব এবং একটি উপপাদ্য নিয়ন্ত্রিত চিত্র অথবা সমতলের নিয়ন্ত্রিত যে কোন অংশের জন্যই সত্য।

উপপাদ্য ১ ঃ একটি ত্রিভুজের বহিঃকোণ যে কোন বিপরীত অন্তস্থঃ কোণ হইতে বৃহত্তর (ইউক্লিড, ১, ১৬)।

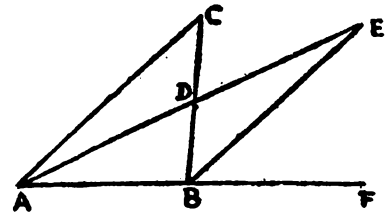

প্রমাণ ঃ A হইতে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু পর্যন্ত AD অঙ্কন কর এবং ইহাকে B পর্যন্ত বর্দ্ধিত কর DE=AD করিয়া গঠিত ADC ও EBD ত্রিভুজ দুইটি সমান, এবং FBD কোণ EBD কোণ হইতে বৃহত্তর হওয়াতে C হইতে বৃহত্তর।

অনুসিদ্ধান্ত ঃ অন্ততঃ একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ সূক্ষ্ম কোণ হইবে।

উপপাদ্য ২ ঃ যদি একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ সমান হয়, বিপরীত বাহুগুলি সমান হয়, ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হইবে।

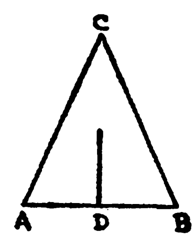

প্রমাণ ঃ ভূমির মধ্য বিন্দুতে উপস্থাপিত লম্ব ত্রিভুজটিকে দুইটি চিত্রে ভাগ করে যাহা সদৃশ হইবার জন্য গঠিত হইতে পারে এবং সমান হয়। এই লম্ব যেহেতু শীর্ষের ভিতর অতিক্রম করে এবং ত্রিভুজের সমান কোণের বিপরীত দুই বাহু সমান।

উপপাদ্য ৩ ঃ একটি ত্রিভুজের অসমান কোণ লইয়া দুই কোণের বৃহত্তর বিপরীত বাহু ক্ষুদ্রতর বিপরীত বাহু হইতে বৃহত্তর হয়। বিপরীতভাবে যদি একটি ত্রিভুজের বাহুগুলি অসমান হয় বিপরীত কোণগুলিও অসমান হইবে এবং বৃহত্তর বাহুর বিপরীতে অবস্থান করিবে।

উপপাদ্য ৪ ঃ যদি দুইটি ত্রিভুজের এক সমান দুইটি বাহু থাকে যথাক্রমে, অন্যটির দুই বাহু পর্যন্ত, কিন্তু প্রথমটির অন্তর্ভূক্ত [অন্তর্ভুক্ত] কোণ হইতে বৃহত্তর, প্রথমটির তৃতীয় বাহু দ্বিতীয়টির তৃতীয় বাহু হইতে বৃহত্তর, এবং বিপরীতভাবে যদি দুইটি ত্রিভুজের এক সমান দুইটি বাহু থাকে, যথাক্রমে, অন্যটির দুই বাহু পর্যন্ত, কিন্তু প্রথমটির তৃতীয় বাহু দ্বিতীয়টির তৃতীয় বাহু হইতে বৃহত্তর, প্রথমটির তৃতীয় বাহুর বিপরীত কোণ দ্বিতীয়টির তৃতীয় বাহুর বিপরীত কোণ হইতে বৃহত্তর।

উপপাদ্য ৫ ঃ একটি সরল রেখার প্রান্তদেশ পর্যন্ত যে কোন বিন্দু হইতে অঙ্কিত দুইটি রেখার যোগফল, অনুরূপভাবে অঙ্কিত কিন্তু উহাদের দ্বারা অন্তর্ভূক্ত [অন্তর্ভুক্ত] দুইটি রেখার যোগফল হইতে বৃহত্তর।

উপপাদ্য ৬ ঃ যে কোন বিন্দুর ভিতর দিয়া একটি সরলরেখার উপর কেবল মাত্র একটি লম্বই অঙ্কিত হইতে পারে।

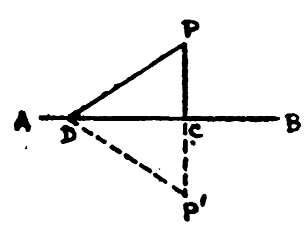

প্রমাণ ঃ ধরা যাউক P′ হইল অবস্থান, যদি সমতলকে ABর কাছাকাছি ইহার সহিত সমাপতনের ভিতরে আবর্তিত করা হয় তাহা ঐ অবস্থান P অধিকার করিবে।

P হইতে AB পর্যন্ত PC ও PD যদি আমাদের এই দুইটি লম্ব থাকিত অনন্তর উহারা CP′ ও DP′ রেখার ধারাবাহিকতা

হইতে পারিত এবং অসম্ভব হইলেও আমাদের দুইটি ভিন্ন সরল রেখা যা P ও P′ কে সংযুক্ত করিতেছে থাকা উচিত ছিল।

অনুসিদ্ধান্ত ঃ দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ সমান হয় যখন একটির অতিভুজ এবং একটি সূক্ষ্ম কোণ সমান হয় যথাক্রমে, অন্যটির অতিভুজ এবং একটি সূক্ষ্ম কোণ পর্যন্ত।

উপপাদ্য ৭ ঃ লম্বই হইতেছে সংক্ষিপ্ত রেখা যাহা একটি বিন্দু হইতে একটি সরলরেখা পর্যন্ত অঙ্কন করা যাইতে পারে।

অনুসিদ্ধান্ত ঃ একটি সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণের কাছাকাছি অতিভুজ যে কোন বাহু হইতে বৃহত্তর।

উপপাদ্য ৮ ঃ লম্বের পাদদেশ হইতে একটি রেখা পর্যন্ত অসমান দূরত্বকে খণ্ডিত করিতেছে কোন বিন্দু হইতে একটি লম্বে যদি বক্ররেখা টানা হয় উহারা অসমান হইবে, এবং আরও বেশী দূরব্যবধান বিশিষ্ট বৃহত্তর হইবে; এবং বিপরীত ভাবে একটি বিন্দু হইতে একটি লম্বে যদি দুইটি বক্র রেখা টানা হয় উহারা অসমান হইবে, বৃহত্তরটি লম্বের পাদদেশ হইতে বৃহত্তর দূরত্বকে খণ্ডিত করিবে।

উপপাদ্য ৯ ঃ একটি সরল রেখার মধ্য বিন্দুতে যদি একটি লম্ব উপস্থাপিত করা হয়, লম্বে নাই এমন যে কোন বিন্দু লম্বের একই বাহুতে রেখার প্রান্ত সীমার সন্নিকটবর্তী।

অনুসিদ্ধান্ত ঃ একটি সরলরেখার প্রান্তসীমা হইতে দুইটি বিন্দু সমদূরবর্তী রেখা পর্যন্ত উহার মধ্য বিন্দুতে একটি লম্ব ধার্য করে।

উপপাদ্য ১০ ঃ দুইটি ত্রিভুজের এক সমান বাহু থাকিলে যথাক্রমে অন্যটির তিন বাহু পর্যন্ত উহারা সমান হয়।

উপপাদ্য ১১ ঃ একটি সমতলে যদি দুইটি রেখা তৃতীয়টির উপর লম্বভাবে উপস্থাপিত হয় উহারা অসমান হইবে, উহাদের প্রান্তসীমা সংযুক্তকারী রেখা উহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বৃহত্তর কোণ ক্ষুদ্রতর লম্ব সমেত অসমান কোণের সৃষ্টি করে।

প্রমাণ ঃ মনে করি AC=BD। উদ্ভূত BD,BE=AC সৃষ্ট করিতেছে। অনন্তর BEC=ACE। কিন্তু BDC=BEC (1) দ্বারা এবং ACD হইতেছে ACEর অংশ। অতএব, BDC=ACD।

উপপাদ্য ১২ ঃ যদি C ও D তে দুইটি কোণ সমান হয়, লম্বগুলিও সমান এবং কোণগুলি যদি অসমান হয় লম্বগুলিও অসমান এবং দীর্ঘতর লম্ব ক্ষুদ্রতর কোণ সৃষ্টি করে।

উপপাদ্য ১৩ ঃ যদি দুইটি রেখা তৃতীয় রেখার উপর লম্ব হয়, তৃতীয় রেখা হইতে যে কোন সমদূরবর্তী বিন্দুগুলি অন্যগুলি হইতেও সমদূরবর্তী হয়।

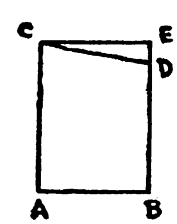

প্রমাণ ঃ ধরা যাউক AB ও CD, HKর উপর লম্ব এবং CDর উপরে যে কোন দুইটি বিন্দু লইলে, C ও D, K হইতে সমদূরবর্তী হয়, অনন্তর C ও D, AB হইতে সমদূরবর্তী হইবে। উপরিপত্তির দ্বারা আমরা Dর উপর Dকে পতিত করিতে পারি এবং অনন্তর DB, CAর সঙ্গে (6) দ্বারা সদৃশ হইবে।

নিম্নবর্ণিত ঘন জ্যামিতির (Solid Geometry) প্রতিজ্ঞাসমূহ প্রত্যক্ষ ভাবে পূর্ববর্তিতার উপর নির্ভরশীল এবং অন্ততঃ স্থানের যে কোন নিয়ন্ত্রিত অংশের জন্য সত্যকে ধারণ করে।

উপপাদ্য ১৪ ঃ যদি একটি রেখা দুইটি প্রতিচ্ছেদকারী রেখার প্রতিচ্ছেদে উহাদের লম্ব হয়, উক্ত রেখা এই বিন্দুর মধ্যে অতিক্রমকারী উহাদের সমতলের প্রত্যেকটি রেখারই লম্ব হইবে।

উপপাদ্য ১৫ ঃ যদি দুইটি সমতল লম্ব হয়, একটি লম্বে উহাদের প্রতিচ্ছেদ পর্যন্ত একটি রেখা অঙ্কিত হইলে একটি অন্যটির লম্ব হয় এবং একটি লম্বের যে কোন বিন্দুর মধ্য দিয়া অঙ্কিত একটি রেখা অন্যটি পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে প্রথমটির উপর অবস্থান করে।

উপপাদ্য ১৬ ঃ যদি একটি রেখা একটি সমতল পর্যন্ত লম্ব হয় যে কোন সমতল ঐ রেখার ভিতরে সমতলের কাছে লম্ব হইবে।

উপপাদ্য ১৭ ঃ যদি একটি সমতল দুইটি প্রতিচ্ছেদকারী সমতলের প্রত্যেকটিরই কাছে লম্ব হয়, এই সমতল উহাদের প্রতিচ্ছেদ পর্যন্ত লম্ব হইবে।

Non-Euclidean Geometry by Manning হইতে
বেলাল চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত।

টীকাগুলি মূল Text-এর অংশ

১। ইউক্লিডের axiom এর উপর পল ট্যানারি কৃত প্রবন্ধ, Bulletin des sciences Mathématiques, 1884 দ্রষ্টব্য।
২। ল্যজ্যাঁদর কৃত দ্বাদশ সংস্করণের Éléments de Géométrie, Livré I, Proposition XIX, এবং Noté II দ্রষ্টব্য।
Bulletin des sciences Mathématiques এর প্রথম সিরিজের দ্বিতীয় ভল্যুমে অনইউক্লিডীয় জ্যামিতির উপর ক্লেইন রচিত প্রবন্ধটিও দ্রষ্টব্য।
৩। American Mathematical Monthly, July-August 1895 দ্রষ্টব্য।
৪। The American Mathematical Monthly পত্রিকায় হলস্টেড কৃত The Translation of Saccheri নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।
৫। অনইউক্লিডীয় জ্যামিতি বিষয়ে অধিকতর আকর্ষনীয় [আকর্ষণীয়] তথ্য উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাইবে।

Encyclopedia Britannica-তে স্যার রবার্ট বল কৃত Measurement নিবন্ধ দ্রষ্টব্য; Revue Général des Sciences, 1891 পত্রিকায় প্যাঁওয়াকারে কৃত "Les Géométries NonEuclidean" নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। Bulletin of the American Mathematical Society, May & June, 1900, পত্রিকায় ফ্রেডরিক এস.উড রচিত Lobachevsky's Geometry প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। Mathematische Annelen, Bd. xliv, p.149, 1897 এবং Bulletin Des Sciences Mathématiques, 1897, গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য। "Letters of Gauss and Bolyai" গ্রন্থে বিশেষ করিয়া কৌতুহলোদ্দীপক একটি চিঠি, যাহাতে গ্যয়স একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এই প্রকল্পে সর্বদাই অনুরূপ একটি সসীম ক্ষেত্রফল টানিয়া আমরা যে তিনটি পারম্পরিক [পারস্পরিক] সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করিতে পারি এই সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন যা এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ও সবিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

অধ্যাপক এঙ্গেল ও স্ট্যাক্কেল রচিত শেষোক্ত প্রবন্ধ দুইটি সমান্তরাল তত্ত্বের সামগ্রিক ইতিহাস, লোবাচ্যেহুস্কি এবং বোলিয়্যাই-র জীবনী ও রচনাবলী সম্বলিত। অধ্যাপক জর্জ ব্রুস হলস্টেড কৃত লোবাচ্যেহুস্কি ও বোলিয়াই এর রচনার অনুবাদ [অনুবাদ] এবং অধ্যাপক ভাসিলিয়েভ এর একটি ভাষণও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

সম্পাদকীয় সংযোজন

৩নং টীকার জন্য ৩নং শীর্ষচিহ্নিত অংশ আমরা প্রবন্ধের কোথাও পাইনি।

সংযোজন

[আলোচ্য অনুবাদে কোথাও বুঝিতে অসুবিধা হইলে দয়া করিয়া লিখিবেন।*]

আপাতদর্শীদের নিকট বৈজ্ঞানিক সত্য দুর্ভেদ্য, বিজ্ঞানের যুক্তিসকল অব্যর্থ সঠিক; অবশ্য যদি দেখা যায় কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাদ করিয়া বসিয়াছেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাঁহার পক্ষে খেলার নিয়মটি বুঝিয়া ওঠা সম্ভব হয় নাই।

অঙ্ক-শাস্ত্র কতকগুলি স্বতঃপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞা হইতে সম্ভূত এবং ক্রমান্বয় নিখুঁত যুক্তিতর্ক দ্বারা বিবেচিত। ইহা — অঙ্কশাস্ত্র সত্য — আমাদের উপর কেবলমাত্র যে তাহা ভর করে যা প্রভাব বিস্তার করে এমন নহে, বিদ্যমান প্রকৃতির উপরও তাহা প্রভাব বিস্তার করে; এমন কি, যেন মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তা নিজেই উহার দ্বারা শৃঙ্খলিত, এবং তাঁহার বাছাই কর্ম্ম অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সমাধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই, কয়েকটিমাত্র পরীক্ষার দ্বারা তাঁহার সেই বাছাই ব্যাপার অর্থাৎ তিনি যে কি কি বাছাই করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করাও যাইতে পারে।

প্রত্যেকটি পরীক্ষা — অঙ্কশাস্ত্রগত ব্যবকলন বিচার সাহায্যে প্রতিটি পরীক্ষা হইতেই কিছু ফলাফল দেখা যায়। এবং এই প্রকারে, ঐ সকল পরীক্ষায়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোন দিক উদ্ভাসিত করিবেই। এহেন (উপায়) ব্যাপার — প্রায় লোকের ধারণায়, বিশেষত ছাত্রদের যাহারা পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম ভাবরূপ জানিতেছে ইহাদের নিকট উহাই বিজ্ঞানের নিশ্চিতত্বের মূল (কারণ)। এবং ছাত্ররা বিশ্বাস করে যে অঙ্কশাস্ত্র পরীক্ষার উহাই ভূমিকা, উহাই কর্ত্তব্য ও করণীয়। এবং এইরূপ ধারণাবশত, গত একশত বৎসর পূর্ব্বে, (যেহেতু) অনেক বিজ্ঞানবিদ্‌রাও ঐ ধারণা পোষণ করিতেন ও ইহারা (নিজ) পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে খুব কমই তথ্য লাভ করিয়া বিশ্বজগতকে একটি ছাঁচে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে, প্রকল্প তাহার সঠিক কি স্থান অধিকার করিয়া আছে, এবং ইহাই সবিশেষ অভিজ্ঞ চিন্তায় উদ্‌ঘাটিত হইল; এবং ধীরে ধীরে একথাও স্বীকৃত হইল যে, অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও যাহারা পরীক্ষা-অভিলাষী তাহাদের দুজনের নিকট প্রকল্প সমানই প্রয়োজনীয়— অপরিহার্য্য। তবু, তাহার পরও, এইসব গড়ন মনন সত্যই খুব শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত কি না সকলেরই এ-সন্দেহ উপস্থিত হয়, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ঐ দুশ্চিন্তা অগভীর ভাসা ভাসা জ্ঞানের জন্যই ঘটিয়াছিল। তাই, খুব সহজেই বলা যায় যে, ইত্যাকার মনোভাব আপাতদর্শীর ধ্যান-ধারণাপ্রসূত ছাড়া আর কিছু নয়।

যে কোন বিষয়কে এক নিমেষে বিশ্বাস করিয়া বসা অথবা সন্দেহ করা দুই অতি সহজ কাজ। এবং এ দুই মনোভাব কোন বিচারবুদ্ধির ধার ধারে না। অতএব, (হাইপথেসিস) প্রকল্প বিষয়ে ঝটিতি কোন নিন্দা করার পরিবর্ত্তে উহার কার্য্যকারিতাকে সম্যক বিচার করিয়া দেখা উচিত এবং এই বিচার সূত্রে একথা আমরা নিশ্চিত উপলব্ধি করিব যে উহা শুধুই যে প্রয়োজনীয় তাহা নহে, উহা বিচার বিবেচনা সিদ্ধ।

প্রকল্পের অনেক রকমভেদ আছে, কয়েকটি অনায়াসে যাচাই করা যায়; যাচাই অর্থাৎ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় উহা অর্থাৎ প্রকল্প বিশেষ ফলদায়ী সত্য। আর এক ধরনের প্রকল্প আছে, যাহা ভাবরূপ স্থির করিবার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। ইহা ছাড়া অবশিষ্ট প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র নামেই অর্থাৎ সংজ্ঞাতেই প্রকল্প, যেগুলি (বলা বাহুল্য) নাম বা রীতিজের ছদ্মবেশ!

এই শেষোক্ত প্রকল্প অঙ্কশাস্ত্র এবং বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হইয়াছে — উহারই নিকট হইতেই বিজ্ঞানে তাহার অমোঘ রুদ্রতা লাভ করিয়াছে।...

আঁরি পোয়কারে-রচিত 'সায়েন্স ও হাইপথেসিস' থেকে অনুবাদের অংশ। নিশ্চয়ই 'অঙ্কভাবনা' — কমলকুমার মজুমদার ও আনন্দমোহন ঘোষ সম্পাদিত অঙ্কবিষয়ক ত্রৈমাসিক (১৯৬৫) — পত্রিকার জন্য এই অংশ অনুবাদিত হয়, কিন্তু, মাত্র ২টি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই, প্রকাশিত হয় নি। ঐ দুই সংখ্যায় 'সায়েন্স ও হাইপথেসিস'-এর আরো দু'টি কমলকুমার-অনূদিত অংশ প্রকাশিত হয়েছিল, 'বিজ্ঞান ও প্রকল্প' শিরোনামায়। সেখানে মূল লেখকের নামের উচ্চারণ লেখা হয়েছিল 'আঁরি প্যাওয়াঁকারে।'

সুব্রত চক্রবর্তী

....

সম্পাদকীয় সংযোজন

কমলকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'অপ্রকাশিত রচনা' নামে কয়েকটি রচনার নির্বাচিত অংশের সংকলন (মোট ১০টি পৃথক অংশ) প্রকাশিত হয় এক্ষণ পত্রিকার ১৩৮৬-এর শারদীয় সংখ্যায়। এই প্রয়োজনীয় অংশটি 'অঙ্কভাবনা' পত্রিকার জন্য রচিত হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে সুব্রত চক্রবর্তী রচিত টীকায়। ** চিহ্নিত অংশটি মূল লেখার অংশ।*

এখানে এই পত্রিকার মারফৎ আমি সকলকে একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি যে, আমার স্বামী স্বর্গীয় কমলকুমার মজুমদারের — ছোটগল্প, প্রবন্ধ, আঁকা ছবি, উডকাট এবং বিলাতি কিউরিওগুলি যাঁদের কাছে আছে — তাঁরা যেন সেগুলি অবশ্যই কমলকুমার মজুমদারের নামে যে ট্রাস্ট বডি সংগঠিত হয়েছে — সেই ট্রাস্টির কাছে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে দিয়ে দেন।

এইসব জিনিসগুলি সানন্দে ফিরিয়ে দেওয়াই হবে উদারতা এবং মর্যাদাসম্পন্ন কাজ। কেন না এই জিনিসগুলি ট্রাস্টি ছাড়া অন্য কারোরই কোন কাজে লাগানো অথবা বিক্রী করা আইনানুগ হবে না।

দয়াময়ী মজুমদার

প্রাসঙ্গিক তথ্য

চিত্রাবলী

❖ কমলকুমারের আঁকা ছবিগুলি আকারে কোনোটাই খুব বড় নয়। অধিকাংশই খুব ছোট। যে কয়েকটি ছবি অপেক্ষাকৃত বড়, সেগুলিও খুব বৃহৎ নয়। বলা যায় তাঁর আঁকা অধিকাংশ ছবিই Miniature.

❖ এখানে অধিকাংশ ছবিই তাদের সম-আকারে মুদ্রিত হল। অধিকসংখ্যক ছবির স্থান সংকুলানের জন্য কয়েকটির সম-আকার রক্ষা সম্ভব হয়নি। কয়েকটি ছবিকে আবার ঈষৎ পরিবর্ধিত করা হয়েছে।

❖ কমলকুমার মূলত পেনসিল কালি ও কলম এবং জলরঙে ছবি আঁকতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর ব্যবহৃত জলরঙ এবং ছবি আঁকবার কাগজ কোনোদিনই খুব উচ্চমানের ছিল না। যার জন্য তাঁর আঁকা অধিকাংশ ছবিই বর্তমানে কিছুটা ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে এবং জীর্ণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্বাস, যাঁরা এই ছবিগুলি দেখবেন, অন্তর্নিহিত প্রসাদগুণ অনুধাবনে তাঁদের কোনো অসুবিধা হবে না।

❖ কোনো ছবি ছাপার সময় চারপাশে যে সাদা বা শূন্যতা ছেড়ে রাখা উচিত তা আমাদের মূলত ব্যয়সংকোচনের জন্য সম্ভব হয়নি। একটি পৃষ্ঠার পরিসরে আমরা যতগুলি সম্ভব ছবিকে, অধিকাংশই তাদের পূর্ণ পরিসরে, মুদ্রিত করবার চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও কয়েকটি ছবিকে আমাদের বাদ দিতেই হল।

❖ তাঁর জীবৎকালে ছবি এঁকে বিক্রির চেষ্টা তিনি বিশেষ করতেন না। স্নেহভাজনদের তিনি আঁকা ছবি উপহার দিতে ভালবাসতেন। হাতের সামনে যে কাগজ পেতেন কমলকুমার তাই ব্যবহার করতেন। এমনকী লেখা কাগজের উপর, ডায়েরির পৃষ্ঠায়, যে কোনো জায়গাতেই তিনি ছবি আঁকতেন। তার কিছু নিদর্শন এই সংকলনেও ছড়িয়ে আছে।

❖ এই সংকলনটি দেখবার পর আমাদের আশা চিত্রশিল্পের নিরিখে কমলকুমারের যোগ্যতার পুনর্বিচার হবে। সাহিত্য এবং চিত্রশিল্প, এই দুই ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার তুল্যমূল্য বিচারে, এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

❖ কমলকুমার মজুমদারের ভাষাশিল্পে অন্যতম প্রধান গুণ যে চিত্রধর্মীতা সেই চিত্রধর্মীতার সূত্র খুঁজতে গিয়ে আমরা অধিকাংশ সময়ই পৌঁছে যাই অতীত বাংলার লোকশিল্পের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন Image-এ এবং 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'র সারবস্তুতে। এই ছবিগুলিতেও সেই রকম গুণাগুণ লক্ষ করা যায়। এ ছাড়াও বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিভিন্ন মূর্তি (Icon) এবং বিবিধ বিষয়বস্তু (Motif) তাঁর ছবিতে বারবার ফিরে এসেছে।

❖ জীবনের প্রথম দিকে কমলকুমার কিছু নগ্নিকাও এঁকেছিলেন। এগুলো হয়তো পরবর্তী জীবনে, সাহিত্য ও শিল্পে, মানবজীবনের বিভিন্ন রূপকে আয়তনে বাঁধবার তাঁর যে প্রচেষ্টা, তার অনুশীলন মাত্র।

বিবিধ রচনা

❖ বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা — ১) *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* - জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ২) *বঙ্গীয় শব্দকোষ* - হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩) *কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি* - সম্পা. সুব্রত রুদ্র, ৪) *যখন ছাপাখানা এল* - শ্রীপান্থ, ৫) *উত্তরাধিকার, কালি ও কলম* ও *শব্দপত্র*, ৬) এ ছাড়া কমলকুমার প্রণীত বিবিধ গ্রন্থ।

❖ লেখাগুলি যাঁরা আমাদের সংগ্রহ করে দিয়েছেন বা যেখান থেকে তা সংগৃহীত হয়েছে তার বিস্তৃত তালিকা — কলকাতার গঙ্গা, পরিপ্রেক্ষিত, নির্বাচিত বই, বাক্‌পটু চিত্রশিল্পী — অদ্রীশ বিশ্বাস। ভারতে মুদ্রণ শিল্প, ভারতের সিংহ, সিংহ শিকারে বিপদ, অবনীন্দ্রনাথের শেষের কাজ, পাঁচমুড়ার মাটি, বাঙ্গালার টেরাকোটা — সৌম্যেন পাল। ছাপাখানা আমাদের বাস্তবতা এবং তিনটি চিত্রনাট্য - শ্রীপান্থ এবং ইন্দ্রনাথ মজুমদার। লেখা বিষয়ক, স্বাতি নক্ষত্রে জল (গল্প), ক্যালকাটা চিলড্রেন্স অপেরা অভিনীত নাটকের টিকিট — মালা চক্রবর্তী। পটকথা — গৌতম বসু। ইদানীন্তন শিক্ষাপ্রসঙ্গ — যাদবপুর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। নাটকের প্রচারপত্র — শুভ মুখোপাধ্যায়। হরবোলার টিকিট এবং প্রচারপত্র — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'অঙ্ক ভাবনা' — সৌম্যেন পাল ও লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি।

❖ কয়েকটি রচনা, যা এখানে মুদ্রিত হয়েছে তা আমরা নিতান্ত জীর্ণ, মলিন অবস্থায় পেয়েছি। আমরা যথাসম্ভব, কমলকুমার ব্যবহৃত শব্দ ও যতিচিহ্ন হুবহু অনুসরণ করেছি। কয়েকটি জায়গায় বোঝা না গেলে '?' চিহ্ন বন্ধনীর মধ্যে রেখে সেগুলিকে নির্দেশিত করেছি।

❖ প্রত্যেকটি রচনার শেষে তার প্রথম প্রকাশ, সম্ভব হলে পুনর্মুদ্রণ সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

❖ কমলকুমার ব্যবহৃত বহু বর্তমানে অপ্রচলিত শব্দ, আকাঁড়া শব্দ-এর অর্থ যথাসম্ভব প্রতিটি রচনার শেষে সংযোজিত করা হয়েছে।

❖ কয়েকটি রচনায় ব্যবহৃত যতিচিহ্ন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। জীর্ণতার জন্য সঠিক যতিচিহ্নটিকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা বহু বিবেচনা করে সঠিক যতিচিহ্নটিকে নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছি।

অঙ্ক ভাবনা

❖ 'অঙ্ক ভাবনা' পত্রিকার মাপ ছিল ২৪.৫X১৮.৫ সেমি। প্রচ্ছদ কালো রঙে, হলদেটে একটু মোটা কাগজে মুদ্রিত।

❖ 'অঙ্ক ভাবনা'য় ব্যবহৃত রেখাচিত্রগুলিকে (diagram) কখনো কখনো কিছুটা ছোট আকারে ছাপা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ছোট মাপের প্রতিলিপির মান সর্বত্র সমানুপাতিক নয়। রেখাচিত্রগুলিকে এমনভাবে হ্রাস (Reduce) করা হয়েছে যাতে রেখাচিত্রের ভেতরের লেখাগুলি পরিষ্কার বোঝা যায়।

❖ 'অঙ্ক ভাবনা'য় ব্যবহৃত অধিকাংশ ছবির ক্ষেত্রেই হুবহু প্রতিলিপি (Facsimile) ব্যবহার করা হয়েছে। মূল 'অঙ্ক ভাবনা'র পাতা বিবর্ণ হয়ে আসবার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিলিপি কিছুটা অস্পষ্ট এসেছে। তাই সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমরা নতুন করে রেখাচিত্রগুলিকে এঁকে (Recreate) দিতে বাধ্য হয়েছি।

- ❖ 'অঙ্ক ভাবনা'র লেখাগুলির জায়গায় জায়গায় রেখাচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। রেখাচিত্রগুলি মূল পত্রিকার লেখার সঙ্গে যেরকম ভাবে ছিল, যে যে জায়গায় ছিল, আমরা ঠিক তাই রেখেছি। কেবলমাত্র কয়েকটি জায়গায় হুবহু তা করা যায়নি। তবে এই পরিবর্তন এমনভাবে করা হয়েছে যাতে পাঠকের কোনো অসুবিধা না হয়।
- ❖ এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'অঙ্ক ভাবনা' পত্রিকার প্রতিটি রচনাই মূল পত্রিকার হুবহু অনুলিপি, এমনকী মুদ্রণপ্রমাদ বা যতিচিহ্ন কোনোভাবেই সম্পাদনা করা হয়নি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, রচনাটির শেষে আমরা টীকা সংযোজন করেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাঠকের পক্ষে সঠিক পাঠোদ্ধার অসম্ভব হবে না।
- ❖ একই শব্দের দুরকম বানান, অধিকাংশ প্রাচীন রীতি অনুযায়ী, দু-একবার হঠাৎ বর্তমানের আধুনিক বানান ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো কখনো তা একটি নির্দিষ্ট রচনাতেই ঘটেছে। আমরা তা হুবহু বজায় রাখলাম।
- ❖ মুদ্রণপ্রমাদের ক্ষেত্রে ভুল বানানটিকেই রেখে তার পাশে ব্র্যাকেটে শুদ্ধ বানানটিকে নির্দেশিত করা হয়েছে। এই ব্র্যাকেটবদ্ধ সঠিক বানান নির্দেশ করবার সময় আমরা প্রাচীন বানান (যে ক্ষেত্রে বর্তমান এবং প্রাচীন বানানে প্রভেদ আছে) নির্দেশ করেছি। যে ক্ষেত্রে বর্তমান এবং প্রাচীন বানানে পার্থক্য নেই সে ক্ষেত্রে সঠিক বানানটিকে নির্দেশ করা হয়েছে।
- ❖ কয়েকটি জায়গায় মনে হয়েছে (আমাদের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশানুসারে) কিছু অনিবার্য শব্দ বা শব্দসম্ভার বাদ পড়ে গেছে। সেক্ষেত্রে < > চিহ্ন দিয়ে রচনাটির শেষে 'সম্পাদকীয় সংযোজন'-এ সেই শব্দটির বা শব্দগুচ্ছের (কখনো কখনো প্রস্তাবিত) হদিস আমরা দিয়েছি।
- ❖ প্রত্যেকটি রচনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য বা টীকা আমরা সেই রচনাটির শেষে সংযোজন করেছি।
- ❖ কয়েকটি বিষয়ানুগ Technical Term-এর যথাসাধ্য সহজবোধ্য ব্যাখ্যা (আমাদের বিশেষজ্ঞ কমিটির নির্দেশানুসারে) দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক পাঠকই রচনাগুলির রসগ্রহণ এবং মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ হন।
- ❖ 'অঙ্ক ভাবনা' পত্রিকার অধিকাংশ জায়গায় একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সমাসবদ্ধ পদ এবং সাধারণত অবিচ্ছিন্নভাবে লেখা হয় এরকম একটি শব্দকে ভেঙে পৃথকভাবে লেখবার প্রবণতা।
- ❖ বহু জায়গায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যতিচিহ্ন, যা অবশ্যম্ভাবী তা পরিহার করা হয়েছে। এরকম দু-একটি ক্ষেত্রে যেখানে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে সেখানে আমরা প্রয়োজনীয় যতিচিহ্নের সংযোজন করলাম।
- ❖ Bold, Underline করা শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, Italics হুবহু মূল পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ছাপা হল। কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।
- ❖ 'অঙ্ক ভাবনা'র দুটি খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ক্রমানুসারে রয়েছে। অর্থাৎ প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৬-এ শেষ। দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা শুরু হবার কথা ৭৭ থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম রচনা 'বিজ্ঞান ও প্রকল্প'-এ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৭ এর বদলে আবার ১ ছাপা হয়েছে। এই ভুল চলেছে প্রথম ৮ পৃষ্ঠা অবধি। অর্থাৎ ৭৭-৮৪, এর বদলে ১-৮ ছাপা হয়েছে। এই ভুল সংশোধন করা হয়েছে মুদ্রিত পৃষ্ঠাসংখ্যার উপর কাগজ সেঁটে। অর্থাৎ ১-এর উপর ৭৭, ২-এর উপর ৭৮....... ৮-এর উপর ৮৪ এইভাবে।
- ❖ প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করা যায়। সম্পাদকীয় শুরু হয়েছে বাঁ দিকের পৃষ্ঠা থেকে এবং এই পৃষ্ঠাটিকে ১নং পৃষ্ঠা ধরা হয়েছে। ডান দিকের পৃষ্ঠায় নম্বর বসেছে ২। পরবর্তী পৃষ্ঠাটিকে (বাঁ দিকের) গণনায় (Page counting) আনা হয়নি। এবার ডানদিকের পৃষ্ঠায় ৩নং নম্বর দিয়ে প্রচলিত পৃষ্ঠাসংখ্যা মুদ্রণের রীতিতে আনা হয়েছে।
- ❖ 'অঙ্ক ভাবনা' পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড-এর প্রথম চারপাতা পৃষ্ঠাসংখ্যার গণনাক্রমে ধরা হয়নি। এখানে কোনো পৃষ্ঠাসংখ্যা মুদ্রিত নেই।
- ❖ 'অঙ্ক ভাবনা' প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছিল চারটি — ১) প্রচ্ছদের পিছনে - Dunlop (পূর্ণপৃষ্ঠা), ২) সম্পাদকীয়'র পিছনে United Commercial Bank (অর্ধপৃষ্ঠা), ৩) 3rd Inside Cover এ - Bata (পূর্ণপৃষ্ঠা), ৪) Back Cover - Calcutta Fan (পূর্ণপৃষ্ঠা)।
- ❖ দ্বিতীয় সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছিল তিনটি — ১) প্রচ্ছদের পিছনে — Tata Scob (পূর্ণপৃষ্ঠা), ২) 3rd Inside Cover - National Rubber Manufacturers Ltd. (পূর্ণপৃষ্ঠা), ২) Back Cover - Dunlop (পূর্ণপৃষ্ঠা)।
- ❖ 'অঙ্ক ভাবনা' পত্রিকার প্রকাশিত দুটি সংখ্যার দাম ছিল ১টাকা ৭৫ পয়সা করে।

একটি বিশেষ আবেদন

পাঠকদের কারো কাছে যদি কমলকুমার মজুমদার-এর এমন কোনো লেখা থেকে থাকে যা প্রকাশিত অথচ অগ্রন্থিত এবং বৃহত্তর পাঠকসমাজের দৃষ্টিগোচর নয়, সেরকম কোনো লেখার সন্ধান যদি কেউ আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে জানান তবে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

আমরা স্থিরনিশ্চিত কয়েকটি পত্রিকা যেমন — দর্পণ, ঘরোয়া, অনন্যা এবং আরো এই ধরনের কয়েকটি, যেগুলি হয়তো বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য তাতে কমলকুমারের কিছু লেখা ছড়িয়ে আছে। কারো কাছে যদি এই পত্রিকাগুলির কোনো সন্ধান থেকে থাকে আমাদের জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। এছাড়াও কোনো পাণ্ডুলিপি অথবা কোনো দুষ্প্রাপ্য এবং এযাবৎ পাঠকসমাজের দৃষ্টিগোচরে আসেনি এমন রচনার সন্ধান কেউ যদি আমাদের দেন তবে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় সেই রচনাগুলিকে প্রকাশ করে আমরা তা বৃহত্তর পাঠকসমাজের দৃষ্টিগোচরে আনতে পারি। ধন্যবাদ —

৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৬৮
দূরভাষ : ২৪৭৩ ৩৬০০
চলমান : ৯৪৩৩০৮৭০২২

বিভাব সম্পাদক
রাহুল সেন

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

(একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

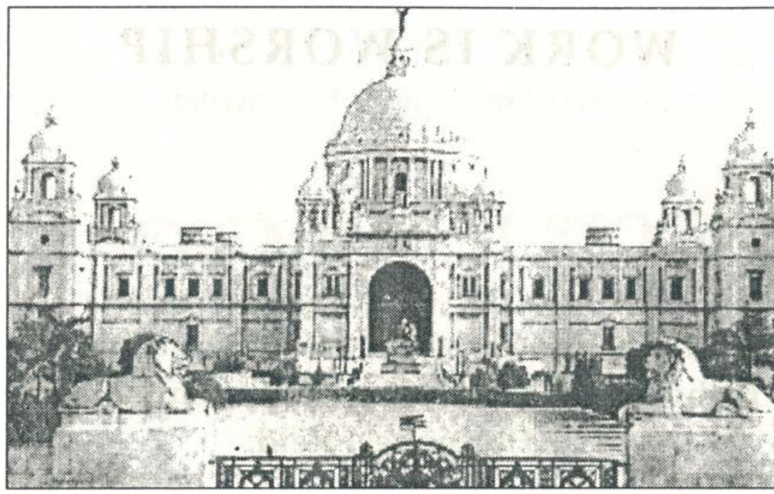

ক) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাঙ্গণে আমাদের গর্ব ও গৌরবভিত্তিক ধ্বনি ও আলোক প্রদর্শনী — কলকাতার কাহিনী

প্রদর্শনীর সময় : অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি : সন্ধ্যা ৬.১৫ থেকে ৭ টা (বাংলা)। ৭.১৫ থেকে ৮টা (ইংরেজি)। মার্চ থেকে জুন : সন্ধ্যা ৬-৪৫ থেকে ৭-৩০টা (বাংলা)। ৭-৪৫ থেকে ৮-৩০টা (ইংরেজি)। **টিকিট** : ১০টাঃ ও ২০ টাঃ ছাত্রদের জন্য ১০টাঃ। তিন বছরের উর্ধ্বে শিশুদের পুরো টিকিট লাগবে। টিকিট কাউন্টার খোলে : দুপুর ১২টা/ ১২-৩০টায়। ব্লক বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ : এডুকেশন ইউনিট-ইন-চার্জ।

খ) প্রদর্শনী চলছে : দরবার হলে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ভারত — তৈলচিত্র। **শিল্পী** : টিলি কেটেল, উইলিয়াম ড্যানিয়েল, টমাস ড্যানিয়েল, উইলিয়াম হজেস, টমাস হিকি, জোহান জোফানি।

গ) স্থায়ী প্রদর্শনী ❖ জাতীয় স্মৃতিকক্ষে দেশবরেণ্য নেতার ছবি ❖ **কলকাতা গ্যালারিতে** কলকাতা ৩০০ বছর সংক্রান্ত ছবি ও সংগ্রহ।

ঘ) সাম্প্রতিক প্রকাশনা :

১. চার্লস ডয়লি-র ক্যালকাটা — অ্যালবাম, এক ও দুই/৪০ টাকা প্রতিটি। **২.** ইন্ডিয়া ইন দি আইজ অফ ড্যানিয়েলস/৪০টাকা। **৩.** ইন্ডিয়া অ্যাজ সিন বাই সিম্পসন/৪০টাকা। **৪.** সিলেক্ট ভিউজ অফ ইন্ডিয়া/৪০টাকা। **৫.** পিকচার পোস্টকার্ড সেট-ডি/১০টাকা। **৬.** পিকচার ফোলিও নম্বর টু/১টাকা। **৭.** পিকচার ফোলিও নম্বর থ্রি/২টাকা। **৮.** সেরামিক টাইলস (ভিউজ অফ সেন্ট আন্দ্রেস চার্চ)/৩২ টাকা। **৯.** চক্রবর্তী, হীরেন: অ্যান আর্বান হিস্টোরিক্যাল পারসপেকটিভ ফর দ্য ক্যালকাটা টারসেন্টেনারি/৩৫টাকা। **১০.** গ্রেগ, চার্লস: ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিংস ইন দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল/১৫০টাকা। **১১.** গোপা চৌধুরী অ্যান্ড ভাস্কর চন্দ্র : এ কমপ্রিহেনসিভ ক্যাটালগ অফ ওয়াটার কালারস, পেন্সিল স্কেচেস অ্যাণ্ড পেন অ্যান্ড ইঙ্ক ড্রয়িংস ইন দ্য কালেকশনস অফ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল/১৫টাকা। **১২.** উর্দু গাইড বুক/৫টাকা। ১৩. গাঙ্গুলি, কে কে : মর্ডান মাস্টারস/৩৫টাকা। **১৪.** ক্যাটালগ অফ বাস্টস অ্যান্ড স্টাচুয়ারি/ ২.৫০টাকা। **১৫.** ক্যালকাটা গ্যালারি — ইন্ডিয়াস ফার্স্ট সিটি গ্যালারি/৫০ টাকা। **১৬.** কনটেমপোরারি আর্ট অফ বেঙ্গল/৩৭৫টাকা। **১৭.** ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ২০০০ ন্যাচারাল হিস্ট্রি পেন্টিং অ্যালবাম সিরিজ এক থেকে তিন/৯০টাকা প্রতিটি। **১৮.** হিলস্কেপ অফ ইন্ডিয়া/৭০টাকা। **১৯.** ভিক্টোরিয়া অ্যাট নাইট/৫টাকা। **২০.** ন্যাশনাল লিডারস পোর্ট্রেট গ্যালারি/১.২৫ টাকা।

১, কুইন্স ওয়ে, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, ফোন : ২২২৩ ১৮৯০-৯১/৫১৪২, ফ্যাক্স : ২২২৩ ৫১৪২

ই-মেল : victomem@cal2vsnl.net.in ❖ **ওয়েবসাইট** : victoria memorial-cal.org.

WORK IS WORSHIP

More than Fifty Two Years of dedicated service in Pathological Biochemical and Immunological (Hormones) field.

*

***

*****

****

Calcutta Clinical Laboratory

36, Ritchie Road, Kolkata-700 019

Phone - 2475 1979

With best compliments from

DEY'S MEDICAL STORES
MFG. (U.P.) LIMITED

REGD. OFFICE
2/B, Beli Road, Allahabad-211002

FACTORY
Karchana, Allahabad - 212301

ADMN.OFFICE
17, Collin Lane, Kolkata-700 016

(MANUFACTURER OF
PHARMACEUTICAL MEDICINE
KEO-KARPIN HAIR OIL & HAIR VITALIZER)

Space donated by

A

Well

Wisher

wbidc

DESTINATION WEST BENGAL

শিল্পোদ্যোগের সব সমস্যার মুশকিল আসান

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের অর্থসাহায্য

✓ মাঝারি আকারের শিল্পগুলির জন্য প্রতিযোগিতামূলক হারে ঋণদানের ব্যবস্থা

✓ বর্তমান লাভজনক সংস্থাগুলির জন্য যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা

✓ বিল ডিসকাউন্টিং-এর সুবিধা

✓ মেয়াদী ঋণের সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ঋণের সাহায্য

✓ নির্বাচিত প্রকল্পগুলিতে ইক্যুইটি অংশগ্রহণের ব্যবস্থা

✓ অ্যাডমিটেড ইন্সেন্টিভ ক্লেমগুলির ক্ষেত্রে ব্রিজ লোনের ব্যবস্থা

শিল্পবন্ধু : লগ্নী বিকাশের কেন্দ্র

✓ সেক্রেটারিয়েট ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স এবং করেন ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশনাল বোর্ডের অনুমোদন

✓ ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা পঞ্জীকরণ

✓ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র

✓ বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত সব রকমের ছাড়পত্র

✓ জমির চিহ্নিতকরণ, বন্টন, মিউটেশন / পরিবর্তনের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুবিধা

✓ লগ্নীকৃত প্রকল্পগুলির গঠনে উপদেশদান এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম কর্তৃক উদ্ভাবিত দুশোটিরও বেশী প্রকল্পের ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান

আমাদের লক্ষ্য। আপনার সাফল্য।

WBIDC

West Bengal Industrial Development Corporation

Making things happen

Ph : (033) 2210 5361-65 Fax : (033) 2248 3737 E-mail : wbidc@vsnl.com Website : www.wbidc.com

1.	Poetry & Truth (1970) – Abu Sayeed Ayyub	Rs. 10.00
2.	Shakespeare : A Book of Homage (1965) – Edited Prof. S. C. Sengupta	Rs. 10.00
3.	The Idea of Revenge in Shakespeare (1969) – Dr. Jagannath Chakraborty	Rs. 20.00
4.	Essays and Studies Vol. VI (1987) – Edited Debabrata Mukherjee	Rs. 25.00
5.	Essays and Studies Vol. VI (1987) – Edited Jasodhara Bagchi	Rs. 50.00
6.	রবীন্দ্রকাব্যে অলংকার (১৯৭১) — ডঃ জটাধারী মালাকার	Rs. 20.00
7.	ভার্জিল : ঈনীড (১৯৭২) — সম্পাঃ হৃষীকেশ বসু ও রবের আতোয়ান	Rs. 20.00
8.	রোমান্টিক ইশ্‌তেহার — ডঃ নারায়ণ মুখার্জী	Rs. 20.00
9.	বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (১৯৮৫-৮৬) — সম্পাঃ পিনাকেশ সরকার	Rs. 20.00
10.	বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (১৯৮৮-৮৯) — সম্পাঃ সত্যবতী গিরি	Rs. 20.00

Books Are Available at the Jadavpur University Press and Granthalok,
National Council of Education, Calcutta - 700 032

Terms & Conditions

1. All correspondence should be addressed to The Registrar, Jadavpur University, Calcutta -700 032, India.
2. Prices in Rupees do not include cost of postage, freight, packing etc. which are to be borne by the customer. Books are sent to countries outside India by sea mail, postage free.
3. All cheques, drafts and money orders are payable to Jadavpur University, Calcutta.
4. Discount of 20% is allowed to booksellers only. Discounts of 40% on the price (excluding V.P. and other charges) of each book are allowed provided the booksellers, agreeable to act as Agents, but not less than 10 copies of any publication at a time. Over-riding discount of 5% over and above 40% may be given to the Selling Agents / Distributors willing to sell more than 500 copies of any publication within a limited period of time.
5. All prices are subject to change without notice due to reasons beyond our control.

JADAVPUR UNIVERSITY
CALCUTTA - 700 032 • INDIA

Officer's Choice
Aqua Pura

Your Time
Your Choice

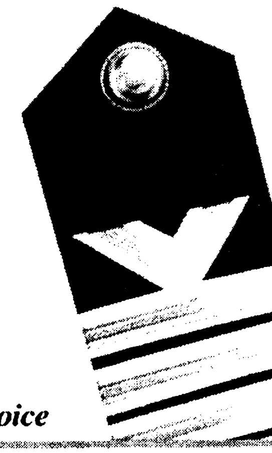

...that leaves you with no choice

A brand owned by B.D.A Limited

Space donated by

A
Well
Wisher

Space donated by

DENOVO PHARMACEUTICALS (P) LTD.

1-20 Super Market Complex
Bangur Avenue
Kolkata - 700055
Ph. : 2574-9428
Fax : 2774-2628

Space donated by

A
Well
Wisher

বৈতালিক

বাদল সরকারের

❖ **বল্লভপুরের রূপকথা** ❖

২৫০ রজনীর পথে

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

❖ **দুর্বুদ্ধি** ❖

(রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের

আমন্ত্রণে শো — উচ্চপ্রশংসিত)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

❖ **ঘন কালো মেঘ** ❖

(বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে

আমন্ত্রিত শো — উচ্চপ্রশংসিত)

নির্দেশনা — প্রদীপ দাশগুপ্ত

যোগাযোগ

৬/১/এ, রাধানাথ মল্লিক লেন,

কলকাতা - ৭০০ ০১২

দূরভাষ : ২২৪১-৭৪৮১

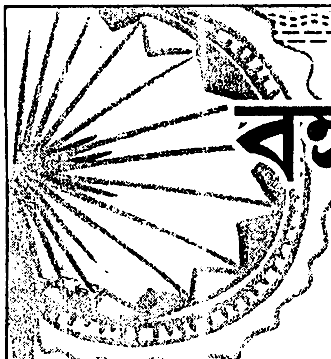

বঙ্গবাসীর

স্পর্শে স্পন্দিত।

প্রতিনিয়ত।

ইউনাইটেড কার লোন • ইউনাইটেড হাউজিং অ্যাডভান্টেজ স্কীম • ইউনাইটেড পার্সোনাল লোন • ইউনাইটেড পার্সোনাল লোন ফর পেনশনারস্ • ইউনাইটেড কনজিউমার লোন • ইউনাইটেড ট্রেড লোন • ইউনাইটেড এডুকেশন লোন • ইউনাইটেড মর্টগেজ লোন • ইউনাইটেড গ্রাম্যশ্রী যোজনা • ইউনাইটেড ক্যাশ রেন্টাল স্কীম

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

পরিষেবায় অনন্য

ওয়েবসাইট : www.unitedbankofindia.com

বিদ্যুৎ চুরি ঃ জনগণের অবগতির জন্য

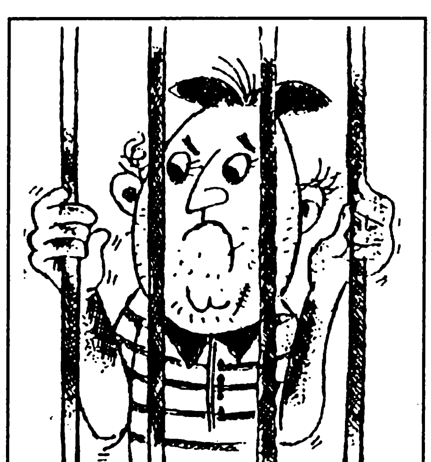

বিদ্যুৎ চোরেরা সাবধান

- বিদ্যুৎ চুরির সাজা এখন আরও কঠোর
- বিদ্যুৎ চোরেদের জন্য গঠিত হয়েছে বিশেষ আদালত এবং ইলেকট্রিসিটি প্রোটেকশন ফোর্স
- বিদ্যুৎ চুরি জামিন-অযোগ্য অপরাধ
- বিদ্যুৎ চুরির শাস্তি ৫ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

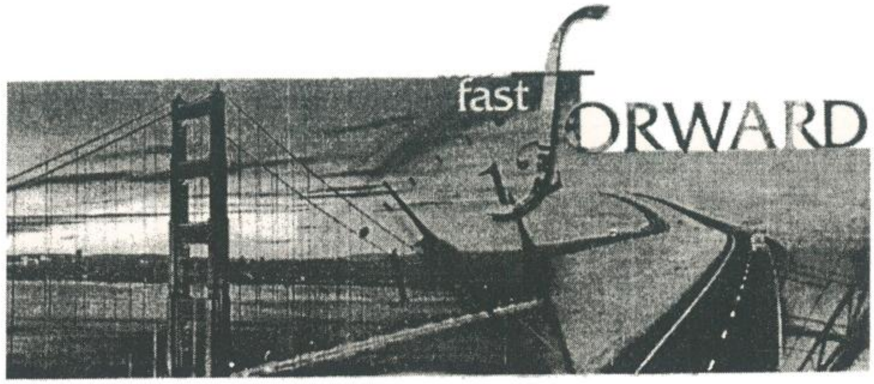

SREI, committed to the growth of the country's core sector has gone far beyond providing finance and refinance for construction equipment and spare parts.

Today, SREI provides valuable inputs as financiers and consultants across infrastructure projects and roads, power and ports in particular.

Fuels the growth in the Indian transporation sector through attractive financial schemes for the commercial vehicle segment and automobiles.

Serves the international traveller through convenient foreign exchange transactions.

Creates a better environment by funding equipment and projects that are environmentfriendly.

Ensures complete protection by providing an entire range of insurance services.

Provides a range of investment opportunities through Government bonds, securities, fixed deposits and mutual funds.

Over the years SREI has built considerable expertise in the management of assets and financial services.

With its widespread network across the country, SREI is ready to meet growing customer needs with tailor-made solutions.

SREI is totally prepared and committed to stand by you. To meet your diverse requirements as a complete finance solutions company.

Financially yours,

SREI INTERNATIONAL™ FINANCE LIMITED

EQUITY PARTNERS IFC USA • DEG GERMANY • FMO HOLLAND

SREI Equik **SREI** Requik **SREI** Parts **SREI** Core **SREI** Auto **SREI** Monitor **SREI** **SREI** Forex **SREI** Life **SREI** General **SREI** Money **SREI**Treasure **SREI** Capital

Atmaram House, I Tolstoy Marg, New Delhi 110001 • Phone 23322274/90 • Fax 23731542
Vishwakarma, 86C Topsia Road South, Kolkata -700046 • Phone 22850112-15/0124-27 • Fax 22857542

নির্মাণে

অনন্য

ম্যাকিনটস বার্ণ লিমিটেড

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান

ডি ১/১ গিলেন্ডার হাউস, ৮, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা - ১
২২২০-৭৮০৫, ২২১০-২১৭৫

ডিডি ১৮/৮, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা - ৬৪
২৩৫৮-১৪১৮, ২৩৫৮-১৪২০, ২৩৩৭-১৬৫৪

সংকীর্ণতা নয়, উদার মানবিক ঐতিহ্যকে পাথেয় করেই আমরা এসেছি নতুন সহস্রাব্দে

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বসু, মেঘনাদ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, আলাউদ্দিন, উদয়শঙ্কর, নজরুল ইসলাম, লালন ফকির, নিবেদিতা, রোকেয়া, ঠাকুর পঞ্চানন, আব্বাসউদ্দিন, জীবনানন্দ, রামকিংকর, সত্যজিৎ, ঋত্বিক — এঁদের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার আমরাই বহন করে চলেছি। রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, প্রগতিশীল চেতনার উন্মেষসাধন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে আন্তরিক প্রয়াস, মাতৃভাষার উপযুক্ত মর্যাদাদান, উৎকর্ষের সন্ধানে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা— এই উদ্যোগগুলি এক নতুন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। এই বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা। রাজ্যের লেখক শিল্পী গায়ক অভিনেতা যাদুকরেরা সারা বিশ্বে আমন্ত্রণ পান তাঁদের শিল্পকলা প্রদর্শনের জন্য। কলকাতার বইমেলা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। রবীন্দ্রসদন, নন্দন, মধুসূদন মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ ও জেলায় জেলায় নানা মঞ্চ এবং বাংলা আকাডেমি, নাট্য আকাডেমি, সঙ্গীত আকাডেমি, চারুকলা পর্ষদ সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অপসংস্কৃতি রোধে ও গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ও প্রসারে আমাদের প্রয়াস সর্বজনবিদিত। নতুন শতকে শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের আরও উন্নতিকল্পে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিক্ষা ও সংস্কৃতি- এই বাংলার হৃদ্‌স্পন্দন
তথ্য ও সংস্কৃতি

আই.সি.এ ১২৬/২০০২

আমরা আর গরীব নই গো

"পঁচিশ বছর আগের কথা। শিবুর বাপ মরল। আমি শিবুর হাত ধরে গাছের তলায়। ঠাঁই নেই। চলে গেল একফালি ধানিজমিও, এভাবে চলল ক'বছর। তারপর এলো পঞ্চায়েতের লোকেরা, বলল, সরকার ধানিজমি দিচ্ছে। আমার শিবু তখন তেরো-চোদ্দয় পা দিয়েছে। ধানিজমি ফিরে পেয়ে মা বেটায় খুশিতে ডগমগ। শিবু লোন পেলো। কাজ পেলো। শিবুর বে হল। আমার নাতি এখন ইস্কুল যায়। এ বি সি ডি পড়ে। আমরা আর গরীব নই গো। সরকারের লোকেরা আমাদের বড্ড উপকার করেছে। ...আহা, শিবুর বাপ যদি আজ বেঁচে থাকতো...।"

পঞ্চমী দাসী
রাজচন্দ্রপুর, হাওড়া

মানুষের স্বার্থে,
মানুষের সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আই.সি.এ ১২৬/২০০২

তমসো মা জ্যোতির্গময়

একটি বোতাম টিপতেই আলোর ঝলক। দূর হয়ে যায় ঘরের অন্ধকার। মনেরও। কিন্তু কতটা সফল হ'ত এই প্রয়াস যদি না থাকত বিদ্যুতের যাদুস্পর্শ?

দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ছে, আর তার সঙ্গে বেড়ে চলেছে বিদ্যুতের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা —- ঘরে বাইরে। বসত বাড়ীতে, শিল্পোদ্যোগে, ব্যবসা-বাণিজ্যে। *এই বিদ্যুৎ-চাহিদার ৬৯ শতাংশ মেটাচ্ছে তাপবিদ্যুৎ — কয়লাই যার মূল জ্বালানী।*

এই কয়লার যোগান দিচ্ছে কোল ইণ্ডিয়া এবং তার ৫.১ লক্ষ কর্মী। আটটি রাজ্যের দূরদূরান্তরে, দুর্গম পরিবেশে নিরলস পরিশ্রম করে এরা কয়লার সরবরাহ অব্যাহত রাখছে। ঘরে-বাইরে আলোর রোশনাই-এর সমৃদ্ধির প্রতিজ্ঞায় দৃপ্ত কোল ইণ্ডিয়া।

আলোয় আলোকময় ভবিষ্যতের সন্ধানী - কোল ইণ্ডিয়া।

কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
১০ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১

With Best Compliments From

J.K. JAZODIA

❖

ANZEN EXPORT

55/3D, BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, GROUND FLOOR,
KOLKATA-700 019
TEL : 2746 449, 2475 0086/0261, FAX : 91-33- 2475 1710/0086
Cable : Anznexpo
E-mail : jajodia.anzen@axcess.net.in

❖

BHARAT SALT SUPPLY CO.

4, Jagmohan Mullick Lane, Kolkata-700 007
Tel : 238 2249/1280/0193, 231 2473 Gram : Lakhisalt

❖

SHUBHAM PHARMACHEM PVT. LTD.

304, Maroo Bhawan, 55/7, Babugenu Road, Princess Street,
Mumbai-400 002
Tel : 2209 3568, 2206 1803 2200 5621, Fax : 91-22-2208 8872
E-mail : Jajodia.shubham@axcess.net.in

আমাদের কথা

বই বিক্রি এবং পড়ার অভ্যাস বাড়াতে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের কাজকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় —

প্রকাশনা

সব স্তরের সব বয়সের পাঠকদের জন্য আমরা শিশুসাহিত্য, নবসাক্ষরদের সাক্ষরোত্তর পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ পড়ার বিষয় প্রকাশ করি। আমরা যে ভাষাগুলিতে বই প্রকাশ করি, সেগুলি হল : অসমীয়া, বাংলা, গুজরাতি, কন্নড়, মলয়ালম, মারাঠি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, তামিল, তেলুগু ও উর্দু। কোঙ্কনি, নেপালি, মণিপুরী এবং সিন্ধী ভাষাতেও বই প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে। আও, নাগা, ভিলি, গোণ্ডি, খাসি, মিসিং, মিজো, গারো ও সাঁওতালী ভাষাতেও ছোটদের বই অনুবাদ করা হচ্ছে।

বই এবং বই পড়ায় উৎসাহদান

সারা দেশে বইমেলা এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে নিয়মিতভাবে সারা দেশে প্রত্যেক এক বছর অন্তর আমরা দেশের সব থেকে বড় পেশাদার বইমেলা এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বৃহত্তম **নয়াদিল্লি বিশ্ব বইমেলা** আয়োজন করি। অংশ নেয় দেশ-বিদেশের এক হাজারেরও বেশি প্রকাশক।

প্রতিবছর আমাদের উদ্যোগে সারা দেশে জাতীয় পুস্তক সপ্তাহ পালিত হয়। আমরা বই উপহার কুপন-প্রকল্প চালু করেছি। পুস্তক বিক্রেতারা যে কোনও ভাষায় যে-কোন ভারতীয় বা বিদেশী বইয়ের জন্য এই কুপন বিক্রি কিংবা বিনিময় করছেন।

বিদেশে ভারতীয় বইয়ের প্রসার

বিদেশে ভারতীয় বইয়ের প্রসারের জন্য আমরা বিশ্বের নানা প্রান্তে আন্তর্জাতিক বইমেলাতে অংশগ্রহণ করি।

লেখক ও প্রকাশকদের সাহায্যদান

বই প্রকাশে উৎসাহ দিতে আমরা পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বইয়ের লেখক এবং প্রকাশকদের সহায়তা দিয়ে থাকি। যে পাঠ্যবই পাঠকদের নাগালের বাইরে কিংবা দুর্লভ সেই বইগুলিকে এই প্রকল্পে ভর্তুকি দেওয়া হয়।

শিশুসাহিত্যের প্রসার

শিশুসাহিত্যের নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, পরিকল্পনা ও অন্যান্য নানা বিষয়ে সাহায্য করতে আমরা শিশুসাহিত্যের জাতীয় কেন্দ্র স্থাপন করেছি। সারা দেশ জুড়ে বিদ্যালয়স্তরে প্রায় দশ হাজার পাঠক-ক্লাব আমরা গড়ে তুলেছি।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, এ-৫ গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-১১০ ০১৬
পূর্বাঞ্চল কার্যালয় : ৫-এ ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
ফোন : ০১১-২৬৫৬ ৮০৫২/২৬৫৬ ৪০২০, ০৩৩-২২৪১ ৩৮৯৯

A BOOK THAT UNFOLDED A MYSTERY AND ROCKED THE ACADEMIC WORLD

Where the Dreams Cross : T S Eliot and French Poetry

Chinmoy Guha

Rs 200

He has gone deeper into the origins of Eliot than any other commentator I have encountered. **Frank Kermode, *Sunday Times*, London**

It casts fresh light on Eliot's poetry, and his enthusiasm for the poet is infectious.
***Times Higher Education Supplement*, London**

Wonderful job.....Most thorough and convincing.
Amiya Dev in *The Statesman*

Seems certain to cause a rumpus sooner or later. **John Bodley, Eliot Estate**

He is a strikingly natural writer of great Ancient-Mariner gifts : he grips one, he convinces. Extremely gifted and powerful. **Faber and Faber**

It is consistently interesting...Dr Guha's work takes scholarship forward, challenging received ideas and offering new perceptions. **Macmillan, U.K.**

Fascinating...There is much that is dramatic and revealing. Meticulously researched and annotated. **Stuart Williams, Chatto & Windus**

Highly Commendable ***Biblio***

Illuminating. **Amit Chaudhuri, *The Telegraph***

Tremendously exciting. It is immensely readable; it is deeply informative. It is a break-through. It will have a far-reaching effect in time in the history of 19th and 20th century European thought. It is a moment of importance in Indian scholarship.
Joe Winter in *Asian Age*

Papyrus, 2 Ganendra Mitra Lane, Kolkata - 700 004,
Tel : 033 2555 6081

Available at

Dasgupta and Co., Sarat Book House, Chakraborty & Chatterjee
Dey Book Store
College Street, Kolkata

Tagore in Akademi Publications

The English Writings of Rabindranath Tagore
Edited by : Sisir Kumar Das

Vol. I	450.00
Vol. II	450.00
Vol. III	650.00

Binodini
Tr : Krishna Kripalani 60.00

Chaturanga
Tr : Asok Mitra 45.00

Gora
Tr : Sujit Mukherjee 185.00

In Your Blossoming Flower Garden
(Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo) 250.00
Ketaki Kushari Dyson

SAHITYA AKADEMI

Head Office
Rabindra Bhavan
35 Ferozeshah Road
New Delhi 110 001

Regional Office
Jeevan Tara
23A/44X, D.H. Road
Kolkata 700 053

শতাব্দীপ্রাচীন বজবজ পৌরসভা মানুষের প্রত্যাশার প্রতি সহানুভূতিশীল। সীমিত ক্ষমতা বা সাধ্যের মধ্যেও আমরা প্রতিনিয়ত জনমুখী, সংবেদনশীল ও পৌর-উপযোগী উন্নয়নের পরিকল্পনা ও কর্মরূপায়ণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই কর্মকাণ্ডে আমাদের অন্যতম শক্তি বজবজ নাগরিকবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ও সচেতন গঠনমূলক সহযোগিতা এবং অবশ্যই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন ও সহায়তা।

প্রতিকূল পরিস্থিতি, মাত্রাতিরিক্ত সমস্যা প্রভৃতি সত্ত্বেও শুধু স্বচ্ছ প্রশাসন নয়, শুধু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তাঘাটের উন্নতিসাধন নয়, মানুষের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা সংস্কৃতির মানন্নোয়নেও অঙ্গীকারবদ্ধ।

দীপেন্দু মিত্র
পৌরপ্রধান
বজবজ পৌরসভা

HMV সা রে গা মা নিবেদিত রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তির ক্যাসেট

আবৃত্তিকার : **বারীন রায়**

আবৃত্তি অনেকেই করেন। কিন্তু অল্প আবৃত্তিকারই পারেন তাকে শিল্প করে তুলতে। অধিকাংশ কবিতাপাঠকই অনাবশ্যক নাটকীয়তা দিয়ে ভারাক্রান্ত করে তোলেন মূল কবিতাটিকে। বিশেষ করে রবীন্দ্রকবিতা নিয়ে এই যথেচ্ছাচার অনভিপ্রেত।

এই প্রেক্ষিতে বারীন রায় তার গভীর নিমগ্ন পাঠে আমাদের শুধু আপ্লুত করেন তাই নয়, তার উচ্চারিত প্রতিটি কবিতা ও গানের পাঠে আমরা নিখাদ রবীন্দ্রনাথকে বার বার ফিরে পাই। গণেশ পাইন অঙ্কিত সুশোভন ক্যাসেট কভার আমাদের প্রতিটি শ্রবনমুহূর্তকে স্মরণীয় করে তোলে।

মূল্য ৪৫ টাকা

With Best Wishes From

ENGINEERING UTILITY SERVICE

Nabarun, Farakka-742236
Ph. : (03485) 252315/252199
Specialist in Fabrication Rubber Items,
MS/HT/SS Fasteners, other Engineering Goods.

Flexiback : Rs. 180 / $ 7
Hardback : Rs. 250 / $ 10

BIVAV

Special Combined Issue
Oct 2002 - Mar 2003
Published in June, 2003
ISSN 0970-1885

Reg. No. : 30017/76
87th Issue
Vol. : 24 No. : 2-3

দূরকে করেছি নিকট বন্ধু
পরকে করেছি ঘর

পরিবহণ পরিষেবায় বাস, ফেরি ও
ভেসেল সার্ভিস আমাদের
গতিশীলতার পরিচায়ক।
আরও বেশী গতি — আরও বেশী
প্রত্যয় — আরও বেশী স্বাচ্ছন্দ্যই
আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

হলদিয়া পৌরসভা